পাঁচটি উপন্যাস

প্রফুল্ল রায়

পাঁচটি উপন্যাস



পত্র ভারতী

PANCHTI UPANYAS
by
Prafulla Roy

ISBN No. 978-81-8374-067-8

প্রচ্ছদ
সুব্রত চৌধুরী

অলংকরণ
সুব্রত মাঝি

মূল্য
২৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

আমার প্রিয় পাঠকদের উদ্দেশে

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই

একটা দেশ চাই

প্র স ঙ্গ ত

দেখতে-দেখতে এই পৃথিবীতে পঁচাত্তরটি বছর কাটিয়ে দিলাম। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে এই শতকের প্রথম দশকের শেষাশেষি অবধি ব্যস্ত আমার জীবন। পঁচাত্তর পার করেও আমি বেঁচে আছি।

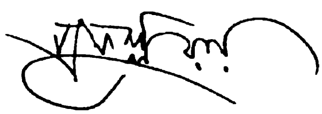
এই দীর্ঘ সময়টা ভারতের তো বটেই, বিশেষ করে বাঙালির জীবনে কত উত্থানপতন যে ঘটে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, তুমুল স্বাধীনতা সংগ্রাম, নৌবিদ্রোহ, লালকেল্লায় আই এন এ'র বীর সেনানীদের বিচারের নামে প্রহসন এবং তার প্রতিবাদে সারা ভারত জুড়ে তীব্র বিক্ষোভ, দাঙ্গা, দেশ-বিভাজন থেকে নানা ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। এর মধ্যে পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র—বাংলাদেশ। এদিকে জঙ্গিহানা, মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, লোকক্ষয়, নাশকতা, অনবরত কত কিছুই তো ঘটে চলেছে।

রাষ্ট্র তো তোলপাড় হচ্ছেই, বাঙালি মধ্যবিত্ত-জীবনকের এই উত্তাল সময় নানা দিক থেকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে। দেশভাগের পর একদা শরণার্থী হয়ে এদেশে চলে এসেছিলাম। আমি মধ্যবিত্তদেরই একজন। আঁচটা আমার গায়ে কম লাগছে না।

দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে অনেক কিছু দেখা যায়, অভিজ্ঞতা পরিধি বিস্তৃত হয়। পঁচাত্তর-পেরুনো জীবনে কত কিছুই তো প্রত্যক্ষ করেছি। যা দেখেছি, উপলব্ধি করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি। বিপুলভাবে আলোড়িতও হয়েছি।

লেখালেখি শুরু করেছিলাম উনিশশো চুয়ান্ন সালে। তারপর পঞ্চান্ন বছর ধরে অবিরল লিখেই চলেছি। পঞ্চান্নটা বছর কম সময় নয়। এর মধ্যে নানা বিষয়বস্তু নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং খবরের কাগজের কলমে যা লিখেছি, ভাবলে নিজেই অবাক হয়ে যাই। যতদিন শ্বাসপ্রশ্বাস চালু থাকবে, লিখেও যাব। লেখকের এটাই নিয়তি।

পঞ্চান্ন বছরে যা লিখেছি, আমার সেই সব সৃষ্টি থেকে পাঁচটি উপন্যাস বেছে নিয়ে এই সংকলন প্রকাশিত হল। আশা করি, পাঠকের ভালো লাগবে।



পাঁ চ টি উ প ন্যা স



রণক্ষেত্র

বাড়ির কাছ থেকেই রিকশা নিয়েছিল দীপা। অনেকগুলো অলিগলি ঘুরে এখন সেটা সঠিক রাস্তায় এসে পড়েছে।

দীপা শুনেছে ব্রিটিশ আমলে রাস্তাটার নাম ছিল রবসন স্ট্রিট। স্বাধীনতার পর কলকাতা কর্পোরেশন নাম বদলে করেছে হরপ্রসাদ সরণি। হরপ্রসাদ চৌধুরি ছিলেন বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী, পরাধীন ভারতে ইংরেজদের জেলে জীবনের অর্ধেক ক্ষয় করেছেন। তাঁর নামেই এ-রাস্তার নাম।

জায়গাটা দক্ষিণ কলকাতায়। এখানে এলে মনেই হয় না, এটা ক্যালকাটা মেট্রোপলিশের একটা অংশ। আশি কি নব্বুই লক্ষ মানুষের এই সুবিশাল শহরের ভিড়, চিৎকার, হইচই, টেনশন, উত্তেজনা, পোড়া গ্যাসোলিনের তীব্র গন্ধ—কিছুই এখানে নেই। রাস্তাটা নির্জন, চুপচাপ একটা দ্বীপের মতো। 'পপুলেশন এক্সপ্লোশনে'-র এই শহরের মধ্যে থেকেও যেন হরপ্রসাদ সরণি কলকাতার বাইরে।

ঝকঝকে রাস্তাটার দু-ধারে প্রচুর গাছপালা—দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া বা ঝাড়াল রেনট্রি। আর চোখে পড়ে বিরাট-বিরাট কমপাউন্ডওয়ালা একেকটা বাড়ি। বেশির ভাগই ব্রিটিশ আমলে তৈরি। গথিক স্ট্রাকচার, মোটা-মোটা থাম, সামনে সবুজ কার্পেটের মতো লন, ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট, লোহার ঘোরানো সিঁড়ি, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সবে শীতের শুরু। সময়টা ডিসেম্বরের গোড়ার দিক। দারুণ একটা ঠান্ডা এখনও পড়েনি। তবে উত্তুরে হাওয়া এর মধ্যেই এ-শহরে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে ন'টা বেজেছে। কাছাকাছি কোনও একটা থানার সাইরেনের আওয়াজ থেকেই তা টের পাওয়া গেছে।

দ্রুত একবার কবজি উলটে ছোট্ট ঘড়িটা দেখে নিল দীপা। ন'টা বেজে সাত। সে জানে দশটার ভেতর না পৌঁছুতে পারলে মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হবে না। কাঁটায়-কাঁটায় দশটাতেই তিনি বেরিয়ে যান। হাতে এখনও প্রচুর সময়, তবু অসহ্য উদ্বেগে দীপার স্নায়ুগুলো স্টিলের তারের মতো টানটান হয়ে গেল। শুধু উদ্বেগই নয়, অদ্ভুত এক উত্তেজনা এবং মারাত্মক ভয়ও।

এমনিতে দীপা খুবই সাহসী এবং তেজী ধরনের মেয়ে। ব্যক্তিত্বও তার প্রবল। কিন্তু মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে সাতটা দিন ভয়ে এবং অস্থিরতায় ঘুমোতে পারেনি। দু-পা বাড়িয়ে তিন পা পিছিয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত ভয়টা অবশ্য কাটিয়ে উঠেছে, মণিমোহনের সঙ্গে দেখা না করে তার উপায় নেই। কেন না, যত দেরি হবে তার পক্ষে অবস্থা ততই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

দীপার বয়স বাইশ-তেইশ। লম্বাটে ডিমের মতো মুখ। রং বেশ ফরসাই। ভাসা-ভাসা মাঝারি চোখ, পাতলা ঠোঁট, ধারালো নাক। ছোট কপালের ওপর থেকে চুলের ঘের। চুল বেশ ঘন আর কালো। সেগুলো একবেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে।

পরনে একটা জেলজেলে সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, পায়ে কম দামের স্লিপার। সারা শরীরে এক টুকরো ধাতুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। না হার, না চুড়ি, না কিছু। বাঁ-হাতের কবজিতে স্টিলের সরু ব্যান্ডে ওয়েস্ট অ্যান্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরোনো গোল লেডিজ ঘড়ি। ঘড়িটা ছিল দীপার মায়ের। এটা তাদের বহুকাল আগের প্রায় ভুলে-যাওয়া সুদিনের স্মৃতিচিহ্ন। পায়ের কাছে মাঝারি সাইজের চামড়ার সুটকেস। সুটকেসটা যে কত বছর আগের, দীপা জানে না। ওটার মধ্যে রয়েছে কিছু শাড়ি জামা এবং টুকিটাকি ক'টা জিনিস।

এখন, এই ডিসেম্বর মাসে আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘ বা কুয়াশা নেই। শীতের ঝকঝকে নীলাকাশ থেকে সকালের মায়াবী রোদ সোনালি ঢলের মতো নেমে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার এই রাস্তাটায়। ঝলমল করছে চারদিক।

এত বেলাতেও রাস্তায় লোকজন বেশ কম। মাঝে-মাঝে দু-চারটে প্রাইভেট কার, স্কুটার কি সাইকেল হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কোনওদিকেই লক্ষ্য নেই দীপার। যদিও সে মণিমোহনদের বাড়ির নম্বর জানে এবং মাস দুই-তিন আগে এসে দেখেও গেছে, তবু পলকহীন পরপর বাড়িগুলো দেখে যাচ্ছে।

আরও খানিকটা যাওয়ার পর মোড়ের মাথায় সাতষট্টি নম্বর বাড়িটা চোখে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল দীপার। 'এই, থামো, থামো'—কাঁপা গলায় রিকশা থামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, সুটকেস হাতে নেমে পড়ল দীপা।

সামনেই লোহার প্রকাণ্ড গেটওয়ালা বাড়িটার গায়ে পেতলের হরফে নম্বরটা বসানো রয়েছে। গেটের দুপাশ থেকে উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল, তার মাথা ঘন লতায় ঘেরা। গেটের ডান পাশের দেওয়ালে পেতলেরই ঝকঝকে প্লেটে বাড়িটার নাম এনগ্রেভ করে লেখা : এমারেল্ড হাউস।

রিকশাওয়ালা চলে গেছে। তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দীপা। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আগেই থমকে গিয়েছিল। এখন সেখানে কয়েকশো ঘোড়া একসঙ্গে দৌড়তে লাগল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ আগে রিকশায় ওঠার সময় থেকে যে-ভয় এবং উৎকণ্ঠা এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গ ছাড়েনি, সেগুলো হঠাৎ হাজার গুণ বেড়ে গেল।

মাত্র দশ গজ দূরে এমারেল্ড হাউসের বিশাল লোহার গেট। দীপা একবার ভাবল, ওখানে যাবে না। যদি মণিমোহন চ্যাটার্জি তার সঙ্গে দেখা না করেন, বা দেখা করলেও অপমান করে তাড়িয়ে দেন? তার চাইতে বরং আর-একটা রিকশা ডেকে ফিরেই যাওয়া যাক।

পরক্ষণেই দীপার মনে হল, এমারেল্ড হাউসের দশ গজের মধ্যে এসে এখন আব ফিরে যাওয়া যায় না। তার শরীরিক এবং মানসিক যা-অবস্থা তাতে মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হওয়াটা একান্ত জরুরি।

দীপা শুনেছে, মণিমোহন চ্যাটার্জি অত্যন্ত রাগী এবং বদমেজাজি, গম্ভীর এবং রাশভারি। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তাঁর। তিনি একজন বড় ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট। এ ছাড়া বড়-বড় তিন-চারটে কোম্পানির ডাইরেক্টরও। তবু দীপা যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই লোকটার সঙ্গে শেষ যুদ্ধটা করতেই হবে।

হয় এই যুদ্ধে সে জিতবে, নইলে চিরকালের মতো অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হবে। মনের সবটুকু সাহস এবং জেদ জড়ো করে এলোমেলো পায়ে দীপা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

গেটের কাছে আসতেই কোত্থেকে একটা ধবধবে উর্দিপরা নেপালি দারোয়ান মাটি ফুঁড়েই যেন ওধারে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কিসকো মাঙতা?'

দীপা বলল, 'মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

দারোয়ানের মোঙ্গলিয়ান মুখে রীতিমতো বিস্ময় ফুটল। চাপা চোখ দুটো অনেকখানি বড় করে দীপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিল সে। খেলো পোশাক, হাতে রং-উঠে-যাওয়া পুরোনো সুটকেস। এভাবে কেউ এ-বাড়িতে আসে না। দারোয়ান জানতে চাইল, বড়ে সাব অর্থাৎ মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে মোলাকাত করার ব্যাপারে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে কিনা।

দীপা মাথা নাড়ল—অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই।

দারোয়ান কপাল কুঁচকে বলল, 'তব্ তো বহোত মুশকিল হো গিয়া।'

দীপার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। উদ্বিগ্ন মুখে সে বলল, 'কীসের মুশকিল?'

দারোয়ান জানায়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া বড়ে সাব কারও সঙ্গে দেখা করেন না।

দীপা ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করল, 'তাহলে কি দেখা হবে না?' একটু ভেবে আবার বলল, 'আমি খুব বিপদে পড়ে তাঁর কাছে এসেছি।'

দারোয়ান সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ দীপাকে লক্ষ্য করল। তারপর জিগ্যেস করল, 'বড়ে সাবের সাথ আপনার কী দরকার? নৌকরি-উকরির জন্যে এসেছেন?'

দীপা অবাক হয়ে গেল, 'নৌকরি-উকরি—মানে চাকরি?'

'হাঁ।'

দারোয়ান একপাশে ঘাড় হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল, অনেকেই চাকরি-বাকরির জন্য বড়ে সাবকে উত্যক্ত করে তোলে। তাই বড়ে সাবের কড়া হুকুম, চাকরির উমেদারদের যেন বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া হয়। দীপা যদি তেমন উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, বড়ে সাবের সঙ্গে দেখা হবে না।

দারোয়ানের কথায় সামান্য ভরসা পাওয়া গেল। জোরে শ্বাস টেনে দীপা দ্রুত বলে উঠল, 'না-না, আমি চাকরির জন্যে আসিনি।'

একটু চুপ করে থেকে দারোয়ান বলল, 'আপনার সাথ বড়ে সাবের জান-পয়চান আছে?'

দারোয়ানটা একেবারে বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলের মতো জেরা শুরু করে দিয়েছে। জবরদস্ত শিল্পপতির লোক তো—মনে-মনে ভাবল দীপা। বলল, 'না-না, উনি আমাকে চেনেন না। কখনও দেখেননি।'

কী একটু ভাবল দারোয়ান। হয়তো দীপার চেহারা বা পোশাক-টোশাক দেখে তার কিছুটা করুণাই হয়ে থাকবে। বলল, 'থোড়া ঠহ্‌র যাইয়ে। বড়ে সাবের কাছে আপনার কী নাম বলব?'

'নাম বলে লাভ নেই। বলবেন জরুরি কাজে একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'ঠিক হ্যায়।'

বন্ধ গেটের বাইরে দীপাকে দাঁড় করিয়ে দারোয়ান চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দীপার বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যেতে লাগল যেন। মণিমোহন চ্যাটার্জি কি তার সঙ্গে দেখা করবেন?

মিনিট তিনেক বাদে দারোয়ানটা ফিরে এল। আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'মোলাকাত নেহী হোগা।'

এমনিতে মোঙ্গলিয়ানদের ভাবলেশহীন মুখে সুখ-দুঃখ আনন্দ বা হতাশা, কিছুই তেমন ফোটে না। তবু দারোয়ানটাকে দেখে মনে হল, মণিমোহন চ্যাটার্জির সঙ্গে দীপাকে দেখা করিয়ে দিতে পারলে সে খুশিই হত।

দেখা হবে না! অত্যন্ত হতাশ দেখাল দীপাকে। তার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। চারপাশের দৃশ্যাবলী দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মনে হল, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, হুড়মুড় করে হাঁটু ভেঙে, ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তার পরেই অদম্য এক সাহস এবং রাগ তার ওপর ভর করল যেন। নিজের অজান্তে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখা না করে আমি যাব না। কিছুতেই না।'

দারোয়ানটা চমকে উঠল। কিছুক্ষণ আগেও যাকে ভীরু এবং কুণ্ঠিত মনে হয়েছে, খুব নীচু গলায় ভয়ে-ভয়ে যে কথা বলছিল, আচমকা তাকে এভাবে চিৎকার করতে দেখলে হকচকিয়ে যাওয়ারই কথা। দারোয়ান বোঝাতে চাইল, বড়ে সাব খুব ব্যস্ত আছেন, এখন কারও সঙ্গে কথা বলার সময় নেই তাঁর। ইচ্ছা হলে, দীপা তার ঠিকানা দিয়ে যেতে পারে। পরে সুবিধেমতো বড়ে সাব যোগাযোগ করে নেবেন। তখন দীপা তার জরুরি কথা বলার সুযোগ পাবে।

গলার স্বর আর-এক পরদা চড়িয়ে দিল দীপা, 'পরে নয়। এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে।'

দারোয়ান এবার ভয়ে-ভয়ে বাড়িটার ভেতর দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'দিদিজি, আপ যাইয়ে। চেল্লামেল্লি করলে বড়ে সাব বহুত গুস্‌সা করবেন।'

কণ্ঠস্বর একই জায়গায় রেখে দীপা বলল, 'গুস্‌সা করলে করবেন। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুমি যদি দেখা করিয়ে না দাও, আমি গেটের বাইরে বসে থাকব। বাড়ি থেকে বেরুতে তো হবেই। তখন তোমার বড় সাহেবকে ধরব।' দারোয়ানকে প্রথম-প্রথম সে আপনি করেই কথা বলছিল। এখন প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে 'তুমি' করে বলতে শুরু করেছে।

দারোয়ান খুবই বিপন্ন বোধ করল। সাহেব সকালের দিকটা নিজের ফ্যাক্টরি এবং অফিসের নানা কাজকর্ম নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকেন। এই সময় হইচই করলে কাজে মন দিতে পারেন না। ফলে ভীষণ রেগে যান। এদিকে এই অচেনা মেয়েটা চেঁচামেচি করে তাকে কি ফেসাদেই না ফেলেছে। তাকে থামাবার জন্য হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'আপ আজ যাইয়ে দিদিজি। অন্য দিন আসুন, জরুর মোলাকাত করিয়ে দেব।'

কিন্তু দারোয়ানের কাকুতিমিনতি কিছুই কানে তুলল না দীপা। উন্মাদের মতো সে সমানে চিৎকার করে যেতে লাগল।

যখন এই সব চেঁচামেচি চলছে সেই সময় ভেতর দিক থেকে একটা আধবুড়ো বেয়ারা গোছের লোক দৌড়তে-দৌড়তে গেটের কাছে চলে এল। শশব্যস্তে বলল, 'কী হচ্ছে সব? কে এত হল্লা করছে? সাহেব রাগ করছেন?'

দারোয়ান কিছু বলার আগেই দীপা বলে উঠল, 'আমি হল্লা করছি। তোমাদের সাহেব যতক্ষণ আমার সঙ্গে দেখা না করছেন, আমি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সাত পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলব। যাও, বলো গিয়ে তোমার সাহেবকে।'

বেয়ারাটা হতভম্বের মতো দু-চার সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল এবং একটু পরেই আবার ফিরে এসে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।' দারোয়ানকে বলল, 'গেট খোল।' যন্ত্রচালিতের মতো দারোয়ান ধাতব শব্দ করে লোহার বিশাল গেট খুলে দিল।

দুই

আগে ভালো করে লক্ষ্য করেনি দীপা। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, নুড়ির রাস্তা সোজা সামনের দিকে চলে গেছে। সেটার একদিকে সবুজ কার্পেটের মতো লন। সেখানে অনেকগুলো গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বেতের সোফা-টোফা সাজানো। একটা মালি মোয়ার দিয়ে সমান মাপে ঘাস ছেঁটে যাচ্ছে। রাস্তাটার আর-এক দিকে নানারকম মরশুমি ফুলের বাগান। সেখানে অন্য একটা মালি বড় কাঁচি দিয়ে ফুলগাছের বুড়ো পাতা বা শুকনো ডাল ছেঁটে দিচ্ছে। লনের ওধারে উঁচু কমপাউন্ড ওয়ালের গায়ে টানা ব্যারাকের মতো খানকয়েক ঘর গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, ওগুলো সার্ভেন্ট এবং মালিদের কোয়ার্টার্স।

নুড়ির রাস্তাটা সোজা গিয়ে বিরাট থামওয়ালা একটা তেতলা বাড়ির সিঁড়ির কাছে থেমেছে।

বেয়ারাটার সঙ্গে নুড়ির রাস্তা পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল দীপা। এখানে মোটা-মোটা অগুনতি থাম লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির পেছনে চৌকো-চৌকো শ্বেত-পাথর বসানো অনেকখানি জায়গা জুড়ে বারান্দা। তারপর থেকে সারি-সারি ঘরগুলো। দরজা-জানালা বিরাট-বিরাট। জানালাগুলোর দুটো পরে পাল্লা। একটা খড়খড়ি, অন্যটা পালকাটা রঙিন কাচ।

বেয়ারা একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'এখানে একটু বসুন। বড় সাহেব এখনই আসবেন।'

বেয়ারা চলে গেল। আর দীপা আস্তে-আস্তে সামনের প্রকাণ্ড ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

গোটা ঘরটার মেঝে ছ'ইঞ্চি পুরু দামি কার্পেটে মোড়া। চারদিকে কম করে সাত-আট সেট সোফা। এ ছাড়া সুদৃশ্য কাশ্মীরি কাঠের স্ট্যান্ডে পেতলের নকশাদার ফ্লাওয়ার ভাস। দুপাশের দেওয়াল কেটে কাচের পাল্লা বসিয়ে নানা ধরনের বই রাখা আছে। হিস্ট্রি সোশিওলজি অ্যানথ্রোপোলজি থেকে শুরু করে নানা সাবজেক্টের বই। তা ছাড়া আছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এবং ওয়ার্ল্ড বুক সিরিজের সেট। এত বিচিত্র ধরনের বই জীবনে কখনও চোখে দেখেনি দীপা।

একটা দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু স্ট্যান্ডে টিভি। আরেকটা দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে অ্যাকুয়েরিয়ামে নানা দেশের লাল নীল সবুজ হলুদ, এমনি বিচিত্র রঙের মাছেরা খেলা করছে। সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠনের মতো আলোর ঝাড় নেমে এসেছে। দুই দেওয়ালে দুটো এয়ারকুলার।

সুটকেস নামিয়ে একটা সোফার কোণের দিকে জড়োসড়ো হয়ে বসল দীপা। এখান থেকে লন মালি গেট ফুল অর্কিড—সবই দেখা যাচ্ছে।

দীপা আগেই শুনেছিল মণিমোহন চ্যাটার্জিরা বিরাট বড়লোক। শুনতে-শুনতে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছিল। এখন বাড়ির ভেতর পা দিয়ে মনে হচ্ছে, যা সে ভেবেছিল, মণিমোহনরা তার চাইতে অনেক গুণ বেশি বড়লোক।

হঠাৎ আবছাভাবে পায়ের আওয়াজ কানে এল। এই বিশাল ড্রইংরুমটার অনেকগুলো দরজা। চমকে মুখ ফেরাতেই দীপা দেখতে পেল, ভেতর দিকের দরজার কাছে মধ্যবয়সি একটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ের রং বাদামি। ছ'ফুটেরও বেশ হাইট। লম্বাটে ভরাট মুখ, চওড়া কপাল, ধারালো চিবুক, পুরু ঠোঁট এবং কঠিন চোয়াল।

'বৃষস্কন্ধ' বলে একটা কথা আছে, ভদ্রলোককে দেখলে তাই মনে পড়ে যায়। ছড়ানো বিশাল কাঁধ তাঁর, হাত দুটো হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। মোটা-মোটা হাড়ের ফ্রেমে মজবুত সুদৃঢ় স্বাস্থ্য। কাঁচাপাকা চুল ব্যাক-ব্রাশ করা।

সব চাইতে বিস্ময়কর তাঁর চোখ। গায়ের রং-এর মতোই মণি দুটো বাদামি। তাঁর তাকানোর ভঙ্গি, মোটা রোমশ ভুরু, শক্ত চিবুকের গঠন—এ-সবের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব যতটা, তার চাইতে অনেক বেশি নিষ্ঠুরতা যেন ফুটে রয়েছে। এই মানুষটাকে ঘিরে কোথায় যেন মোটা-মোটা অদৃশ্য দেওয়াল খাড়া হয়ে আছে। সেগুলো ভেঙে তাঁর কাছাকাছি যাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার।

এমন এক প্রচণ্ড শক্তিমান প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা প্রায় অসম্ভব। এমারেল্ড হাউসে আসার আগে বারকয়েক শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দীপার। আরও একবার হল পনেরো ফুট দূরে দরজার ফ্রেমের নীচে দাঁড়ানো মানুষটিকে দেখে। নিজের অজান্তে কখন যে উঠে দাঁড়িয়েছে, দীপা টের পায়নি। সে বুঝতে পারছিল ইনিই মণিমোহন চ্যাটার্জি।

মণিমোহনের চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দীপাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন তিনি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আসার জন্য বিরক্তিতে তাঁর কপাল কুঁচকে আছে। দীপার জেলজেলে শাড়ি, রুক্ষ্ম চুল, খেলো চটি ইত্যাদি দেখতে-দেখতে বিরক্তির সঙ্গে তাচ্ছিল্য এবং কিছুটা ঘৃণাই যেন মিশল।

মিনিটখানেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর মণিমোহন ঘরের মাঝখানে চলে এলেন। গম্ভীর কর্কশ গলায় বললেন, 'গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অসভ্যের মতো চিৎকার করছিলে কেন?'

ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে-যেতে আচমকা দীপার মধ্যে কি একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন। সে বুঝতে পারছিল, সমানে-সমানে যুদ্ধ না করে মিইয়ে বা কুঁকড়ে থাকলে মণিমোহন তাকে গুঁড়িয়ে ফেলবেন। দুর্জয় সাহস এবং জেদ নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সেসব আবার ফিরে এল যেন। শ্বাসক্রিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। ফুসফুসে অনেকখানি বাতাস টেনে দীপা বলল, 'অসভ্যের মতো চিৎকার না করলে আপনি বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না।'

ভেতরে-ভেতরে একটু থমকে গেলেন মণিমোহন। এরকম সাজগোজ এবং চেহারার একটি মেয়ে তাঁর সামনে এসে ঘাড় নুইয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু সে যে এভাবে মুখের ওপর জবাব দেবে, মণিমোহন ভাবতে পারেননি। বললেন, 'তুমি জানো না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না?'

'জানতাম না। আপনার দারোয়ান একটু আগে আমাকে বলেছে। অবশ্য—' কথা শেষ না করে দীপা থেমে গেল।

'অবশ্য কি?' কপাল আরও কুঁচকে গেল মণিমোহনের।

'আগে থেকে চেষ্টা করলেও আমার মতো একটা মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন কি?'

এমন মেয়ে আগে আর কখনও দেখেননি মণিমোহন।

সত্যিই তিনি একে দেখা করার সুযোগ দিতেন না। মনে-মনে তিনি স্বীকার করলেন, মানুষ চেনার অপরিসীম ক্ষমতা এই মেয়েটার। দীপার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কী নাম তোমার?'

'আমি মার্গারেট থ্যাচার কি ইন্দিরা গান্ধীর মতো বিখ্যাত মহিলা নই যে নাম বললেই চিনতে পারবেন। তবু যখন জানতে চাইলেন তখন বলছি—আমার নাম দীপা, দীপা মণ্ডল।'

মণিমোহন বুঝতে পারছিলেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে বা গম্ভীর গলায় কথা বলে এই মেয়েটি অর্থাৎ দীপাকে নোয়ানো যাবে না। তিনি বললেন, 'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

দীপা বলল, 'ঠিক এক কথায় তা বলা যাবে না। দয়া করে আপনি যদি বসেন, আমিও বসতে পারি। তারপর আপনার কাছে আসার কারণটা জানাচ্ছি।'

দীপা যেভাবে তাঁকে বসতে বলল তাতে মনে হচ্ছে, এই বাড়ি-টাড়ি তাঁর নয়—দীপার। তিনিই এখানে দীপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। রেগে উঠতে গিয়েও কিছুটা মজাই যেন লাগল মণিমোহনের, কিন্তু বাইরে তা ফুটে উঠতে দিলেন না। নীরস রুক্ষ গলায় বললেন, 'বসবার সময় নেই। যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো।'

'এত কথা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলা যায় না। দয়া করে বসুন।' অত্যন্ত বিনীত ভাবেই বলল দীপা, তবু তার বলার ভঙ্গিতে কোথায় যেন খানিকটা জেদ রয়েছে।

'ঠিক আছে, বোসো।' কবজি উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে মণিমোহন বললেন, 'দশ মিনিট সময় দিতে পারি। তার মধ্যে তোমার বক্তব্য শেষ করতে হবে।' বলতে-বলতে একটা সোফায় বসে পড়লেন মণিমোহন।

যুদ্ধের প্রথম রাউন্ডে তার জেদটার জয় হওয়াতে দীপার আত্মবিশ্বাস বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। একটু দূরে আগের সেই সোফায় মণিমোহনের মুখোমুখি বসে পড়ল সে।

মণিমোহন বললেন, 'এবার বলো—' পরক্ষণেই তাঁর চোখ এসে পড়ল দীপার সেই রং-ওঠা কালচে সুটকেসটার ওপর। দীপার সোফার পাশে কার্পেটের ওপর সেটা সন্তর্পণে দাঁড় করানো আছে।

মণিমোহন একটু অবাক হয়েই এবার বললেন, 'এ কি, সুটকেস নিয়ে এসেছ কেন?' এরকম লটবহর নিয়ে কেউ কখনও কারও সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে, এটা তাঁর কাছে অভাবনীয়।

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল না দীপা। স্থির চোখে এক পলক মণিমোহনকে দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এবার সে আসল জায়গায় পৌঁছে গেছে। শরীরে এবং মনে যেখানে যতটুকু শক্তি এবং সাহস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে দীপা আস্তে-আস্তে বলল, 'আমি এখানে থাকতে এসেছি। সুটকেসে আমার জামাকাপড় আছে।'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না মণিমোহন। তীব্র চাপা গলায় বললেন, 'হোয়াট?'

দীপা ফের একইরকম কণ্ঠস্বরে বলতে লাগল, 'এখানে থাকতে এসেছি। বলতে পারেন, আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'

দীপার কথা শেষ হতে-না-হতেই চিৎকার করে উঠলেন মণিমোহন, 'অধিকার—মানে রাইট। হোয়াট ডু ইউ মিন?'

দীপা মণিমোহনের দিকে তাকাল না। চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে রইল।

মণিমোহন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'চুপ করে রইলে কেন? বলো—কীসের অধিকার?'

চোখ তুলল না দীপা। মেঝের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বলতে লজ্জা করছে, তবু নিজের ভবিষ্যৎ আর আপনাদের পরিবারের সুনামের জন্যে না বলে উপায় নেই।'

শরীরের সমস্ত স্নায়ু টানটান করে অপেক্ষা করতে লাগলেন মণিমোহন।

দীপা এবার বলল, 'আমার পেটে অনীশের বাচ্চা রয়েছে।'

মণিমোহনের মাথার ভেতর একটা জ্বলন্ত পেরেক ঢুকে গেল যেন। কর্কশ গলায় তিনি বললেন, 'কে অনীশ?'

'আপনার ছেলে?'

নিজের অজান্তেই মণিমোহন খাড়া দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরের রক্তচাপ হঠাৎ যেন অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। চোখের সাদা অংশে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে লাগল। গলার শিরগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে উঠল। অত্যন্ত হিংস্র এবং নিষ্ঠুর দেখাল মণিমোহনকে। তাঁর গলার পেশি ছিঁড়ে একটা জান্তব চিৎকার বেরিয়ে এল, 'ইম্‌পসিবল—ইম্‌পসিবল। আমি বিশ্বাস করি না।'

দীপাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'আপনার জায়গায় আমি হলেও বিশ্বাস করতে চাইতাম না। নিজের ছেলের সম্বন্ধে এসব কে আর বিশ্বাস করতে চায়?'

'স্টপ দিস লাই।'

দীপা যেটুকু লেখাপড়া জানে তাতে এই ইংরেজি শব্দ তিনটের মানে বুঝতে অসুবিধে হল না। সে বলল, 'আমি যে বলেছি তার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। ধমকে, চিৎকার করে আপনি আমাকে থামাতে পারবেন না।'

মণিমোহনের চোয়াল পাথরের খিলানের মতো শক্ত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে গলার স্বর আরও কয়েক পরদা চড়িয়ে দিলেন, 'ইউ ডার্টি উম্যান, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ?'

ডার্টি উম্যান কথাটার অর্থ দীপা জানে কিন্তু ব্ল্যাকমেল শব্দটা তার সম্পূর্ণ অজানা। অপমানে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তীব্র গলায় বলল, 'আমি বাজে নোংরা মেয়ে নই, ভদ্র পরিবারের মেয়ে।' একটু থেমে বলল, 'ব্ল্যাকমেল বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

'ভয় দেখিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকতে চাইছ। কিন্তু তা হবে না।' বলতে-বলতে মণিমোহনের চোখমুখ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, 'কে তোমাকে এ বাড়িতে পাঠিয়েছে?'

দীপা বলল, 'কেউ না। আমি নিজেই এসেছি। ভয় দেখিয়ে আপনার পুত্রবধূ হওয়ার কোনওরকম ইচ্ছাই আমার নেই। সেটুকু আত্মসম্মান বোধ আমার আছে। কিন্তু এখন আমি নিরুপায়।'

'এই মুহূর্তে তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, আমি পুলিশ ডাকব।'

দীপা অদ্ভুত হাসল। বলল, 'ডাকতে পারেন, আমার আপত্তি নেই। এখানে আসার আগে আমিও থানায় যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা না করে কিছু করা ঠিক হবে না। ভাবলাম, সব শুনে আপনি আমাকে বিপদ আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবেন।'

মেয়েটার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেলেন মণিমোহন। সে যদি সত্যি-সত্যিই ব্ল্যাকমেলের উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এমন দুঃসাহসী ক্রিমিনাল খুব কমই জন্মেছে। কিন্তু তার অপকট মুখ, কথা বলার ভঙ্গি দেখে এক-একবার সংশয় হচ্ছে, মেয়েটা বোধহয় মিথ্যে বলছে না। জীবনে অসংখ্য মানুষ দেখেছেন মণিমোহন, বিপুল তাঁর অভিজ্ঞতা। তিনি জানেন, সত্যের নিজস্ব একটা জোর আছে। কিন্তু মেয়েটা যা বলছে তা যদি আদৌ মিথ্যে না হয়? না, না, ভাবনাটাকে এক ধাক্কায় মাথা থেকে বার করে দিলেন মণিমোহন। তারপর আবার যখন চিৎকার করতে যাবেন সেই সময় চোখে পড়ল, ঘরের বাইরে বেয়ারা এবং মালিরা এসে জড়ো হয়েছে। উগ্র রক্তাক্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাতে নাড়লেন মণিমোহন, 'যাও—কী দরকার এখানে?' বলে তাঁর খেয়াল হল, এভাবে চেঁচামেচি করা ঠিক হয়নি। এ-জাতীয় নোংরা জঘন্য ব্যাপার, তা যতই মিথ্যে হোক, চাকর-বাকরদের কানে যাওয়া ঠিক নয়। তারা এই নিয়ে চারদিকে চাউর করে বেড়াবে।

মালি এবং বেয়ারারা উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেছে। মণিমোহন আবার দীপার দিকে ফিরলেন। রাগ উত্তেজনা হিংস্রতা এবং প্রবল রক্তচাপে তাঁর মাথার ভেতরটা টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু এবার আর বিস্ফোরণ ঘটতে দিলেন না। প্রাণপণে গলার স্বরটা অনেকখানি নামিয়ে আস্তে-আস্তে মণিমোহন বললেন, 'সিট ডাউন—' দীপা বসলে মণিমোহনও ফের মুখোমুখি বসলেন। মাথার ভেতরে যা-ই চলুক, খুব শান্ত গলায় জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

'ঢালিপাড়ায়।'

'মানে রেললাইনের ধারের বস্তিতে?'

'ঠিক বস্তিতে নয়। বস্তিতে ঢোকার মুখে যে গলিটা রয়েছে, অঘোর নন্দী লেন, তারই একটা বাড়িতে।'

'বাড়ির নম্বর কত?'

'তেরো।'

এত কথা যে মণিমোহন জিগ্যেস করছেন সেটা অকারণে নয়। তিনি বুঝতে পারছিলেন, দীপা ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়। তর্জন-গর্জন করে বা ধমকধামক দিয়ে তাকে দমানো যাবে না। তাকে নাড়াচাড়া করতে হবে অন্যভাবে। সে জন্য তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক কিছু জানা দরকার।

মণিমোহনের কণ্ঠস্বর এবং ব্যবহার হঠাৎ যেভাবে বদলে গেল তাতে অস্বস্তি বোধ করল দীপা। এতক্ষণ অনবরত হুমকি দেওয়ার পর তাঁর এই নতুন চালটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে-ভেতরে সে খুবই সতর্ক হয়ে রইল।

মণিমোহন এবার বললেন, 'কে-কে আছে তোমার?'

দীপা স্থির চোখে মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা-মা আর ছোট ভাই।'

'বাবা কী করেন?'

'কিছু না। একটা লোহার কারখানায় কেরানি ছিলেন। তিন বছর হল, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আর কোথাও কাজ পাননি।'

'ভাই ছোট না বড়?'

'দু-বছরের ছোট।'

'সে কিছু করে?'

'না। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। মাইনে দিতে না পারায় স্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছে। ওই পড়াশোনায় চাকরি হয় না। এখন মস্তানি করে বেড়ায়।'

'আই সি। তাহলে তোমাদের সংসার চলে কী করে?'

'আমি ঢালিপাড়ার প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করি। আর সকাল-বিকেল টিউশনি। এতে কোনও

রকমে চলে।'

'কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

'কোনওরকমে হায়ারসেকেন্ডারিটা পাশ করেছি।'

'তাহলে তুমি ছাড়া রোজগার করার আর কেউ নেই।'

'না!'

মণিমোহনের হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে বললেন, 'তোমাকে দশ মিনিট সময় দেব বলেছিলাম। বেয়াল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এবার আমাকে উঠতে হবে।'

দীপা চমকে উঠল, 'আমার—আমার কী হবে?'

মণিমোহনের চোখের বাদামি তারা থেকে এবার আগুন ছুটতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে, চাপা গলায় তিনি বললেন, 'বদমাশ মেয়ে, যার ভাই মস্তান, বাবা বেকার, যারা বস্তিতে থাকে, আমি তাকে ছেলের বউ করে ঘরে তুলব! তুমি ভেবেছ কি? ব্ল্যাকমেল করার জায়গা পাওনি?'

ব্ল্যাকমেল শব্দটার মোটামুটি একটা মানে আন্দাজ করে নিয়েছিল দীপা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আমি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসিনি।'

'তুমি যা বলছ তার প্রমাণ কী?'

ঠোঁট টিপে কী যেন ভাবল দীপা। তারপর জোরে শ্বাস টেনে বলল, 'অনীশ বাড়ি আছে?'

মণিমোহন হকচকিয়ে গেলেন। 'তাকে—তাকে দিয়ে কী হবে?'

'দয়া করে তাকে এখানে ডাকান। আমার অবস্থার জন্য কে দায়ী, প্রমাণ করে দেব।'

'ঠিক আছে।' দীপার চ্যালেঞ্জটা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিলেন মণিমোহন। একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ছোট সাহেবকে এখানে আসতে বলো। বলবে, আমি ডেকেছি।'

দু-মিনিট পর অনীশ ড্রাইংরুমে এসে ঢুকল এবং দীপাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়েছে।

এমনিতে অনীশ বেশ সুপুরুষ। মণিমোহনের মতোই হাইট। তবে গায়ের রং টকটকে নয়—বাদামি। চুল ব্র্যাকব্রাশ করা, নাকমুখ কাটা-কাটা, চওড়া কপাল, ধারালো থুতনি। এই মুহূর্তে তাকে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে। ঠোঁট টিপে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

দু-দিক থেকে দীপা আর মণিমোহন পলকহীন অনীশকে লক্ষ্য করছিলেন। অনীশ কিন্তু সোজাসুজি কারও দিকেই তাকাতে পারছিল না। চোখের কোণ দিয়ে একবার বাবাকে, একবার দীপাকে দেখছিল। বিশেষ করে দীপাকে। তাকে এ বাড়িতে বাবার সঙ্গে ড্রাইংরুমে দেখবে, অনীশ কখনও ভাবতেও পারেনি।

মণিমোহন দীপাব দিকে আঙুল বাড়িয়ে রুক্ষ গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এই মেয়েটিকে চেনো?'

অনীশ ভয় এবং অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে ওঠার জন্য ভেতরে-ভেতরে নিজের সঙ্গেই যেন প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল। চোখে-মুখে নকল বিস্ময় ফুটিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চাইল, 'না।' তবু গলাটা সামান্য কেঁপে গেল।

দক্ষিণ কলকাতার এই নিরিবিলি রাস্তা, মণিমোহনের সাজানো ড্রইংরুম, বাইরের লন, বাগান—দীপার চোখের সামনে সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। পায়ের তলায় কার্পেট- মোড়া মেঝে ঢেউয়ের মতো দুলতে লাগল। মুখ থেকে দ্রুত সব রক্ত নেমে যাচ্ছে তার। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই দীপার মাথার ভেতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু একটা ঘটে গেল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তার। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির চোখে অনীশের দিকে তাকাল সে।

এদিকে মণিমোহন অনীশকে বলছিলেন, 'একে দেখোনি কোনওদিন?'

এতক্ষণে অস্বাচ্ছন্দ্য এবং নার্ভাস ভাবটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছে অনীশ। নীরস গলায়

সে বলল, 'না।'

'আই সি'—মণিমোহন এবার বললেন, 'কিন্তু এই মেয়েটি তোমার সম্বন্ধে সিরিয়াস অ্যালিগেশন এনেছে। কী বলেছে জানো?'

উত্তর না দিয়ে অনীশ অপেক্ষা করতে লাগল।

গলা খাকরে মণিমোহন বললেন, 'মেয়েটি বলছে, সে প্রেগনেন্ট। এর জন্যে তোমাকে দায়ী করছে।'

প্রথমে চমকে উঠল অনীশ। তার পরেই গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করল, 'লাই—আটার লাই। পুরোটাই বানানো আর মিথ্যে।'

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দীপার মনে হচ্ছিল, তার চোখের তারা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। শিরদাঁড়া বেয়ে গলগল করে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। দীপা কিন্তু চিৎকার করল না। তীব্র মোচড়ে শরীরটাকে পুরোপুরি অনীশের দিকে ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'তুমি আমাকে চেনো না? কখনও দেখোনি?'

'নো—নেভার! কে আপনি?' রুক্ষ, বিরক্ত মুখে বলল অনীশ!

'মিথ্যেবাদী, নির্লজ্জ'—দীপা বলতে লাগল, 'তুমি যে আমাকে চেনো, কম করে পঞ্চাশটা লোক তার সাক্ষী আছে।'

অনীশ মণিমোহনের দিকে ফিরে বলল, 'বাবা, শি ইজ আ ডেঞ্জারাস উম্যান। আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে এ-বাড়িতে ঢুকেছে।'

মণিমোহন বললেন, 'আমারও সেইরকমই মনে হয়েছিল। তোমার মুখে শুনবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।' দীপার দিকে ফিরে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'গেট আউট। এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

মরিয়া ভঙ্গিতে দীপা বলল, 'আমি যাব না।'

মণিমোহন বললেন, 'ধৈর্যের একটা সীমা আছে। এক মিনিটের ভেতর এখান থেকে না গেলে আমার চাকর আর দারোয়ানেরা তোমাকে লাথি মারতে-মারতে বার করে দেবে।'

'বার তো করে দিতে চাইছেন। আমার পেটের বাচ্চার কী হবে?'

উত্তর না দিয়ে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে দরজার কাছে চলে গেলেন মণিমোহন। উত্তেজিত গলায় ডাকলেন, 'লছমন, তরখু সিং, লালধারী—ইধার আও।'

মুখ থেকে হুকুম খসতে-না-খসতেই আধ ডজন বেয়ারা-টেয়ারা দৌড়ে এল। মণিমোহন দীপাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই আওরতের ঘাড় ধরে গেটের বাইরে বার করে দিয়ে এসো।'

দীপা বলল, 'খবরদার, আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।' মণিমোহনকে বলল, 'আজ আমাকে তাড়িয়ে দিলেন কিন্তু আমি আপনাদের ছাড়ব না। আমার ক্ষতি করে দিয়ে আপনার ছেলে পার পেয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। কিছুতেই না—'

মণিমোহন গর্জে উঠলেন, 'গেট আউট।'

নাক-মুখ ঝাঁঝাঁ করছে দীপার। অপমানে কপালের রগগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে। কিছুই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধের মতো টক্কর খেতে-খেতে ড্রইংরুমের বাইরে বেরিয়ে এল দীপা। তারপর প্রায় টলতে-টলতে লন এবং বাগানের মাঝখানে নুড়ির রাস্তার ওপর দিয়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা যেতে-না-যেতেই কার যেন অস্পষ্ট ডাক কানে এল দীপার, 'এ আওরত, এ আওরত—'

মুখ ফেরাতেই দীপা দেখতে পেল, মণিমোহনের নেপালি দারোয়ানটা তাকে ডাকছে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে যখন প্রথম সে ওই গেটটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দারোয়ানটা তাকে

মোটামুটি সম্মান দেখিয়ে দিদিমণি বলেছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে মণিমোহন তাকে চূড়ান্ত অপমান করল, তখনই দারোয়ানের চোখে দীপা অনেকটা নেমে গেছে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সে এখন আওরত বলে ডাকছে।

চোখাচোখি হতেই দীপার সেই পুরোনো সুটকেসটা ফুটপাথে ছুড়ে দিল দারোয়ান। তখনই দীপার মনে পড়ল, সুটকেসটা মণিমোহনদের ড্রইংরুমে ফেলে সে চলে এসেছিল।

কয়েক পা পিছিয়ে এসে সুটকেসটা তুলে নিল দীপা। তারপর আবার চলতে শুরু করল। তার মনে হচ্ছিল, আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যেন।

তিন

হরপ্রসাদ সরণি যেখানে ডাইনে ঘুরে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় মিশেছে, সেই মোড়ের মাথায় রিকশার স্ট্যান্ড। দশ-বারোটা রিকশা সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীপা মোড়ে এসে রিকশায় উঠে বলল, 'ঢালিপাড়ার বস্তির কাছে চলো।' রেললাইনের ধারে ওই বিশাল বস্তিটা এই অঞ্চলের বিখ্যাত জায়গা। বিখ্যাত না বলে নোটোরিয়াস বলাই হয়তো ঠিক। সবাই জায়গাটা চেনে।

রিকশায় যেতে-যেতে দু-ধারের বাড়িঘর লোকজন গাড়ি-টাড়ি, কিছু চোখে পড়ছিল না দীপার। কিছুক্ষণ আগে মণিমোহনদের বাড়িতে যা-যা ঘটে গেল সেসব ভাবতে চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু পরপর ধারাবাহিক ভাবে কিছুই যেন ধরতে পারছে না, ভাবনাটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে বারবার অনীশের মুখটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। ধূর্ত বেড়ালের মতো সরটুকু খেয়ে গোঁফ মুছে অনীশ তার জীবন থেকে সরে পড়েছে। অথচ একদিন তাকে কি বিশ্বাসই না করেছিল! অসীম নির্ভরতায় নিজের সব কিছু তার হাতে সঁপে দিয়েছে দীপা। এর পরিণতি কী হতে পারে, একবারও চিন্তা করে দ্যাখেনি।

কিন্তু তার পেটে যে বাচ্চাটা এসেছে, একটু আগে তার দায়িত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করল অনীশ। শুধু কি তাই, অনীশ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, দীপাকে সে চেনে না, এমনকী কখনও দেখেনি পর্যন্ত। মানুষের এই বিশ্বাসঘাতকতা তার মাথার ভেতরে জ্বলন্ত পেরেকের মতো বারবার বিঁধে যাচ্ছিল।

দীপা অনীশ এবং মণিমোহনকে জানিয়ে এসেছে, সহজে তাদের ছাড়বে না। কিন্তু তারা সোসাইটির একেবারে নীচের লেভেলের মানুষ। তাদের কোনও জমকালো পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে পুলিশ অফিসার, এমএলএ বা মন্ত্রী খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর অনীশরা? ওরা আছে সোসাইটির সব চাইতে উঁচু স্তরে। অগাধ টাকা ওদের, প্রচুর ক্ষমতা এবং চারদিকে প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স। রাগ এবং উত্তেজনার ঝোঁকে দীপা তো শাসিয়ে এল কিন্তু ওইরকম প্রবল শক্তিমান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে লড়াই চালাবে কীভাবে? তার ক্ষমতা কতটুকু? এই অসম যুদ্ধে ওরা ইচ্ছা করলে তাকে গুঁড়িয়ে শেষ করে ফেলতে পারে। কিছুক্ষণ আগেও শিরদাঁড়া টানটান করে দীপা অনীশ এবং মণিমোহনের সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে সামনে লড়ে গেছে। কিন্তু এখন উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পর স্নায়ুগুলো ক্রমশ আলগা হয়ে যাচ্ছে। অনীশরা যখন স্বীকারই করল না তখন অবৈধ সন্তানের মা হয়ে চরম অসম্মান আর দুর্নাম গায়ে মেখেই কি তাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে? সে তো একরকম শেষ হয়ে যাওয়াই। ভেতরে-ভেতরে ভীষণ ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত বোধ করল দীপা। দু-হাতে মুখ ঢেকে জোরে মাথা নাড়তে-নাড়তে রুদ্ধ গলায় সে সামনে বলে যেতে লাগল, 'পারব না, পারব না, পারব না—'

কখন যে রিকশাটা রেললাইনের ধারে ঢালিপাড়া বস্তির মুখে চলে এসেছে, দীপার খেয়াল

ছিল না। রিকশাওয়ালা গাড়ি থামিয়ে বলল, 'মাইজি—আ গিয়া—'

আচ্ছন্নের মতো হাতের ভেতর থেকে মুখ তুলল দীপা। তারপর ভাড়া মিটিয়ে সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়ল।

দীপাদের বাড়িটা ঠিক বস্তির ভেতরে নয়। অঘোর নন্দী লেন নামের একটা সরু গলি বর্ডার লাইনের মতো মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সেটার একধারে কুখ্যাত ঢালিপাড়া বস্তি, আর এধারে সারি-সারি পুরোনো ক্ষয়াটে চেহারার সব বাড়ি। বেশির ভাগই টিনের বা টালির। দু-চারটে ইটের তৈরি একতলা যা আছে সেগুলোর বয়স যে কত, কেউ জানে না। জব চার্নকের সময়েই হয়তো ওগুলোর ভিত গাঁথা হয়েছিল। এইরকম একটা বাড়িতেই আরও তিন ভাড়াটের সঙ্গে দীপারা থাকে।

ওদের ভাঙাচোরা সদর দরজার পাল্লায় প্রচুর কাঠের টুকরো এবং টিনের তাপ্পি। নীচের দিকটা জলে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে।

কাছাকাছি আসতেই দীপা দেখতে পেল, মা সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপার মা কমলার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন। একসময় বেশ সুন্দরীই ছিল মহিলা। এখন সারা শরীর জুড়ে শুধু ধ্বংসের ছাপ। গায়ের রং কবেই জ্বলে গেছে। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে। চোখদুটো ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢোকানো। চুল উঠে-উঠে কপালটা একেবারে মাঠ।

এই মুহূর্তে কমলার পরনে মিলের আধময়লা লাল-প্যাড় শাড়ি আর সাদা জামা। শির বার-করা সরু-সরু দুই হাতে দু-গাছা লোহা ছাড়া সমস্ত শরীরে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য লোহার সঙ্গে সধবার লক্ষণ হিসেবে দুটো শাঁখাও রয়েছে।

কমলা চাপা নীচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কী হল ওখানে?' তার কণ্ঠস্বরে ভয় এবং উৎকণ্ঠা জড়ানো।

দীপা উত্তর দিল না, আচ্ছন্নের মতো মায়ের পাশ দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে সোজা নিজের ঘরে চলে এল।

এ-বাড়িতে সবসুদ্ধু খানছয়েক ঘর। ছিরিছাঁদহীন ব্যারাকবাড়ির ঘরের মতো এগুলোও পরপর তোলা হয়েছে। সামনে দিয়ে টানা চওড়া বারান্দা।

বাঁ-দিকে বারান্দার শেষ মাথার ঘর দুখানা দীপাদের। তার পরের দুটো ঘর নিয়ে থাকে প্রাইভেট ফার্মের এক কেরানি—উমাপদ, তার স্ত্রী শিবানী এবং তাদের দুটো ছোট-ছোট বাচ্চা। উমাপদর পরের ঘরটায় থাকে এক মধ্যবয়সি নার্স—বিভা। সে একা নির্ঝাঞ্ঝাট মানুষ, মা-বাবা ছেলেপুলে বা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বলতে তার কেউ নেই। বিভার পাশের ঘরটা এক হিন্দুস্থানি হকারের। নাম রাজেশ্বর সিং, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব ছোট্ট সংসার রাজেশ্বরের। স্বামী আর স্ত্রী মিলিয়ে মাত্র দুজন। স্ত্রী গঙ্গা বাঁজা বলে বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা নেই। রাজেশ্বর সারা সকালটা বাঁধা খদ্দেরদের বাড়ি-বাড়ি খবরের কাগজ দেয়। তারপর বাকি দিন গড়িয়াহাটায় নানারকম ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন বেচে। ওখানে এক বাড়ির দেওয়ালে তার ছোটখাটো একটা স্টল আছে। সব মিলিয়ে এ-বাড়িতে মোটমাট চার ভাড়াটে।

টানা বারান্দার নীচে এক ফালি চাতাল। চাতালটা বহুকাল আগে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল। এখন ফেটে চাকলা-চাকলা সিমেন্ট উঠে ভেতরের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ফাটা জায়গাগুলোতে জমে আছে শুকনো শ্যাওলার পুরু আস্তর, আর গজিয়েছে ঘাস।

চাতালটার ডান দিকে টালির ছাউনি দেওয়া পরপর চারটে রান্নাঘর, বাঁ-দিকে কর্পোরেশনের কল, স্নান-টান করার জন্য খানিকটা ঘেরা জায়গা আর দুটো পায়খানা। এগুলো সবই এজমালি।

এই মুহূর্তে বাড়িতে লোকজন বেশি নেই। উমাপদ, রাজেশ্বর এবং বিভাকে এ-সময়টা কখনই পাওয়া যায় না, যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। আর দীপার ভাই পিন্টুর সঙ্গে বাড়ির সম্পর্ক

সামান্যই। দু-বেলা খাওয়া আর রাত্তিরে ঘুমের সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিনই সে বাইরে-বাইরে থাকে। ন'টার পর থেকে বাড়িটা চলে যায় মেয়েদের দখলে।

এখন শিবানী আর গঙ্গাকে রান্নাঘরে দেখা যাচ্ছে। তারা খুবই ব্যস্ত। বারান্দায় শিবানীর বাচ্চাদুটো হুটোপাটি করছে। আর বাঁ-দিকের শেষপ্রান্তে একটা হাতল-ভাঙা খাটো চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে দীপার বাবা আদিনাথ।

আদিনাথের বয়স ষাট-বাষট্টি। কোনও একসময় লম্বা-চওড়া সুপুরুষ চেহারা ছিল তার। এখন শরীর-টরীর ভেঙেচুরে একেবারে ধ্বংসস্তূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরনে রং জ্বলে-যাওয়া লুঙ্গি আর তালিমারা হাফশার্ট।

দীপাকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে হাতের কাগজ একপাশে রেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল আদিনাথ।

এদিকে কমলাও মেয়ের পেছন-পেছন ঘরের ভেতর চলে এসেছিল। এই পুরোনো ভাঙাচোরা বাড়িটার যা হাল তার সঙ্গে দীপার এই ঘরটা একেবারেই খাপ খায় না। ঘরটা ছিমছাম, চমৎকার সাজানো। একধারে তক্তাপোশে ধবধবে বিছানা, আর-এক দিকে ছোট একটা আলমারি। সাজবার জন্য ড্রেসিং টেবল নেই। তবে দেওয়ালে একটা চৌকো ঝকঝকে আয়না লাগানো রয়েছে, সেটার সঙ্গে সুদৃশ্য কাঠের তাক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আছে টুকিটাকি ক'টা প্রসাধনের জিনিস— পাউডার, চিরুনি, ছোট একটা সেন্টের শিশি, ক্রিমের কৌটো, কুমকুম ইত্যাদি ইত্যাদি। একপাশে একটা ছোট পড়ার টেবলও রয়েছে, টেবলটার ওপর সুতোর ফুলতোলা সুন্দর টেবল ক্লথ। টেবলে রয়েছে মাটির সুদৃশ্য ফুলদানি, কলম, একটা চৌকো টেবল ক্লক আর ধূপদানি। দেওয়াল কেটে র‍্যাক বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের কিছু বই ব্রাউন পেপারের মলাট দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

কমলা বলল, 'অনীশদের ওখানে কী হয়েছে, বলনি না তো?'

দীপা এবারও উত্তর দিল না। হাতের সুটকেসটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে নিজেকে একরকম বিছানায় ছুড়েই দিল সে এবং বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে রইল।

কমলা আবার বলল, 'অনীশদের বাড়ি যাওয়ার সময় বলেছিলি ফিরবি না। তা হলে—' কথা শেষ না করেই থেমে গেল সে।

কমলার না-বলা কথার মধ্যে অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন ছিল। সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না দীপার। তবু সে চুপ করেই থাকে। যেভাবে কিছুক্ষণ আগে দাঁতে দাঁত চেপে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মণিমোহনের সঙ্গে সে যুদ্ধ করেছে তাতেই তার সবটুকু শক্তি শেষ। এই মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না তার। এমনকী কারও সঙ্গই ভালো লাগছে না।

কমলা তক্তাপোশের কাছে এসে দাঁড়াল। অনেকটা ঝুঁকে জিগ্যেস করল, 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি?'

মা যেভাবে একটানা ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে তাতে কতক্ষণ আর মুখ বুজে থাকা যায়! অবশ্য মাকে দোষও দেওয়া যায় না। তার সম্পর্কে মায়ের উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা তো থাকবেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীপা এবার বলল, 'হয়েছে।'

'তবে?'

'তোমার কী ধারণা, ওরা আমাকে বরণ করে ঘরে তুলে নেওয়ার জন্যে হাত ধুয়ে বসে ছিল?'

শ্বাস টানার মতো শব্দ করে কমলা বলল, 'কিন্তু তুই তো ওখানে থাকার জন্যেই গিয়েছিলি।'

দীপা বালিশ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। নিজের সম্মান আর ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে তো চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'তুমি কি জানো—' দীপা বলতে লাগল, 'ওদের বাড়িতে কত চাকরবাকর আর দারোয়ান আছে!'

কমলা বলল, 'থাকতেই পারে। তুই তো বলেছিস, ওরা খুব বড়লোক।'

একটু চুপ করে থাকল দীপা। তারপর বলল, 'চাকর-দারোয়ান ডেকে অনীশের বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।'

শঙ্কিত মুখে কমলা জিগ্যেস করল, 'চাকরেরা তোর গায়ে হাত তুলেছে নাকি?'

'নিজের থেকে না বেরিয়ে এলে তুলত।'

দরজার বাইরে একটা চাপা ফ্যাসফেসে গলা শোনা গেল, 'হারামীদের এতবড় আস্পর্ধা! আমার মেয়ের গায়ে হাত তুললে চামড়া গুটিয়ে দিয়ে আসতাম।'

আদিনাথের গলা। মুখ না তুলেও দীপা টের পেল, বাবা বারান্দার কোণ থেকে উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আদিনাথের এই আস্ফালনের দাম কানাকড়িও নয়। দীপা জানে, দুর্বল ভীরুর পাল দূর থেকেই চোটপাট করে। কাছে যাওয়ার সাহস তাদের নেই। নইলে দীপার এমন মারাত্মক ক্ষতির কথা জানবার পরও বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত না আদিনাথ। দৌড়ে গিয়ে অনীশের টুঁটি ধরে টেনে এনে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে চলে যেত। এসব না করে বাড়িতে বসেই সে শুধু চেঁচামেচি করছে।

কমলাও জানে, তার স্বামীর দৌড় কতটা। তার কথার উত্তর না দিয়ে দীপাকে জিগ্যেস করল, 'অনীশ তখন ও-বাড়িতে ছিল?'

দীপা বলল, 'ছিল। তার সামনেই তো ওর বাবা আমাকে অপমান করল।'

কমলা চমকে উঠল, 'অনীশ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখল? বাপকে কিছু বলল না!'

'কিছু না। উলটে জানালো, সে আমাকে চেনে না। কোনও জন্মে দেখেনি। ভয় দেখিয়ে আমি নাকি ওদের বাড়িতে ঢুকতে চাইছি।'

বাইরে চাপা হিংস্র গলায় গর্জে উঠল আদিনাথ, 'বিশ্বাসঘাতক—জানোয়ার।'

কমলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার পায়ের জোর যেন আলগা হয়ে যাচ্ছিল। মাথাটা ভয়ানক টলছিল। আবছা গলায় বলল, 'এতবড় সর্বনাশ করার পর এমন কথা বলতে পারল অনীশ? মুখে বাধল না!'

দীপা কিছু বলল না। হঠাৎ সে টের পেল, চোখের মণি ফাটিয়ে জলের স্রোত বেরিয়ে আসছে।

দীপার পিঠে একটা হাত রেখে কমলা খুব আস্তে করে ডাকল, 'বুনা—'

দীপা অনুভব করল, মায়ের হাতটা ভয়ানক কাঁপছে। তার ছোঁয়ার মধ্যে ভয় উদ্বেগ মমতা, এমনি কত কি যে মেশানো। সে বলল, 'কী বলছ মা?'

কমলা বলল, 'এখন কী করবি তুই? ওরা তোকে এভাবে তাড়িয়ে দিল!'

অনীশদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর দীপা এতই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যে-কোনও কিছুই স্পষ্ট ভাবার শক্তিটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। পেটের বাচ্চাটাকে নিয়ে সে কী করবে, তার গর্ভবতী হওয়ার খবরটা জানাজানি হওয়ার পর লোকে তার গালে কী পরিমাণ চুনকালি মাখাবে, তার জন্য কতটা অসম্মান ও দুর্নাম অপেক্ষা করছে—এই মুহূর্তে এসব চিন্তা করতে পারছে না দীপা। মায়ের কথায় মাথার ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু ওঠানামা করতে লাগল। আচমকা উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুখটা বালিশে ঘষতে-ঘষতে সে চিৎকার করে উঠল, 'যাও তোমরা, যাও। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না—কিচ্ছু

ভালো লাগছে না।'

কমলা আর দাঁড়াল না। ভয়ে-ভয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

মুখ না ফিরিয়ে দীপা টের পেল, বাবাও দরজার পাশ থেকে সরে গেছে।

অনেকক্ষণ পর অস্থিরতা কমে এল দীপার। উত্তেজিত স্নায়ুগুলো ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। আস্তে-আস্তে মুখ তুলল সে। থুতনিটা বালিশে ডুবিয়ে দূরমনস্কর মতো সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

জানালার গা ঘেঁষে একটা নিমগাছ। নীচে কিছু আগাছা, ভাঙা ইটের টুকরো, কাচের টুকরো, নানা রকমের জঞ্জাল, ইত্যাদি। তার পরেই ভাঙাচোরা পাঁচিল। পাঁচিলের পর সরু গলি। গলি পেরিয়ে এ-অঞ্চলের বিখ্যাত ঢালিপাড়ার বস্তি। বস্তির মুখে দু-তিনটে মুদি দোকান, পান-বিড়ির দোকান, আর আছে চায়ের স্টল। এই স্টলগুলোর সামনে কাঠের বেঞ্চে চিরস্থায়ী একটি ভিড় সারাক্ষণ অনড় হয়ে থাকে। দিনরাত ওখানে হইহল্লা, চিৎকার, খিস্তি।

চায়ের দোকানগুলো দেখে ওদের সত্যিকার চেহারা বোঝার উপায় নেই। বাইরে বিরাট উনুনে চব্বিশ ঘণ্টা চায়ের জল ফুটছে। একপাশে সারি-সারি বোয়েমে নোনতা বিস্কুট আর বাজে বেকারির রদ্দি পাউরুটি সাজানো। বস্তির লোকেরা এসে চা-বিস্কুটও খায়, রুটিও কেনে। আদতে এগুলো ধোঁকাবাজি। এদের আসল কারবারটা সামনের দিকে নয়, পেছনে। সেখানে রয়েছে জালা বোঝাই তাড়ি আর দিশি চোলাই মদের সারি-সারি বোতল।

সন্ধের পর দোকানগুলোতে ভিড়টা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে বাড়ে হল্লা এবং চিৎকার। এক-এক দিন মাতলামির ডিগ্রি চড়ে গেলে ছুরি মারামারি কিংবা বোমাবাজি শুরু হয়ে যায়।

বস্তির পর রেললাইন। তার ওধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে রেল ইয়ার্ড। সেখানে বম্বে মাদ্রাজ হরিয়ানা থেকে মাল বোঝাই হয়ে অগুনতি ওয়াগন আসে। সর্বক্ষণই ওখানে কয়েকশো ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকে। ঢালিপাড়া বস্তির সমস্ত সমস্যা এবং ঝামেলার উৎস ওই ওয়াগনগুলো।

এখানে ওয়াগন ব্রেকারের তিন-চারটে গ্যাং আছে। ওয়াগনের দখল নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় রোজ খুনোখুনি তো হচ্ছেই, তার ওপর রয়েছে রেলপুলিশের সঙ্গে প্রতি রাত্রেই এনকাউন্টার। বোমা রাইফেল আর স্টেনগানের শব্দে তখন সমস্ত এলাকা থরথর কাঁপতে থাকে।

এই মুহূর্তে বস্তির মাথায় যে আকাশের লম্বাটে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেখানে এলোমেলো টুকরো-টুকরো মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর চোখে পড়ছে ক'টা চিল। অলস ডানা মেলে তারা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দীপা বস্তির মাথায় স্কাইলাইন, মেঘ, চিল, চায়ের দোকান—কিছুই দেখছিল না। কয়েকমাস আগের একটা রাতের ছবি তার চোখের সামনে অদৃশ্য কোনও স্ক্রিনে যেন ফুটে উঠছিল।

এ-বছর মারাত্মক বর্ষা গেছে। কলকাতার আবহাওয়া অফিস জানিয়েছিল, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত বৃষ্টি আর হয়নি। অর্ধশতাব্দীর এই রেকর্ড বর্ষণে কলকাতা একেবারে ডুবে গিয়েছিল।

জুন মাসের মাঝামাঝি সেই দিনটায় খুব সম্ভব এ-বছরের সব চাইতে বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। সকাল থেকেই পাহাড়ের মতো কালো ভারি মেঘে আকাশ ঢেকে গিয়েছিল। যত বেলা বাড়ছিল, মেঘের ভারে আকাশটা যেন ঝুলে পড়ছিল।

ভোর হতে-না-হতেই অল্প-অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেদিন। কিন্তু তা দেখে বিকেল পর্যন্ত বোঝা যায়নি, সন্ধের সময় গোটা শহর লণ্ডভণ্ড করে অমন বিপর্যয় ঘটে যাবে।

তখন ভবানীপুরে বিকেলের দিকে একটা টিউশনি করত দীপা। আড়াইটে কি তিনটে বাজলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বেরুবার মুখে কমলা বলেছিল, 'আকাশের যা অবস্থা, আজ

না হয় পড়াতে না-ই গেলি।'

দীপা বলেছে, 'যে মেয়েটাকে পড়াই, আসছে সপ্তাহে তার হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা। এখন না গেলে চলে!'

'কিন্তু জোরে বৃষ্টি নামলে মুশকিলে পড়ে যাবি। ফিরবি কী করে?' কমলাকে বেশ চিন্তিত মনে হয়েছিল।

দীপা বলেছে, 'সকাল থেকেই তো মেঘ জমে আছে। জোরে বৃষ্টি নামার হলে এতক্ষণে নেমেই যেত। মনে হচ্ছে সারাদিনই এইরকম গুঁড়ি-গুঁড়ি পড়বে।'

'বেরুবিই যখন, বেশি দেরি করিস না, তাড়াতাড়ি পড়িয়েই চলে আসিস।'

'ঠিক আছে।'

ভবানীপুরে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে চারটে বেজে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেকের বেশি সে তার ছাত্রীটিকে পড়ায়নি। পাঁচটা যখন বাজে, ছাত্রীর মা-ই তাকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিয়েছিল। 'আজ আর পড়াতে হবে না। শিগগির বাড়ি চলে যান। মেঘের যা চেহারা হচ্ছে, চারদিক ভাসিয়ে দেবে।'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চমকে উঠেছিল দীপা। আকাশের যে রং দেখে সে বেরিয়েছিল, এর মধ্যে কখন যেন তার গায়ে কেউ আরও দশ পোঁচ আলকাতরা লাগিয়ে দিয়েছে। মেঘের পাহাড় কলকাতার ওপর আরও অনেকখানি নেমে এসেছে।

ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবে বাস রাস্তায় এসেছে দীপা, আকাশটাকে ভেঙে-চুরে বৃষ্টি নেমে গেল, সেইসঙ্গে উলটোপালটা ঝড়ো হাওয়া কলকাতার হাড় গুঁড়িয়ে দিতে-দিতে চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল। ব্যাগ থেকে দীপা সবে ছাতাটা খুলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে দমকা তেজী হাওয়ায় সেটার ডাঁটিগুলো মট করে ভেঙে গেল। দুর্যোগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচার জন্য দৌড়ে সামনের একটা ঝোলানো বারান্দার তলায় অগুনতি লোকের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

তারপর দেড়-দু-ঘণ্টা এমন তোড়ে বৃষ্টি পড়ল যাতে দশ ফুট দূরের কিছুই প্রায় দেখা যায়নি। প্রবল ঝড় রাস্তার ধারের অনেকগুলো বিরাট-বিরাট গাছ শেকড়সুদ্ধু উপড়ে এনে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিল।

কলকাতায় আধ ঘণ্টা মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হলে দেড় ফুট জল জমে যায়। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের মতো ভয়াবহ। একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে বুক সমান জল জমে গিয়েছিল। ইঞ্জিনে জল ঢুকে কয়েকশো ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেট কার, অটোরিকশা অচল হয়ে চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ঝুলন্ত বারান্দার তলায় প্রচণ্ড বৃষ্টির ছাটে অনবরত ভিজতে-ভিজতে রীতিমতো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল দীপা। বারবার মনে হচ্ছিল, মায়ের কথা শুনলেই ভালো করত। এত মেঘ মাথায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো ঠিক হয়নি।

কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন কীভাবে সে বাড়ি ফিরবে? দু-একটা বাস যাও জল ঠেলে-ঠেলে আসছে, এক সেকেন্ডও দাঁড়াচ্ছে না। দাঁড়ালেই বা কি! সেগুলোর পেটের ভেতর এক ইঞ্চিও ফাঁক নেই। এমনকী দরজা-জানালাতেও গুচ্ছের লোক ঝুলছে। মানুষের সেই নিরেট দেওয়াল ফুঁড়ে কার সাধ্য বাসে ওঠে। বিশেষ করে তার মতো একটা মেয়ের পক্ষে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

রাস্তার যা হাল তাতে গোটা কলকাতা একরকম অচলই হয়ে গেছে। এর মধ্যে আড়াই মাইল জল সাঁতরে বাড়ি পৌঁছুনোর কথা ভাবা যায় না। রাস্তার কোথায় ম্যানহোল খোলা আছে, কোথায় টেলিফোন বা সিএমডিএ-র লোকেরা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে তা-ই বা কে জানে। ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে যেখানে-সেখানে মরণফাঁদ তৈরি হয়ে আছে। এই অবস্থায় বাড়ির দিকে যাওয়া মানে মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

ঘণ্টাদেড়েক পর জলের তোড় কমে এসেছিল। সেইসঙ্গে হাওয়ার দাপটও। তবে একটানা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছিল।

এদিকে ঝুল-বারান্দার তলায় দু-ফুটের মতো জল জমে গেছে। বৃষ্টির ছাটে আগেই সারা শরীর ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল দীপার। মাথা থেকে, শাড়ি জামা থেকে সমানে জল ঝরছিল। হাতের আঙুলগুলো ভিজে-ভিজে সিটিয়ে গেছে। ভীষণ শীত করছিল তার। জলো হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

বৃষ্টিটা ধরে এলে ঝুল-বারান্দার তলা থেকে লোকজন জল ভেঙে-ভেঙে চলে যেতে শুরু করেছিল। জায়গাটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল।

একা এভাবে জলেডোবা নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের পক্ষে ঠিক নয়। তার ওপর ঝপ করে বিকেলটা ফুরিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

ওদিকে আকাশে তখনও প্রচুর মেঘ। বৃষ্টিটা যে কমে এসেছিল, তার মানে এই নয়—একেবারেই থেমে যাবে। যে-কোনও মুহূর্তে প্রচণ্ড উদ্যমে আবার শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভীষণ ভয় করছিল দীপার। চটি দুটো খুলে এক হাতে ঝুলিয়ে, আর-এক হাতে শাড়িটা অনেকখানি গুটিয়ে একসময় সে জল ভাঙতে শুরু করেছিল। যতই এগুচ্ছিল, চোখে পড়েছে চারদিকে রাস্তা বলতে কিছুই নেই—সব নদী।

জলের তলায় অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে, গর্ত-টর্ত বাঁচিয়ে পা ফেলতে হচ্ছিল দীপাকে। পাঁচ ফুট করে এগুচ্ছিল, আর অনেকটা করে জীবনীশক্তি যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল।

আধ ঘণ্টা যাওয়ার পর দীপার মনে হয়েছিল, আর পারবে না। হাতে-পায়ের জোড় দ্রুত আলগা হয়ে আসছিল। চারদিক ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। যে-কোনও মুহর্তে ঘাড় গুঁজে, মুখ থুবড়ে সে পড়ে যাবে।

ধুঁকতে-ধুঁকতে আরও খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ দীপার চোখে পড়েছিল একটা দামি প্রাইভেট কার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে জল ঢুকলেও গাড়িটা পুরোপুরি অচল হয়ে যায়নি।

একজন সুপুরুষ চেহারার যুবক ড্রাইভ করছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বলেছে, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

দীপা চমকে উঠেছিল। সে জানে এই জাতীয় ছোকরারা খারাপ মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। লিফট দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে রেপ-টেপ করে কোথাও ফেলে দেয়। চেঁচামেচি করলে খুন, মার্ডারও করে ফেলে। দীপার মতো মেয়েকে বাড়ি বসে থাকলে তো চলে না। অনেক সময় টুইশনি করে ফিরতে-ফিরতে রাতও হয়ে যায়। অনেকদিন রাত্রে প্রায় ফাঁকা রাস্তায় যখন সে বাসটাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেই সময় নিঃশব্দে একটা দামি গাড়ি গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ বাড়িয়ে চাপা গলায় কেউ বলেছে, 'উঠে আসুন না।' দীপা ভয় হয়তো পেয়েছে, তবে তা বুঝতে দেয়নি। পা থেকে চটি খুলে, চিৎকার করে বলেছে, 'তুমি যাদের খুঁজছ আমি সেই ক্লাসের নই। জুতিয়ে তোমার গাল ছিঁড়ে দেব।'

গাড়ি আর দাঁড়ায়নি, আচমকা দারুণ স্পিড তুলে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেছে।

সেই দুর্যোগের রাতে শরীরের সবটুকু শক্তি ফুরিয়ে এলেও দীপা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই যুবকটি আবার বলেছে, 'দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম, আপনি জল ঠেলে-ঠেলে এগুচ্ছেন। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। এভাবে একা-একা কোনও মেয়ের পক্ষে হেঁটে যাওয়া খুবই রিস্কি। জলের তলায় কোথায় গর্ত-টর্ত আছে, কে জানে। তা ছাড়া এই রাস্তাটা রাত্রিবেলা খুব খারাপ। অ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্টরা সুযোগের জন্য ওত পেতে থাকে।'

যুবকটিকে খারাপ মনে হয়নি। অন্তত কথায়-বার্তায় তাকে দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো লেগেছিল—যে শুধু নিজের কথাই ভাবে না, অন্যের ব্যাপারেও চিন্তা করে। সেই দুর্যোগের রাতে,

কলকাতা যখন জলের তলায় ডুবে গেছে, ফাঁকা রাস্তায় একটি বিপন্ন অচেনা মেয়েকে ফেলে যেতে তার মন সায় দেয়নি। সে এবার বলছিল, 'নিজের সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হচ্ছি। আই অ্যাম নট আ বিস্ট। আমাকে ভদ্রলোক ভাবতে পারেন। উঠে আসুন—'

দীপার দ্বিধা তখনও কাটেনি। উত্তর না দিয়ে জড়সড় হয়ে সে যুবকটির দিকে তাকিয়েই ছিল।

যুবকটি এবার বলেছে, 'অন্য সময় হলে আপনার দিকে হয়তো তাকাতামই না, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখছেন? প্লিজ, আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

কথাগুলো শুনতে-শুনতে দীপার মনে হয়েছিল, তার সম্বন্ধে যুবকটি যেন একটা নৈতিক দায়িত্ব বোধ করছে। এরপর সে আর কিছু ভাবতে পারছিল না। শুধু মনে হয়েছিল, হয়তো এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অন্য এক বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। গাড়িতে তুলে যুবকটি যদি তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে, সে ছেড়ে দেবে না। দীপাকে খুন না করা পর্যন্ত তার শারীরিক ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। তেমন দরকার হলে মানুষের সঙ্গে এখনও সে কিছুক্ষণ যুঝতে পারবে, কিন্তু কোমর সমান জলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিন-চার মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বাড়ি পৌঁছনো তার পক্ষে অসম্ভব।

শেষপর্যন্ত নিরুপায় এবং মরিয়া হয়েই গাড়িতে উঠেছিল দীপা। যুবকটি কিন্তু তার অসহায়তার কোনওরকম সুযোগই নেয়নি, বরং তার আচরণ কথাবার্তা—সবই ছিল অত্যন্ত ভদ্র এবং মার্জিত। তার ব্যবহারে আপত্তিকর বা ভয় পাওয়ার মতো কিছুই ছিল না।

ফ্রন্ট সিটে নিজের পাশে দীপাকে বসতে বলেনি যুবকটি। ব্যাক-ডোর খুলে পেছনের সিটে তাকে বসিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

দীপা তাদের রাস্তার নাম জানিয়েছিল।

যুবকটি বলেছিল, 'ভালোই হল, আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি। কাছাকাছিই আমাদের বাড়ি।'

দীপা উত্তর দেয়নি। সে মনে-মনে ঠিকই করে নিয়েছিল, পারতপক্ষে সে নিজের থেকে যেচে কিছু বলবে না। বেশি কথা বলা মানেই খানিকটা সুযোগ দেওয়া। গাম্ভীর্যের দেওয়াল তুলে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করবে সে। অবশ্য যে-মানুষ অযাচিতভাবে তাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, বাড়ি পৌঁছে নিশ্চয়ই দীপা তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবে।

যুবকটি এবার বলেছে, 'গাড়ি কিন্তু জোরে চালাতে পারব না। খুব আস্তে-আস্তে এগুতে হবে।'

কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি দীপার। অত জলে স্পিড তোলা অসম্ভব।

ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছিল যুবকটি, 'চারদিকে তাকিয়ে দেখুন, কত গাড়ি অচল হয়ে পড়ে আছে। একবার ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেলে আমার গাড়ির অবস্থাও ওগুলোর মতোই হবে। তাহলে সারারাত গাড়িতে বসেই দুজনকে কাটাতে হবে।' বলে সে একটু হেসেছিল।

হালকা চালে মজা করেই কথাটা বলেছে যুবকটি, তবু রাতভর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় জলেডোবা নির্জন রাস্তায় একটি অচল গাড়িতে তার সঙ্গে রাত কাটাবার কথা ভাবতেই অদ্ভুত ভয়ে দীপার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠান্ডা স্রোত যেন বইতে শুরু করেছিল। কাঁপা গলায় সে বলেছে, 'স্পিড দেওয়ার দরকার নেই। আপনি আস্তেই চালান। বাড়িতে পৌঁছুতে দেরি হলে আর কি করা যাবে।'

জলে ঢেউ তুলে স্টিম লঞ্চের মতো এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। ঠান্ডা ভেজা বাতাস এতক্ষণ মিইয়ে ছিল, হঠাৎ আবার তার দাপট বেড়ে গিয়েছিল। আকাশটা আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ ঝলকাতে লাগল। চিনির দানার মতো হালকা বৃষ্টি পড়ছিল, আচমকা সেটার তোড় প্রচণ্ড বেড়ে গেল।

লক্ষ কোটি সিসের ফলা মিনিটে হাজার মাইল স্পিডে যেন নেমে আসছে আকাশ থেকে।

এভাবে ঘণ্টাখানেক চললে ক'টা স্ক্রাই-স্ক্রেপার ছাড়া গোটা কলকাতা সোজা জলের তলায় ডুবে যাবে।

গাড়ির জানালাগুলো খোলা ছিল। তার ভেতর দিয়ে উলটোপালটা জলের ছাট আসছিল। যুবকটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, 'জানলা বন্ধ করুন।' বলতে-বলতে সামনের দিকের জানালাগুলোর কাচ সে নিজেই তুলে দিয়েছিল।

আর চমকে উঠে দ্রুত হাত বাড়িয়ে পেছন দিকের জানালা বন্ধ করেছিল দীপা।

যুবকটি বলেছিল, 'এরকম বৃষ্টি পড়তে থাকলে পনেরো মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিনে জল ঢুকে যাবে। কী যে করব তখন!' গাড়ির ভেতরে কম পাওয়ারের যে নীলাভ বাল্বটা জ্বলছিল তার আলোয় তাকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

দীপা কিছু বলেনি। তবে সে-ও খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। টের পাচ্ছিল, ভেতরকার উদ্বেগ তার চোখেমুখেও ফুটে বেরিয়েছে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য ইঞ্জিনে জল ঢোকেনি। বৃষ্টিটা হঠাৎ যেভাবে প্রবল বেগে আবার পড়তে শুরু করেছিল, তাতে মনে হয়েছিল, বাকি রাতটুকু আর থামবে না। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে হঠাৎই থেমে গিয়েছিল। আর যুবকটি রাস্তার জলের বিরুদ্ধে একটানা যুদ্ধ করে-করে যখন ঢালিপাড়ার বস্তির কাছে চলে এসেছিল তখন একটা বেজে গেছে।

কাছাকাছি এলেও দীপাদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি, কেন না, ওদিকটা খুবই নীচু। দীপাদের অঘোর নন্দী লেনে তখন কম করে সাড়ে তিন ফুটের মতো জল।

যুবকটি এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলেছিল, 'আপনাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূরে?'

দীপা বলেছিল, 'সামনের ওই রাস্তাটা ডানদিকে ঘুরে যেখানে আর-একটা রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, সেই মোড়ের মাথায়।'

'আপনাকে এই রাস্তাটুকু জল ঠেলে হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে ওদিকে যাওয়া ইম্পসিবল। ইঞ্জিনে জল ঢুকলে আমি আর বাড়ি ফিরতে পারব না।'

'না, না, আপনাকে আর যেতে হবে না।' গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে দীপা বলেছিল, 'আমার জন্যে আপনার অনেক কষ্ট হল। কী বলে যে ধন্যবাদ দেব।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই। কেউ বিপদে পড়লে আর-একজনকে তো পাশে এসে দাঁড়াতেই হয়।'

ভদ্র পরোপকারী এই যুবকটিকে সেই মুহূর্তে খুব ভালো লেগেছিল দীপার। বলেছিল, 'এত কাছে এলেন, অথচ বাড়ি নিয়ে যেতে পারছি না। রাস্তার যা হাল!'

যুবকটি হেসে বলেছিল, 'পরে কখনও দেখা হলে যাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা চলি। নমস্কার।'

'নমস্কার।' বলেই হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল যুবকটির। খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে, 'ওই দেখুন, একসঙ্গে এতটা সময় কাটালাম, অথচ কেউ কারও নাম জানি না। আমি—অনীশ চ্যাটার্জি—'

দীপা তার নাম জানিয়ে জলের ভেতর সতর্ক পা ফেলে-ফেলে বাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন একটু বেলায় যখন কাছাকাছি থানা থেকে ন'টার সাইরেন বেজে উঠেছে, সেই সময় আদিনাথ দীপার ঘরের সামনে এসে ব্যস্তভাবে ডাকাডাকি শুরু করেছিল, 'বুনা—বুনা—'

দীপার ঘুম কিছুক্ষণ আগে ভেঙেছে কিন্তু তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। কাল প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভেজার জন্য জ্বর-জ্বর লাগছিল। মাথাটা ভীষণ ভারী, কপালের দুপাশে রগগুলো অনবরত লাফাচ্ছিল। সে ঠিকই করে রেখেছে আজ আর স্কুলে যাবে না। সারাদিন শুয়ে-শুয়েই কাটিয়ে দেবে। বেলা আর-একটু বাড়লে বাবা বা পিন্টুকে দিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নেবে।

শুয়ে-শুয়ে অন্যমনস্কের মতো বাইরে পাঁচিলের ওধারে ঢালিপাড়া বস্তির একটানা টালির চাল, কাকেদের ওড়াউড়ি বা আকাশ দেখছিল দীপা। কাল অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পর আর বৃষ্টি হয়নি। জলে-ধোওয়া আকাশ বেলা ন'টার রোদে ঝকঝক করছিল। আকাশের দিক থেকে নীচে তাকালেই চোখে পড়ছিল তাদের অঘোর নন্দী লেনে এবং তার আশেপাশে সব জায়গাতেই কালকের বৃষ্টির জল খানিকটা-খানিকটা জমে আছে। এখানে একদিন তোড়ে বৃষ্টি হলে, জল সরতে তিনদিন লেগে যায়।

আদিনাথের ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল দীপা, 'কী বলছ?'

'একটি ছেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'কে?'

'চিনি না, আগে দেখিনি। নাম বলল অনীশ।'

এই নামের কাউকে প্রথমটা চিনতেই পারেনি দীপা। পরক্ষণেই কাল রাতের সেই যুবকটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। রাত্রে পৌঁছে দিয়ে সকালেই যে আবার সে চলে আসবে, এটা ভাবা যায়নি। দীপা প্রায় হকচকিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, 'অনীশ কোথায়?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'এক মিনিট দাঁড়াতে বলো। ঘরটা গুছিয়ে নিই।'

আদিনাথ বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিল, 'ছেলেটা কে রে? চেহারা, জামাকাপড় দেখে ভালো ফ্যামিলির মনে হচ্ছে।'

ক্ষিপ্র হাতে বিছানা তুলে একটা ধবধবে চাদর পাততে-পাততে দীপা বলেছিল, 'কাল রাত্তিরে যে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছে সে।'

প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে কীভাবে বাড়ি ফিরেছে, কালই মা-বাবাকে জানিয়েছিল দীপা। আদিনাথ আর কোনও প্রশ্ন না করে শশব্যস্তে চলে গিয়েছিল। পেছন থেকে বলেছে, 'আমার ঘরে এনে বসিও। আমি কলতলায় যাচ্ছি।'

মুখ-টুখ ধুয়ে, মা-বাবার ঘর থেকে শাড়ি-টাড়ি বদলে, মাকে অনীশের জন্য মিষ্টি আনার টাকা দিয়ে, ফের নিজের ঘরে এসে দীপা দেখল, ছোট টেবলটার পাশে একমাত্র চেয়ারটিতে বসে আছে অনীশ। আদিনাথ একধারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে।

দীপা আদিনাথের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'মা তোমাকে ডাকছে বাবা।'

'হ্যাঁ, যাই—'

'আদিনাথ চলে যেতে বিছানার এক কোণে আস্তে-আস্তে বসেছিল দীপা। সে কিছু বলার আগেই হেসে-হেসে অনীশ বলেছে, 'দারুণ একটা সারপ্রাইজ দিলাম তো।'

সারপ্রাইজ কথাটার মানে দীপার অজানা নয়। সে বলেছিল, 'তা দিয়েছেন। এই সকালবেলায় আপনাকে আশা করিনি।' তার চোখ-মুখ এবং কণ্ঠস্বর থেকে তখনও বিস্ময় কাটেনি।

'একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হয়েছে, বলতে পারেন।'

কিছু না বলে অনীশের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছে দীপা।

অনীশ বলেছে, 'কাল রাত্তিরে বাড়ি ফিরে মনে হয়েছিল ওভাবে রাস্তার জলের মধ্যে আপনাকে নামিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। এদিকে স্লাম এরিয়া, জায়গাটা ভালো না। আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল।'

বিস্ময়টা এতক্ষণে অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। দীপা হালকা গলায় বলেছিল, 'ও, এই জন্যে আমার খোঁজ নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়েছিল অনীশ।

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'আপনি তো আমাদের বাড়ির অ্যাড্রেস জানেন না। এলেন কী করে?'

'রাস্তাটা কাল দেখিয়ে দিয়েছিলেন। জিগ্যেস করে করে চলে এলাম। এটা কি খুব একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার?'

দীপা বলেছিল, 'রাস্তায় তো এখনও জল আছে?'

অনীশ বলেছিল, 'আছে, তবে কালকের মতো অতটা নেই। আট-ন' ইঞ্চি মতো হবে।'

'গাড়ি এনেছেন নাকি?'

'না। কারা ইট পেতে দিয়েছে, তার ওপর দিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি।'

'এত কষ্ট করে আসার কোনও মানে হয়!' দীপা হাসতে-হাসতে বলেছিল, 'বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমাকে ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ঘোরাঘুরি করতে হয়। আমাদের মতো মেয়ের কথা অত ভাবতে নেই।'

অনীশ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, মিষ্টির প্লেট আর চা নিয়ে কমলা ঘুরে ঢুকেছে। তার পেছন-পেছন আদিনাথ।

কাপ-টাপগুলো টেবলের ওপর রেখে কমলা বলেছিল, 'একটু চা খান বাবা।'

অনীশ বিব্রতমুখে বলেছিল, 'আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট। আমাকে আপনি বলবেন না।'

একটু ইতস্তত করে কমলা শেষপর্যন্ত বলেছিল, 'কাল তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে মেয়েটার কী বিপদ যে হত! ভগবান তোমার ভালো করবেন।'

আদিনাথও গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল অনীশকে। রাস্তায় কত রকম লোক ঘোরাফেরা করে। কাল রাত্তিরে দীপা তাদের কারুও পাল্লায় পড়লে সর্বনাশ হয়ে যেত। ভাগ্যিস অনীশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

অনীশ সবিনয়ে জানিয়েছে, বিশেষ কিছুই সে করেনি। যে কেউ এটুকু করত।

আদিনাথ বলেছে, 'কেউ করে না, কেউ করে না। আজকাল মনুষ্যত্ব জিনিসটা আর নেই বললেই চলে। এর মধ্যে কেউ ভালো কিছু করলে মনে হয়, মানুষ জাতটা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।' আদিনাথকে সেই মুহূর্তে আশাবাদী দার্শনিকের মতো দেখাচ্ছিল।

অনীশের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বলেছে, 'এ-সব শুনলে আমার ভীষণ সঙ্কোচ হয়।'

আদিনাথ একটু বেশি বকে। অনীশ জানানো সত্ত্বেও তার আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের তোড় থামছিল না।

অগত্যা কমলাকে বাধা দিতে হয়েছে, 'তুমি এখন চল। ওরা কথা বলুক।' একরকম জোর করেই স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সে।

এরপর অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি অনীশ। বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট। তারপর বিদায় নিয়েছিল। তাকে বাইরের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দীপা বলেছে, 'এদিকে এলে আবার আসবেন।'

'আচ্ছা।' মাথা নেড়েছিল অনীশ, 'অবশ্য কবে আসব, এক্ষুনি বলতে পারছি না।'

একটু চুপ।

তারপর অনীশই আবার বলেছে, 'এর মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বোধহয় নেই—তাই না?'

অনীশের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার। পলকের জন্য ভেতরে-ভেতরে থমকে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তার মনে পড়েছে, প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে নির্জন জলেডোবা রাস্তায় গাড়ির ভেতর একা পেয়েও যে তাকে রেপ তো করেইনি, এমনকী ফ্রন্ট-সিটে নিজের পাশে পর্যন্ত বসায়নি, তাকে বিশ্বাস করা যায়। এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখা গেছে তাতে অনীশকে ভদ্র শোভন মার্জিত এবং বিনয়ীই মনে হয়েছে।

দীপা বলেছিল, 'আমি ভবানীপুরে বিকেলের দিকে টিউশনি করতে যাই। ওখান থেকে রবীন্দ্রসদনের কাছে এসে বালিগঞ্জের বাস ধরি।'

কথাগুলোর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি অনীশের। সে জিগ্যেস করেছে, 'রোজ টিউশনিতে যান?'

'হ্যাঁ।'

'রবীন্দ্রসদনের কাছে এসে কখন ফেরার বাস ধবেন?'

'সাড়ে পাঁচটা, ছ'টায়।'

'কাইন্ডলি ওই সময় একটু ওয়েট করবেন।'

'আচ্ছা। তবে সাড়ে সাতটার বেশি আমি বাইরে থাকি না। মা-বাবা ভীষণ চিন্তা করে।'

'তার ভেতরেই ফিরে আসবেন।'

অনীশ চলে গিয়েছিল।

আর দীপা বাড়ির বাঁধানো চাতাল পেরিয়ে নিজের ঘরে যেতে-যেতে লক্ষ্য করেছিল, আদিনাথ কমলা আর পিন্টু বারান্দার ওধার থেকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছিল, অনীশ সম্পর্কে ওদের অসীম কৌতূহল। যে আগের রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পরের দিন ফের খবর নিতে আসে তার সম্বন্ধে অগুনতি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

দীপা দাঁড়ায়নি। কয়েক পলক ওদের দেখে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। এবং যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তা-ই। এক মিনিটও কাটেনি, দরজাব বাইরে থেকে আদিনাথের গলা ভেসে এসেছিল, 'বুনা—'

এটাই প্রত্যাশিত ছিল, কাজেই দীপা চমকে ওঠেনি। আস্তে-আস্তে মুখ ফিরিয়ে দরজার কাছে মা এবং বাবাকে দেখতে পেয়েছিল সে। চোখাচোখি হতেই ওরা ঘরে চলে এসেছে। দীপা আর শুয়ে থাকতে পারেনি, হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসেছিল।

আদিনাথ এমনিতে এ-ঘরে আসে না, এখন কিন্তু যে চেয়ারটায় কিছুক্ষণ আগে অনীশ বসে ছিল সেখানে জাঁকিয়ে বসল। কমলাও দীপার গা ঘেঁষে বসেছে। অর্থাৎ অনীশের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না জেনে মা আর বাবা এ-ঘর থেকে নড়বে না।

কমলা একটু ইতস্তত করে বলেছে, 'অনীশকে তুই কতদিন চিনিস?'

প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে মুহূর্তে স্নায়ুগুলো চকিত হয়ে উঠেছে দীপার। স্থির চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'তোমাদের তো রাত্তিরে ফিরেই বলেছি, কালই ওকে প্রথম দেখলাম।'

মায়ের মুখ-চোখ দেখে মনে হয়নি, তার কথা বিশ্বাস করেছে। সে বলেছিল, 'কাল নামিয়ে দিয়ে আজই আবার চলে এল!'

বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু উকিলের মতো উলটোপালটা প্রশ্ন করে মা এবং বাবা কী জানতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার। একমাত্র রোজগেরে মেয়ে যদি প্রেম করে বসে এবং তার পরিণতি বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়, তখন এ-বাড়িতে নিশ্চয়ই আর থাকবে না। তার মানে গোটা পরিবারটাকে অবধারিত না খেয়ে মরতে হবে। অনীশের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও বা তাকে অনেকবার কৃতজ্ঞতা জানালেও তাদের মনে দুশ্চিন্তা এবং প্রবল ভয় ঢুকে গেছে। এটাই স্বাভাবিক।

সংসার সম্পর্কে দীপার যথেষ্ট কর্তব্যবোধ এবং মমতা। বাবা-মা আর ভাইয়ের জন্য স্কুলের পরও মুখে রক্ত তুলে তাকে টিউশনি করতে হয়। তবু মা-বাবা এভাবে সন্দেহ করায় ভীষণ রেগে গিয়েছিল দীপা। রূঢ় গলায় সে বলেছে, 'কী আবার ব্যাপার?' মায়ের দিকে ফিরে বলেছে, 'আজ চলে এলে আমি কী করতে পারি?'

সংসারের একমাত্র প্রতিপালক এবং রক্ষক এভাবে খেপে উঠবে, আদিনাথরা ভাবতে পারেনি। মুহূর্তে তারা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল। মিনমিনে গলায় আদিনাথ বলেছিল, 'না, হঠাৎ এল কিনা—মানে আগে আসবে বলে তো শুনিনি—'

দীপা উত্তর দেয়নি।

কমলা একটু ভেবে এবার জিগ্যেস করেছে, 'অনীশরা কোথায় থাকে?'

দীপা নীরস গলায় বলেছে, 'জানি না।'

'কী করে ছেলেটি?'

মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছিল দীপার। সে ফেটে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলেছে, 'জিগ্যেস করিনি।'

সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ মেয়েকে লক্ষ্য করে কমলা বলেছে, 'একটা ছেলে হঠাৎ বাড়ি এল। তার সম্বন্ধে কিছু জানা গেল না—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গিয়েছিল।

দীপা খেপে উঠেছিল, 'আবার যদি অনীশের সঙ্গে দেখা হয়, ওর তো বটেই, ওর চোদ্দোপুরুষের খবর জেনে নেব। বলব, সব লিখে দিন, আমার মা-বাবা জানতে চেয়েছে।' একটু থেমে বলেছে, 'এত যে জানতে চাইছ, তোমাদের মতলবটা কী?'

আদিনাথ এবং কমলা, দুজনেই হকচকিয়ে গেছে। আদিনাথ বলেছে, 'কীসের আবার মতলব, কিচ্ছু না। কি যে বলিস তুই!'

কমলা বলেছে, 'মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের সবসময় দুশ্চিন্তা। তুই যখন মা হবি তখন বুঝতে পারবি।'

মনের মধ্যে যা-ই থাক, কমলা যা বলেছে তাতে অনেকখানি যুক্তি আছে। দীপার উগ্র অসন্তুষ্ট ভাবটা নরম হয়ে এসেছিল। তবে সে কিছু বলেনি।

আদিনাথ অনীশ সম্পর্কে আর কোনও প্রশ্ন করেনি। সে এবার শুধু বলেছে, 'তোর শরীরটা ভালো না। এখন শুয়ে থাক, আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট নিয়ে আসছি। চলো গো—' কমলাকে সঙ্গে করে সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ওরা চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেছিল পিন্টু। একটা ভুরু ওপরে তুলে, আর-একটা ভুরু নীচে নামিয়ে আস্তে-আস্তে মাথাটা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলেছিল, 'দিদি, তুই টেরিফিক।'

চোখ কুঁচকে ভাইকে দেখতে-দেখতে দীপা বিরক্ত মুখে বলেছিল, 'কীসের টেরিফিক?'

'গুরু, ডুবে-ডুবে বেশ ওয়াটার খাচ্ছিলে। এতদিনে ক্যাচ হয়ে গেলে।' ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হাসতে শুরু করেছিল পিন্টু।

পিন্টুর ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার। সে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, 'কীসের ওয়াটার? কীসের ক্যাচ?'

'বুঝে-সুঝেও নকশা করছ গুরু?'

গলার স্বর আর-এক পরদা চড়িয়ে দীপা বলেছে, 'একেবারে ইয়ার্কি করবি না। ভাগ এখান থেকে।'

পিন্টু তার কথা গ্রাহ্যই করেনি। দীপার ঘর থেকে চলে যাওয়ার কোনওরকম ইচ্ছাও ছিল না তার। চোখ নাচিয়ে-নাচিয়ে সে বলেছে, 'তোর টেস্ট আছে দিদি।'

গলাটা আরও কয়েক পরদা চড়িয়ে দীপা বলেছিল, 'গেলি এখান থেকে!'

'যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। তবে গুরু, একটা কথা বলে যাই—' এই পর্যন্ত বলে ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে অদ্ভুত কায়দা করে পিন্টু হেসেছিল।

তার হাসি দেখে মাথার ভিতর রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল দীপার। উত্তর না দিয়ে জ্বলন্ত চোখে পিন্টুর দিকে তাকিয়ে থেকেছে সে।

পিন্টু এবার বলেছিল, 'মালটাকে যদি খেলিয়ে তুলতে পারিস, আমি একটা টেরিফিক জামাইবাবু পেয়ে যাব।'

'জুতিয়ে তোমার মুখ ছিঁড়ে দেব বাঁদর।' বলতে-বলতে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পিন্টুর দিকে দৌড়ে গিয়েছিল দীপা, 'অসভ্য উল্লুক—'

কিন্তু সে কাছাকাছি যাওয়ার আগেই কোমরটা মজাদার ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে সট করে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল পিন্টু। সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বলেছে, 'কোনও হেল্প দরকার হলে বোলো গুরু। অলওয়েজ আমাকে পাবে।' বলেই গলাটা টেনে নিয়ে ছুট লাগিয়েছিল।

মা-বাবা আর পিন্টু যেভাবে অনীশের ব্যাপারটা নিয়ে হইচই বাধিয়ে দিয়েছিল তাতে দীপা ঠিকই করে ফেলেছিল, তার সঙ্গে আর দেখা করবে না। রবীন্দ্রসদনের কাছে এসে অনীশের জন্য দাঁড়াবেও না। বাস পেলেই উঠে পড়বে। কিন্তু পরের দিন ভবানীপুরে টিউশনি সেরে রবীন্দ্রসদনের কাছে আসতেই দেখা গেল, অনীশ বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপাকে দেখে উজ্জ্বল হাসিমুখে অনীশ বলেছিল, 'আপনার আগেই আমি এসে গেছি।'

তক্ষুনি আদিনাথ কমলা এবং পিন্টুর মুখ দীপার চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। আড়ষ্টভাবে সে-ও হেসেছিল, 'তা-ই তো দেখছি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?'

'এই মিনিট চার-পাঁচেক। আসুন—'

'কোথায়?'

'আসুন না—'

কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনীশের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে ওধারে চলে গিয়েছিল দীপা। যে-গাড়িটায় করে দুর্যোগের রাতে অনীশ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সেটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। রবীন্দ্রসদনের বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি পার্ক করা বে-আইনি, তাই এখানে ওটা রেখে ওপারে গিয়ে দীপার জন্য অপেক্ষা করেছিল অনীশ।

আগের দিন পেছনের দরজা খুলে দীপাকে ব্যাক সিটে বসতে বলেছিল অনীশ। সেদিন কিন্তু সামনের দরজা খুলে দিয়েছে, 'উঠুন।'

ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে দীপা, তবে কিছু বলেনি। আস্তে-আস্তে উঠে বসে পড়েছিল।

অনীশ ঘুরে গিয়ে ওপাশের দরজা দিয়ে ড্রাইভারের সিটে উঠেই স্টার্ট দিয়েছিল। ছোট্ট ঝকঝকে বিদেশি গাড়িটা তেলের মতো মসৃণ ভাবে গড়াতে-গড়াতে রেসকোর্সের দিকে চলে গিয়েছিল।

দীপা একটু উদ্বিগ্নভাবেই জিগ্যেস করেছে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুন তো?'

অনীশ বলেছে, 'বিশেষ কোনও জায়গায় নয়। ময়দানের দিকে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে-টেড়িয়ে কোথাও বসে একটু চা খাব।'

'আমি কিন্তু রাত্তিরে বেশিক্ষণ বাইরে থাকি না।'

'মনে আছে। কাল বলেছিলেন, সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যান।'

'হ্যাঁ।'

'তার আগেই ফিরবেন।'

দীপা উত্তর দেয়নি। স্নায়ুগুলোকে সতর্ক রেখে অনীশের পাশাপাশি ফ্রন্ট সিটে বসেছিল

সে, আর হুঁ-হাঁ করে অনীশের কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন বেশি দেরি করেনি অনীশ। খানিকক্ষণ বেড়িয়ে চৌরঙ্গির এক রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে আটটার ঢের আগেই দীপাকে পৌঁছে দিয়েছিল।

একটা ব্যাপার দীপার চোখে পড়েছে, অঘোর নন্দী লেনে তাদের বাড়ি পর্যন্ত গাড়িটা নিয়ে যায়নি অনীশ। বেশ খানিকটা দূরে বড় রাস্তার মোড়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কাল কি দেখা হবে?'

অনীশ যে এরকম কিছু বলবে, দীপার আগেই তা মনে হয়েছিল।

সে জিগ্যেস করেছে, 'কেন, দরকার আছে?'

'না। দরকার কিছু নেই। খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করা যেত, এই আর কি।'

সোজাসুজি অনীশের চোখের দিকে তাকিয়ে দীপা এবার বলেছে, 'গল্প করার মতো আর কেউ নেই বুঝি?'

সামান্য থিতিয়ে গিয়েছিল অনীশ। ঘাড় কাত করে বলেছে, 'অনেক আছে। তবে আপনার মতো কেউ নেই।'

'আমি কি অন্য সবার থেকে আলাদা?'

'এখন পর্যন্ত তাই তো মনে হচ্ছে।'

একটু চুপ করে থেকে দীপা বলেছে, 'ঠিক আছে, কাল রবীন্দ্রসদনের কাছে ওই সময় এলে দেখা হতে পারে।'

'ফাইন।'

অনীশ চলে গিয়েছিল। আর দীপা রাস্তার মোড় থেকে তাদের গলিতে ঢুকে পড়েছিল। ওখান থেকে তিন-চার মিনিট হাঁটলেই তাদের বাড়ি।

পরের দিনও অনীশের সঙ্গে বিকেলে দেখা হয়েছিল। তার পরের দিনও। এবং এইভাবে প্রতিদিন।

রোজই ঘণ্টাখানেক ময়দানে বা গঙ্গার ধারে ঘুরে কোথাও চা-টা খেয়ে বাড়ির কাছে বড় রাস্তার মোড়ে দীপাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে অনীশ।

অনীশরা কোথায় থাকে, কী করে, দীপা নিজের থেকে কিছুই জানতে চায়নি। তবে এটা বুঝতে পারছিল, অনীশ পয়লাওয়ালা ভালো ফ্যামিলির ছেলে। প্রচুর টাকা না থাকলে অমন ঝকঝকে ফরেন গাড়িতে রোজ ঘোরে কীভাবে? দামি-দামি রেস্তোরাঁর অত বিল দেয় কী করে?

বড়লোক লম্পট বজ্জাত ছেলেদের সম্বন্ধে দীপার পরিষ্কার ধারণা আছে। এরকম দু-একজনের পাল্লায় বেশ কয়েক বার তাকে পড়তে হয়েছে। অনেক কষ্টে, কখনও বুদ্ধি খাটিয়ে, কখনও বা স্রেফ আঁচড়ে কামড়ে এবং চিৎকার করে লোকজন জুটিয়ে নিজেকে উদ্ধার করেছে সে। কিন্তু অনীশ তাদের মতো নয়। শুধুমাত্র ফ্রন্ট সিটে তাকে পাশে বসিয়ে বেড়ানো, গল্প করা এবং রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করেনি অনীশ। তার গায়ে হাত দেয়নি, চুমু খায়নি বা আরও বড়রকমের ক্ষতি করতে চেষ্টা করেনি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে দীপা। সেই যে প্রথম দিন বলে দিয়েছিল, রাত্তিরে সাড়ে সাতটার পর সে বাইরে থাকে না, সেটা ভোলেনি অনীশ। পরে আর তাকে মনে করিয়ে দিতে হতো না। সাড়ে সাতটার আগেই দীপাকে বাড়ির কাছাকাছি বড় রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যেত।

মোড় পর্যন্ত এসেও গাড়ি নিয়ে অঘোর নন্দী লেনে তাদের বাড়ির সামনে কখনও যেত না অনীশ। এটা দীপার পক্ষে ভালোই হয়েছে। রোজ রাত্তিরে একটা দামি গাড়ি থেকে তাকে নামতে দেখলে অঘোর নন্দী লেনে এবং ওধারেব বস্তির লোকজন তার সম্বন্ধে কী ভাববে, দীপা

তা জানে। সেটা তার পক্ষে খুবই অস্বস্তির কারণ হতো।

অনীশ হয়তো দীপার অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে গলির ভেতর গাড়ি নিয়ে আসত না। কিংবা অন্য যে কারণ থাকতে পারে তা এইরকম—বস্তি এরিয়ায় দামি গাড়ি ঢুকতে দেখলেই সে সবার চোখে পড়ে যেত। অনীশ খুব সম্ভব তা একেবারে চায়নি। মোটামুটি এইভাবে অনীশের মনোভাবটা আন্দাজ করেছে দীপা।

কিন্তু আর-একটা দিক তার কাছে আদৌ পরিষ্কার নয়। অনীশকে দেখে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে তার মতো ছেলের পক্ষে দীপার মতো একটি মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়া বেশ অস্বাভাবিক। এর কারণ কোনওভাবেই দীপা বুঝে উঠতে পারেনি। তার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, কিন্তু এটাও তো ঠিক, দিনকয়েক মেলামেশার ফলে অনীশকে ভালোও লাগতে শুরু করেছিল। বিকেল হলেই ছাত্রী পড়িয়ে কখন যে রবীন্দ্রসদনের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াত, নিজেরই খেয়াল থাকত না। এক দিকে সন্দেহ, অন্য দিকে প্রবল আকর্ষণ, তখন এই দুইয়ের টানা-পোড়েন চলছে দীপার মধ্যে। সে ভাবত, দেখাই যাক না অনীশ শেষপর্যন্ত তাকে কোথায় নিয়ে যায়।

একদিন ময়দানের দিকে বেড়াতে-বেড়াতে দীপা জিগ্যেস করেছিল, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না?'

ততদিনে তারা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করেছে। অবশ্য এতটা ঘনিষ্ঠতার ইচ্ছা দীপার ছিল না। অনীশকে ভালো লাগলেও নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার মেয়ে সে নয়। নিজের চারপাশে অদৃশ্য সুকঠিন একটি দেওয়াল প্রথম থেকেই তুলে রেখেছে দীপা। কিন্তু অনীশ একরকম জোরজার করেই তাকে 'তুমি' বলিয়েছে। গোড়ার দিকে এভাবে বলতে আড়ষ্ট বোধ করত দীপা, পরে অবশ্য সে ভাবটা কেটে গেছে।

অনীশ বলছিল, 'মনে করব কেন? যা বলবার বলে ফ্যালো—'

দীপা একটু চিন্তা করে বলেছে, 'আমরা কীরকম জায়গায় থাকি, নিজের চোখেই দেখে এসেছ।'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো।'

'ওটাকে প্রায় বস্তিই বলা যায়।'

'তাতে কী?'

উত্তর না দিয়ে দীপা বলে যাচ্ছিল, 'আমার মা-বাবা আর ভাইকেও তুমি দেখেছ।'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো।' একটু অবাকই হয়েছিল অনীশ।

দীপা বলেছে, 'আমরা ভীষণ গরিব। বাবার চাকরিবাকরি নেই, পুরোপুরি বেকার। ভাইটা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, দিনরাত চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। লোকে বলে, মস্তান হয়ে উঠছে। এভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশের খাতায় নাম উঠে যাবে।'

চোখের সামনে নিজেদের সংসারের একটা অস্বস্তিকর ছবি টাঙিয়ে দিয়ে দীপা ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছে, ধরা যাচ্ছিল না। অনীশের বিস্ময় বাড়ছিলই। সে বলেছে, 'এসব শুনে কী হবে? কোনও দরকার নেই।'

'দরকার আছে।'

'মানে?'

'যার সঙ্গে মিশছ তার সব ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে রাখা ভালো।'

অনীশ উত্তর দেয়নি।

দীপা নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে এবার যা জানিয়েছে তা এইরকম। নিজের চারিত্রিক সুনাম এবং সেই কারণে সামাজিক সম্মান আর বিশুদ্ধ একটি শরীর ছাড়া তার কিছুই নেই। এ

দুটো কোনওভাবে নষ্ট হলে সে শেষ হয়ে যাবে, বেঁচে থাকার কোনও মানেই তখন তার কাছে আর থাকবে না।

অনীশ প্রথমটা হকচকিয়ে গেছে। তারপর স্থির চোখে দীপাকে লক্ষ্য করতে-করতে বলেছে, 'ক'দিন তো আমাকে দেখলে। কী মনে হচ্ছে—আমি একটা জন্তু?'

ভিতরে-ভিতরে থিতিয়ে গিয়েছিল দীপা। কথাগুলো রূঢ়ই হয়ে গেছে তার। বেশ খানিকক্ষণ পর সে আস্তে-আস্তে বলেছে, 'আমি তোমাকে জন্তু বলিনি। আমাদের মতো গরিব ফ্যামিলির মেয়েদের অবস্থাটা কী, সেটাই শুধু জানাতে চেয়েছি।'

অনীশ উত্তর দেয়নি, একদৃষ্টে সে দীপার দিকে তাকিয়েই ছিল।

দীপা এবার বলেছে, 'একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে কোরো না।'

'মনে করব না—বলো।'

'আমি তোমার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না।'

অনীশ বলেছে, 'একটু ধৈর্য ধরে থাকো। খুব শিগগিরই তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব। তখন আমার সম্বন্ধে সবই জানতে পারবে। প্লিজ, শুধু ক'টা দিন সময় আমাকে দাও।'

এরপর কিছু বলার থাকে না, অগত্যা দীপা চুপ করেই থেকেছে।

এদিকে অনীশের ব্যাপারে বাড়িতে চাপা টেনশন চলছিল। যদিও সে মাত্র একদিনই এসেছিল তবু কমলা এবং আদিনাথের মনে বেশ খানিকটা দুর্ভাবনা থেকেই গেছে। অনীশ সম্পর্কে গোড়ায়-গোড়ায় তারা সোজাসুজি কিছু জিগ্যেস করত না, তবে মা-বাবার তাকানো এবং হাবভাব দেখে টের পাওয়া যেত ওরা রীতিমতো সন্দিগ্ধ আর চিন্তিত।

অনীশের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে দীপার যা দৈনন্দিন রুটিন ছিল তার এতটুকু হেরফের হয়নি। তার মর্নিং স্কুল। কাঁটায়-কাঁটায় সে আগে যেমন স্কুলে যেত, পরেও তাই গেছে। ফিরেছে এগারোটায়। দুপুরে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে তিনটে নাগাদ। ফিরতে-ফিরতে সাতটা-সাড়ে সাতটা। আটটার পর এক মিনিটও সে বাইরে থাকেনি। তাকে ধরার কোনও উপায়ই ছিল না, তবু মা-বাবার সন্দেহ কিছুতেই কাটেনি। তারা যে তার চলাফেরার দিকে নজর রাখছে, সেটা টের পাওয়া যেত। স্কুল থেকেই হোক বা টিউশনি সেরে সন্ধেবেলাতেই হোক, সে বাড়ি ফিরলেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ্য করত আদিনাথ আর কমলা। তার চোখে-মুখে ওরা কি খুঁজত, কে জানে।

একদিন দীপা মাকে হঠাৎ জিগ্যেসই করে বসেছিল, 'তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখ?'

কমলা চমকে উঠে বলেছে, 'কই, কিছু না তো।'

রুক্ষ গলায় দীপা বলেছে, 'কেন বাজে কথা বলছ। দেখ, অথচ স্বীকার করবে না।'

কমলা একেবারে মিইয়ে গেছে। কোনওরকমে বলেছে, 'কী যে বলিস তার মাথামুণ্ডু নেই।' বলতে-বলতে একরকম দৌড়েই রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।'

কিন্তু এভাবে বেশিদিন লুকোচুরি চলল না। এক রবিবারের সকালে দীপা যখন তার ঘরে বসে চা খাচ্ছে, মা এসে ঘরে ঢুকেছিল। ওই সময়টা মায়ের রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকার কথা। নিশ্চয়ই কোনও জরুরি ব্যাপার আছে, নইলে সে আসত না।

দীপা জিগ্যেস করেছিল, 'কিছু বলবে?'

কমলা ভয়ে-ভয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কী?'

'বললেই তো তুই রাগারাগি করবি।'

মায়ের মুখ-চোখের চেহারা দেখে হেসে ফেলেছিল দীপা, 'আমি বুঝি সবসময় রাগ করি?'

ভরসা পেয়ে কমলা আস্তে-আস্তে মেয়ের পাশে বসেছিল, 'না-না, শুধু-শুধু রাগ করবি কেন? সংসারের জন্যে মুখে রক্ত তুলে খাটিস, মেজাজ কি সবসময় ঠিক থাকে।'

চায়ে আলতো চুমুক দিয়ে দীপা এবার বলেছে, 'যা বলবে বলো।'

কমলা তক্ষুনি উত্তর দিল না, মনে-মনে বলার জন্য যেন তৈরি হতে লাগল।

'কী হল তোমার?' একটু যেন অসহিষ্ণুই হয়ে উঠেছে দীপা, 'যা টাকা দিয়েছিলাম সব খরচ হয়ে গেছে?'

ক্ষুব্ধ অভিমানের গলায় কমলা বলেছিল, 'টাকা ছাড়া তোর সঙ্গে বুঝি আর কোনও কথা থাকতে পারে না? সেদিন যা দিয়েছিলি তাতে এ-মাসটা চলে যাবে। টাকার জন্যে এখন তোকে ভাবতে হবে না।' একটু থেমে বলেছে, 'তোর কাছে অন্য ব্যাপারে এসেছি।'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে থেকেছে দীপা।

এবার দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে কমলা জিগ্যেস করেছে, 'আচ্ছা বুনা, ওই ছেলেটি তো আর এল না।'

মা যে অনীশ সম্পর্কে কিছু বলতে এসেছে, আগেই আবছাভাবে বুঝতে পেরেছিল দীপা। আবার মনে হয়েছিল, এতদিন যখন এ-নিয়ে মুখ খোলেনি তখন হয়তো কিছু না-ও বলতে পারে। সতর্ক ভঙ্গিতে কমলার দিকে তাকিয়ে সে বলেছে, 'শুধু-শুধু কি করতে আসবে? অত জলঝড়ের মধ্যে রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ঠিকমতো পৌঁছুতে পেরেছি কিনা, দেখতে এসেছিল। তারপর আসার তো কোনও কারণ নেই।'

কমলা থমকে গিয়েছিল। অনীশের ব্যাপারটা দীপা যে এভাবে উড়িয়ে দেবে, সে ভাবতে পারেনি।

দীপা আবার বলেছে, 'হঠাৎ অনীশের কথা বললে যে? ওর সঙ্গে কিছু দরকার আছে?'

চমকে উঠে কমলা বলেছিল, 'না-না, দরকার আবার কীসের?'

একটু চুপচাপ।

তারপর কমলা আচমকা জিগ্যেস করেছে, 'তোর সঙ্গে সেদিনের পর অনীশের আর দেখা হয়নি?'

দীপার রাগও হচ্ছিল, আবার যথেষ্ট মজাও পাচ্ছিল সে। দুই বিরুদ্ধ পক্ষের ঘাঘু উকিলের মতো তাদের যেন দুর্দান্ত বুদ্ধির খেলা চলছিল। চোখ কুঁচকে মাকে দেখতে-দেখতে দীপা বলেছে, 'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, এটা বললে তুমি কি খুশি হবে?'

কমলা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর করুণ মুখে বলেছে, 'ওভাবে প্যাঁচ দিয়ে বলছিস কেন? সাদা মনে জিগ্যেস করলাম, তার ওই উত্তর হল?'

'ঠিক আছে, সোজাসুজিই বলছি। অনীশের সঙ্গে আমার রোজই দেখা হয়।'

কমলা খুব অবাক হয়নি, এই উত্তরটাই যেন সে আশা করেছিল। দেখা হোক বা না হোক, এ-ছাড়া অন্য কিছু বললে সে বিশ্বাসই করত না। পরিপূর্ণ চোখে মেয়েকে লক্ষ্য করতে-করতে কমলা শ্বাসরুদ্ধের মতো জানতে চেয়েছে, 'কেমন ছেলে অনীশ?'

'এখনও বুঝতে পারিনি। পারলে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

দীপার কাঁধে হাত রেখে কাঁপা গলায় কমলা বলেছে, 'দেখিস বুনা, আমাদের যেন সর্বনাশ না হয়ে যায়।'

এতক্ষণ দীপার সঙ্গে এক হিসেবি সন্দিগ্ধ ভীরু মেয়েমানুষ যেন কথা বলছিল। এই প্রথম সে টের পেয়েছে কমলার ভেতর থেকে তার নিজের মা বেরিয়ে এসেছে, যে সন্তানের বিপদের

আশঙ্কায় অস্থির, উৎকণ্ঠিত। কমলার হাতের ছোঁয়া তার স্নায়ুর ভেতর দিয়ে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত যেন পৌঁছে গিয়েছিল।

দু-হাতে মায়ের হাতটা জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিল দীপা। গভীর গলায় বলেছিল, 'মা, কত কম বয়েস থেকে তুমি আমাকে একা-একা রাস্তায় বেরুতে দিয়েছ। কখনও খারাপ কিছু কি দেখেছ? আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, এমন কিছু করব না যাতে তোমাদের মাথা কাটা যায়, আর আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়।'

মনে আছে, সেদিনই মা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে পিন্টু তার ঘরে এসেছিল। সে বলেছে, 'কি গুরু, কীরকম চালাচ্ছ!'

বস্তির ছোকরাদের সঙ্গে দিনরাত মিশে পিন্টুর বারোটা বেজে গেছে। কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, জানে না। ভদ্রতা, সহবত—এসবের ধার ধারে না। ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে তাকিয়েছিল দীপা, কিছু বলেনি।

ঘরের একমাত্র চেয়ারটা শব্দ করে টেনে নিয়ে বসতে-বসতে পিন্টু এবার বলেছে, 'খুব উড়ছিস দিদি।'

'উড়ছিস দিদি!' ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে দীপা, 'ছোটলোক, বাঁদর—এসব কী ধরনের কথা! বদের ধাড়ীদের সঙ্গে আড্ডা মেরে-মেরে একেবারে গোল্লায় গেছিস।'

দীপার বিরক্তি বা ঝাঁঝ কিছুই গায়ে মাখেনি পিন্টু। দুই চোখ আর দুই হাত নাচাতে-নাচাতে বলেছে, 'উড়লে বলব কি বড়ি ফেলে শুয়ে আছিস। যাঃ বাবা!'

মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে দীপার। দাঁতে দাঁত চেপে সে পিন্টুকে দেখছিল।

পিন্টু থামেনি, 'দু-দিন আগে ভিক্টোরিয়ার দিকে গিয়েছিলাম। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি, সট করে চোখে পড়ল সেই মক্কেলের সঙ্গে তুই রেসকোর্সের পাশ দিয়ে একটা ফরেন কারে উড়ে বেড়াচ্ছিস।'

দীপা চমকে উঠেছে। ভেতরে-ভেতরে সে বেশ গুটিয়ে গিয়েছিল। তবে সে ভাবটা বাইরে ফুটে উঠতে দেয়নি। ব্যাপারটা পুরোপুরি উড়িয়েই দিতে চেয়েছিল দীপা, 'আজে বাজে কী বলছিস!' তবে তার গলায় একটু আগের সেই ঝাঁঝ বা ক্রোধ ছিল না।

'আজে বাজে!' চোখের তারা ঘুরিয়ে দীপাকে দেখতে-দেখতে বলেছিল পিন্টু।

'না তো কী!' দীপা পিন্টুর দিকে তাকাতে পারেনি। অবশ্য এ-বাড়ির কাউকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। কেন না তার পয়সাতেই সংসার চলে। সবাই এ-জন্য তাকে যে তোয়াজ করে, দীপা তা জানে। দীপা কিছু করলে বাধা দেওয়ার সাহস বা শক্তি কারও নেই। তবু ছোট ভাইয়ের কাছে ওভাবে ধরা পড়ে যাওয়াতে তার খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নখ খুঁটতে-খুঁটতে সে বলেছে, 'দূর থেকে কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস! আর সেটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস।'

পিন্টু চেয়ার থেকে উঠে দীপা যেদিকে মুখ ফিরিয়েছিল সেদিকে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে মজাদার ভঙ্গি করে বলেছে, 'আমার চোখে দূরবিন ফিট করা আছে গুরু। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ফরেন কারে সেই মক্কেলের পাশে তুমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

দীপা উত্তর দেয়নি।

পিন্টু এবার বলেছে, 'টেরিফিক গাড়িটা কি ওই মালের নাকি রে দিদি?' তার চোখ চকচকিয়ে উঠেছিল।

দীপা বলেছে, 'জানি না, যা এখান থেকে।'

পিন্টু চলে যায়নি। একটু চিন্তা করে বলেছে, 'দিদি, একটা কথা বলব?'

দীপা আস্তে-আস্তে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল, তবে কিছু বলেনি।

পিন্টু এবার বলেছিল, 'এ-বাড়ি থেকে তুই কেটে পড়।'

দীপা বিমূঢ়ের মতো বলেছে, 'কেটে পড়ব! মানে!'

'এখানে থেকে কী করবি বল। বাবা-মা আমি—সবাই তোর ব্লাড চুষে ছিবড়ে করে ফেলব। চান্স যখন একটা পেয়ে গেছিস ওই মক্কেলটার কাঁধে চেপে স্রেফ হড়কে যা।'

দীপা অবাক। কিছুক্ষণ আগেও অসভ্যতা আর বাঁদরামো করছিল পিন্টু, কিন্তু এখন তার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে গভীর সহানুভূতির ছাপ। সে যে খুব আন্তরিকভাবেই কথাগুলো বলেছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি দীপার।

এই পিন্টু স্কুল-টুল ছেড়ে যখন মস্তান হয়ে উঠল, বাজে বখা ছোকরাদের সঙ্গে মিশে জাহান্নামে যেতে লাগল, তখন থেকেই তাকে ঘেন্না করে আসছে দীপা। পারতপক্ষে সে তার সঙ্গে কথা বলত না, তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু তার মধ্যেও মমতা এবং ভালোত্বের একটু তলানি যে এখনও অবশিষ্ট আছে—এটা দীপার কাছে একটা নতুন আবিষ্কার। তার চোখের কোণ শিরশির করছিল, গলার কাছটা ভারী হয়ে উঠছিল। পিন্টুর হাত ধরে কাছে বসিয়ে কাঁপা গলায় সে বলেছিল, 'ধর আমি এ-বাড়ি থেকে চলে যাব। কিন্তু তোদের কী হবে? বাবার চাকরি নেই, তুই বেকার। সংসার চলবে কীভাবে?'

'গুলি মার সংসার-ফংসারকে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। আমি তো মস্তান হয়েই গেছি, ওয়াগন ব্রেকারদের গ্যাং-এ ঢোকার জন্যে পা-ও বাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে যদি কিস্‌সু না হয়, হাতে ড্যাগার আর চেম্বার তুলে নিতে হবে।' পিন্টু এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছিল, 'আমাদের যা হওয়ার হবে, তুই তো ভালোভাবে বাঁচ।'

দীপা উত্তর দেয়নি। অদ্ভুত আবেগে তার বুকের ভেতর ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল।

পিন্টু হঠাৎ জিগ্যেস করেছে, 'তোর ওই মক্কেলের বাড়ির ঠিকানাটা দে তো।'

দীপা চমকে উঠেছিল। ঠিকানা সে-ও জানত না, জানলেও দিত না। পিন্টু গিয়ে কী হুজ্জুত পাকিয়ে বসবে, কে জানে। দীপা বলেছিল, 'ঠিকানা দিয়ে কী হবে?'

তার মনোভাবটা আঁচ করতে পেরেছিল পিন্টু। সে হেসে-হেসে বলেছে, 'তোর ভয় নেই দিদি। আমার মতো মাকড়া ওর কাছে গেলে তোর কেস কিচাইন হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি না।'

পিন্টুর এই কাণ্ডজ্ঞান ভালোই লেগেছে দীপার। সে হালকা গলায় বলেছে, 'তাহলে ঠিকানা চাইছিস কেন?'

'বাবাকে ভালো ড্রেস-ট্রেস চড়িয়ে পাঠিয়ে দেব। তোর মক্কেলের বাবার সঙ্গে বাত পাক্কা করে আসবে। একটা কাগজে অ্যাড্রেসটা ঝট করে লিখে দে।'

দীপা এবার বিরক্তভাবে বলেছিল, 'আমি অনীশদের ঠিকানা জানি না।'

'সে কি রে! মক্কেল তোকে বাড়ি পৌঁছে দিল, ফরেন কারে ঘোরাচ্ছে, আর তার অ্যাড্রেসই জানিস না!'

'ও বলছিল, শিগগির একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে।'

অভিজ্ঞ বয়স্ক লোকের মতো এবার গম্ভীর মুখে পিন্টু বলেছে, 'এটা ঠিক করিসনি দিদি, ওর ঠিকানাটা জানা দরকার। হয়তো মক্কেল জেন্টলম্যান, তবু আমরা ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যদি কিছু খারাপ মতলব-ফতলব থাকে?'

পিন্টুর গাম্ভীর্য, দূরদর্শী বিজ্ঞ মানুষের মতো কথাবার্তা দীপাকে বিস্মিত করেছিল। সেদিন এই বখাটে অসভ্য ইতর ছেলেটার ভেতর থেকে সম্পূর্ণ অচেনা একটি কোমল মমতাময়

সহানুভূতিপ্রবণ মানুষ যেন বেরিয়ে এসেছিল। একটা মানুষের ভেতর কতরকম মানুষই না থাকে! দীপা কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

অনীশের ঠিকানাটা যেন কোনও সমস্যার ব্যাপারই না, এভাবে পিন্টু এবার বলেছে, 'ঠিক আছে, ওটা নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি মক্কেলের পাত্তা লাগিয়ে ফেলব। কলকাতায় যখন থাকে তখন মাল যাবে কোথায়? তিনদিনের ভেতর অ্যাড্রেস নিয়ে আসব।'

তিন দিন লাগেনি, দেড় দিনের মাথায় অনীশদের বাড়ি ঠিকানা জোগাড় করে এনেছিল পিন্টু। চোখ দুটো পুরোপুরি গোল করে বলেছিল, 'এ কাকে ক্যাচ করেছিস দিদি!'

উদ্বিগ্ন মুখে দীপা জিগ্যেস করেছিল, 'কেন, কী হয়েছে?'

'মক্কেলদের কী বাড়ি রে গুরু, দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যায়। চার-পাঁচটা ফরেন কারও আছে।' বলতে-বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল পিন্টু, 'আমার কী মনে হয়, জানিস দিদি?'

দীপা উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল, 'কী?'

'ওই মালেদের ডেফিনিটলি নোট ছাপার কারখানা আছে। না হলে এমন টেরিফিক বাড়ি আর এত গাড়ি-ফাড়ি হয় কী করে?'

দীপা উত্তর দেয়নি।

পিন্টু থামেনি। সমানে বলে যাচ্ছিল সে, 'আরও অনেক খবর এনেছি, দিদি। তোর ওই মক্কেলের বাবার নাম মণিমোহন চ্যাটার্জি। ব্যারাকপুর আর টিটাগড়ে ওদের অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আছে।'

এ-ছাড়া আরও প্রচুর খবর দিয়েছিল পিন্টু। পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা ওদের বাড়ি নিয়মিত যাতায়াত করে। ইলেকশানে যে ক্যান্ডিডেটের জেতার সম্ভাবনা, নির্বাচনী প্রচারের সময় গোপনে তাকে টাকাও দিয়ে থাকেন মণিমোহন। এটা নাকি তাঁর ইনভেস্টমেন্ট, পরে নানাভাবে তিনি এর সুযোগ নিয়ে থাকেন।

দীপা চমকে উঠেছিল। মণিমোহন চ্যাটার্জির নামটা তার আগেই শোনা। ইনিই যে অনীশের বাবা, এটা জানার সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে ভেতরে চাপা উদ্বেগ টের পেতে শুরু করেছিল সে। এত বড়লোকের ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ না হলেই হয়তো ভালো হত।

পিন্টু এবার বলেছিল, 'দিদি, তুই ভাবিস না। আসছে রবিবার বাবাকে মণিমোহন চ্যাটার্জির কাছে পাঠিয়ে দেব। মক্কেলের সঙ্গে তোর মহব্বত যখন জমে গেছে তখন চিন্তা-ফিন্তার কিছু নেই। বস্তির মেয়ের সঙ্গে রাজার ছেলের বিয়ে! শ্লা, একখানা ফাটাফাটি ব্যাপার হয়ে যাবে, না কি বলিস?'

দীপা শশব্যস্তে বলে উঠেছিল, 'না-না পিন্টু, মা-বাবাকে এখন কিছু বলিস না। তাড়াহুড়োর কী আছে, আর কিছুদিন যাক না।'

আসলে সেই মুহূর্তে অনীশের কথা ভাবছিল দীপা। অনীশ কথা দিয়েছে, তাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে। যতদিন নিয়ে না যাচ্ছে সে অপেক্ষা করতে চাইছিল।

দীপার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে থমকে গিয়েছিল পিন্টু। সে বলেছে, 'অল রাইট। তোর সিগন্যাল না পেলে মুখে তালা ঝুলিয়ে রাখব।'

দীপা সতর্কভাবে বলেছে, 'অনীশের ব্যাপারটা অন্য কাউকে বলিস না।'

'তুই আমাকে কী ভাবিস বল তো?' নিজের মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে পিন্টু বলেছে, 'এটার ভেতর স্ক্র্যাপ আয়রন পোরা রয়েছে?'

দীপা হকচকিয়ে গিয়েছিল।

পিন্টু এবার বলেছে, 'আরে বাবা, আমি কি ড্রাম পিটিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় বলে বেড়াব, তোমরা শোনো আমার দিদি প্রেমের হেভি গাড্ডায় পড়ে গেছে! তোর প্রেস্টিজ নেই?'

এইভাবে মাসদেড়েক কেটেছে। তারপর আচমকা ভবানীপুরের টিউশনিটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। যে মেয়েটিকে সে পড়াত, তার বাবা সাত দিনের নোটিশে মাদ্রাজে বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য এর জন্য দীপার ক্ষতি খুব একটা হয়নি। ছাত্রীর বাবা যেদিন তাকে ট্রান্সফারের কথা বললেন তার পরদিনই কসবায় একটা টিউশনি পেয়ে গিয়েছিল দীপা। কাজেই ভবানীপুরের দিকে আর আসা হত না, একেবারে উলটো দিকে যেতে হতো।

অসুবিধে যা হয়েছিল তা হল, অনীশের সঙ্গে তার যোগাযোগটা হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আগে ভবানীপুরে টিউশনি সেরে রবীন্দ্রসদনের সামনে অনীশের জন্য অপেক্ষা করত দীপা, কিন্তু কসবায় ছাত্রী পড়িয়ে অত দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য একদিন পড়াতে না গিয়ে সে ওখানে যেতে পারত, অনীশকে বলতে পারত রবীন্দ্রসদনের বদলে সাউথ ক্যালকাটার কোথাও যেন সন্ধেবেলা সে চলে আসে, কিন্তু নতুন টিউশনি নিয়েই কামাই করতে সাহস হয়নি। এর জন্য ছাত্রীর মা-বাবা যে আদৌ খুশি হবে না, সে তা জানত।

অনীশের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবে, দীপা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। অবশ্য পিন্টু ওদের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে এনেছে। সেখানে চিঠি লিখতে পারত দীপা, কিন্তু সে চিঠি যদি অনীশের হাতে না পড়ে অন্য কারও হাতে পড়ে? তা ছাড়া অনীশ যদি পায়ও, নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে। কেন না সে তাকে ঠিকানা দেয়নি। নিশ্চয়ই ভাববে, দীপা পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তার খবরাখবর নিয়েছে। ফলে দীপার সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ হয়ে যাবে।

আরও দিনকয়েক কাটার পর এক রবিবারের দুপুরে দীপা ঠিক করেছিল, হরপ্রসাদ সরণিতে অনীশদের এমারেল্ড হাউসের সামনে দিয়ে বারকয়েক ঘোরাঘুরি করবে। হঠাৎ যদি অনীশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—এটাই আসল উদ্দেশ্য। দেখা হলে অবশ্য তাকে একটু অভিনয় করতে হবে। অনীশকে সে জানিয়ে দেবে, একটা জরুরি কাজে সে ও-পাড়ায় গিয়েছিল এবং অনীশের সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার। ওই রাস্তায় অনীশদের বাড়ি এটা জানার পর সে অবাক হওয়ার ভান করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে-মনে বেশ কয়েক বার এই অভিনয়টার রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছিল দীপা। দেখা হওয়ার সম্ভাবনা যদিও খুব কম, তবু একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিল।

সেই দিনটা নানাভাবে তাকে অনেকগুলো সুযোগ করে দিয়েছিল। বাবা-মা সকাল বেলাতেই দক্ষিণেশ্বরে চলে গেছে। সেখানে কী একটা উৎসব ছিল, ওদের ফিরতে-ফিরতে রাত হয়ে যাবে। পিন্টুও বাড়ি ছিল না, বন্ধুদের সঙ্গে দু-দিনের জন্য দীঘায় বেড়াতে গেছে। পাশের ঘরের উমাপদ বউ ছেলেপুলে নিয়ে গিয়েছিল শালীর ছেলের অন্নপ্রাশনে। অবশ্য রাজেশ্বর সিংরা ছিল। ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত খাটুনির পর দুপুরে খেয়েদেয়ে সে বিকেল অব্দি ঘুমোয়। একা-একা তার নিঃসন্তান বউ গঙ্গা আর কি করবে, সে-ও শুয়ে পড়ে। বিভাও সেদিন বাড়িতে ছিল না, নার্সিংহোমে ডিউটি দিতে চলে গিয়েছিল।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ভালো একটা শাড়ি পরে, পরিপাটি চুল আঁচড়ে, একটু সেন্ট মেখে, ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দীপা। সবার কাছেই একটা করে চাবি থাকে। মা-বাবা যদি তার আগেও কোনও কারণে ফিরে আসে, ঘরে ঢুকতে অসুবিধা হবে না।

বাড়িটা পেছনে রেখে অঘোর নন্দী লেনের মোড়ে আসতেই নিজের অজান্তেই থমকে দাঁড়িয়ে

পড়েছিল দীপা। ওধার থেকে অনীশ আসছে।

প্রথমটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছিল। পরক্ষণে আশ্চর্য এক আবেগ প্রবল স্রোতের মতো তার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করেছিল। দীপা টের পাচ্ছিল, এই আধাআধি চেনা, অনেকটাই অচেনা যুবকটিকে কবে যেন নিজের অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেছে।

একটু পরেই অনীশ কাছে চলে এসেছে। সে বলেছিল, 'এ কি, বেরুচ্ছ নাকি? আর এক মিনিট দেরি হলে তোমার সঙ্গে দেখা হত না।'

অনীশকে দেখে খুব ভালো লাগছিল দীপার। কি এক সুখানুভূতি তার স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। সে বলেছে, 'চলো, বাড়ি যাই।'

'তুমি কোনও কাজে যাচ্ছিলে নিশ্চয়ই।'

'তেমন কিছু জরুরি ব্যাপার নয়। এসো—'

বাড়ির দিকে যেতে-যেতে অনীশ জিগ্যেস করেছে, 'তুমি আজকাল রবীন্দ্রসদনের কাছে যাও না কেন? আমার ওপর রাগ-টাগ করেছ?'

রবীন্দ্রসদনের সামনে না যাওয়ার কারণটা জানিয়ে দিয়েছিল দীপা।

অনীশ বলেছে, 'ও, এই ব্যাপার। আমি তো কিছুই জানি না।'

'জানাব কী করে—বলো। আমাকে কি তোমার ঠিকানা দিয়েছ?'

বিব্রতভাবে অনীশ বলেছে, 'তা অবশ্য ঠিক। তোমাকে একটা ফোন নাম্বার দেব। এবার থেকে দরকার হলে দুপুরের দিকে ওখানে ফোন কোরো।'

'আচ্ছা।' দীপা ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছিল।

অনীশ একটু ভেবে এবার বলেছে, 'তোমার সঙ্গে কতদিন দেখা হচ্ছে না, আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। তাই ভাবলাম তোমাদের বাড়ি যাই।'

দীপা মনে-মনে বলেছে, 'আমারও খারাপ লাগছিল। তাই তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম।' তবে মুখে কিছু বলেনি।

অনীশ আবার বলেছে, 'কসবায় কতক্ষণ পড়াও?'

'পাঁচটা, সাড়ে-পাঁচটা পর্যন্ত।'

'ছ'টার সময় গোল পার্কের কাছ চলে যেতে পারি।'

'এসো।'

বাড়ি ফিরে এসে তালা খুলে অনীশকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল দীপা। বলেছিল, 'দু-মিনিট বসো, আমি আসছি।'

অনীশ বলেছিল, 'নিশ্চয়ই মিষ্টি-টিষ্টি আনতে যাচ্ছ?'

সেইরকমই ইচ্ছে ছিল দীপার। সে বলেছে, 'এই মানে—'

'মানে-টানের দরকার নেই। এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি, মিষ্টি আনতে হবে না।'

'চা করে আনি?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। প্লিজ তুমি বোসো।'

প্রায় জোর করেই দীপাকে বসিয়ে দিয়েছিল অনীশ। তারপর বলেছে, 'বাড়িটা ভীষণ চুপচাপ দেখছি। কেউ নেই নাকি?'

'না।'

মা-বাবা, পিন্টু এবং বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা কে কোথায় গেছে, সব জানিয়েছিল দীপা।

সেই দুপুরবেলায় চারপাশ আশ্চর্য নিঝুম। বাইরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে নিমগাছের ডালে একজোড়া শালিক অনবরত খুনসুটি করে চলেছে। কোথায় যেন থেকে-থেকেই ঘুমন্ত গলায় একটা

কাক ডেকে উঠছিল। শালিকের কিচির-মিচির আর কাকের ডাক দুপুরের নির্জনতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

আকাশে ছন্নছাড়া কিছু মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। জলের মিহি দানা মেশানো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল ঝিরঝির করে।

মুখোমুখি বসে এলোমেলো কথা বলতে-বলতে হঠাৎ কী যেন হয়ে গিয়েছিল দুজনের। সেদিনের স্তব্ধ নির্জন দুপুর অনিবার্য নিয়তির মতো দুটি যুবক-যুবতীকে পরস্পরের খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, ঘটিয়ে দিয়েছিল আশ্চর্য এক ম্যাজিক।

একসময় দীপা বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে টের পেয়েছিল সে আর অনীশ বিছানায় শুয়ে আছে আর দুজনের শরীর কী এক অভ্রান্ত নিয়মে গলে-গলে মিশে যাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে সে অনুভব করতে পারছিল দুটো পুরু উষ্ণ ঠোঁট তার ঠোঁটের সব নির্যাস শুষে নিচ্ছে।

কতক্ষণ পর কে জানে, দুটো শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপরও অপরিসীম সুখানুভূতিতে সমস্ত স্নায়ু আচ্ছন্ন হয়ে ছিল দীপার।

কিন্তু কখন যেন একসময় ঘোরটা কেটে গিয়েছিল দীপার। চমকে ধড়মড় করে উঠে বসেছে সে। শ্বাসরুদ্ধের মতো শাড়ি-টাড়ি টেনে উরু হাঁটু এবং পায়ের পাতা ঢেকে, দুই হাতে মুখ গুঁজে আচমকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

তার পিঠে একা হাত রেখে নরম গলায় অনীশ বলেছে, 'কাঁদছ কেন?'

দীপার কান্না থামেনি। উদভ্রান্তের মতো মাথা নাড়তে-নাড়তে সে বলেছে, 'এ কী করলাম আমি, এ কী করলাম!'

আস্তে-আস্তে দীপার পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে অনীশ বলেছে, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? যা হল তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কোয়াইট ন্যাচারাল।'

ভয়ে-ভয়ে দীপা জিগ্যেস করেছে, 'যদি কিছু হয়ে যায়?'

'হলে তখন দেখা যাবে। অত নার্ভাস হয়ো না তো। স্মাইল—হাসো হাসো।'

এরপর থেকে গড়িয়াহাটার মোড়ে সন্ধের আগে-আগে অনীশের সঙ্গে রোজ দেখা হতে লাগল। দিনগুলো স্বপ্নের মধ্যে যেন উড়ে যাচ্ছিল।

মাসতিনেক বাদে হঠাৎ একদিন স্নান করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল দীপা। সেইসঙ্গে হড়হড় করে বমি, সারা শরীর একেবারে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল তার।

কমলা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে দীপার হাত-পা-মুখ-বুক ধুইয়ে, জামাকাপড় বদলে ঘরে এনে শুইয়ে দিয়েছিল।

প্রথমটা কমলার মনে হয়েছিল, খাওয়াদাওয়ার গোলমালে বদহজম হয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার অভিজ্ঞ চোখ আতিপাতি করে দীপার চোখে-মুখে কি যেন খুঁজতে শুরু করেছিল। খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল কমলাকে।

মায়ের দিকে তাকাতে পারছিল না দীপা। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মায়ের সমস্ত শরীর যেন হুড়মুড় করে ভেঙে তার পাশে পড়ে গিয়েছিল। তার মুখ থেকে সব রক্ত পরতে-পরতে নেমে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে। দু-হাতে দীপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা শিথিল গলায় সে বলেছিল, 'কে আমাদের এমন ক্ষতি করল?'

দ্রুত মায়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে দিয়েছিল দীপা। সেই দুপুরের প্রথম মাসটায় সে বুঝতে পারেনি কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকে একটু-একটু করে নিজের

শরীরে কীসের একটা সংকেত পাচ্ছিল। বিবাহিতা দু-একজন বন্ধুর কাছে এ-সব ব্যাপারে আগেই দীপা অনেক কিছু শুনেছে। নিজের দেহে সেই লক্ষণগুলি আবছাভাবে ফুটে উঠতে দেখছিল সে। আর এখন তো—

শ্বাস-টানার মতো শব্দ করে চাপা গলায় কমলা আবার বলেছিল, 'কীরে, চুপ করে আছিস কেন? বল।'

দীপা মুখ তোলেনি, বালিশে মুখ গুঁজে রেখেই আবছা গলায় অনীশের নাম বলেছিল।

খুব অবাক হয়নি কমলা। এটা যেন একরকম জানাই ছিল তার। তবু ভয়ার্ত মুখে সে বলেছে, 'কী হবে এখন? অনীশ কিছু বলেছে?'

'ভাবতে বারণ করেছে।'

'বিয়ের কথা কিছু বলেছে?'

'না।'

'শেষে যদি পিছিয়ে যায়?'

দীপা উত্তর দেয়নি।

কী চিন্তা করে কমলা জিগ্যেস করেছিল, 'তোর বাবাকে অনীশদের বাড়ি পাঠাব?'

দীপা বলেছে, 'আর কিছুদিন যাক না—'

'আর দেরি করলে লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না।'

একটু চুপ। তারপর কমলাই ফের বলেছে, 'অনীশ কি এর মধ্যে আমাদের এখানে আসবে?'

দ্বিতীয় বার সেই যে অনীশ দীপার খোঁজে অঘোর নন্দী লেনে এসেছিল, তারপর থেকে মাঝে-মাঝেই আসত। দীপা বলেছিল, 'আসতে পারে। আমাকে কিছু বলেনি।'

কমলা বলেছিল, 'দু-চার দিনের ভেতর না এলে তোর বাবাকে পাঠাতেই হবে। এ-নিয়ে কারও আপত্তি আমি শুনব না।' চিরদিনের ভীরু কমলাকে সেই মুহূর্তে ভীষণ একরোখা আর জেদী মনে হয়েছিল। সর্বক্ষণ যে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে তার ভেতর থেকে অন্য এক কমলা বেরিয়ে এসেছিল যেন।

অনীশ কবে আসবে সেজন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি, পরের দিনই সে দীপাদের বাড়ি চলে এসেছিল।

আগের দিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেদিন কসবায় যায়নি দীপা। সন্ধেবেলা তার জন্য গোলপার্কে দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে শেষপর্যন্ত কী ভেবে অঘোর নন্দী লেনে চলে এসেছে অনীশ। বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে আদিনাথ এসে তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিন সে এলে আদিনাথ বা কমলা সোজা দীপার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সেদিন আদিনাথ বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। এসো—'

অনীশ রীতিমতো অবাকই হয়েছিল। চমকে আদিনাথের দিকে তাকিয়েছে সে। আদিনাথের মুখে চাপা অসন্তোষ ক্ষোভ বিরক্তি বা অন্য কী যে ছিল, ঠিক বুঝতে পারেনি। তবে এটা টের পেয়েছে, এই আদিনাথ অন্যদিনের আদিনাথের মতো নয়। যে-মানুষ মেয়ের রোজগারে বেঁচে থাকার গ্লানিতে জড়সড় হয়ে থাকে এই আদিনাথের মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনীশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল।

আদিনাথ সেদিন তাকে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকেছিল। একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে অনীশকে বসিয়ে, তার মুখোমুখি বসতে-বসতে বলেছিল, 'আজকালের ভেতর তুমি না এলে আমাকে তোমাদের বাড়ি যেতে হত।'

হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল অনীশ। বলেছিল, 'কেন বলুন তো?' গলার স্বরটা স্বাভাবিক

ছিল না তার, ভীষণ কাঁপছিল।

এদিকে দীপা নিজের ঘরে শুয়ে ছিল। শুয়ে-শুয়েই টের পেয়েছিল, অনীশ এসেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন অনীশ তার ঘরে এল না তখন আস্তে-আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে পাশের ঘরে আদিনাথ এবং অনীশের গলা শুনতে পেয়েছিল। তা ছাড়া চোখে পড়েছিল, ওই ঘরেরই দরজার ঠিক বাইরে শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে কমলা। নিজের অজান্তেই মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ওখান থেকে অনীশ এবং আদিনাথকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আদিনাথ তখন বলছে, 'আমাদের ফ্যামিলিকে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচাও।'

অনীশ বলেছিল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুনা তোমাকে কিছু বলেনি?'

দীপার ডাক নাম যে বুনা, এতদিনে জেনে গেছে অনীশ। সে বলেছিল, 'না।'

'লজ্জায় হয়তো বলতে পারেনি। কিন্তু আমার পক্ষে মুখ বুজে থাকা সম্ভব না।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থেমেছিল আদিনাথ। তারপর আবার শুরু করেছে, 'দীপা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, তোমার সন্তান তার পেটে।'

মুহূর্তে মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে অনীশের। গলগল করে ঘামতে শুরু করেছিল সে। ভাঙা-ভাঙা দুর্বল স্বরে বলেছে, 'কী বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি।' আদিনাথ সোজাসুজি অনীশের চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

অনীশ মুখ নামিয়ে নিয়েছিল, ঘামে তখন তার জামা-টামা ভিজে গেছে। পুরোনো বাড়ির সেই ছোট চাপা ঘরটায় তার দম যেন আটকে আসছিল।

আদিনাথ এবার বলেছে, 'দেখ বাবা, মানুষের শরীরে কামের প্রবৃত্তি থাকবে, সাময়িক উত্তেজনায় সে কিছু করে বসবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু না। তা ছাড়া যুবক-যুবতীকে তো ঘি আর আগুনই বলা হয়। যা হওয়ার তা হয়েই গেছে, এখন তোমাকে বুনা আর তোমার সন্তানের দায়িত্ব নিতে হবে।'

বাবাকে যত দেখছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল দীপা। ভীরু বেকার এবং মেয়ের পয়সায় বেঁচে-থাকা একটা অপদার্থ মানুষের মতো নয়, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল পিতার মতো কথা বলছিল আদিনাথ। ফলে বাবার সম্বন্ধে খুবই শ্রদ্ধা হচ্ছিল। সেইসঙ্গে ভেতরে-ভেতরে তীব্র উৎকণ্ঠাও বোধ করছিল। আদিনাথ যেভাবে যা-যা বলছে তাতে অনীশ অসন্তুষ্ট না হয়। তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হলে দীপাকে যে কী বিপদে পড়তে হবে, সে-ই জানে।

অনীশের মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুঝিবা একটা অতল খাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর যে-কোনও মুহূর্তে আদিনাথ তাকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেবে। ভয়ার্ত শুষ্ক গলায় সে বলেছিল, 'আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

'ভাবাভাবির সময় নেই অনীশ।' আগের দিন যেভাবে কমলা দীপাকে বলেছিল অবিকল সেই সুর এবং সেই ভঙ্গিতে আদিনাথ অনীশকে বলে যাচ্ছিল, 'তুমি তো জানোই, আমরা কত গরিব, তবু মানসম্মান বলে কিছু তো একটা আছে। তুমি যদি দয়া না করো, সেটা তো যাবেই, তার ওপর মেয়েটাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।'

তক্ষুনি উত্তর দেয়নি অনীশ। অনেকক্ষণ পর বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি বাড়িতে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলি।'

'কবে আমরা জানতে পারব?'

'কাল।'

'তুমি আসবে?'

'হ্যাঁ।'

এরপর আর কোনও কথা হয়নি। মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল অনীশ এবং কমলা আর দীপাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

দীপা বলেছিল, 'এসো আমার ঘরে।'

অনীশ আস্তে-আস্তে মাথা নেড়েছে, 'না, আজ থাক।' দীপাদের পাশ দিয়ে সে সদর দরজার দিকে চলে গিয়েছিল।

দীপা তার পিছু-পিছু গেছে। বলেছে, 'দু-মিনিট বসে যাও। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'আজ আমাকে ক্ষমা করো। প্লিজ—' পেছন ফিরে একবারও দীপার দিকে তাকায়নি অনীশ। অঘোর নন্দী লেনের আঁকাবাঁকা সর্পিল গলি মাড়িয়ে প্রায় টলতে-টলতে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন অনীশ আসেনি, তার পরের দিনও না। এমনকী দশদিন পার হয়ে যাওয়ার পরও না। এমনকী গোলপার্কে এসে দীপার জন্য অপেক্ষাও করেনি।

উৎকণ্ঠায়, ভয়ে, সামাজিক অসম্মানের আশঙ্কায় দীপাদের গোটা পরিবারটার শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন। দীপার পেটে ভ্রূণটা যত বড় হচ্ছিল ততই দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছিল।

দশদিন পর আদিনাথ বলেছিল, 'ও আর আসবে না, মনে হচ্ছে।'

আদিনাথের কথাগুলো যেন বাতাসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল। দীপা বিমূঢ়ের মতো বাবার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিয়েছে।

আদিনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, 'বিশ্বাসঘাতক! পশু!'

বাবা যা-ই বলুক, অনীশকে এতটা নীচের স্তরে নামাতে ইচ্ছে হয়নি দীপার। সে তখনও ভাবছিল, নিশ্চয়ই অনীশ সুখবর নিয়ে আসবে। মা-বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে খানিকটা সময় লাগছে। সহজে এরকম একটা ব্যাপার কেউ কি মেনে নেয়!

কমলা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এ ক'দিনে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় তার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। চোখের কোলে স্থায়ী কালির ছোপ পড়েছে, গাল বসে গেছে, কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। সে বলেছিল, 'এখন কী হবে মেয়েটার? আমরা যে শেষ হয়ে গেলাম।'

একটু দূরে মূর্তির মতো বসে ছিল পিন্টু। আগেই সে দীপার ব্যাপারটা জেনেছে। আদিনাথের মতো প্রচণ্ড রাগে পিন্টু ফেটে পড়েনি বা কমলার মতো ভেঙে চুরমারও হয়ে যায়নি, শুধু বিষণ্ণ চোখে দীপার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। পিন্টুকে এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে কখনও কেউ দেখেনি।

এদিকে আদিনাথ স্ত্রীকে বলেছিল, 'তুমি মনে করেছ, আমি ওকে ছেড়ে দেব? কক্ষনো না। এত বড় একটা অন্যায় করে হারামজাদা বজ্জাত পার পেয়ে যাবে, আমি তা হতে দেব না। দেশে আইনকানুন এখনও আছে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কমলা জিগ্যেস করেছে, 'কী করতে চাও তুমি? কত বড়লোক ওরা জানো! পয়সার জোরে ওরা আইনকানুন কিনে নিতে পারে।'

'অত সোজা না। এখনই আমি ওদের বাড়ি যাচ্ছি।' বলে জামাকাপড় বদলাবার জন্য ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল আদিনাথ।

দীপার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে হঠাৎ কী একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল যেন। আদিনাথকে থামিয়ে সে বলেছিল, 'তোমাকে যেতে হবে না বাবা—'

বিমূঢ়ের মতো আদিনাথ জিগ্যেস করেছে, 'তাহলে?'

'আমি নিজেই যাব।'

'তুই!'

'হ্যাঁ, বাবা—' আস্তে মাথা নেড়েছে দীপা, 'যা করবার আমিই করব।'

'কিন্তু তুই ছেলেমানুষ। ওদের সঙ্গে কি পারবি!'

'দেখি একবার।' দীপার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল।

তারপর আজ কিছুক্ষণ হরপ্রসাদ সরণিতে মণিমোহন চ্যাটার্জি আর অনীশের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। অনীশ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সে তাকে চেনে না। চরম অপমান করে ওরা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে।

একটা ব্যাপার কিছুতেই দীপা বুঝে উঠতে পারছে না, তার মতো গরিব পরিবারের মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে কেন মিশেছিল অনীশ? প্রথম দিকে তার কথাবার্তায় বা আচরণে তো এতটুকু গোলমাল ছিল না। কিন্তু দীপা গর্ভবতী হওয়ার পর সে পালাল কেন? মণিমোহন চ্যাটার্জির ভয়ে? বাবার কাছে অনীশ যে কুঁকড়ে থাকে সেটা নিজের চোখেই দেখে এসেছে দীপা। বাবার ভয়ে তাকে পিছিয়ে যেতেই হবে, এটা জানা সত্ত্বেও সে কেন তার এমন মারাত্মক ক্ষতিটা করল?

একটা মেরুদণ্ডহীন কেঁচোর বীজ পেটে নিয়ে কার জন্ম দিতে চলেছে দীপা? ঘৃণায় অপমানে তার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করতে লাগল। মনে হল, বমি করে ফেলবে। সেইসঙ্গে অসহ্য এক রাগ তার মাথায় অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে লাগল।

কতক্ষণ চুপচাপ বাইরের পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে বিছানায় পড়ে ছিল, দীপার খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে পিন্টুর চিৎকার ভেসে এল, 'শুয়ারের বাচ্চার বডি আমি ফেলে দেব। শ্লা বেজন্মা, এক্ষুনি যাচ্ছি। দেখব কে তোকে বাঁচায়—'

সঙ্গে-সঙ্গে আদিনাথ এবং কমলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাথা গরম করিস না পিন্টু। তুই ঠান্ডা হয়ে বস। যা করার আমরা করব।'

দীপা আর শুয়ে থাকতে পারল না। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে দৌড়ে বারান্দায় চলে এল। অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'কী হয়েছে?'

আদিনাথ' বলল, 'পিন্টু অনীশদের বাড়ি যেতে চাইছে।'

উত্তেজিত হইচই শুনে এরকমই কিছু আন্দাজ করেছিল দীপা। বলল, 'ওখানে গিয়ে কী হবে?'

পিন্টু বলল, 'না গেলে হারামীর বাচ্চাকে টাইট দেব কী করে? শ্লা, ঢালিপাড়া বস্তি ঝেঁটিয়ে সব লোক নিয়ে ওদের বাড়ি ঘেরাও করব। দশটা পেটো ঝাড়লে বাপ বাপ বলে মাকড়া লাইনে এসে যাবে।'

দীপা চমকে উঠল, 'তুই কি চাস আমি আত্মহত্যা করি—'

'মানে?'

'বস্তির লোকেরা যখন জিগ্যেস করবে, হঠাৎ মণিমোহন চ্যাটার্জির বাড়ি কেন ঘেরাও করতে যাচ্ছিস, তখন তাদের কী বলবি?'

পিন্টু থতিয়ে গেল। মুখ নীচু করে বলল, 'কিন্তু একদিন-না-একদিন সবাই তো ওই শালার কথা জানবে।'

পিন্টুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলতে লজ্জায় সঙ্কোচে মাথা কাটা যাচ্ছিল দীপার। কিন্তু না বলেই বা উপায় কী? হঠকারিতা বা উত্তেজনার ঝোঁকে লোকজন জুটিয়ে সে যদি সত্যি-সত্যিই অনীশদের বাড়ি বোমা মারতে যায়, ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। মণিমোহন পুলিশ দিয়ে ওকে

ধরিয়ে পাঁচ-সাত বছরের জন্য জেলে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। যাদের অত টাকা তারা প্রফেশনাল মার্ডারার লাগিয়ে পিন্টুকে খুনও করাতে পারে।

তা ছাড়া অন্য দিক থেকে মারাত্মক অস্বস্তির কারণও আছে। পিন্টুটার যেরকম মাথা গরম, রাগের মাথায় বস্তির লোকেদের নিশ্চয়ই গিয়ে বলবে, অনীশ দীপাকে গর্ভবতী করে পালিয়ে গেছে। এটা জানাজানি হলে এখানে আর থাকা যাবে না। হয় আত্মহত্যা, নইলে রাতের অন্ধকারে মুখ ঢেকে চোরের মতো চলে যেতে হবে।

হঠাৎ দীপার চোখে পড়ল, বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা বাবা আর পিন্টুর চেঁচামেচিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁ করে তাদের কথা শুনছে। তাড়াতাড়ি ভাইকে নিজের ঘরে টেনে এনে বোঝাতে লাগল দীপা। তার ব্যাপার নিয়ে কোনওরকম হইচই যেন বাধিয়ে না বসে পিন্টু। মাথা ঠান্ডা করে ভেবেচিন্তে মণিমোহনদের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এগুতে হবে, নইলে ওরা একেবারে শেষ করে দেবে।

দীপার কথাটা পছন্দ হল না পিন্টুর। দুর্বিনীত ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'শ্লা, তোর এত বড় ড্যামেজ করে হড়কে বেরিয়ে যাবে আর আমরা ভেবেচিন্তে এগুব! আমার তো পেটো ঝেড়ে-ঝেড়ে হোল ওয়ার্ল্ড একেবারে পাউডার করে দিতে ইচ্ছে করছে। তুই আমাকে আটকাস না দিদি।'

'কিন্তু—'

'তুই ভাবছিস ওরা টাকার জোরে আমাকে শেষ করে দেবে, এই তো? এতদিন তুই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিস। তোর প্রেসটিজের জন্যে লাইফটা যদি চলে যায়—যাবে।'

দু-চোখ জলে ভরে গিয়েছিল দীপার। গভীর আবেগে পিন্টুর একটা হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিয়ে সে বলল, 'আমার একটা কথা তোকে শুনতেই হবে।'

'কী?'

'ক'টা দিন আমাকে সময় দে। এর ভেতর যদি কোনও উপায় ভেবে বার করতে না পারি তোর যা ইচ্ছে করিস।'

চোখ কুঁচকে কী চিন্তা করল পিন্টু। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তোকে এক উইক টাইম দিলাম।' বলেই বেরিয়ে গেল।

আর ধীরে-ধীরে ফের বিছানায় গিয়ে শুয়ে দু-হাতে মুখ ঢাকল দীপা। মণিমোহনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় যা ভেবেছিল, আরও একবার সেই কথাই তার মনে পড়ে গেল। মণিমোহন চ্যাটার্জিদের বিরুদ্ধে তার মতো দুর্বল অসহায় সম্বলহীন একটি মেয়ে যুদ্ধ চালাবে কীভাবে?

চার

অনীশদের বাড়ি থেকে ফেরার পর দুটো দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে যান্ত্রিক নিয়মে দৈনন্দিন কাজগুলো করে গেছে দীপা। ডেইলি রুটিনে এতটুকু হেরফের হয়নি। সকালে উঠে স্কুলে যাওয়া, দুপুরে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে সামান্য রেস্ট নিয়েই কসবায় টিউশনি—এইভাবেই কেটে গেল।

এই দু-দিনে পেটের ভ্রূণ নিশ্চয়ই আরও একটু বড় হয়েছে কিন্তু অনীশদের বিরুদ্ধে কোনও রণকৌশল এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি দীপা। একবার ভেবেছে, অনীশদের বাড়ি যাবে। পরক্ষণেই এই চিন্তাটা খারিজ করে দিয়েছে। ওখানে গিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। প্রথমত দারোয়ান তাকে চিনে রেখেছে, কিছুতেই বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেবে না। জোরজার করে ঢুকলেও পুলিশ ডেকে মণিমোহন তাদের হাতে তুলেও দিতে পারেন। চুরি, অনধিকার প্রবেশ বা ব্ল্যাকমেলিং

—পয়সার জোরে এরকম ডজন-ডজন চার্জে ফাঁসিয়ে দিলে দীপা কী করতে পারে?

দীপা আরও ভেবেছে, বাড়িতে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনীশ যখন ভেতরে ঢুকবে বা বেরুবে তখন তাকে ধরবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছে, যে মুখের ওপর বলে দিয়েছে তাকে চেনে না—এমন একটা নোংরা কৃমিকে ধরে কী লাভ? যদি তার সঙ্গে দেখাও হয়ে যায়, কী করবে দীপা? চিৎকার করে রাস্তায় লোক জড়ো করবে? গালাগাল দিয়ে, অপমান করে তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে? কিন্তু এসব তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

আর-একটা কাজও করা যায়। হরপ্রসাদ সরণির প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দেওয়া যায়, অনীশ তার কী পরিমাণ ক্ষতি করেছে। কিন্তু এসব করতে হলে নিজের গর্ভবতী হওয়ার প্রসঙ্গটা অনিবার্য নিয়মেই উঠবে। এটা তো মিথ্যে নয়, সেদিন নিঝুম দুপুরে নির্জন বাড়িতে যা ঘটেছিল তাতে দীপারও সায় ছিল। তার অনিচ্ছা বা আপত্তি থাকলে এই দেহ কোনওভাবেই দখল করতে পারত না অনীশ। কাজেই তৃতীয় এই চিন্তাটাকে নাকচ করে দিতে হয়েছে।

দু-দিন পর আজ কসবা থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে ছিল দীপা। তার চোখ জানালার দিকে ফেরানো। এখন পরিপূর্ণ পূর্ণিমা চলছে। রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। দুধের মতো অঢেল জ্যোৎস্নায় বস্তি এবং আবর্জনায়-ভরা কলকাতা আশ্চর্য মায়াবী হয়ে আছে। দীপা সেসব কিছুই দেখছিল না, অন্যমনস্কের মতো শুধু তাকিয়েই আছে।

এখনও অবশ্য খুব খুঁটিয়ে না দেখলে বাইরে থেকে গর্ভধারণের লক্ষণ বোঝা যায় না কিন্তু ক'দিন আর? খুব বেশি হলে মাসখানেক বা মাসদুয়েক। যা করার তার মধ্যেই করে ফেলতে হবে। বাইরে থেকে আদিনাথের গলা ভেসে এল, 'বুনা—'

জানালার দিক থেকে আস্তে-আস্তে এধারে মুখ ফিরিয়ে দীপা দেখতে পেল, একা বাবাই না, মা-ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' দুজনে ঘুরে ঢুকল। আদিনাথ বসল চেয়ারে, আর কমলা তক্তপোশে দীপার গা ঘেঁষে।

কারও সঙ্গ এই মুহূর্তে ভালো লাগছিল না দীপার, সে কিছুটা নিস্পৃহ চোখে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে রইল।

আদিনাথ বলল, 'একটা কথা ভেবে দেখলাম বুনা—'

'কী?'

'অনীশদের নামে কেস করা দরকার। আজ দুপুরে জানাশোনা একজন উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। সে বললে, কেস করলে আমরা জিতে যাব।' প্রবল উৎসাহে আদিনাথ বলতে লাগল, 'কান ধরে ওকে বিয়ে তো করানো যাবেই, ক্ষতিপূরণও আদায় করতে পারব। তুই কী বলিস?'

দীপা জিগ্যেস করল, 'কেস যে করবে, টাকা পাবে কোথায়? তোমার উকিল কি বিনে পয়সায় আমাদের জন্যে মামলা লড়বে?'

আদিনাথের উৎসাহ অনেকখানি নিভে গেল। টাকাপয়সায় কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। সে বলল, 'তুই কিছু টাকা জোগাড় করতে পারবি না?'

রেগে উঠতে গিয়েও হঠাৎ হেসে ফেলল দীপা। বলল, 'কীভাবে সংসার চলছে, জানো না? প্রতি মাসেই কিছু-না-কিছু ধার হয়ে যাচ্ছে। কেস করার টাকা আমাকে কে দেবে? আর দিলেও শোধ করব কী করে?'

এই সময় ভয়ে-ভয়ে কমলা বলে উঠল, 'সেই হারটা বেচে দিয়ে বরং—'

এই হারের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। আদিনাথের চাকরি চলে যাওয়ার পর তার কোম্পানি থেকে কিছু টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সেই টাকা থেকে দীপার বিয়ের জন্য একটা হার,

এক জোড়া কানের দুল আর চারগাছা ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত-বসানো চুড়ি বানিয়ে রাখা হয়েছিল। হাজার কষ্ট এবং অভাব সত্ত্বেও ওই সোনার জিনিস ক'টা বিক্রির কথা আদিনাথরা ভাবতেও পারেনি। মানসিক দিক থেকে কতটা মরিয়া হয়ে উঠলে শেষ সম্বলটুকুও বেচার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, দীপা বুঝতে পারছিল। এ-সবই তার সম্মান এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্যে। মা-বাবা যে তার জন্য এতটা ভেবেছে, এই কারণে কৃতজ্ঞতা এবং গভীর আবেগে দীপার মন ভরে গেল। তবু অন্য একটা দিক সে ভোলেনি, সেটা কঠিন নিষ্ঠুর বাস্তবের দিক। দীপা বলল, 'কিন্তু মা, ওই গয়না ক'টা বেচে তুমি কত টাকা পাবে?'

কমলা জিজ্ঞাসু চোখে আদিনাথের দিকে তাকাল। সোনার দাম সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। আদিনাথ বলল, 'তিন-চার হাজারের মতো পেতে পারি।'

দীপা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশের ঘরের শিবানী দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল। আদিনাথকে বলল, 'দাদা, আপনাকে কে ডাকছে।'

'কে?' আদিনাথ চেয়ার থেকে উঠতে-উঠতে জিগ্যেস করল।

'নাম বলেনি।' শিবানী আর দাঁড়াল না। আদিনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে সোজা সদরের দিকে চলে গেল।

এমনিতে আদিনাথের কাছে লোকজন বড় একটা আসে না। এই অঘোর নন্দী লেনে বেশ কয়েক বছর কাটালেও তার চেনাজানা মানুষের সংখ্যা খুবই কম। একসময় বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইচই করে জীবন কাটিয়ে দিতে ভালোবাসত সে, তখন দিনরাত তাকে ঘিরে কত মানুষ, কত বন্ধু! কিন্তু চাকরি যাওয়ার পর যেদিন ঢালীপাড়া বস্তির গায়ে এই গলিতে চলে এল সেদিন থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে আদিনাথ। বাজার করার সময়টুকু ছাড়া পারতপক্ষে সে বাড়ি থেকে বেরোয় না। বারান্দার এক কোণে একটা ভাঙা চেয়ারে সারাক্ষণ যে নিজেকে আটকে রেখেছে তার সঙ্গে কারও আলাপ পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই কেউ তার কাছে আসেও না। আচমকা আজ একজন এসে পড়ায় সবাই বেশ অবাকই হল।

দীপা এবং কমলা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। একটু পর তারা দেখতে পেল, দামি ধুতি-পাঞ্জাবি পাম্প শু্য পরা মধ্যবয়সি একটি লোককে সঙ্গে করে উঠোন পেরিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল আদিনাথ। লোকটাকে আগে আর কখনও দেখেছে বলে দীপা মনে করতে পারল না। তবে তার মনে কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে। হুট করে বাবা কেন একটা অচেনা লোককে একেবারে নিজেদের শোওয়ার ঘরে নিয়ে তুলল? দীপা কমলাকে জিগ্যেস করল, 'এই লোকটাকে চেনো?'

'না।' কমলা মাথা নাড়ল, 'আগে আর কোনওদিন এ-বাড়িতে আসেনি।'

কমলার কথা শেষ হতে-না-হতেই আদিনাথ আবার এ-ঘরে এল। তাকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চাপা গলায় বলল, 'মণিমোহন চ্যাটার্জি দূত পাঠিয়েছে।'

স্নায়ুগুলো মুহূর্তে টানটান হয়ে উঠল দীপার। শিরদাঁড়া আপনা থেকেই সোজা হয়ে গেল। এদিকে কমলাও চকিত হয়ে উঠেছে। ভীরু গলায় জিগ্যেস করল, 'কেন, হঠাৎ লোক পাঠাল?'

'এখনও কিছু বলেনি। যা বলার তোমার আমার দুজনের সামনে বলতে চায়। দু-কাপ চা করে ও-ঘরে এসো।' বলেই চলে গেল আদিনাথ।

কমলাও আর বসে থাকল না। 'দেখি, অনীশের বাবা কী খবর পাঠিয়েছে'—বলতে-বলতে সে-ও বেরিয়ে গেল।

দীপা লক্ষ্য করেছে, মায়ের চোখে-মুখে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে একটু আশাও চিকচিকিয়ে উঠেছে। মা হয়তো ভেবেছে, মণিমোহন চ্যাটার্জি তাঁর মতো পালটেও থাকতে পারেন। দীপাকে

বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর তাঁর অনুশোচনা হয়ে থাকতে পারে। সেই কারণে একটা মিটমাট করে নিতে চাইছেন।

মায়ের মতো দীপা অবশ্য আশাবাদী নয়। তবু কী কারণে মণিমোহন হঠাৎ লোক পাঠিয়ে বসলেন তা জানার জন্য তীব্র কৌতূহল বোধ করতে লাগল। কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, সে উঠে পড়ল। তারপর পা টিপে-টিপে বাইরে বেরিয়ে মা-বাবার ঘরের পাশে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। যদিও এভাবে চোরের মতো অন্যের কথা শুনতে তার খারাপ লাগে, এটা খুবই কুরুচির ব্যাপার, তবু অপ্রতিরোধ্য কোনও শক্তি তাকে নিজের ঘর থেকে যেন এখানে টেনে নিয়ে এসেছে।

দরজাটা আধাআধি ভেজানো। তার ফাঁক দিয়ে দীপা দেখতে পেল, সেই মাঝবয়সি লোকটা মা-বাবার বিছানায় বসে চা খেতে-খেতে বলছে, 'এটাকে আপনারা একটা অ্যাকসিডেন্ট বলে ধরে নিন। আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরা কত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে বলুন তো। আমাদের সময়ে কি এসব ছিল? বেশি মিশলে অনেক সময় এরকম অ্যাকসিডেন্ট ঘটেই যায়।' বলতে-বলতে একটু থেমে সে আবার শুরু করে, 'আপনার মেয়ে একটা ভুল করে বসেছে। এটা অবশ্য কোয়াইট ন্যাচারাল। ওর যা বয়েস তাতে এমন ভুল হতেই পারে। যৌবন বড় গোলমেলে জিনিস মশাই।' লোকটার চোখ-মুখ শেষ দিকে দার্শনিকের মতো হয়ে উঠল।

এদিকে শুনতে-শুনতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে অদিনাথের। সে কর্কশ গলায় বলল, 'এসব ধানাইপানাই শোনাবার জন্যে মণিমোহন চ্যাটার্জি আপনাকে পাঠিয়েছে নাকি?'

'উঁহু উঁহু—' শশব্যস্তে জিভ কেটে লোকটা বলল, 'শুধু এসব কেন, আরও অনেক দরকারি কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'অনেক কথার দরকার নেই। একটা কথা জানতে পারলেই আমার চলবে।'

'কী বলুন তো।'

'এই যে আমার মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করা হল, তার সম্মান এরপর কী করে বাঁচবে? লোকে যে আর ক'দিন পর আমাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে গায়ে থুথু দিতে-দিতে পাড়া ছাড়া করে দেবে।'

'আহা—' ডান হাতে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে লোকটা বলল, 'আপনাদের সবার সম্মান মানে প্রেস্টিজ যাতে বাঁচে, সেই জন্যেই তো চ্যাটার্জি সাহেব একটা ফরমুলা দিয়ে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কীসের ফরমুলা?'

'ভেরি সিম্পল। লোকলজ্জার হাত থেকে আপনার মেয়েও বেঁচে যাবে, আপনারাও মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন।'

বিরক্ত গলায় আদিনাথ বলল, 'পরিষ্কার করে বলুন, কীভাবে সেটা সম্ভব।'

লোকটা বেশ নীচু গলায় কথা বলছিল। আচমকা স্বরটাকে আরও কয়েক পরদা নামিয়ে বলল, 'যদি রাজি থাকেন, কালই একটা নার্সিং হোম ঠিক করে দিচ্ছি। কয়েক ঘণ্টার মোটে ব্যাপার। সকালে আপনার মেয়েকে ভরতি করে দিলে সন্ধেবেলা আগের মতো কুমারীটি হয়েই বাড়ি ফিরে আসবে। একেবারে নিষ্পাপ ভারজিন। কারও বাপের সাধ্যি নেই, কিছু টের পায়।'

জানাজানি হওয়ার ভয়ে জোরে চেঁচাতে পারছিল না আদিনাথ। হিংস্র গলায় বলল, 'গর্ভপাত করিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে চাইছেন?'

'সর্বনাশ কোথায়?' লোকটা কোনও কারণেই উত্তেজিত বা ক্ষিপ্ত হয় না। সব সময় পরম সহিষ্ণু এবং অবিচলিত। নির্বিকার ভঙ্গিতে সে বলতে লাগল, 'অ্যাবরশান করিয়ে তাকে তো নরম্যাল করে দেওয়া হবে। ভালো ছেলে দেখে সম্বন্ধ করে তখন তার বিয়ে দিতে পারবেন। গায়ে এই অ্যাকসিডেন্টের—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আদিনাথ, 'কি পাগলের মতো প্রলাপ বকছেন মশাই! আমার মেয়ের এমন মারাত্মক সর্বনাশ করে দিল অনীশ। এখন বলছেন গর্ভপাত করিয়ে অন্য ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে—' আদিনাথকে উন্মত্তের মতো দেখাচ্ছে। প্রবল রক্তচাপে তার গলা দড়ির মতো পাকিয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন এই মুহূর্তে ফেটে যাবে।

'দাঁড়ান-দাঁড়ান মশাই—' হাত তুলে লোকটা বলল, 'অনীশের কথা কী যেন বললেন? সে কার ক্ষতি করেছে?'

'কার আবার, আমার মেয়ের। ভেবেছেন, অ্যাবরশানের ব্যবস্থা করে সে পার পেয়ে যাবে?'

'এ তো অদ্ভুত কথা শুনছি। আপনার মেয়ে সেদিন চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তার অবস্থার কথা বলেছিল। চ্যাটার্জি সাহেবের মনটা ভীষণ নরম, খুবই সিমপ্যাথেটিক টাইপের মানুষ, পরের দুঃখে গলে যান। তাই আমাকে বললেন, মেয়েটাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দাও। আর আপনি কিনা এরকম একটা বাজে ব্যাপারে তাঁর ছেলে অনীশকে জড়িয়ে দিতে চাইছেন? এটা কিন্তু আপনার কাছে আশা করিনি আদিনাথবাবু।' অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়তে লাগল লোকটা।

আদিনাথ প্রথমটা থ হয়ে গেল। পরক্ষণেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার করে উঠল, 'অনীশ এ-ব্যাপারে না থাকলে মণিমোহন চ্যাটার্জি এমনি-এমনি আমার ছ'কোণা মুখ দেখার জন্যে আপনাকে পাঠিয়েছে?'

লোকটা বলল, 'ওই যে বললাম, অত বড়লোক হলে কী হবে, চ্যাটার্জি সাহেবের হার্টটা একেবারে ফুলের মতো। সামান্য একটা ভুলের জন্যে আপনার মেয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই উনি আমাকে পাঠালেন। আপনি ওঁর গ্রেটনেসের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।'

শরীরের সব রক্ত হঠাৎ মাথায় উঠে এল আদিনাথের। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'গ্রেটনেস! আপনার চ্যাটার্জি সাহেবকে বলে দেবেন, তার ছেলেকে আমি পাঁচ বছর জেলের ভাত খাইয়ে আনব। উকিলের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি এ-ব্যাপারে।'

লোকটা আগের মতোই নির্বিকার। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে দুটো কৌটো বার করল সে। এক নম্বর কৌটোটা খুলে বাঁ-হাতের তালুতে খানিকটা পানের মসলা ঢালল, তারপর দু-নম্বর কৌটো থেকে কয়েক কুচি জরদা নিয়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে মুখে পুরল। জিভের তলায় সেগুলো রেখে আধবোজা চোখে তার ঝাঁঝটা শুষে নিতে-নিতে বলল, 'আপনার বয়েস কত আদিনাথবাবু?'

আচমকা এরকম বেখাপ্পা প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল আদিনাথ। বলল, 'আমার বয়েস দিয়ে কী হবে?'

'দরকার আছে। বলুন না—'

'ছাপান্ন-সাতান্ন।'

'আমারই বয়সি। আমাকে বন্ধু হিসেবে ধরতে পারেন।' লোকটা বলতে লাগল, 'আপনাকে একটা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। একেবারে মাথা গরম করবেন না। আপনি বিশ টাকা ফি-র উকিল দেবেন, চ্যাটার্জি সাহেব তার বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা ফি-র পাঁচটা ঝানু ব্যারিস্টার দাঁড় করাবেন। একটার জায়গায় পঞ্চাশটা ডেট নেবেন। কতদিন ওঁর সঙ্গে লড়াই চালাতে পারবেন? পরে হয়তো মানহানির কেস করে আপনাদেরই জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি আদিনাথ। ভেতরে-ভেতরে সে বেশ ঘাবড়েই গেল। দীপার জন্য যে সামান্য সোনাটুকু আছে তা বেচে মণিমোহনের সঙ্গে কতক্ষণ আর যুদ্ধ করা যায়? ভেতরে তার যা-ই চলুক, বাইরে তা ফুটে উঠতে দিল না আদিনাথ। কর্কশ গলায় বলল, 'অন্যায়ও করবে, উলটে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে জেলেও পাঠাতে চেষ্টা করবে। কারবারটা ভালোই। তা মশাই আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। যা হওয়ার হবে, জেলে যেতে হয় যাব। কিন্তু অনীশ যে এমনি-

এমনি পার পেয়ে যাবে, সেটা কিছুতেই হতে দেব না।'

লোকটা বলল, 'আপনি যখন এত জোর দিয়ে বলছেন তখন না হয় ধরেই নিচ্ছি, আপনার মেয়ের অনেক পুরুষ-বন্ধুর মধ্যে অনীশ একজন ছিল—'

তাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে আদিনাথ খেঁকিয়ে উঠল, 'আমার মেয়েকে আপনি ভেবেছেন কী? বাজে বদ ছুকরিদের মতো গণ্ডা-গণ্ডা ছেলে নিয়ে ঘোরে?'

'আচ্ছা-আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, তার একজনই পুরুষ বন্ধু ছিল এবং কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে দুজনেই ভুল করে বসেছে। কিন্তু মণ্ডলমশাই, আপনি যদি মনে করেন চ্যাটার্জি সাহেব আপনার মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে নিয়ে যাবেন, বিরাট ভুল করবেন। আপনাকে অপমান করছি না। চ্যাটার্জি সাহেবের বেয়াই হিসেবে আপনাকে ভাবতে—মানে বুঝলেন কিনা, হেঁহেঁ—' একটু থেমে ফের বলল, 'ওই সব আকাশকুসুম ভেবে তো লাভ হয় না, মাটিতে পা রেখে বাস্তব ব্যাপারটা বুঝতে হয়। তাই আপনাদের সম্মানও যাতে বাঁচে আর চ্যাটার্জি সাহেবদের সম্মানও বজায় থাকে, ওই নার্সিংহোমের ফরমুলাটা দিয়েছিলাম।'

আদিনাথ রক্তাক্ত চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'তাহলে মেনে নিচ্ছেন, আমার মেয়ের এই অবস্থার জন্যে অনীশই দায়ী।'

'মেনে নিলাম কোথায়? আপনাদের মনে একটা সন্দেহ যখন দেখা দিয়েছে, চারদিকে একটা ঢিঢিক্কার পড়ে যেতে পারে। এসব স্ক্যান্ডাল চ্যাটার্জি সাহেব একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই আর কী—' বলতে-বলতে গলাটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে দিল, 'আমার কথা ভালোয়-ভালোয় মেনে নিলে আপনার মশাই লাভই হবে। নার্সিং হোমের খরচা তো দিতেই হবে না। নগদ হাজার দশেক টাকাও পেয়ে যাবেন।'

'অ্যাঁ—'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা পনেরো হাজারই দেওয়া যাবে।'

আদিনাথ বলল, 'টাকা দিয়ে আমাকে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'কত দিলে আপনি একেবারে সুবোধ বালক হয়ে যাবেন? কত? আমার দিক থেকে তিরিশ হাজার পর্যন্ত অফার রইল। দু-দিন পর আবার আসব। এর মধ্যে ভেবেচিন্তে মনস্থির করে রাখবেন। আচ্ছা এখন যাই।' বলতে-বলতে উঠে পড়ল সে। 'মনে রাখবেন ভুজঙ্গ ঘোষ যা বলে গেল তাতে আপনাদের ভালোই হবে।'

দীপা রুদ্ধশ্বাসে সব শুনে যাচ্ছিল। আর দাঁড়াল না সে, দ্রুত নিজের ঘরে চলে এল। আর সেখান থেকেই দেখতে পেল আদিনাথ লোকটার সঙ্গে চাপা গলায় কী সব বলতে-বলতে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ওদের কথার একটি বর্ণও আর শুনতে পেল না দীপা।

তিরিশ হাজার টাকার অফারটা তাদের সংসারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটা টের পেতে দীপার আদৌ অসুবিধে হল না।

কাল রাত্তিরে মণিমোহন সেই লোকটিকে পাঠিয়েছিলেন। সে চলে যাওয়ার পর থেকেই আদিনাথ আর কমলা অনবরত গুজগুজ করে কী সব পরামর্শ করে যাচ্ছে। খুব সম্ভব কাল রাত্তিরেও ওরা ঘুমোয়নি। তিরিশ হাজার টাকা সামান্য ব্যাপার নয়।

আজ সন্ধেবেলায় টিউশনি থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে দীপা চা খাচ্ছে, বাইরে থেকে কমলার গলা কানে এল, 'বুনা—'

এ-ধারে মুখ ফেরাতেই দীপা দেখতে পেল মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই কমলা বলল, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।' বলতে-বলতে ভেতরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে

তার গা ঘেঁষে বসল।

মাকে লক্ষ্য করছিল দীপা। চায়ের কাপটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখতে-রাখতে বলল, 'কী কথা?'

কমলা তক্ষুনি উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলল, 'দ্যাখ মা, যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তবে লোক জানাজানি হওয়ার আগে পেটের আপদটাকে দূর করে দেওয়াই ভালো। নার্সিং হোমে গেলে ন্যাকি একদিনের ভেতর সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।'

মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে দীপা বলল, 'কাল দুপুরেও তো বাবা বলছিল অনীশ আমাকে বিয়ে না করলে ওদের নামে কেস করবে, ওদের দিয়ে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে ছাড়বে। আজ হঠাৎ সব পাপ ধুয়ে-মুছে আমাকে শুদ্ধ করে নিতে চাইছে যে?'

এরকম একটা অস্বস্তিকর বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল কমলা। বলল, 'সব দিক ভেবে দেখলাম, অনীশদের সঙ্গে মামলা করে আমরা কিছুতেই পারব না। মাঝখান থেকে তোর বিয়ের জন্যে যে সোনাটুকু রেখেছিলাম--সব খোয়াতে হবে। তার ওপর মানহানির মামলা করে ওরা আমাদের বিপদে ফেলে দেবে। তাই—'

'ভুজঙ্গ ঘোষ কাল রাত্তিরে তোমাকে আর বাবাকে এইসব পরামর্শ দিয়ে গেছে—তাই না?'

কমলা হকচকিয়ে গেল, 'কী বলছিস বুনা!'

খুব শান্ত মুখে দীপা বলল, 'আমি সব শুনেছি মা। তিরিশ হাজার টাকার জন্যে এতবড় জঘন্য অন্যায় মেনে নিতে চাইছ!' বলতে-বলতে সে টের পেল, বারান্দায় ভেজানো দরজার ঠিক বাইরে আদিনাথ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দুজনের কথা শোনার জন্যই যে সে সেখানে ওত পেতে রয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। অর্থাৎ ভুজঙ্গ ঘোষ যে ফরমুলা দিয়ে গেছে কমলার মুখে তা শুনে দীপার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা জানতে চাইছে।

আঁচলে চোখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কমলা। ভাঙা ঝাপসা গলায় বলল, 'আমরা বড় গরিব বুনা। আইনকানুন বিচার আমাদের জন্যে নয়। তবু এর মধ্যে যদি কিছু টাকা পেয়ে যাই—অনেক দুঃখে, নিজের ওপর অনেক ঘেন্নায় এ কথা বলছি মা।' বলতে-বলতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

দীপা উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর কমলা ভয়ে-ভয়ে বলল, 'তুই তো কিছু বললি না বুনা—'

দীপা অন্যমনস্কর মতো বলল, 'কী বলব?'

'তুই তো সব জানিস। ওই লোকটা এলে তো কিছু বলতে হবে।'

আদিনাথ এবং কমলার মনোভাব বুঝতে পারে দীপা। তাদের ওপর এক ধরনের করুণাই হচ্ছে। দীপা জানে, তার এই অবস্থার জন্য মা-বাবা খুবই কষ্ট পাচ্ছে, ক্ষমতা থাকলে অনীশের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হয়তো ওরা তাকে খুনই করে ফেলত। কিন্তু ভুজঙ্গ ঘোষ কাল রাত্তিরে যে লোভটা দেখিয়ে গেছে সেটা বড়শির মতো তাদের গলায় আটকে গেছে। তাদের কাছে তিরিশ হাজার টাকা একটা বিরাট ব্যাপার। মেয়ের গর্ভপাতের জন্য হাজার বার তারা নিজেদের ধিক্কার দেবে, আত্মগ্লানিতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পুড়তে থাকবে, তবু টাকাটা হাত পেতে নেবেও।

মা-বাবার কথা দীপা যেমন ভাবছে, তার পাশাপাশি মণিমোহন চ্যাটার্জির মুখটাও তার মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটা তাকে দেখে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করেছিল, বারবার ভয় দেখিয়েছিল, হুমকি দিচ্ছিল, এমনকী অপমান করে বাড়ি থেকে বারও করে দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যায়নি। ভুজঙ্গ ঘোষকে পাঠিয়ে, অ্যাবরশানের ব্যবস্থা করে এবং প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে সে চিরকালের মতো এটাকে চাপা দিতে চায়। পরে যাতে এই নিয়ে কোনওরকম ঝঞ্ঝাট বা সমস্যা না দেখা দেয় সেই কারণে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে চাইছে।

দীপার আচমকা মনে হল, মণিমোহন ভীষণ ভয় পেয়েছেন, নইলে লোক পাঠিয়ে এতগুলো টাকা দিতে চাইতেন না। তার পেটে যতদিন ভ্রূণটা থাকবে তাঁর আতঙ্ক কাটবে না। গলার কাঁটার মতো ওটা সারাক্ষণ আটকে থাকবে। দীপা ঠিক করে ফেলল, নার্সিং হোমে যাবে না, পেটের ভেতর অনীশের বাচ্চা বড় হতে থাক। সে কমলাকে বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও। আর—'

দম বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল কমলা। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করল, 'আর কী?'

'ভুজঙ্গ ঘোষ এলে আমাকে খবর দিও। তাকে যা বলার আমি বলব।'

এরপর আর কিছু বলতে সাহস হয়নি কমলার।

দু-দিন পর রাত্রিবেলা যখন ভুজঙ্গ আবার এল তখন দীপা সবে টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরেছে। আদিনাথের সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে সে বারান্দায় উঠতে-না-উঠতেই দীপা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কোনওরকম ভণিতা-টণিতা না করে সোজা সে ভুজঙ্গকে বলল, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' আদিনাথকে বলল, 'বাবা, তুমি ও-ঘরে যাও। ভুজঙ্গবাবুর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলে আমি ওঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আদিনাথ এবং ভুজঙ্গ দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দীপা যে এভাবে এসে তাদের বলবে, কেউ ভাবতে পারেনি। বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে ভুজঙ্গ বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। চলুন—'

ভুজঙ্গকে ঘরে এনে দরজা ভেজিয়ে দিল দীপা। সে টের পেল, আদিনাথ নিজের ঘরে যায়নি, প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।

যে ভুজঙ্গ কোনও কারণেই বিচলিত হয় না বা ঘাবড়ায় না, তার চোখে-মুখে অস্বস্তি দেখা দিল। অস্থিরভাবে সে বলল, 'আমাকে কিছু বলতে চান?'

'নিশ্চয়ই।' দীপাকে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা চঞ্চল দেখাচ্ছে না। খুব শান্ত গলায় সে বলল, 'আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন।'

বিমূঢ়ের মতো ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে ভুজঙ্গ অপেক্ষা করতে লাগল। আর খানিকটা দূরে, তক্তপোশে তার মুখোমুখি বসল দীপা।

ভুজঙ্গ বলল, 'কী ব্যাপার বলুন—'

সোজা তার চোখের ভেতর চোখ রেখে দীপা বলল, 'মণিমোহন চ্যাটার্জি আপনাকে যে মতলবে বাবার কাছে পাঠিয়েছে তা হবে না।'

চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল ভুজঙ্গ, 'অ্যাঁ, আপনি কী বলতে চাইছেন।'

দীপা অচঞ্চল ভঙ্গিতে বলল, 'তা আপনি ভালো করেই জানেন। মণিমোহন চ্যাটার্জিকে জানিয়ে দেবেন, আমি নার্সিং হোমে যাচ্ছি না।'

ভুজঙ্গ অন্ধকার জগতের পোকা। মণিমোহন তাকে দিয়ে নানা ধরনের গোপন গর্হিত এবং জঘন্য কাজ করিয়ে নেন। সারাটা জীবন সে নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করেই কাটিয়ে দিচ্ছে। তার নখের মাথা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দুর্গন্ধে বোঝাই। এইসব কাজ করতে গিয়ে কতরকম মানুষই বা দেখল। কিন্তু দীপার মতো এমন তেজি বেপরোয়া মেয়ে জীবনে আর দেখছে কী? যার পেটে অবৈধ ভ্রূণ বড় হচ্ছে, আর ক'দিন পর শরীরে প্রেগনান্সির লক্ষণ ফুটে উঠলে গোটা অঞ্চলের লোক যে তার গায়ে থুথু দেবে, এ সব গ্রাহ্যই করছে না। ভুজঙ্গ বলল, 'এর ফল কী হবে বুঝতে পারছেন?'

'আমি কি পাঁচ বছরের খুকি যে বুঝব না!'

'লোকে যা-তা বলবে।'

'তা তো বলবেই।' দীপা বলতে লাগল, 'অবৈধ বাচ্চার মা হলে লোকে তাকে ঘেন্না করে, উৎপাত করে তার জীবন নষ্ট করে দেয়। কিন্তু যে লম্পট বজ্জাতের জন্যে তার এই দুর্ভোগ, এত কষ্ট, সে বেশ পার পেয়ে যায়।' একটু থেমে বলল, 'আমি কিন্তু অনীশকে ছাড়ব না।'

ভুজঙ্গ কী বলবে, প্রথমটা ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ পর বলল, 'ব্যাপারটা মিটমাট করে নিলে ভালো হত না?'

'বদমাশ ইতর বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে কীসের মিটমাট?' কর্কশ গলায় বলল দীপা। তার মুখ এখন শান-দেওয়া ছুরির মতো দেখাচ্ছে।

ভুজঙ্গ বলল, 'আপনার উত্তেজিত হওয়ার হয়তো কারণ আছে কিন্তু রাগারাগি করে তো সবসময় কাজ হয় না। বাস্তব দিকটাও মাথায় রাখতে হয়।'

'বাস্তব দিক বলতে?'

'আপনার বাবার সঙ্গে ক'দিন আগে আমার কিছু কথা হয়েছে, আপনি কি তা জানেন?'

'তিরিশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছেন তো?'

ভুজঙ্গ বুঝতে পারছে, ওই তিরিশ হাজার টাকাটা দীপার কাছে ঘুষই, মোলায়েম করে উপহার বললে সে খেপে উঠবে। ভুজঙ্গ বলল, 'ঘুষ যখন বলছেন তখন আর কী বলব! অবশ্য—'

'কী?'

'তিরিশে রাজি না হলে চ্যাটার্জি সাহেবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিগারটা আর-একটু বাড়াবার চেষ্টা করব। ধরুন আরও দশ বাড়বে।' বলে উৎসুক চোখে দীপাকে দেখতে লাগল ভুজঙ্গ।

দীপা বলল, 'এক লাখ দিলেও আমি রাজি না।'

এক লাখেও যে রফা করতে চায় না তাকে কোন অঙ্কের টাকা অফার করবে? ভুজঙ্গের মাথার ভেতর একটা চাকা ঘুরতে লাগল যেন। গলগল করে সে ঘামতে শুরু করেছে। দীপাকে সে যে কী বলবে, ভেবে পেল না।

দীপা এবার বলল, 'মিটমাটের একটা রাস্তাই খোলা আছে ভুজঙ্গবাবু।'

ভুজঙ্গ আশান্বিত হয়ে উঠল। গভীর আগ্রহে জিগ্যেস করলে, 'বলুন, কী রাস্তা—'

'মণিমোহন চ্যাটার্জিকে জানিয়ে দেবেন, টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যাবে না। আমাকে তাঁর ছেলের বউ করে ঘরে তুলে নিতে হবে। এ-ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই।'

ভুজঙ্গ তক্ষুনি উত্তর দিল না। তার মুখে অদ্ভুত এক নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠতে লাগল। স্থির চোখে দীপাকে দেখতে-দেখতে বলল, 'এটাই তাহলে আপনার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাহলে চলি। চ্যাটার্জি সাহেবকে আপনার কথা জানাব।'

ভুজঙ্গ উঠে পড়ল। সে দরজা খুলতেই দেখা গেল মা আর বাবা বুকে শ্বাস আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভুজঙ্গকে নিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

পাঁচ

দ্বিতীয় বার ভুজঙ্গ যে এসেছিল তারপর আরও সাতদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে মা আর বাবা দীপার সঙ্গে কথা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা মুঠোর ভেতর এসেও বেরিয়ে গেছে। এ-আক্ষেপ এবং হতাশা তাদের ঘুচবার নয়।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য দীপা নার্সিং হোমে গেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

আজকাল আকছার এ-সব ঘটছে। কিন্তু জেদী একগুঁয়ে মেয়ে গোঁ ধরে আছে, তাকে মণিমোহন চ্যাটার্জির ছেলের বউ করতে হবে, যা কি না একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ফলে ওদিকটা তো গেলই, অতগুলো টাকার আশাও আর রইল না। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা কি একটা-দুটো পয়সা! জীবনে একসঙ্গে এত টাকা আগে আর কখনও দেখেনি আদিনাথরা, ওটা পেলে বাকি জীবনটা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে কাটানো যেত। কিন্তু আহাম্মক অবুঝ মেয়ে হঠকারিতার ঝোঁকে সব শেষ করে দিল।

আজ টিউশনি সেরে ছাত্রীদের বাড়ি থেকে বেরুতে-বেরুতে বেশ রাত হয়ে গেল। ক্লাস ফোরের যে মেয়েটাকে সে পড়ায়, দিন পনেরো বাদে তার একটা পরীক্ষা রয়েছে। তাই একটু বেশি সময় দীপাকে ওর সঙ্গে লেগে থেকে পড়া-টড়াগুলো মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হচ্ছে। মেয়েটা ভীষণ ফাঁকিবাজ। যেটুকু সময় দীপা থাকে ততক্ষণই বই নিয়ে বসে। বাকি সময়টা বই-টইয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই বললেই হয়।

পয়সা বাঁচাবার জন্য বাস-টাসে ওঠে না দীপা, পায়ে হেঁটেই কসবায় যাতায়াত করে।

আজ ছাত্রীদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে আসছিল দীপা। হঠাৎ ঝপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গোটা অঞ্চলটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায়।

লোডশেডিংটা কলকাতায় নতুন কোনও ব্যাপার নয়। ওটা ছাড়া এই শহরকে যেন ভাবাই যায় না। এখানকার মানুষজনের দিব্যদৃষ্টি এমনই খুলে গেছে যে অন্ধকার যত ঘনই হোক, চলতে-ফিরতে কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

রাত একটু বেশি হলে কলকাতার এই দিকটায় লোক চলাচল কমে যায়। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল দীপা। আচমকা যে অন্ধকার নেমে গেছে সেদিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না তার। নিজের কথাই ভাবছিল সে। সেদিন রাতে ভুজঙ্গকে জানিয়েছিল, মিটমাটের শর্ত একটাই। তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে অনীশকে। কিন্তু এ-শর্ত যে ওরা মানবে না, সে-সম্পর্কে এখন আর সংশয় নেই। তাহলে এর ভেতর ভুজঙ্গ নিশ্চয়ই চলে আসত। নিজের ন্যায্য অধিকার কীভাবে আদায় করবে আজ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি দীপা।

মণিমোহনের মতো প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রণকৌশল তার অজানা।

সে জানে তরে পেটের বাচ্চাটার জন্য মণিমোহনরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। ভুজঙ্গ চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে চাইলেও সে নার্সিং হোমে গিয়ে অ্যাবরশান করতে চায়নি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য পেটের ভ্রূণটাকে মণিমোহনদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রের মতো ব্যবহার করবে। কিন্তু কীভাবে? সেই পদ্ধতিটা কিছুতেই স্থির করতে পারছে না দীপা।

আজকাল এক মুহূর্তও সে ঘুমোতে পারে না। সর্বক্ষণ পাথরের চাঁইয়ের মতো প্রবল দুশ্চিন্তা তার মাথার ওপর চেপে বসে থাকে। এক-এক সময় দীপার মনে হয়, স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, দীপা তো টের পাচ্ছে তার পেটের ভ্রূণটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। শরীরের ভেতর একটা প্রচণ্ড ভাঙচুর যে শুরু হয়ে গেছে, সেটা প্রতি মুহূর্তেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষপর্যন্ত অনীশদের সম্বন্ধে কোনও একটা উপায় সে ভেবে বার করতে না পারে, কী পরিণতি হবে তার? অবৈধ একটা বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

হঠাৎ রাস্তার ওধার থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ধারে যান, ধারে যান—'

দীপা চমকে উঠল। পরক্ষণেই সে টের পেল গাঁকগাঁক করতে-করতে একটা বিরাট ট্রাক প্রচণ্ড স্পিডে তার পেছন দিকে পঞ্চাশ গজের ভেতর এসে পড়েছে। বাঁচতে হলে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তাকে কিছু একটা করতে হয়, নইলে ট্রাকটা তাকে পিষে দিয়ে চলে যাবে।

এই রাস্তাটায় ফুটপাথ নেই। মোটামুটি রাস্তার ধার ঘেঁষেই হাঁটছিল দীপা। পলকের জন্য

তার চোখের সামনে অন্ধকার এলাকাটা আরও অন্ধকার হয়ে গেল। তার পরেই একরকম মরিয়া হয়ে পাশের একটা ছোট একতলা বাড়ির রোয়াকে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে। সঙ্গে-সঙ্গে ট্রাকটা তার পাশ দিয়ে উন্মত্তের মতো তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল।

সামলে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল দীপার। তার হৃদ্‌পিণ্ডে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠতে এক সেকেন্ড দেরি হলে এতক্ষণে তার কী হাল যে হতো, ভাবতেও শিউরে উঠছে দীপা। রক্তমাংস এবং হাড়ের একটা ডেলা পাকানো ভয়াবহ ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল।

হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছে দীপার, দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। আস্তে-আস্তে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে। গলগল করে ঘাম ছুটে তার জামা-টামা ভিজে যেতে লাগল।

এদিকে রাস্তার ওধার থেকে হইচই করতে-করতে আট-দশটা লোক দৌড়ে এসেছে। সবার চোখে-মুখে প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং আশঙ্কা। একসঙ্গে তারা হুড়মুড় করে কথা বলতে লাগল।

'দিদি, কিছু হয়নি তো আপনার?'

'ট্রাক ড্রাইভারটা নির্ঘাত মাল খেয়ে চালাচ্ছিল। না হলে এরকম স্পিড দেয়?'

'শালাকে পুলিশে দেওয়া দরকার।'

'এই সব লোকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত।'

'ট্রাকের নম্বরটা নিতে পারলাম না। পেছন দিকের নাম্বার প্লেটের ওপর আলো ছিল না। ওটা পাওয়া গেলে ব্যাটাকে ধরে ফাঁসিয়ে দেওয়া যেত।'

লোডশেডিংটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। ঝপ করে যেমন অন্ধকার নেমেছিল ঠিক তেমনি আচমকাই আলো ফিরে এল।

আকস্মিক মৃত্যুভয় এবং আতঙ্ক এখন অনেকখানি কেটে গেছে। আস্তে-আস্তে মুখ থেকে হাত সরিয়ে দীপা সামনের দিকে তাকাল। ততক্ষণে লোকগুলো তার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছে।

উদ্বিগ্ন সুরে একটি মধ্যবয়সি লোক জিগ্যেস করলে, 'আপনার চোট-টোট লাগেনি তো?'

আস্তে মাথা নাড়ল দীপা—লাগেনি।

অন্য একজন বলল, 'তবু একবার ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে নেওয়া দরকার। কাছেই ডাক্তারখানা আছে। সেখানে চলুন—'

দীপা জানে, সে অক্ষতই আছে। প্রচণ্ড ভয় পাওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতিই হয়নি তার। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। জোরে শ্বাস টেনে সে বলল, 'দয়া করে আপনারা একটা রিকশা ডেকে দিন। বাড়ি গিয়ে দরকার হলে ডাক্তার দেখাব।'

একটি ছেলে রিকশা ডেকে নিয়ে এল।

এরপর আরও দু-দিন একই ব্যাপার ঘটল। দু-দিনই দুটো ট্রাক গাঁগাঁ করে মারাত্মক স্পিডে পেছন দিক থেকে ছুটে আসছিল। কিন্তু লোকজনের চিৎকারে লাফিয়ে একপাশে সরে যাওয়ায় অ্যাকসিডেন্টটা আর ঘটেনি। দীপা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে।

প্রথম দিন মনে হয়েছিল, ঘটনাটা নিতান্তই আকস্মিক। হয়তো ট্রাকের ব্রেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিংবা ড্রাইভার মদ-টদ খেয়ে নেশার ঘোরে গাড়ি চালাচ্ছিল।

কিন্তু পরপর তিন দিন একই ঘটনা যখন ঘটল তখন দীপার মনে হয়েছে, এটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে তাকে খুন করার একটা ষড়যন্ত্রই যেন হয়েছে। তবে এ-সম্পর্কে সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তাকে খুন করে কার কী লাভ হবে, সে বুঝতে পারেনি।

বাড়িতে এ-নিয়ে মা-বাবাকে কিছু জানায়নি দীপা। প্রথমত তারা ভীষণ ঘাবড়ে যাবে, হয়তো টিউশনি ছেড়ে দিতে বলবে। কিন্তু টিউশনি করে বাড়তি রোজগার না করলে সংসার চলবে কী করে? মা-বাবাকে না জানালেও পিন্টুকে জানিয়েছে দীপা। পিন্টু বলেছে, 'সাবধান হয়ে রাস্তায় চলবি। আর দু-একটা দিন দেখ। যদি মনে হয় কোনও হারামি তোকে মার্ডার করার ধান্দা করছে, হোল ঢালিপাড়া বস্তি সঙ্গে করে কসবায় চলে যাব। ট্রাক যদি তোকে ফিনিশ করতে আসে, আর ফিরে যেতে হবে না। ড্রাইভারের লাশ ওখানে শুয়ে থাকবে আর ট্রাকটা অ্যাশ হয়ে যাবে।'

পিন্টু ভরসা দিলেও বড় রাস্তা দিয়ে রাত্তিরে ফেরার ঝুঁকি নেয়নি দীপা। দিনের বেলা প্রচুর লোকজন আর বাস মিনিবাস ট্যাক্সি রিকশা চলে, তখন অত ভয় নেই। যাওয়ার সময় মেইন রোড দিয়েই সে যায় কিন্তু ফেরার সময় আজকাল সে গলি-টলি দিয়ে খানিকটা ঘুরপথেই বাড়ি আসে।

এভাবে দিনচারেক বেশ ভালোই কাটল। তারপর আজ হঠাৎ একটা গলির মুখে আসতেই লোডশেডিং হয়ে গেল আর তখনই অন্ধকার ফুঁড়ে দুটো ছোকরা তার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মুখ চোয়াড়ে, নিষ্ঠুর রক্তাভ চোখ, শক্ত চোয়াল। পরনে টাইট ফুলপ্যান্ট আর বুশসার্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট। একজনের বাঁ-হাতের কবজিতে স্টিলের বালা, আর-এক জনের ডান হাতে। একজনের গলায় রুপোর চেইনে লকেট ঝুলছে, লকেটটা অবিকল একটা মীনে-করা রুপোর ড্যাগার। আরেক জনের গলাটা খালি। তবে দুজনেরই হাতে আট ইঞ্চি ছোরা। অন্ধকারেও সে দুটোর ফলা যেন ঝলকাচ্ছে। দুজনেরই বয়স তেইশ-চব্বিশ।

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল দীপার, ছোরার ফলার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। মুহূর্তে গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোনওরকমে অসহ্য কাঁপা গলায় সে বলতে পারল,—'কী—কী চাই?'

শব্দ না করে একটা ছোকরা বিশ্রী হাসল। সঙ্গে-সঙ্গে দু-পাটির অনেকগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল, তার দাঁতগুলো কুকুরের দাঁতের মতো ধারালো। চোখ দুটো কুঁচকে সে বলল, 'তোমার পেট চিরে বাচ্চাটা বার করে নিয়ে যেতে চাই দিদিমণি।'

চমকে উঠল দীপা। সে শুধু বলতে লাগল, 'না-না'—'না-না', কিন্তু তার গলায় এবার স্বর ফুটল না।

দ্বিতীয় ছোকরাটা বাঁ-পাশ থেকে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল, 'মনে করেছ বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে গলি-ফলি দিয়ে গেলে বেঁচে যাবে! তিন-দিন-ট্রাকওলাকে ভোগা দিয়ে হড়কে গেছ। এবার তোমার লাশ ফেলে দেব।' বলেই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করে।

তৎক্ষণাৎ দুজনের চেহারা আগোগোড়া বদলে যায়। ছোরা দুটো মাথার ওপর তুলে সরীসৃপের মতো তারা আস্তে-আস্তে দীপার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

আগে আর কখনও নিজের চোখে কোন হত্যাকারীকে দেখেনি দীপা। এই প্রথম বুঝতে প'রল খুন করার সময় মানুষের মুখের চেহারা এই রকমই হয়ে যায়। বিহ্বলের মতো এক পলক তা৷কয়ে থাকে দীপা। পরক্ষণেই টের পায় তার মধ্যে অলৌকিক সাহস যেন নেমে এসেছে। শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে দুজনকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে চিৎকার করতে-করতে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে।

আচমকা এরকম একটা ঘটনার জন্য তৈরি ছিল না খুনি দুটো। প্রবল ধাক্কায় তারা হুড়মুড় করে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। আর সেই সুযোগে দৌড়তে-দৌড়তে গলি-টলি পেরিয়ে দীপা একটা চওড়া রাস্তায় নেমে পড়ে। এখানে প্রচুর আলো, গাড়ি-টাড়ি এবং মানুষজনও অজস্র।

খুনি দুটো কয়েক সেকেন্ড হতভম্বের মতো পড়ে থাকে। তার পরই খানিকটা সামলে নিয়ে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠেই দীপা যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটতে শুরু করে। কিন্তু গলির মুখ

পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এত লোকজন এবং গাড়ি-টাড়ি দেখে আর এগুতে সাহস হয় না।

দীপা ততক্ষণে একটা বাসে উঠে পড়েছে।

পরের দিনই কসবায় ছাত্রীর বাবাকে একটা চিঠি লিখে সে জানিয়ে দেয়, আপাতত জরুরি কারণে তার পক্ষে টিউশনি করা সম্ভব না, তিনি যেন মেয়ের জন্য অন্য টিউটরের ব্যবস্থা করেন। দীপা দূরে কোথাও টিউশনি করতে যাবে না, বাড়ির কাছাকাছি কিছু একটা জুটিয়ে নেবে।

ছয়

তাকে খুন করার জন্য যে চক্রান্ত চলছে সে-ব্যাপারে এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই দীপার। তিন দিন ট্রাকের তলায় তাকে পিষে মারার চেষ্টা হয়েছে, একদিন পেশাদার খুনিও পেছনে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু চারবারই প্রায় অলৌকিকভাবে সে বেঁচে যায়। অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এখনও যে দীপা টিকে আছে তার কাছে এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

মা-বাবা বা পিন্টুকে এখনও এ-সব কথা জানায়নি দীপা। কারণ তাকে হত্যার পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র কারা করছে, হাঁ করা মাত্র ওরা ধরে ফেলবে। মা-বাবা তাতে যত না ঘাবড়ে যাবে তার চাইতে খেপে উঠবে অনেক বেশি। বলবে, কেন সে পেটের ভেতর পাপ পুষে রেখেছে, কেন সে নার্সিং হোমে গিয়ে জঞ্জাল সাফ করে এল না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীপারও এক-এক সময় মনে হচ্ছে ভুজঙ্গ ঘোষের কথামতো অ্যাবরশনটা করিয়ে নিলেই হয়তো ভালো হতো। তাতে খুন হয়ে যাওয়ার ভয়টা অন্তত থাকত না, তার ওপর অনেকগুলো টাকাও পাওয়া যেত। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অদম্য জেদটা তাকে পেয়ে বসেছে। দেখাই যাক, শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। যদি মরতেও হয়, অনীশদের সে সহজে ছাড়বে না।

পিন্টুর সঙ্গেও এ-নিয়ে কোনও কথা বলেনি দীপা। ওর যা মাথা গরম তাতে হয়তো রাগের মাথায় বস্তির ছোকরাদের জুটিয়ে অনীশদের বাড়ি গিয়ে ঝামেলা করবে। বোমা-টোমাও মারতে পারে। তার ফল হবে মারাত্মক। পুলিশ ডেকে মণিমোহন নিশ্চয়ই ওদের জেলে পাঠিয়ে দেবেন। কিংবা ওঁর যা টাকার জোর তাতে পিন্টুর পেছনে প্রফেশনাল খুনিদেরও লাগিয়ে দিতে পারেন।

দীপা বুঝতে পারছে, এখন উত্তেজনার ঝোঁকে কিছু করা ঠিক হবে না। ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় তাকে এগুতে হবে।

কিছুদিন পারতপক্ষে সে বাড়ি থেকে বেরুবে না। অবশ্য স্কুলে যেতেই হবে। আর কাছাকাছি যদি দু-একটা টিউশনি পায়, সেখানেও যাবে। এই অঘোর নন্দী লেন বা ঢালিপাড়ার বস্তির দিকটায় সে অনেকখানি নিরাপদ।

বিকেলের দিকে আজকাল দীপা যে কসবা যাচ্ছে না, সেটা লক্ষ করে একদিন কমলা জিগ্যেস করল, 'কি রে, ক'দিন ধরে দেখছি, তুই টিউশনিতে যাচ্ছিস না।'

দীপা একটু চুপ করে থাকে। তারপর মিথ্যেই বলে, 'টিউশনিটা আর নেই।'

'তাহলে—' এই পর্যন্ত বলে একটু উদ্বিগ্ন ভাবেই কমলা তাকায়।

মায়ের উদ্বেগের কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয় না দীপার। সে বলে, 'ভেবো না। তোমার টাকা পেলেই তো হল। নতুন টিউশনি আমি জোগাড় করে নেব।'

কমলার মুখটা ম্লান দেখায়। সে বলে, 'আমি কি তোকে টাকার কথা বলেছি।'

এর উত্তর দিতে গেলে রূঢ়ই হতে হবে দীপাকে। মুখের ওপর বলতে হবে, 'টাকা ছাড়া আমার সঙ্গে তোমাদের আর তো কোনও সম্পর্ক নেই।' কিন্তু এই মুহূর্তে তিক্ততা বা উত্তেজনা কিছুই ভালো লাগছে না দীপার। সে চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে গলা নামিয়ে কমলা বলল, 'ওই ব্যাপারটার কী হবে? কিছু ভেবেছিস?'

মা কী ইঙ্গিত দিয়েছে, বুঝতে পারে দীপা। সে বলে, 'না।'

'এখনও সময় আছে, ভুজঙ্গ বলে সেই লোকটাকে ডেকে পাঠাব? তোর বাবার কাছে সে ঠিকানা দিয়ে গেছে।'

'না।'

মেয়েকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ দেখে কমলা। তারপর বলে, 'আমাদের মতো গরিবদের অত একগুঁয়েমি ভালো না। জেদটা এবার ছাড়।'

দীপা উত্তর দিল না।

কমলা বলতে থাকে, 'ভুজঙ্গর কথায় সেদিন রাজি হলে সব দিক থেকেই ভালো হতো। কোনও দুশ্চিন্তা থাকত না।'

হঠাৎ মাথার ভেতর প্রবল রক্তচাপ অনুভব করে দীপা। বলে, 'মা, চুপ করো।'

কমলা থামে না। গলা চড়িয়ে বলে, 'কেন চুপ করব? নিজের দোষে বিপদ বাধিয়ে মেজাজ দেখানো হচ্ছে!'

খেপে উঠতে গিয়েও একেবারে থ হয়ে যায় দীপা। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'নিজের দোষে!'

'না তো কী?' কমলার গলা আর-এক পরদা চড়ে, 'তোর ইচ্ছে না থাকলে অনীশ সুযোগ নিতে পারত? শুধু-শুধু অন্যের ছেলেকে একতরফা দোষ দিলে তো চলবে না।'

দীপা চমকে ওঠে। এই কথাটা মনে-মনে আগেও সে ভেবেছে। হয়তো সবাই তা-ই ভাবে। তবে এখন পর্যন্ত কমলা ছাড়া আর কেউ তার মুখের ওপর এভাবে বলেনি।

আজ মায়ের ওপর কী যেন ভর করেছে! মরিয়া হয়ে সে বলতে থাকে, 'তোর রোজগারে খাই বলে এ-সব সহ্য করতে হচ্ছে। এর চেয়ে মরা হাজার গুণ ভালো। কেন যে প্রাণটা বেরুচ্ছে না।'

দীপা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

কমলা এক নাগাড়ে বলে যায়, 'আর ক'দিন পর তোর দিকে তাকিয়ে সবাই যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, চারদিকে ঢিঢি পড়ে যাবে। তখন কী যে করব!' উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা দেখায় তাকে।

দীপা শান্ত মুখে এবার বলে, 'তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না। গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দেব। মরার সময় কাউকে ফাঁসিয়ে যাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

কমলা আর কিছু বলে না। ক্রুদ্ধ, হিংস্র চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আরও একমাস কেটে গেল।

এর মধ্যে পাড়ার কাছাকাছি এক বাড়িতে টিউশনি জোগাড় করে নিয়েছে দীপা। ক্লাস টু আর ফোরের দুটি মেয়েকে পড়াতে হয়। ওরা দুই বোন।

আজ দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে কলতলায় স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল

দীপা। সেই সঙ্গে হুড়হুড় করে বমিও করে ফেলল। ক'দিন ধরেই মাথা ঘোরে তার এবং বমিবমি ভাবটা ছিল, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি আগে হয়নি।

টিন আর দরমা দিয়ে ঘেরা কলতলার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল বিভা। দীপা পড়ে যেতেই সে কমলাকে ডেকেই দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দীপাকে টেনে তুলতে গিয়ে নার্সের অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখতে থাকে।

ততক্ষণে রান্নাবান্না ফেলে ছুটে এসেছে কমলা। বিভা আর সে ক্ষিপ্র হাতে দীপার সারা শরীর ধুইয়ে-মুছিয়ে তার ঘরে এনে শুইয়ে দেয়।

দীপা টের পায়, আগাগোড়া বিভার দুই চোখ অনবরত তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে। বিভার ধারালো নজর তার রক্তমাংস এবং হাড় পর্যন্ত ফুঁড়ে ভেতরে কী যেন খুঁজতে থাকে।

এরকম তীব্র জলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দীপা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে তার শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে।

কমলা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে কোমল গলায় জিগ্যেস করে, 'কি রে, হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল কেন? কাল রাত্তিরে ঘুম হয়নি?'

'হয়েছে।' আস্তে উত্তর দেয় দীপা।

'ভালো হজম হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

'তা হলে এরকম হল কেন?'

'কি জানি।'

কমলা আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বিভা পাশ থেকে বলে উঠল, 'ও এখন বিশ্রাম করুক। চলুন বউদি, আমরা বাইরে যাই। আপনার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার যখন কমলা এ-ঘরে এল তখন তাকে আগুনখাকির মতো দেখাচ্ছে। মায়ের এমন চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি দীপা। বিশেষ করে যেদিন থেকে সে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে সেদিন থেকে ভয়ে-ভয়ে নিজেকে গুটিয়েই রেখেছে মা।

এই মুহূর্তে মায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল দীপা।

কমলা দু-হাতে মাথার চুল খামচে ধরে হিস্টিরিয়া রুগির মতো চেঁচাতে লাগল, 'এখন আমি কী করি! হে ভগবান কী করি!'

দীপা ভীত স্বরে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তোমার? ওরকম করছ কেন?'

তার কেন মরণ হয় না, এই সব বলে আরও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করল কমলা। তার চিৎকার কান্না এবং আক্ষেপের ভেতর থেকে যেটুকু জানা গেল তা এইরকম। দীপা যে গর্ভবতী হয়েছে, বিভা তা বুঝতে পেরেছে। কমলা অবশ্য বোঝাতে চেয়েছে, সংসারের জন্য দিনরাত খেটে-খেটে ক্লান্তিতে দীপা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। কিন্তু নার্সের অভিজ্ঞ চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। যা বুঝবার সে তা বুঝে ফেলেছে। আর বিভা যে-ধরনের মেয়েমানুষ তাতে তার পেটে কথা থাকে না। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর এ-ধারে অঘোর নন্দী লেন ওধারে ঢালিপাড়া বস্তি মিলিয়ে যে বিরাট এলাকা, সর্বত্র দীপার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।

দীপা আস্তে-আস্তে চমকটা কাটিয়ে ওঠে। শান্ত মুখে বলে, 'আজ হোক কাল হোক, লোকে তো জানতই। না হয় ক'দিন আগেই জানল। আমরা তো চিরকাল এটা চাপা দিয়ে রাখতে পারব না।'

'চুপ কর তুই, চুপ কর। পেটের জন্যে তোর অনেক অত্যাচার অপমান সহ্য করেছি,

কিন্তু আর না। যদি মরিও তোর অন্ন আর মুখে তুলব না।'

দীপা আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা, মা—'

কমলা আর দাঁড়ায় না, দু-চোখে আঁচল চাপা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বিভার সম্বন্ধে মায়ের ধারণা যে কতটা নির্ভুল দু-দিনেই টের পেয়ে যায় দীপা। এ-অঞ্চলে সবাই তাকে বেশ সমীহ করে চলে। এমনিতেই বস্তির ছেলে-ছোকরারা মেয়ে-টেয়ে দেখলে জিভের ডগা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে সিটি দেয় বা নানারকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে উত্যক্ত করে তোলে। কিন্তু দীপার এমন একটা ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য রয়েছে যে কেউ এ-সব করতে সাহস করে না। তা ছাড়া সে এখানকার প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের খুব যত্ন করে পড়ায়। টিচার হিসেবে দীপা খুবই দায়িত্বশীল। এই সব কারণে ঢালিপাড়া বস্তি, অঘোর নন্দী লেন এবং আশেপাশের বিরাট এলাকা জুড়ে যত মানুষজন, সবাই তাকে ভালোও যেমন বাসে, তেমনি তার সম্বন্ধে তাদের মনে এক ধরনের শ্রদ্ধার ভাবও রয়েছে।

তা ছাড়া অন্য একটা কারণেও মস্তান বা বখা ছোকরারা দীপাকে বিরক্ত করে না। কেন না সে পিন্টুর দিদি। পিন্টুও তো হাফ-মস্তান। দিদির পেছনে কেউ লাগলে পিন্টু ছেড়ে দেবে না, ছুরি এবং পেটো নিয়ে গোটা এলাকা সে তোলপাড় করে ফেলবে।

আগে সে যখন স্কুলে যাতায়াত করত বা কোনও কাজে রাস্তায় বেরুত, কেউ তার দিকে বিশেষ তাকাত না। তাকালে এবং চোখাচোখি হয়ে গেলে 'কেমন আছেন দিদি?' বা 'কোথায় চললেন?' —সসম্ভ্রমে এ-জাতীয় দু-একটা কথা বলত। খুবই সাধারণ সৌজন্যমূলক প্রশ্ন। দীপা লক্ষ্য করেছে, পিন্টুর বন্ধুরা তাকে দেখলে চট করে হাতের তালুতে সিগারেট লুকিয়ে ফেলত।

কিন্তু ইদানীং এ-অঞ্চলের লোকেরা, সে রাস্তায় বেরুলেই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। একদিন একটা লোককে চোখ কুঁচকে দাঁত বার করে হাসতে দেখেছে। লোকটার নাম সে জানে না, তবে মুখটা চেনা।

বাড়িতে স্বস্তি নেই। দীপা লক্ষ্য করেছে, অন্য ভাড়াটেরা আজকাল পারতপক্ষে তাদের ঘর মাড়ায় না। কেমন যেন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। তাদের, বিশেষ করে তাকে যেন চেনেই না, এমন একটা ভাব। অথচ দীপা চলতে-ফিরতে টের পায়, চোরা চোখে বাড়ির লোকেরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে।

এইভাবে দিনতিনেক কেটে গেল।

এর মধ্যে কমলা এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি। ভীষণ জেদ তার। দীপা অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, তার হাতে-পায়ে ধরেছে কিন্তু মাকে টলানো যায়নি। অবৈধ অবাঞ্ছিত সন্তান পেটে পুষে রেখে যে-মেয়ে সংসারের সবার মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছে তার রোজগারের ভাত সে মুখে তুলবে না। বাবা খিদেটা একেবারেই সহ্য করতে পারে না, তাই খাচ্ছে। কিন্তু দীপার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

একমাত্র পিন্টুকে কাছে পেলে কথা বলে মনটা হালকা হয় কিন্তু ক'দিন ধরে তাকেও বেশি দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোনও একটা ব্যাপারে সে ভীষণ জড়িয়ে গেছে। সারাদিনে হুট করে একবার এসে নাকেমুখে গুঁজেই দৌড় লাগাচ্ছে। রাত্তিরে কখন এসে আবার কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, টেরই পাওয়া যাচ্ছে না।

দীপা যে কী করবে, ভেবে পায় না। যত দিন যাচ্ছে আরও বিভ্রান্ত, আরও দিশেহারা হয়ে পড়ছে সে। চারপাশে এমন কেউ নেই যে তাকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে, বুঝিয়ে দিতে পারে কী তার করা উচিত এবং কোন পথে এগুলে জীবনের সবচেয়ে জটিল এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ক্রমশ সে যেন এক বায়ুশূন্য অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

আজ সন্ধেবেলা টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরতেই দীপার চোখে পড়ল মা-বাবার ঘরে কারা যেন কথা বলছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ভালো করে লক্ষ্য করতেই মা-বাবা আর পিন্টুকে দেখা গেল। ওরা ছাড়া আর কারা আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দরজার দিকে পেছন ফিরে বসার জন্য ওদের মুখ চোখে পড়ছে না।

ও ঘরে কীসের আলোচনা চলছে, কে জানে। এই সময়টা কোনওদিনই বাড়ি থাকে না পিন্টু। আজ নিশ্চয়ই এমন কিছু জরুরি ব্যাপার ঘটেছে যাতে তাকে থাকতে হয়েছে।

যাদের কাছে আজকাল কেউ আসে না, হঠাৎ তাদের ঘরে কেন এত লোকের সভা বসেছে— এটা জানার জন্য অদম্য এক কৌতূহল দীপাকে পেয়ে বসে। একবার সে ভাবে সটান মা-বাবার ঘরে চলে যায়। পরক্ষণেই চিন্তাটাকে নাকচ করে আস্তে-আস্তে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আর সেই মুহূর্তে পিন্টু তাকে দেখতে পায়। 'দিদি, দিদি—' বলতে-বলতে সে বেরিয়ে আসে।

দীপা দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাছে এসে পিন্টু বলল, 'তোর এত দেরি হল আজ?'

দীপা জানায়, তার দুই ছাত্রীর সামনেই একটা পরীক্ষা রয়েছে. পড়াতে-পড়াতে দেরি হয়ে গেছে।

পিন্টু এবার বলে, 'সেই বিকেল থেকে নীলকান্তবাবু তোর জন্যে এসে বসে আছেন।'

রীতিমতো অবাক হয়েই দীপা জিগ্যেস করল, 'নীলকান্তবাবু কে?'

'তুই তো আবার রাজনীতি-ফীতি বুঝিস না। গ্রেট পলিটিক্যাল লিডার। এবার আমাদের এই এরিয়া থেকে নীলকান্তদা ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন।'

'আমার সঙ্গে ইলেকশানের কী সম্পর্ক?'

'ইলেকশান-ফিলেনশান না, অন্য দরকারে এসেছেন নীলকান্তদা। তুই তোর ঘরে গিয়ে বস, আমি ওঁকে নিয়ে আসছি।' বলে আর দাঁড়ায় না পিন্টু, দীপাকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

অগত্যা দীপা বিভ্রান্তের মতো নিজের ঘরে ঢোকে। তার সঙ্গে একজন রাজনৈতিক নেতার কী দরকার থাকতে পারে, সে ভেবে পায় না।

ঘরে এসে দীপা বসে না, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পর নীলকান্তকে নিয়ে আসে পিন্টু। তবে মা-বাবা বা অন্য কেউ আসেনি।

নীলকান্তর বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুল বেশির ভাগই সাদা। শরীরে একফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। খুব লম্বা নন, মাঝারি হাইটের পেটানো স্বাস্থ্য তাঁর। পরনে ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। আশ্চর্য স্নেহ-মাখানো মুখ তাঁর। দেখলেই মনে হয় বাবা কি কাকার মতো আপনজন।

পিন্টু দুজনের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদি, তুই নীলকান্তদার সঙ্গে কথা বল। আমি যাই।' বলে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দীপা একটু ইতস্তত করে নীলকান্তকে বলল, 'আপনি বসুন।'

নীলকান্ত ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে বললেন, 'আপনিও বসুন না—' তাঁর কণ্ঠস্বর এই বয়সেও বেশ সুরেলা এবং গম্ভীর।

দীপা বিছানার এক কোণে বসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

নীলকান্ত বললেন, 'মা, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব ক্লান্ত। বেশিক্ষণ সময় আপনার নেব না। মাত্র পাঁচ মিনিট।'

দীপা উত্তর দিল না।

নীলকান্ত কোনওরকম ধানাই-পানাই না করে কাজের কথায় চলে এলেন, 'মা, আপনি আমাকে নিজের সন্তানের মতো মনে করবেন। আমার কাছে আপনার কোনওরকম সঙ্কোচ নেই।' এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'পিন্টুর কাছে আপনার দুঃখের কথা সব শুনেছি। অনীশ আর মণিমোহন চ্যাটার্জির মতো লোকেরা সমাজের, দেশের কলঙ্ক।'

দীপা শিউরে উঠেই মুখ নামিয়ে নিল, তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল যেন। সে বুঝতে পারছিল পিন্টু আর কোনও দিকে পথ না পেয়ে তার সমস্যা সমাধানের জন্য সোজা রাজনৈতিক নেতার কাছে চলে গেছে। উদ্দেশ্য, মণিমোহনদের ওপর পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করানো। নিশ্চয়ই পিন্টু নীলকান্তকে তার গর্ভবতী হওয়ার খবরও দিয়েছে। লজ্জায়, সঙ্কোচে দীপার নাকমুখ ঝাঁঝা করতে লাগল।

নীলকান্ত বলতে লাগলেন, 'এই সব কৃমিকীটদের শায়েস্তা না করলে সোসাইটি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আমরা হতে দিতে পারি না। মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এই সব অশুভ শক্তিকে গুঁড়িয়ে দিতেই হবে।' মিটিংয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের যা হয় নীলকান্তরও তা-ই হচ্ছিল। কথায়-কথায় বক্তৃতার ঢং এসে যাচ্ছিল।

দীপা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এবারও কিছু বলল না।

নীলকান্ত সমানে বলে যাচ্ছেন, 'আপনি কি জানেন মা, নেক্সট ইলেকশানে মণিমোহন চ্যাটার্জি এখান থেকে দাঁড়াচ্ছে। যে লম্পট বজ্জাত ছেলেকে ওভাবে প্রোটেকশান দেয়, পীপলের সঙ্গে যাদের এতটুকু সম্পর্ক নেই, যারা আপনার মতো গরিব ফ্যামিলির মেয়ের সর্বনাশ করে, তাদের জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকার নেই। ওদের আমি ক্রাশ করে দেব। এ জন্যে আপনাকে আমার পাশে চাই।'

দীপা মুখ তুলল না।

নীলকান্ত থামেননি, 'আমি একটা পরিকল্পনা করেছি। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এ-পাড়ার প্রতিটি মানুষের কাছে যাব, জানিয়ে দেব মণিমোহন চ্যাটার্জি আপনার কতটা ক্ষতি করেছে—'

শুনতে-শুনতে শ্বাস আটকে আসতে থাকে দীপার। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে, আগামী নির্বাচনে নীলকান্ত তাকে শাণিত অস্ত্রের মতো ব্যবহার করে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মণিমোহনকে ধ্বংস করতে চান। যে অবৈধ ভ্রূণ পেটের ভেতর বড় হচ্ছে তাকে এভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে কাজে লাগানো যেতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল! দেখা যাচ্ছে, নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য তার কাছে ছুটে আসেননি নীলকান্ত। পৃথিবীতে অবৈধ সন্তানেরও তাহলে প্রয়োজনীয়তা আছে!

দীপা মনস্থির করে ফেলল। তার চরম লজ্জাকে এবং গ্লানিকে ব্যবহার করে নীলকান্ত ইলেকশানে তরে যাবেন, এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। এমনিতেই আমি মরে আছি। ওভাবে আমাকে রাস্তায় নামালে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।' বলে জোরে-জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল।

নীলকান্ত বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন না মা—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হল না। তার আগেই দীপা বলে উঠল, 'ওভাবে বেরুলে আপনি হয়তো জিতে যাবেন, মণিমোহন চ্যাটার্জি হয়তো হেরে যাবেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা কী হবে সেটা ভেবেছেন কী?'

তাঁর উদ্দেশ্যটা যে দীপা এভাবে এবং এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবে, আগে বুঝতে পারেননি নীলকান্ত। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন কিন্তু অসীম ধৈর্য এবং অধ্যবসায় তাঁর। কয়েক মুহূর্ত পর শান্ত সহিষ্ণু মুখে বললেন, 'শুধু ইলেকশানের দিকটাই দেখছেন, অন্য দিকটা কিন্তু ভেবে দেখেননি মা। এভাবে ঘুরলে মণিমোহনদের ওপর একটা প্রচণ্ড প্রেসার পড়ত। তারা শেষপর্যন্ত আপনার সঙ্গে একটা আপসের পথে আসতই।'

হাতজোড় করে দীপা শুধু বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন—'

নীলকান্ত বুঝতে পারছিলেন, এখন দীপাকে টানা-হ্যাঁচড়া করতে গেলে লাভ হবে না। পরে আবার এসে ঠান্ডা মাথায় তাকে বোঝাতে হবে। চেয়ার থেকে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আজ আমি যাচ্ছি। এখন আপনি খুবই ক্লান্ত, তা ছাড়া মনটাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আমার কথাটা পরে ভেবে দেখবেন। খবর দিলেই আমি চলে আসব। মনে রাখবেন আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।'

সাত

নীলকান্ত চলে যাওয়ার পর পিন্টুকে নিজের ঘরে ডেকে আনল দীপা। তারপর উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে বলল, 'নীলকান্তবাবুকে আমার কথা বলেছিস কেন?'

দিদির এমন উগ্র মূর্তি আগে আর কখনও দেখেনি পিন্টু। সে বেশ ঘাবড়েই গেল, 'কী করব বল। তুই নিজে কিছু করছিস না। এদিকে লোকে গুজগুজ শুরু করে দিয়েছে। আমিও যে মণিমোহন শুয়োরের বাচ্চাটার বাড়িতে গিয়ে পেটো-ফেটো ঝাড়ব—ভেবে দেখলাম তাতে ফায়দা নেই। শালাদের যা টাকা, আমাকে ফলস কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। আজকাল পলিটিক্যাল হুড়ো ছাড়া কিছু হয় না। তাই নীলকান্তদার কাছে গিয়েছিলাম।'

দীপা বলল, 'আমাকে শেষ না করে তুই ছাড়বি না।'

পিন্টু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'নীলকান্তদাকে তুই তো ভাগিয়ে দিলি। কিন্তু কিছু একটা না করলে কী করে চলবে। চারদিকে সব শালা মাকড়া ব্যাপারটা জেনে গেছে—'

দীপা হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে রইল। তারপর বলল, 'আজ রাতটা আমাকে ভাবতে দে। কাল থেকে কিছু একটা করবই।'

পরের দিন সকালে পিন্টুকে ডাকতে হল না, সে নিজের থেকেই দীপার ঘরে চলে এল। বলল, 'কি রে, কিছু ভেবেছিস?'

সারারাত ঘুমোয়নি দীপা। আরক্ত চোখে পিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল. 'ভেবেছি। তোকে দুটো কাজ করতে হবে।'

'কী?'

'মণিমোহন চ্যাটার্জির বাড়ির উলটোদিকের ফুটপাথে দু-তিনটে তক্তপোশ পেতে দিবি। পারবি?'

'পারব না কেন? কিন্তু ওখানে তক্তপোশ পেতে কী হবে?'

'পরে বুঝতে পারবি।'

একটু ভেবে পিন্টু বলল, 'কবে পাততে হবে?'

দীপা বলল, 'আজই।'

'এ তো একটা কাজ হল। আর-একটা?'

'বারো-চোদ্দোটা ছেলে জোগাড় করতে হবে।'

'বারো-চোদ্দোটা কেন, বারো-চোদ্দোশো জোটাতে পারি।'

'অত দরকার নেই। যা বললাম তা পেলেই হবে। তবে দেখে যেন মনে হয় ভদ্র ফ্যামিলির ছেলে। বখা, নেশাখোর, চোয়াড়ে মার্কা চেহারা চলবে না।'

'ঠিক আছে, জেন্টলম্যানের বাচ্চাদের মতো চেহারাই পাবি।'

'তক্তপোশ পেতে ছেলেগুলোকে ওখানে নিয়ে বসাবি। তারপর আমাকে খবর দিবি।'

পিন্টু চলে যাওয়ার পর মুখ-টুখ ধুয়ে এসে আলতা দিয়ে খবরের কাগজে বড়-বড় হরফে পোস্টার লিখতে শুরু করল দীপা।

ঠিক দু-ঘণ্টা বাদে দেখা গেল, হরপ্রসাদ সরণিতে মণিমোহনের বাড়ির ঠিক উলটোদিকের ফুটপাথে একটা বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের ধার ঘেঁষে পরপর তিনটে তক্তপোশ পাতা রয়েছে। মাঝখানের তক্তপোশটায় বসে আছে দীপা এবং তাকে ঘিরে পিন্টু এবং তার দলবল। যে পোস্টারগুলো কিছুক্ষণ আগে দীপা তার ঘরে বসে লিখেছিল, এখন সেগুলো বাউন্ডারি ওয়ালে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। পোস্টারগুলোয় যা লেখা আছে তা এইরকম ঃ

'মণিমোহন চ্যাটার্জির ছেলে অনীশ দীপা মণ্ডল নামে একটি মেয়ের চরম ক্ষতি করেছে। সব জেনেশুনেও মণিমোহন ছেলের কুকর্মের কোনও প্রতিকার করেননি, বরং তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।'

'আমরা মণিমোহনকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি তিনি একটি সম্মানজনক মীমাংসায় না আসেন, তাঁর ছেলে অনীশের কুকীর্তি বিস্তৃতভাবে ফাঁস করব।

'আপনারা হয়তো জানেন না মণিমোহন চ্যাটার্জি আগামী নির্বাচনে বিধানসভার প্রার্থী হচ্ছেন। যিনি লম্পট শয়তান ছেলেকে প্রশ্রয় দেন, দেশ তাঁর কাছে কী আশা করতে পারে!'

হরপ্রসাদ সরণির লোকজনই শুধু না, মুখে-মুখে খবর পেয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে চারপাশের মানুষ দীপাদের দেখতে এল। যত বেলা চড়তে লাগল, ভিড়ও ততই বেড়ে চলল। সেই সঙ্গে হইচই, চিৎকার এবং মণিমোহনদের সম্বন্ধে নানা ধারালো মন্তব্যও চলতে লাগল।

দীপা পোস্টারে চব্বিশ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল। অতটা সময় লাগল না। সন্ধের পর ভুজঙ্গ ঘোষ এসে খবর দিল, মণিমোহন দীপার সঙ্গে কথা বলতে চান। রাত্রিবেলা লোকজন চলে গেলে ভুজঙ্গ এসে দীপাকে মণিমোহনের বাড়ির খিড়কি দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবে। দীপা জানাল, তার সঙ্গে কথা বলতে হলে মণিমোহনকে তাদের অঘোর নন্দী লেনের বাড়িতে যেতে হবে।

ভুজঙ্গ বলল, 'তা হলে আমি চ্যাটার্জি সাহেবকে জিগ্যেস করে আসি।'

দীপা বলল, 'আসুন।'

রাস্তা পেরিয়ে ওধারে চলে গেল ভুজঙ্গ। দশ মিনিট বাদে ফিরে এসে জানাল, মণিমোহন রাত বারোটায় দীপাদের বাড়ি যাবেন।

দীপা বুঝতে পারল, মানুষজনের সামনে মণিমোহন অঘোর নন্দী লেনে যাবেন না, তাঁর মর্যাদায় আটকাবে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবেই মণিমোহনের পক্ষে যাওয়া সম্ভব।

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটায় মণিমোহন দীপাদের বাড়ি এলেন। সঙ্গে ভুজঙ্গ। ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমন্ত বাড়িতে আদিনাথ কমলা পিন্টু এবং দীপার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুরু হল। দশ মিনিটের ভেতরেই এত বড় একটা জটিল সমস্যার সমাধানের সূত্রও বেরিয়ে গেল।

মণিমোহন বললেন, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। লেট আস ফরগেট ইট। আমি পনেরো দিনের মধ্যে দীপাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে যাব।'

॥ আট ॥

মণিমোহনের কথার নড়চড় হল না। ঠিক পনেরো দিনের মধ্যেই অনীশের সঙ্গে দীপার বিয়ে হয়ে গেল।

এ-বিয়েতে প্রচুর খরচ করেছেন মণিমোহন। অজস্র আলো জ্বলেছে, নহবতখানা বসিয়ে দিনরাত সানাই বাজানো হয়েছে, বাজি পোড়ানো হয়েছে। অঘোর নন্দী লেন এবং ঢালিপাড়া বস্তির অগুনতি মানুষকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন মণিমোহন।

এই বিয়ের পেছনে মণিমোহনের সুদূরপ্রসারী একটা চাল রয়েছে। বস্তির মেয়েকে যখন পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতেই হল তখন তা থেকে যতটা সুবিধে এবং লাভ নিংড়ে বার করে নেওয়া যায়। মণিমোহন যেন সবাইকে দেখাতে চাইছেন, তিনি কত মহানুভব, কত উদার। আসলে কিছুদিন বাদে যে নির্বাচন আসছে তাঁর লক্ষ্য সেদিকেই। এই বিয়ের জোরেই তিনি এ-অঞ্চলের ভোটারদের কাছে গিয়ে হাত পাততে পারবেন।

বৌভাতের এক সপ্তাহ পর দ্বিরাগমনে এল দীপা এবং অনীশ। আদিনাথের কাছে তিন রাত থাকার কথা ওদের, কিন্তু অনীশ একদিন থেকেই চলে গেল। জরুরি কাজে তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। তিন দিন পর ফিরে সে দীপাকে নিয়ে যাবে।

প্রথম রাতটা কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দীপা সোজা আলিপুর কোর্টে চলে এল এবং খুঁজে-খুঁজে একজন ভারিক্কী চেহারার মধ্যবয়সি উকিলও বার করল। তাঁকে দিয়ে মণিমোহনের ঠিকানায় ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়ে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বিকেল হয়ে গেল।

আরও দু-দিন পর উদ্বিগ্ন মুখে অনীশ এসে হাজির। বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি ডিভোর্সের নোটিশ দিয়েছ!'

'হ্যাঁ।' খুব শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নড়ল দীপা।

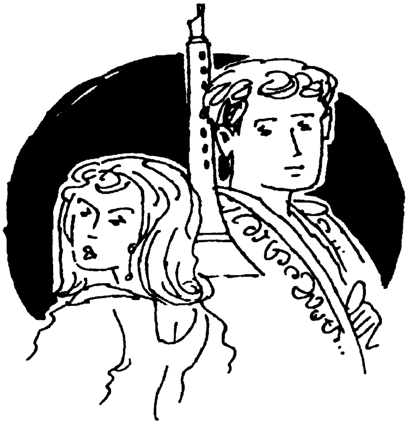
'এর মানে?'

'খুব সহজ। তোমার সঙ্গে আমার যে-বিয়েটা হয়েছে তার পেছনে ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা কিছুই নেই। যা আছে তা হল ঘৃণা, সন্দেহ আর বিদ্বেষ। এর ওপর কোনও সম্পর্কই টিকতে পারে না।'

'তা হলে বিয়ের জন্যে এত সব কাণ্ড করলে কেন?'

'আমার আর আমার পেটের বাচ্চাটার জন্যে একটা সামাজিক স্বীকৃতির দরকার ছিল। কুমারী মেয়ের সন্তানদের লোকে কী বলে, নিশ্চয়ই তুমি তা জানো। আমার বাচ্চাটার ওরকম দুর্ভাগ্য হোক, সেটা আমি চাইনি। তাই তোমাকে এভাবে বিয়ে করেছি।' একটানা কথাগুলো বলে একটু হাঁপায় দীপা। তারপর তীব্র গলায় আবার বলে, 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা—ঘৃণা—ঘৃণা—'

বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে অনীশ।



হঠাৎ বসন্ত

বম্বে হারবার লাইনের লাস্ট ডাউন ট্রেনটা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে যখন বান্দ্রা পৌঁছুল, প্ল্যাটফর্মের প্রকাণ্ড ঘড়িটায় তখন রাত একটা বেজে পঁচিশ। বান্দ্রা এ-লাইনের শেষ স্টেশন।

বোম্বাইয়ের যে শহরতলি দিয়ে হারবার লাইনের ট্রেনগুলো যায়, তার দু-ধারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট অর্থাৎ কটন মিল, গ্লাস ফ্যাক্টরি, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ইত্যাদি-ইত্যাদি। আর আছে বম্বে পোর্ট।

সারাদিন, শুধু দিনই বা কেন, রাত বারোটা পর্যন্ত এ-লাইনের ট্রেনগুলোতে গাদাগাদি ভিড় লেগে থাকে। কিন্তু এখন এই লাস্ট ডাউন ট্রেনটা একরকম ফাঁকাই এসেছে। বম্বে পোর্টের কিছু মজুর, কলকারখানার লাস্ট শিফ্টের কিছু ওয়ার্কার কামরাগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। ট্রেন থামতেই তারা হুড়মুড় করে প্ল্যাটফর্মে নেমে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

জোহনের কিন্তু অত তাড়াহুড়ো নেই। ট্রেনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলে ধীরেসুস্থে কাঁধে লম্বা ফ্লুটের বাক্সটা চাপিয়ে নেমে পড়ল সে। এটা সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনের বাইরে যেতে হলে লম্বা ওভারব্রিজ পেরিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নামতে হবে। বাইরে বেরুবার গেটটা ওখানেই। জোহন এলোমেলো পা ফেলে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। অল্প-অল্প টলছিল সে। এই টলটলায়মান অবস্থাটা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল।

জোহনের বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। জাতে সে গোয়াঞ্চি পিদ্রু, অর্থাৎ গোয়ার ক্রিশ্চান। গোল ধরনের মুখ তার, ধারালো চিবুক, ছড়ানো কাঁধ। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চির বেশি হবে না। গায়ের রং পোড়া ব্রোঞ্জের মতো। হাত-পায়ের হাড় বেশ চওড়া এবং মজবুত। শরীরে চর্বির পরিমাণ কম, তাই তাকে কিছুটা রোগা দেখায়। জুলপি এবং মাথার চুল সিকি ভাগ সাদা হয়ে গেছে। সব চাইতে আশ্চর্য তার চোখ। এমন সরল, মায়াবী চোখ ক্কচিৎ দেখা যায়।

জোহন একটা ব্যান্ড পার্টিতে লম্বা ফ্লুট অর্থাৎ বাঁশি বাজায়। এছাড়া অফ-সিজনে অর্থাৎ যখন উৎসব-টুৎসব থাকে না কিংবা যেটা বিয়ের মরশুম নয়, বায়নার অভাবে তাদের বাজনার দল যখন বেকার বসে থাকে, সেই সময়টা সাট্টা কিংবা মাট্‌কা খেলে, রেসের বই-টই বেচে কিছু কামিয়ে নেয়।

এই মুহূর্তে জোহনের পরনে সার্টিনের ওপর জরির কারুকার্য-করা হাইনেক পাঞ্জাবি আর দু-ধারে লম্বালম্বি নীল বর্ডার দেওয়া ফুল প্যান্ট; মাথায় নেটিভ স্টেটের রাজাদের মতো পাগড়ি। পায়ে সস্তা দামের রঙচঙে নাগরা। অর্থাৎ ব্যান্ড পার্টির পুরো ড্রেসটা রয়েছে তার গায়ে।

আজ দুপুরে জোহনদের বাজনার দল—'আনারকলি ব্যান্ড পার্টি' মেরিন লাইন্সে এক মাড়োয়ারি শেঠের মেয়ের বিয়েতে বাজাতে গিয়েছিল। তারপর আর বাজনার ড্রেসটা ছাড়া হয়নি।

শেঠজির বাড়িতে রাত এগারোটা পর্যন্ত তারা একটানা বাজিয়ে গেছে। তারপর হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে চলে এসেছিল।

জোহনদের বাজনার দলের বেশির ভাগ লোকই থাকে পুরোনো বোম্বাইতে, পায়ধুনির দিকটায়। কেউ-কেউ তারদেও কিংবা সেন্ট্রালের কাছে। একমাত্র জোহনই এতদূরে, শহরতলির প্রায় শেষ মাথায় ছিটকে চলে এসেছে। সে ঠিক বান্দ্রাতেই থাকে না, থাকে সমুদ্রের ধারে ডান্ডা কোস্টের কাছে এক লঝঝড় বস্তিতে। এখানে এই বস্তিগুলোকে বলে ঝোপড়পট্টি। বান্দ্রা স্টেশন থেকে প্রায় তিনটি মাইল গেলে তবে ডান্ডা কোস্টের সেই ঝোপড়পট্টি।

রাত এগোরোটায় শেঠজির বাড়ি থেকে বেরিয়ে একে-একে সব যে-যার আস্তানায় চলে গেছে। একা জোহনই মেরিন লাইন্স থেকে কারনাক রোডে এসে হাঁটতে-হাঁটতে ক্রফোর্ড মার্কেটের

কাছে চলে এসেছিল।

বিয়ে বাড়ি কিংবা ফেস্টিভ্যালে বাজাতে-টাজাতে গেলে বেশির ভাগ জায়গাতেই তাদের খাইয়ে দেয়। কিন্তু মেরিন লাইন্সের শেঠজিটি এমনই চিপ্‌পুস মাড়োয়ারি যে এক গেলাস জল পর্যন্ত খাওয়ায়নি। দুপুর একটা থেকে রাত এগারোটা অর্থাৎ ঝাড়া দশটি ঘণ্টা একনাগাড়ে বাজিয়ে দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল জোহনের। পাকস্থলীতে খিদেটা আগুনের মতো দপদপ করছিল। ক্রফোর্ড মার্কেটের পিছন দিকে সিদ্দিদের একটা হোটেলে ঢুকে প্রথমে এক বোতল ঠার্‌রা (এক জাতের দিশি মদ) খেয়েছে জোহন, তারপর গলা পর্যন্ত ঠেসে-ঠেসে রুটি আর মাংস। খানপিনা হয়ে গেলে ঠার্‌রার নেশায় টলতে-টলতে সে চলে এসেছিল ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে; সেখান থেকে বারোটা পঁয়তাল্লিশে হারবার লাইনের লাস্ট ট্রেন ধরে বান্দ্রায় এসেছে।

সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মটা এখন একেবারে ফাঁকা। শুধু এই প্ল্যাটফর্মটাই নয়, অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোতেও লোকজন চোখে পড়ছে না। চায়ের স্টল, খাবারের স্টল, মিল্ক বার, খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের দোকান, ফলের স্টল, সব বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি, কালো কোট গায়ে দিয়ে যে টিকিট কালেক্টারগুলো অন্য সময়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদেরও এখন দেখা যাচ্ছে না।

পায়ে-পায়ে ওভারব্রিজের কাছে চলে এল জোহন। তারপর টলতে-টলতে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠতে লাগল। মিনিট পাঁচেক বাদে দেখা গেল স্টেশন পেরিয়ে সে বাইরের রাস্তায় চলে এসেছে। এখান থেকে বাস ধরে তাকে ডান্ডায় যেতে হবে। জোহন স্টেশনের উলটোদিকের বাস স্ট্যান্ডটায় গিয়ে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার হঠাৎ খেয়াল হল, স্ট্যান্ডে সে ছাড়া আর কেউ নেই। কীরকম একটা সন্দেহ হল জোহনের। নেশাজড়ানো ঘোলাটে চোখে এদিক-সেদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ল, বাঁ-দিকের ফুটপাথে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে মাছভাজাওলারা বসে আছে। রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত ভাজা পমফ্রেট মাছ শালপাতায় সাজিয়ে ওরা বসে থাকে। কেন না আশে-পাশে অগুনতি বে-আইনি শুঁড়িখানা আর বার আছে। চাট হিসেবে ভাজা পমফ্রেট মাছের দারুণ ডিম্যান্ড।

মাছভাজাওলাদের কাছে এসে জোহন জিগ্যেস করল, 'ডান্ডার লাস্ট বাস কি চলে গেছে?'

একটা মাছভাজাওলা বলল, 'হাঁ, আধা ঘণ্টা আগে।'

তার মানে ঝাড়া তিনটি মাইল এখন জোহনকে হাঁটতে হবে। জড়ানো, চাপা গলায় সে বলল, 'যাঃ শালে—' বলেই এলোমেলো টলমলে পায়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল। বাঁকের শপিং সেন্টার, নতুন সিনেমা হল, হোটেল, গেস্টহাউস পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সে লিংকিং রোডে এসে পড়ল। তারপর কোনাকুনি ডান্ডা কোস্টের দিকে এগুতে লাগল।

এত রাতে রাস্তায় লোকজন নেই। মাঝে-মধ্যে দু-একটা ফ্লাইং পুলিশ দেখা যাচ্ছে। ক্বচিৎ কখনও হুস করে জুহু বিচের দিকে থেকে এক-আধটা প্রাইভেট কার সত্তর-আশি মাইল স্পিডে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বান্দ্রা থেকে ডান্ডা কোস্ট পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় যে ফ্লাইং পুলিশেরা ঘুরে বেড়ায়, তারা সবাই জোহনকে চেনে। চলতে-চলতে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তারা কেউ-কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

একটা মারাঠি পুলিশ হাতের ভেতর কাঠের রুল ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল, 'ড্রেসটা তো দারুণ বানিয়েছিস; বিলকুল রাজা-রাজা মনে হচ্ছে!'

জোহনের গায়ে যে পোশাক সেটা আনকোরা নতুন, আজই সে প্রথম পরেছে। তাদের 'আনারকলি ব্যান্ড পার্টি'-র ড্রেস রাজরাজড়াদের পোশাকের ঢং নকল করে বানানো হয়। জোহন ঢুলু-ঢুলু চোখে তাকিয়ে ডান হাতটা কপালের কাছাকাছি সেলামের ভঙ্গিতে তুলে বলল, 'আপনার মেহেরবানি।'

রগড়ের গলায় পুলিশটি এবার বলল, 'তা রাজাসাব, এত তকলিফ করে পায়দল যাচ্ছেন যে?'

'রোজই তো এয়ার-কন্ডিশনড কারে চড়ে বেড়াই। আজ ভাবলাম একটু হাঁটি—' বলেই চোখ পিটপিট করতে লাগল জোহন।

'শালে হারামি—' আলতো করে জোহনের পাছায় রুলের খোঁচা দিয়ে পুলিশটা এগিয়ে গেল।

আরও খানিকটা যাবার পর আর-একটি পুলিশের সঙ্গে দেখা হল। সে তার মুখের কাছে নাক এনে গন্ধ শুঁকে বলল, 'অ্যাই, আজ আবার ঠার্‌রা গিলেছিস!'

'হ্যাঁ—' ঘাড়টা আড়াই ফুট হেলিয়ে দিল জোহন, 'খেতে কি চাই, তবে না খেয়ে পারি না—'

'কেন?'

'লস্‌ হয়ে যাবে যে—'

'কার লস্‌ হবে?'

'ওই যারা ঠার্‌রা বানিয়েছে। মাল না কাটলে শালেলোগ রাস্তায় বসে যাবে। সেই জন্যেই তো খেতে হয়।'

নেশার মধ্যেও করুণ মুখ করে বলল জোহন।

পুলিশটা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল। তারপর আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, 'দিল্লাগি! যা ভাগ, শরাবি কাঁহাকা—'

জোহন ফ্যাক্‌ করে একটু হাসল। তারপর ঘাড় হেঁট করে টলতে-টলতে আবার এগিয়ে চলল।

দ্বিতীয় পুলিশটির পর আর কারও সঙ্গে দেখা হল না। কতক্ষণ বাদে, জোহনের খেয়াল নেই, একসময় ডান্ডা কোস্টের কাছে চলে এল সে।

বান্দ্রা এবং খারের নতুন টাউনশিপটা যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর অনেকটা রাস্তা একেবারে নির্জন। তার দু-ধারে বাড়ি-টাড়ি নেই; এমনকি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে দু-চারটে আলো লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, কারা যেন সেগুলো খুলে নিয়ে গেছে। সুতরাং রাস্তাটা অন্ধকারও।

এই রাস্তাটা সমুদ্রের ধারে ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। জোহন এই জনশূন্য ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তার আধাআধি যখন এসে পড়েছে, সেই সময় খুব কাছাকাছি কোথায় যেন ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়ে-গলার তীক্ষ্ণ কাতর চিৎকার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল, 'বাঁচাও-বাঁচাও, মেরে ফেলল—'

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় টক্কর খেয়ে চলতে-চলতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল জোহন। পুরো এক বোতল ঠার্‌রা তলপেটে নিম্নচাপ সৃষ্টি করছিল এবং মাথার ভেতর একটানা মেরি-গো-রাউন্ড ঘুরিয়ে যাচ্ছিল। পলকে নেশাটা ফিকে হয়ে এল। কোত্থেকে শব্দটা আসছে বোঝবার জন্য ভয়ে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। একে অন্ধকার, তার ওপর নেশায় চোখ ভারী হয়ে প্রায় বুঁজে আছে। জোহন করল কি, দু-আঙুল দিয়ে ডান চোখের পাতা টেনে বড় করে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু না, কিছুই চোখে পড়ছে না। আচমকা তার মনে পড়ে গেল, পকেটে একটা লাইটার রয়েছে। ঝট করে সেটা বার করে জ্বালিয়ে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে আবছাভাবে তার চোখে পড়ল, কয়েক গজ দূরে দুটো ঢ্যাঙা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বয়স-টয়স বোঝা যাচ্ছে না, তবে দু-জনেরই হাতে দুটো লম্বা ছোরা। লাইটারের আলোয় ছোরা দুটো ঝকঝকিয়ে উঠছে। তাদের পায়ের কাছে কেউ, একটা মেয়েই হবে হয়তো, পড়ে আছে। কারও নড়াচড়া নেই; সব মিলিয়ে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো সব স্থির।

শরীরের সবগুলো জোড়ের মুখে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল যেন। জোহন একবার ভাবল, পেছন ফিরে দৌড় লাগায়। দৌড়তে গিয়ে দেখল, পেরেক ঠুকে পা দুটো যেন কেউ রাস্তার সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে। হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসল সে, ভাঙা বসে-যাওয়া গলায় বলল, 'তোরা কে?'

ঢ্যাঙা লোক দুটো, হত্যাকারীর মতো যাদের চেহারা, চাপা গলায় বলল. 'চোপ শালে, বাত্তি বুঝা (নিভিয়ে দে), নেহি তো পেটে ড্যাগার ঘুসিয়ে দেব।'

ফুঁ দিয়ে লাইটারটা নেভাতে যাচ্ছিল জোহন, মুহূর্তে লোক দুটোর পায়ের তলা থেকে মেয়ে-গলার অস্পষ্ট গোঙানি উঠে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথার ভিতরটা কীরকম জট পাকিয়ে গেল তার। শরীরের সবটুকু শক্তি গলায় জড়ো করে সে চিৎকার করে উঠল, 'মার্ডার-মার্ডার পুলিশ-পুলিশ—'

আচমকা চিৎকারে লোকদুটো হকচকিয়ে গেল। তারপর লাফ দিয়ে পাশের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিমেষে উধাও। মেয়েটা ওখানে পড়েই রইল।

এবার কী করবে জোহন ভেবে পেল না। সমুদ্রের দিক থেকে যে উলটোপালটা হাওয়া উঠে আসছিল, লাইটারটা তাতেই নিভে গেছে। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর অলৌকিক কোনও শক্তির টানে মেয়েটা যেখানে পড়ে আছে, পায়ে-পায়ে সেখানে চলে এল।

কাছে এসে লাইটারটা আবার জ্বালল জোহন। দমকা বাতাসে তক্ষুনি সেটা নিভে গেল। কিন্তু পলকের মধ্যে সে যা দেখল, ঠার্‌রার নেশাটা তাতেই ছুটে গেল। চাপ-চাপ ঘন রক্তে অনেকটা জায়গা ভেসে গেছে আর তার মধ্যে মেয়েটা কাত হয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। জোহনের মনে হল, শরীরের হাড়গুলো গলে-গলে বেঁকেচুরে যাচ্ছে, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। একবার ভাবল, পালিয়ে যায়। কিন্তু পালাতেও পারল না। এ-অবস্থায় মেয়েটাকে ফেলে যাওয়া যায় না। চারদিকটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে শ্বাস-টানার মতো শব্দ করে জোহন ডাকল, 'অ্যাই—'

মেয়েটির দিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

জোহন আবার বলল, 'কে তুমি?'

এবারও মেয়েটার উত্তর নেই।

আচমকা জোহনের খেয়াল হল, মেয়েটা মরে যায়নি তো? ভাবতেই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঠান্ডা স্রোতের মতো কিছু নেমে গেল। নিজের অজান্তেই কাঁধ, কপাল এবং বুকে আঙুল ঠেকিয়ে একটা ক্রস আঁকল সে। তারপর ঘাড় থেকে ফ্লুটের বাক্সটা রাস্তায় নামিয়ে রেখে হাঁটু মুড়ে অন্ধকারেই আন্দাজে-আন্দাজে মেয়েটার মুখের ওপর ঝুঁকল। লাইটারটা আরেকবার জ্বেলে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে উলটোপালটা বাতাসে যাতে নিভে না যায়, বাঁ-হাত দিয়ে তাই আড়াল করে রাখল, আর ডান হাতটা মেয়েটার নাকের কাছে ধরে বুঝতে চেষ্টা করল শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলছে কি না। অনেকক্ষণ পর, যোহনের মনে হল, তিরতির করে একটু নিশ্বাস পড়ল হাতের ওপর। ওহ্‌ ক্রাইস্ট, মেয়েটা তবে এখনও মরেনি! হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিংবা ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে পারলে নিশ্চয়ই ওকে বাঁচানো যাবে। দ্রুত আরেকবার ক্রস আঁকল জোহন। তারপর আবার ডাকতে লাগল, 'অ্যাই-অ্যাই—'

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, জোহন বুঝতে পারল, মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে আছে।

এখন ওকে কীভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়? যতদূর চোখ যায়, রাস্তায় লোকজন গাড়ি-টাড়ি কিছুই নেই। যে-কোনও একটা গাড়ি—প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, ট্রাক, ভ্যান, এমনকি বাস পর্যন্ত—দেখতে পেলে সেটা থামিয়ে ড্রাইভারের হাতে-পায়ে ধরে রাজি করিয়ে মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যেত। একটা লোক পেলেও দুজনে ধরাধরি করে যা হোক ব্যবস্থা করতে পারত জোহন। যাই হোক গলা চড়িয়ে চিৎকার করে-করে সে ডাকতে লাগল, 'আশেপাশে কেউ আছ? কোই হ্যায় ভাই?'

কেউ উত্তর দিল না।

বান্দ্রায় ওয়াটারফিল্ড রোডে কর্পোরেশনের একটা হাসপাতাল আছে। কিন্তু সেটা প্রায় দু-আড়াই মাইল দূরে। একা একটা অজ্ঞান মেয়েকে কাঁধে করে এতটা রাস্তা যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া হঠাৎ মনে হল, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রচুর লাফড়ায় (ঝামেলায়) পড়তে হবে। মেয়েটা তার কে? কোথায় তাকে পেয়েছে? তার এমন অবস্থা হল কীভাবে? এ-সব প্রশ্নের জবাবদিহি করতে-

করতে তার লাইফ হেল হয়ে যাবে। তারপর পুলিশের লাফড়ায় পড়তে হবে কি না, কে জানে। তার চাইতে, জোহন স্থির করে ফেলল, আপাতত মেয়েটাকে তাদের ঝোপড়পট্টিতেই নিয়ে যাবে। কথাটা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ল, আরে তাদের ঝোপড়পট্টিতেই তো একটা বুড়ো পার্শি ডাক্তার রয়েছে। লাইটারটা নিভিয়ে পকেটে পুরল জোহন। তারপর মেয়েটাকে কাঁধে তুলে ফ্লুটের লম্বাটে বাক্সটা এক হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল। যেতে-যেতে অন্ধকারেই সে টের পেতে লাগল, মেয়েটার শরীর থেকে রক্ত চুঁইয়ে-চুঁইয়ে তার জামা-টামা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে অনেকটা জায়গা জুড়ে ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টি। ভাঙাচোরা টিন, অ্যাসবেস্টসের টুকরো, টালি, প্যাকিং বাক্সের পাতলা কাঠ, বাতিল চট—ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো একটানা সারি-সারি অগুনতি ঘর তোলা হয়েছে। এই হল ঝোপড়পট্টি।

বোম্বাই শহরে হাজার-হাজার চোখ-ধাঁধানো বাড়ি, গন্ডা-গন্ডা স্কাইস্ক্রেপার। মডার্ন আর্কিটেকচারের যত নমুনা আছে, সব এখানকার রাস্তায়-রাস্তায় ছড়ানো। তবু ওগুলোর গা ঘেঁষে এই নোংরা-কুৎসিত ঝোপড়পট্টিগুলোও আছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষ জীবাণুর মতো এর ভেতর গাদাগাদি করে পড়ে থাকে।

ডান্ডা কোস্টের এই ঝোপড়পট্টির একধারে থাকে মারাঠি জেলেরা; আরেক দিকে নানা জাতের মানুষ—বিহারি, বাঙালি, কেরেলি, কুর্গি, গোয়াঞ্চি ইত্যাদি-ইত্যাদি। ঝোপড়পট্টিগুলো ছোটখাটো এক-একটি ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যেন।

ডান্ডা কোস্টের এই ঝোপড়পট্টিটার শেষ মাথায় একটা ঘরে থাকে যোহন। কিছুক্ষণ পর মেয়েটাকে নিয়ে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। মেয়েটাকে কাঁধে রেখেই পকেট হাতড়ে চাবি বার করে তালা খুলল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেওয়ালের গা থেকে তারে-ঝোলানো সুইচটা বার করে আলো জ্বালল।

ঝোপড়পট্টিতে বম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই আলো-টালো দেয়নি। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ-কেউ চুরি করে কর্পোরেশনের রাস্তার লাইট থেকে কানেকশান নিয়ে আলো জ্বালায়। জোহনও লম্বা তার-ফার লাগিয়ে একটা চোরাগোপ্তা কানেকশান নিয়েছে। ক্বচিৎ কখনও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লোকেরা ইন্সপেকশনে এলে পাঁচ-দশটা টাকা হাতে ধরিয়ে দেয়।

ঘরটা আলোয় ভরে গিয়েছিল। একধারে দড়ির খাটিয়ার ওপর নোংরা ধামসানো বিছানা। আরেক ধারে সস্তা দামের একটা টেবিলে পারা-ওঠা আয়না, চিরুনি, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, দুটো হাতল-ভাঙা কাপ, একটা প্লাস্টিকের গেলাস এবং একটা অল্প দামের ট্রানজিস্টর। টেবিলটার তলায় হাট করে খোলা একটা টিনের বাক্স, এক কোণে দড়িতে ঝোলানো দুটো পায়জামা, একটা শার্ট, নোংরা গেঞ্জি, চিটচিটে রুমাল। এক দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি, আরেক দেওয়ালে একটা হুইস্কি কোম্পানির ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ক্যালেন্ডারটার গোটা পাতা জুড়ে প্রায়-উলঙ্গ একটি মেমসাহেব বিরাজ করছে।

মেয়েটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল জোহন, তারপর ফ্লুটের বাক্সটাকে দেওয়ালের একটা হুকে ঝুলিয়ে রেখে আবার মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়াল। এতটা রাস্তা একটা মানুষের অজ্ঞান দেহের ভার বয়ে এনেছে জোহন; দারুণ হাঁপাচ্ছিল সে। কপালে ঘাড়ে গলায় দানা-দানা ঘাম জমেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতেই সে মেয়েটাকে দেখতে লাগল।

অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে মেয়েটার বয়স খুব বেশি হবে না, এই পঁচিশ-ছাব্বিশের মতো। মুখের গড়ন বেশ ধারালো, রং পাকা গমের মতো। চোখ বুঁজে আছে, তবু বোঝা যাচ্ছে সে দুটো বেশ বড়-বড় এবং তাতে লম্বাটে টান। প্রচুর চুল মেয়েটার, সরু কোমর, তীক্ষ্ণ নাক, দীর্ঘ আঙুল। তবে গোটা শরীরটাই প্রায় রক্তে মাখামাখি।

হঠাৎ কী মনে পড়তে দ্রুত একটা হাত মেয়েটার নাকের কাছে এনে নিশ্বাসপতন লক্ষ করল জোহন; পরক্ষণে সেই হাতটা কপালের ওপর রেখে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একরকম দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ঝোপড়পট্টির আর-এক মাথায় একটা ঘরের সামনে এসে থামল। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'ডাক্তারসাব, ডাক্তারসাব—'

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে ঘুম-জড়ানো গলা শোনা গেল, 'কৌন?'

'আমি জোহন, জোহন ফুলুটবালা—'

একটু পরেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার নাম ডাক্তার গিল্ডার। বয়স সাতষট্টি-আটষট্টি। জাতে পার্শি। মাঝারি মাপের চেহারা। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। এত বয়স হয়েছে তবু স্বাস্থ্য বেশ ভালো; পেটানো মজবুত শরীর। চৌকো মুখ, ধূর্ত নীলচে চোখ।

গিল্ডার একসময় বম্বে মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রিওলা ডাক্তারই ছিল। বিশ-পঁচিশ বছর আগে বেআইনি গর্ভপাত করবার সময় তার হাতে একটি মেয়ের মৃত্যু ঘটে। তাই নিয়ে প্রচুর ঝঞ্ঝাট হয়েছে। পুলিশ এসেছে, কোর্টে তার বিরুদ্ধে কেস উঠেছে এবং মামলায় দোষী প্রমাণিত হয়ে দু-মাস জেলও খাটতে হয়েছে গিল্ডারকে। সেই সঙ্গে ডাক্তারি ডিগ্রি এবং রেজিস্ট্রেশন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। নামকাটা ডাক্তার গিল্ডার জেল থেকে বেরিয়ে নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষপর্যন্ত এই ডান্ডা কোস্টে এসে ঠেকেছে। এই ঝোপড়পট্টিতেই তার ষোলো-সতেরো বছর কেটে গেল। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে সে প্র্যাকটিস-ট্র্যাকটিস করে। তা ছাড়া কাছাকাছি একটা বে-আইনি হতচ্ছাড়া চেহারার বেশ্যাপট্টি আছে, সেখানেও বেশ জমজমাট পসার গিল্ডারের। তবে পসার যতটা, সেই তুলনায় পয়সা নেই। এখানকার মানুষগুলো দু-বেলা পেট ভরে খেতেই পায় না, ডাক্তারের পয়সা দেবে কোত্থেকে? যে যা দ্যায়, চোখ বুঁজে তাই পকেটে পোরে গিল্ডার। নাম-কাটা ডাক্তারের ফি-র দিকে তাকালে চলে না।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে ডাক্তার গিল্ডার জিগ্যেস করল, 'এত রাত্তিরে! কী ব্যাপার রে?'

জোহন বলল, 'ফেঁসে গেছি ডাক্তারসাব। আপনাকে একবার আমার ঝোপড়িতে যেতে হবে।'

'কী হয়েছে?'

'একটা লড়কি বিলকুল বেহোঁশ হয়ে রয়েছে; তাকে দেখতে হবে।'

গিল্ডারের ঘুমন্ত ভাবটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে কেটে গেল যেন। সে বলল, 'লড়কি! তুই তো স্রিফ আকেলা নাঙ্গা আদমি; শাদি-টাদি করিসনি। লড়কি পেলি কোথায়? ভাগিয়ে এনেছিস নাকি?'

'আপনি চলুন, যেতে-যেতে বলছি।'

গিল্ডার বুঝল, বেহুঁশ মেয়েটার জন্য অস্থির হয়ে আছে জোহন; সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে নিয়ে যেতে চায় সে। যে ঢলঢলে প্যান্টটা পরা ছিল, তার ওপর একটা কোঁচকানো-মোচকানো বুশ শার্ট চড়িয়ে পেটমোটা ঢাউস ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল গিল্ডার। দরজায় তালা লাগিয়ে বলল, 'চল—'

ঝোপড়পট্টির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা নোংরা রাস্তা দিয়ে ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। এই রাস্তাগুলো যুগপৎ নর্দমা এবং পায়ে চলার পথ। দু-ধারের ঝোপড়িগুলো থেকে যত ময়লা জল, আবর্জনা, আনাজের খোসা এখানে ছোড়া হয়। এক-এক জায়গায় ডাঁই করা আবর্জনা পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে।

যেতে-যেতে সংক্ষেপে মেয়েটাকে কোথায় পেয়েছে এবং কী অবস্থায় ঝোপড়পট্টিতে তুলে এনেছে, বলে গেল জোহন।

সব শুনে গম্ভীর, চিন্তিত মুখে গিল্ডার বলল, 'তাই তো; পুলিশের ঝামেলা-ফামেলায় না আবার পড়ে যাস—'

জোহনের গলা শুকিয়ে গেল, 'কী হতে পারে ডাক্তারসাব?'

গিল্ডার এই ঝোপড়পট্টির বাসিন্দাদের রোগ-টোগই শুধু সারায় না; সে তাদের পরামর্শদাতাও। কেউ বিপদে পড়লে তার কাছে ছুটে আসে। গিল্ডার আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে রাগের সুরে বলল, 'আগে মেয়েটাকে দেখি।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?'

'ভেবে দেখতে হবে।'

একসময় ওরা জোহনের ঝুপড়িতে এসে পড়ল।

মেয়েটাকে জোহন যেভাবে শুইয়ে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই কাত হয়ে পড়ে আছে সে। চোখ তেমনই বোঁজা। জোহন তাকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে, এর কথা বলছিলাম—'

গিল্ডার ঢাউস ব্যাগটা পাশে রেখে মেয়েটার হাত তুলে নিয়ে পাল্স্ দেখতে লাগল। জোহন তার গা ঘেঁষে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল। মিনিটখানেক বাদে মেয়েটার হাত নামিয়ে গিল্ডার ঘাড় ফেরাতেই জোহন শ্বাসরুদ্ধের মতো জিগ্যেস করল, 'কীরকম দেখলেন ডাক্তারসাব?'

'ভালো না।'

'বাঁচবে তো? ঘরে এনে তোলার পর যদি মরে যায়, আমি গেছি—'

'ভয় নেই, বেঁচে যাবে। তবে তোকে বেশ ভোগাবে। এক কাজ কর—খানিকটা গরম জল দরকার। জোগাড় করতে পারবি?'

'পারতেই হবে।'

জোহনের এই ঝুপড়িতে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই, কাজেই বাসন-কোসনও নেই। তার খাওয়া-দাওয়া সবই বাইরে-বাইরে, কখনও উদিপিদের লাঞ্চ হোমে; কখনও সিন্ধি, পাঞ্জাবি বা গোয়াঞ্চিদের হোটেলে। খিদের সময় কাছাকাছি যা পাওয়া যায়, সেখানেই ঢুকে পড়ে জোহন।

হাঁড়ি-কড়া বাসন-কোসন না থাকলেও এই ঝুপড়িতে একটা পুরোনো জং-ধরা কেরোসিনের কুকার আছে। জোহনের দারুণ চায়ের নেশা। ঘণ্টায় দু-বার করে তার চা চাই। ঝুপড়িতে যখন সে থাকে কুকার ধরিয়ে চা-টা নিজের হাতেই করে নেয়।

টেবিলের তলা থেকে কুকারটা বার করে ধরিয়ে ফেলল জোহন। তারপর দশ মিনিটের ভেতর টিনের মগে জল গরম করে গিল্ডারের কাছে নিয়ে এল।

গিল্ডার তার প্রকাণ্ড ব্যাগ থেকে তুলো বার করে গরম জলে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে মেয়েটার রক্ত মুছতে লাগল। ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করতে-করতে আঁতকে ওঠার মতো করে বলল, 'ওহ্, অনেক জায়গায় স্ট্যাব করেছে।'

গিল্ডারের পাশ থেকে জোহন অস্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ—'

গিল্ডার বলল, 'মেয়েটার শাড়ি ব্লাউজ রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে; এগুলো বদলাতে হবে যে—'

এবার দারুণ বিপদে পড়ে গেল জোহন। তার ঝুপড়িতে কি বিয়ে করা বউ আছে, যে শাড়ি-টাড়ি থাকবে? কিন্তু ওই মেয়েটার রক্তমাখা কাপড়-চোপড় বদলাবার জন্য এখন কী দেয় সে? এত রাতে এই ঝোপড়পট্টিতে কেউ জেগেও নেই। থাকলে না হয় কারও কাছ থেকে শাড়ি-ফাড়ি চেয়ে আনা যেত। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত নিজের একটা পায়জামা আর বুশ শার্ট এনে গিল্ডারের হাতে দিল যোহন।

গিল্ডার মজার গলায় বলল, 'এগুলো মেয়েরা পরে নাকি?'

ঘাড় চুলকে জোহন বলল, 'আপনি তো জানেন ডাক্তারসাব, মেয়েমানুষের লাফড়া আমার ঘরে নেই; শাড়ি কোথায় পাব? এই দিয়েই কাজ চালিয়ে দিন।'

'শালে হারামি—' বলেই একটা খিস্তি দিল গিল্ডার। তার জিভ বেশ আলগা; সেখানে কিছুই

আটকায় না।

জোহন ঠোঁট কুঁচকে হাসল, কিছু বলল না।

আর গিল্ডার এক কাণ্ডই করে বসল। জোহনের চোখের সামনে মেয়েটার শাড়ি জামা-টামা খুলে কাটা জায়গাগুলো সেলাই করে দিতে লাগল।

যুবতী মেয়ের খোলা শরীর আগে আর কখনও দেখেনি জোহন। মেয়েটার জ্ঞান নেই। দেহ রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত আর জোহনের বয়সও কিছু কম নয়। পঞ্চাশের কাছাকাছি, তবু মেয়েটাকে দেখতে-দেখতে তার চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল, নাকের ভেতর দিয়ে সোডার ঝাঁজের মতো কিছু উঠে আসছিল, তালুর কাছটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল।

এদিকে সেলাই-টেলাই হয়ে গেলে হাত-টাত ধুয়ে গিল্ডার মেয়েটাকে পায়জামা আর বুশ শার্ট পরিয়ে একটা ইঞ্জেকশান দিল। ব্যাগ থেকে অনেকগুলো ট্যাবলেট বার করে কাগজে মুড়তে-মুড়তে বলল, 'জ্ঞান ফিরলে দু-ঘণ্টা পরপর একটা করে খাইয়ে দিবি। কাল সন্ধেবেলা এসে আবার ইঞ্জেকশান দিয়ে যাব। রোজ একটা করে সাত দিন ইঞ্জেকশান চলবে।' বলতে-বলতে তার ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল—'দে, ওষুধের দামটা দিয়ে দে।'

তালুর ভেতর সেই ঝাঁ-ঝাঁ করা ভাবটা এখনও রয়েছে। ঘোরের মধ্যে জোহন জিগ্যেস করল, 'কত?'

'দশ টাকা।'

আজ মেরিন লাইন্সে শেঠের মেয়ের বিয়েতে বাজিয়ে কুড়িটা টাকা পেয়েছে জোহন। ব্যান্ডপার্টিতে একদিন বাজালে তার মজুরি কুড়ি টাকা। আজকের মজুরি থেকে এক বোতল ঠার্রা আর রুটি মাংস খেয়েছে সে, তাতে খরচ হয়েছে ছ'টাকার মতো। বাকি চোদ্দোটা টাকা এখনও রয়েছে। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে গিল্ডারকে দিল জোহন।

গিল্ডার একটু চুপ করে থেকে হেসে-হেসে বলল, 'আমার ফি-টি কিছু দিবি না?'

আরও দুটো টাকা বার করে নিঃশব্দে গিল্ডারকে দিল জোহন। তার মানে আজকের মজুরির পুরোটাই প্রায় খতম।

পকেটে টাকা পুরতে-পুরতে গিল্ডার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কী মনে পড়তে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আজকের রাতটা পারলে মেয়েটার কাছে জেগেই কাটাস। জ্ঞান ফিরে এলে ওর যদি খুব যন্ত্রণা হয়, আমাকে খবর দিবি।'

জোহন ঘাড় কাত করল—দেবে।

দরজার বাইরে গিয়ে গিল্ডার আবার বলল, 'আরেকটা কথা—'

জোহন তাকিয়ে রইল।

গিল্ডার বলতে লাগল, 'ঝোপড়পট্টির লোকেরা অবশ্য মেয়েটা তোর কে হয় জানতে চাইবে না। এখানে কেউ কারওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না; কিন্তু ওর এমন অবস্থা হল কী করে যদি জিগ্যেস করে, তখন কী বলবি?'

জোহন প্রতিধ্বনির মতো করে বলল, 'কী বলব?'

'বলবি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। মেয়েটার জ্ঞান ফিরলে ওকেও তাই বলতে বলে দিস।'

'আচ্ছা।'

'সত্যি কথা বললে আবার পুলিশের লোকেরা এসে যেতে পারে।'

গিল্ডার চলে গেল। জোহন দরজা বন্ধ করে মেয়েটার কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। মেয়েটা চোখ বুঁজে পড়ে আছে। এবার জোহনের মনে হল, আস্তে-আস্তে মেয়েটার শরীরে জীবন যেন ফিরে আসছে। তিরতির করে বুকটা ওঠানামা করছে। বেঁচে যাবে মেয়েটা, নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে। তাকে দেখতে-দেখতে হঠাৎ জোহনের খেয়াল হল ব্যান্ডপার্টির যে ড্রেস তার গায়ে রয়েছে,

সেটা রক্তে মাখানো। রক্তের দাগ সহজে ওঠে না। এখনও ধুয়ে-টুয়ে ফেললে ড্রেসটা খানিকটা হয়তো বাঁচানো যাবে। অল্প-স্বল্প দাগ থাকলেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। নইলে দামি নতুন ড্রেসটাই বরবাদ।

ঝোপড়পট্টির মধ্যেই একটা জলের কল আছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে কোনও একটা পাইপ-টাইপ ফেটে যাবার জন্য দিনরাত ওটা দিয়ে জল পড়ে। জোহন ঝট্ করে একটা পায়জামা আর জালিকাটা গোলাপি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ব্যান্ডপার্টির ড্রেস আর মেয়েটার শাড়ি জামা-টামা নিয়ে কল থেকে ধুয়ে আনল। ভেজা পোশাকগুলো ঘরেই শুকোতে দিয়ে আবার মেয়েটার কাছে এসে বসল।

আজ গোটা রাতই মেয়েটার পাশে বসে জেগে থাকতে হবে। ডাক্তার গিল্ডার তাই বলে গেছেন। ঝাড়া দশ-বারো ঘণ্টা ফুলুট বাজিয়ে হাতে-পায়ে আর জোর নেই, দারুণ খাটুনি গেছে। জোহন ভেবেছিল, ঝোপড়পট্টিতে ফিরেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। তারপর পরিপাটি একটি ঘুমে রাত কাবার করে ফেলবে। তা নয়, কী যে লাফড়া হয়ে গেল! মেয়েটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে না আনলেই বোধহয় ভালো হতো। ঘুমের বারোটা তো বেজেই গেছে, মজুরির যে-টাকাটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটাও মেয়েটার জন্যই প্রায় শেষ হয়ে গেল। এরপর আরও কত খরচ-টরচ, আরও কত ঝামেলা পোয়াতে হবে, কে জানে।

ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে এনে ঢোকানো ঠিক হয়নি। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠতে গিয়ে আচমকা মেয়েটার নগ্ন খেলা শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে নাকে-মুখে সেই সোডার ঝাঁজটা ফের অনুভব করতে শুরু করল জোহন।

মেয়েটার জ্ঞান ফিরল ভোরের দিকে।

সারা রাত চোখের পাতা টান-টান করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল জোহন। এক মুহূর্তের জন্যও সে ঘুমোয়নি; মাঝে-মধ্যে ঢুলুনি এলেও জোর করেই চোখ মেলে রেখেছে।

মেয়েটা তাকাতেই জোহন তার মুখের ওপর ঝুঁকল। তার চোখ ঘোলাটে, আচ্ছন্ন। গলার ভেতর থেকে আবছা গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে আসছিল। জোহন জিগ্যেস করল, 'এখন কেমন লাগছে?'

মেয়েটা উত্তর দিল না; তার চোখ দুটো ক্লান্তভাবে বুঁজে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার যখন সে তাকাল তার চোখের সেই আচ্ছন্ন ঘোলাটে ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। ঝুপড়ির ভেতরটা দেখতে-দেখতে খুব দুর্বল গলায় বলল, 'আমি কোথায়?'

জোহন বলল, 'ডাভার ঝোপড়পট্টিতে।'

'এখানে এলাম কী করে?'

মেয়েটা হিন্দিতেই কথা বলছিল। তা থেকে তার দেশ কোথায়, কী জাত, বোঝা যাচ্ছিল না। কেন না বাঙালি-বিহারি-পাঞ্জাবি-কেরেলি সবাই বম্বেতে হিন্দি বলে থাকে। তবে মেয়েটার বলার ধরনে কুর্গ অঞ্চলের টান আছে।

জোহন বলল, 'পরে শুনো। এখন শরীর কেমন লাগছে বলো—'

'খুব দুব্‌লা, মাথা ঘুরছে।' বলতে-বলতে হাতের ওপর ভর দিয়ে হঠাৎ উঠে বসতে চেষ্টা করল মেয়েটা। কিন্তু সে বসবার আগেই তার দু-কাঁধ ধরে ব্যস্তভাবে শুইয়ে দিল জোহন। 'উঁহু-উঁহু, এখন উঠো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

শুয়ে-শুয়ে মেয়েটা জিগ্যেস করল, 'তুমি কে?'

'আমার নাম জোহন।'

'তুমিই আমাকে এখানে এনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে কোথায় পেলে?'

'পরে বলব।'

চোখ আধাআধি বুঁজে কিছু ভাবতে চেষ্টা করল মেয়েটা। তার কপালে এলোমেলো আঁচড়ের মতো অনেকগুলো রেখা ফুটে উঠতে লাগল। একসময় কী যেন মনে পড়ে গেল তার। জোহনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দুটো লোক কাল রাত্তিরে আমাকে ডাম্ভার দিকে এনে সারা গায়ে ছুরি মেরেছিল। মনে আছে হাত তুলে ছুরি ঠেকাতে-ঠেকাতে অজ্ঞান হয়ে আমি রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।' একটু থেমে আবার বলল, 'তুমি কি রাস্তা থেকে আমাকে তুলে এনেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই লোকদুটো তখন কোথায় ছিল?'

ওই ব্যাপারটা নিয়ে এখন কোনও কথা বলতে চাইছিল না জোহন। প্রচুর রক্তপাতের ফলে মেয়েটার শরীর দুর্বল হয়ে আছে। তাছাড়া সারা রাত সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। এখন যে-কোনও উত্তেজনা তার পক্ষে ক্ষতিকর। জোহন বলল, 'পরে শুনো।' বলতে-বলতেই গিন্ডারের কথা মনে পড়ে গেল তার।

গিন্ডার বলে গিয়েছিল, জ্ঞান হবার পর মেয়েটার শরীরে যদি খুব যন্ত্রণা হয, তাকে যেন জোহন খবর দেয়। জোহন মেয়েটার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল তার কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে কি না।

মেয়েটা মাথা নাড়ল—হচ্ছে না।

তার মানে গিন্ডারকে এখন খবর দেবার দরকার নেই। সন্ধেবেলা সে নিজে থেকেই এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যাবে। গিন্ডারের কথা ভাবতেই জোহনের হঠাৎ খেয়াল হল, জ্ঞান হবার পর মেয়েটাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিতে হবে। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ট্যাবলেট আর জল এনে খাইয়ে দিল। পরক্ষণেই জোহনের মনে পড়ল, আজ ফার্স্ট ট্রেন ধরে তার সিটিতে যাবার কথা ছিল। তাদের 'আনারকলি ব্যান্ড-পার্টি'-র মালিক এবং ব্যান্ড মাস্টার ইফতিকার সাহেব ভোরবেলাতেই দলের সবাইকে অফিসে চলে যেতে বলেছিল। আজ নতুন বাজনাব রিহার্সাল শুরু হবে।

জোহন দ্রুত একবার ফালিমতো জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকাল। এতক্ষণে বেশ রোদ উঠে গেছে।

বাইরে ঝোপড়পট্টির মাঝমধ্যিখানে সেই একমাত্র জলের কলটা ঘিরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। বহু লোকের কথা বলা এবং যাতায়াতের আওয়াজ ভেসে আসছিল। জোহন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইফতিকার সাহেব মানুষটা এমনিতে চমৎকার—ভোলাভালা, সাদাসিধে, আকাশের মতো বিরাট দিল, দলের লোকেদের বিপদে-আপদে দশ হাত দিয়ে আগলায়। কিন্তু কাজের গাফিলতি দেখলে একেবারে খেপে যায় সে। বাপ-মা চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে খিস্তি দেয়। জোহন ঠিক করে ফেলল এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে সে। কিন্তু এই মেয়েটা? একে কে দেখবে? ভারী গাড্ডায় পড়া গেল তো মেয়েটাকে নিয়ে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে জোহনের মুখ চকচক করে উঠল। মুশকিল আসানের আভাস সে পেয়ে গেছে। মেয়েটার দিকে ফিরে দ্রুত বলল, 'তোমার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।'

মেয়েটা বলল, 'মেরি সরোজিনী দেবাসিয়া। তবে সবাই আমাকে 'মেরি' বলে ডাকে।'

কথা বলার ধাঁচ শুনে জোহন যা আন্দাজ করেছিল তা-ই, অর্থাৎ মেয়েটা কুর্গিই। দেবাসিয়া পদবি কুর্গ ছাড়া আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না। সে অবাক এবং কিছুটা খুশিও হল এই ভেবে,

মেয়েটা সম্ভবত ক্রিশ্চানও। মেরি নামটা অন্তত তা-ই বোঝাচ্ছে। আগ্রহের সুরে জোহন জিগ্যেস করল, 'তুমি ক্রিশ্চান?'

'হ্যাঁ।'

'কী ক্রিশ্চান?'

'ক্যাথলিক।'

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে জোহন এবার বলল, 'তুমি একটু একলা থাকো, আমি আসছি।' বলেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঝোপড়পট্টির ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে যেতে-যেতে জোহন দেখল, মেয়েমানুষ-পুরুষমানুষ-বাচ্চা-কাচ্চা—এখানকার যত বাসিন্দা, কেউ আর ঝুপড়ির ভেতরে নেই। রোদ উঠতে না উঠতেই বেরিয়ে পড়েছে। জোহনকে ডেকে কেউ-কেউ কথা বলছিল। সে কেমন আছে, এত সকালে হনহনিয়ে কোথায় চলেছে, ইত্যাদি-ইত্যাদি। হাঁটতে-হাঁটতেই জোহন উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। তবে যত বাচ্চার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, তারা আবদারের গলায় একই কথা বলে যাচ্ছিল, 'জোহন চাচা, তুমি আজকাল আমাদের ফ্লুট শোনাও না। আজ শোনাতে হবে কিন্তু। না শোনালে ছাড়ব না।'

জোহন সময় পেলেই ঝোপড়পট্টির কাচ্চা-বাচ্চাদের জড়ো করে ফ্লুটে নানারকম মজার মজার গান বাজিয়ে শোনায়—বেশির ভাগই হিন্দি ছবির গানের সুর। বয়স্ক লোকজনের চাইতে ছেলেপুলেদের মধ্যেই তার খাতিরটা বেশি। যেতে-যেতে হাত তুলে-তুলে জোহন তাদের বলল, 'আজ না, আরেক দিন শোনাব।'

দশ মিনিটের মধ্যে ঝোপড়পট্টির শেষ মাথায় একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল জোহন। ঘরটার সামনের দিকের বারান্দায় বসে আজবলাল আর তার বউ এখন কলাই-করা মগে করে চা এবং পাও (পাঁউরুটি) খাচ্ছে। আজবলাল ইউ পি-র লোক, এখানে সকলে তাকে বলে ভাইয়া। তবে বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা। এই বয়সেও একটা চুল পাকেনি, গোলাকার মুখে বসন্তর দাগ, গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। লোকটা চাকরি-বাকরি বা ব্যাবসা-ট্যাবসা কিছুই করে না; তার একমাত্র ধান্দা হল জুয়া খেলা। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে বম্বে শহরে এসেছিল সে; তারপর থেকে জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছুই করেনি। জগতে যত রকমের জুয়া আছে—সাট্টা, মাটকা, তাসের বাজি, ঘোড়ার রেস, কোনওটাতেই আজবলালের অরুচি নেই। জুয়ার পয়সাতেই তার সংসার চলে। বছর দশেক আগে এক সাট্টা খেলার আড্ডাতে তার সঙ্গে জোহনের আলাপ; সেই আলাপ থেকে পরে বেশ গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে।

আজবলালের বউ সোমবারি বেশ গাবদা-গোবদা মেয়েমানুষ। লম্বা যতটা, চওড়াও সে প্রায় ততখানিই। অনেকটা জায়গা জুড়ে, প্রায় দু-তিন মিটার হবে, সে বসে আছে। গোলগাল মুখ, অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেছে। আজবলালের তুলনায় তার বয়স ঢের বেশি মনে হয়। তবে সোমবারির সব আকর্ষণ তার চোখে; সর্বক্ষণ সেখানে কৌতুকের ছটা ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। ছড়া কেটে-কেটে আর হেসে-হেসে গানের সুরে উত্তরপ্রদেশের দেহাতি বুলিতে সে মুখরোচক অশ্লীল কথা বলে যেতে পারে। দারুণ মজার মেয়েমানুষ।

জোহনকে দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, 'আরে আও-আও ফ্লুটবালা—'

জোহন বারান্দায় উঠে ওদের পাশে গিয়ে বসল। আজবলাল আবার বলল, 'দু-মাস বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল। কাম-কাজ বহুত জোর চলছে না কি?'

'হ্যাঁ; এখন শাদির মরশুম তো। হাতে অনেক বায়না আছে।'

'আজ ছুটি বুঝি?'

'না। এক্ষুনি সিটিতে ছুটতে হবে।'

'তবে এলে যে? কিছু দরকার আছে?'

'হাঁ, বহুত দরকার। শোন—'

জোহন বলতে যাচ্ছিল, তার আগে হাত তুলে সোমবারি বাধা দিল, 'দরকারের কথা পরে হবে; আগে তো চা খাও।'

বলেই হাতের ভর দিয়ে নিজের বিশাল শরীর টেনে তুলল।

জোহন হাঁ-হা করে উঠল, 'না ভাবী, এখন আর চা খাব না। দরকারি কথাটা সেরেই স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।'

সোমবারি বলল, 'চা না খেলে তোমার কোনও কথা শুনছি না।' ঘর থেকে স্টোভ বার করে এনে চটপট চায়ের জল চড়িয়ে দিল সে। ক্ষিপ্র হাতে চা করে, সঙ্গে পাও সাজিয়ে জোহনকে দিতে-দিতে বলল, 'এবার দরকারি কথাটা বলো—'

চায়ের মগে লম্বা চুমুক দিয়ে জোহন বলল, 'ভাবী, আমি স্রিফ মরে গেছি।'

ঠোঁট টিপে কিছুক্ষণ ছোট-ছোট চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল সোমবারি। তারপর বলল, 'কোনও লড়কির চক্করে পড়েছ নাকি?'

'তোমার জবাব নেই ভাবী, ঠিক ধরেছ।'

'বয়েস কত মেয়েটার?'

'ঠিক জানি না; চব্বিশ-পঁচিশ হবে আর কি—'

একটু চিন্তা করে সোমবারি জিগ্যেস করল, 'আর তোমার?'

অবাক হয়ে জোহন বলল, 'আমার বয়েস দিয়ে কী হবে?'

'বলোই না—'

'পঁচাশের (পঞ্চাশ) মতো; দু-এক বছর কমও হতে পারে।'

সোমবারির মুখে একটা ছায়া কিছুক্ষণের জন্য অনড় হয়ে রইল। তারপর ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে সে বলল, 'তর তো সত্যনাশ (সর্বনাশ) হো গিয়া—'

এতক্ষণ চুপচাপ চা-পাউরুটি খেয়ে যাচ্ছিল আজবলাল। এবার সে বলে উঠল, 'বিলকুল—'

জোহন চমকে উঠল, 'ক্যা হো গিয়া?'

সোমবারি বলল, 'সত্যনাশ। এই বয়েসে একটা জওয়ানি ছোকরিকে খেলিয়ে তুলতে পারবে তো ফুলুটবালা?'

দেখো দেখি, কী ভাবতে এরা কী ভেবে বসে আছে। জোহন বলল, 'খেলাবার কথা আসছে কীসে? মাজাক (ইয়ারকি) না করে আমার কথাটা আগে শুনেই নাও না—'

ভালোমানুষের মতো মুখ করে সোমবারি বলল, 'আচ্ছা বলো—'

মেরির ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে সোমবারির মুখের দিকে তাকাল জোহন, 'এবার বুঝতে পারছ তো, কীরকম ফেঁসেছি! তুমি আমাকে বাঁচাও ভাবী।'

'কী করতে হবে বলো—'

'মেয়েটায় সবে জ্ঞান ফিরেছে। ওর কাছে একজন থাকা দরকার। এদিকে আমাকে বেরুতে হচ্ছে। তুমি যদি ওর কাছে থাকো, তাহলে আমি ভরসা করে বেরুতে পারি।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না সোমবারি। স্বামীর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'তুমি কি আজ বেরুবে, না ঘরেই থাকছ?'

আজবলাল বলল, 'ঘরে বসে থাকলে চলবে? আজ মহালছমিতে ঘোড়ার রেস আছে না? ঘণ্টাখানেকের ভেতর বেরিয়ে পড়ব।'

'ভালোই হল। রান্না-টান্নার ঝামেলা আর করছি না। তুমি হোটেলে খেয়ে নিও। ঘরে বাসি রুটি আছে, তাই দিয়ে আমি চালিয়ে নেব। এখন ফুলুটবালার সঙ্গে যাচ্ছি। বেরুবার সময় ঘরে

তালা লাগিয়ে আমাকে চাবিটা দিয়ে যেও—' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সোমবারি। জোহনের দিকে ফিরে বলল, 'চলো'।

সোমবারিকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ বাদে নিজের ঝুপড়িতে ফিরে এসে জোহন দেখল, মেরি খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি এখন বেশ স্বাভাবিক; আগের সেই আচ্ছন্নতা আর নেই। জোহনদের দেখে সে উঠে বসতে চাইল, জোহন উঠতে দিল না। হাতের ইশারায় তাকে শুয়ে থাকতে বলে সোমবারিকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার ভাবী; তোমার কাছে থাকবে। আমাকে এখন কাজে বেরুতে হচ্ছে।

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করল মেরি।

সোমবারির দিকে ফিরে জোহন বলল, 'এই হল মেরি। এর কথাই তোমাকে বলেছি ভাবী।'

'হ্যাঁ—' মেরির দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিল সোমবারি।

কোথায় মেরির ওষুধ আছে, কখন-কখন কীভাবে তা খাওয়াতে হবে, সব জানিয়ে তিনটে টাকা সোমবারিকে দিতে-দিতে জোহন এবার বলল, 'ওর বোধহয় দুধ ফল-টল খাওয়া দরকার। কিনে দিও—'

'আচ্ছা—' সোমবারি দড়ির খাটিয়ায় মেরির পাশে গিয়ে বসল।

আর জোহন কাল রাত্তিরে ব্যান্ডপার্টির যে ড্রেসটা ধুয়ে শুকোতে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে পরে ফেলল। ঘুরে-ফিরে ড্রেসটা দেখতে-দেখতে লক্ষ্য করল রক্ত ধুয়ে ফেললেও এখানে-ওখানে ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগ রয়ে গেছে। লনড্রিতে না দিলে ওই দাগ উঠবে না। তার মানে পুরো পাঁচটি টাকা গচ্চা যাবে।

পাঁচ টাকা খরচের কথা ভাবাভাবির সময় এখন নেই। চটপট ঘরে এসে চুলটা কোনওরকমে আঁচড়ে নিল জোহন। ফ্লুটের বাক্সটা কাঁধে ফেলে সোমবারি আর মেরির দিকে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল।

গোয়ার মার্মুগাঁও পোর্টের কাছে এক ছোট শহরে জোহনদের বাড়ি। খুব ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে দেশ ছেড়ে বম্বে চলে এসেছিল সে। সেই থেকে এখানেই আছে। বম্বে আসার বছরখানেক আগে, জোহনের বয়স তখন পাঁচ কি ছয়, তার মা মারা গিয়েছিল। মায়ের মুখ এতদিনে তার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। দেশের কথাও জোহনের তেমন মনে পড়ে না। কখনও-সখনও একা-একা চুপচাপ বসে থাকলে তাদের সেই শহরে পোর্তুগিজ আমলের পুরোনো বাড়ি-ঘর, আঁকা-বাঁকা পাথুরে রাস্তা, নীল জলে-ভরা সমুদ্রের খাড়ি, আবছা-আবছা ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

বম্বে থেকে গোয়ার সেই ছোট্ট শহরটা মোটে দুশো মাইল দূরে। ব্যালার্ড পিয়ের থেকে আজ দুপুরে জাহাজে উঠলে কাল দুপুরে পৌঁছনো যায়। কিন্তু বাবার সঙ্গে সেই যে বম্বে চলে এসেছিল, তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি।

মনে আছে, বম্বে এসে এক রোড কন্ট্রাক্টরের কাছে মজুরের কাজ নিয়েছিল বাবা। সারাদিন বাবা রাস্তা তৈরি বা মেরামতের কাজ করত। আর জোহনকে একটু দূরে ছায়া-টায়া দেখে কোনও গাছের তলায় বা বাড়ির নীচে বসিয়ে রাখত। বিকেলবেলা কাজকর্ম চুকিয়ে মজুরি বুঝে নিয়ে জোহনের হাত ধরে কটন গ্রিনের ওদিকে এক ভাঙা-চোরা বাতিল গুদাম ঘরে চলে যেত। তখন ওখানেই তারা থাকত।

দু-তিন বছর এভাবে কাটবার পর দুম করে বাবা একদিন মরে গেল। তখন জোহনের বয়স

কতই বা, খুব বেশি হলে দশ-এগারো। বাবা মরে যাবার পর কে তাকে দেখে, কে-ই বা খাওয়ায়। খিদের চোটে প্রথম-প্রথম দারুণ কষ্ট পেয়েছে জোহন। ভিক্ষে করার অভ্যাস নেই; লোকের কাছে হাত পাততে পারত না। ইরানিদের হোটেলে, নইলে উদিপিদের লাঞ্চহোমের সামনে গিয়ে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। দয়া-টয়া হলে কেউ এক-আধ টুকরো ছুড়ে দিত; কেউ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাড়িয়ে দিত।

কিছুদিন পর জোহনের মনে হয়েছিল, এভাবে বাঁচা যাবে না। তার একটা ছোট মাউথ অর্গান ছিল। বাবা যখন পিচ গলিয়ে স্টোন চিপ্‌স্ মিশিয়ে রাস্তায় ঢালত, কিংবা মেরামতের জন্য গাঁইতি দিয়ে পুরোনো পিচের আস্তর তুলে ফেলত, তখন একধারে বসে মাঝে-মাঝে আপন মনে মাউথ অর্গানটা বাজিয়ে যেত জোহন। বাবার মৃত্যুর পর বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল, নাকি নিজেরই মাথা থেকে ওটা বেরিয়েছিল, মনে নেই। জোহন মাউথ অর্গানে হিন্দি ছবির গান বাজিয়ে ফুটপাথে-ফুটপাথে ঘুরে বেড়াত। মোটামুটি ভালোই বাজাত সে। দোকানদার-টোকানদাররা তাকে ডেকে গণ্ডা-গণ্ডা মশলাদার হিন্দি ছবির গানের সুর শুনে পয়সা-টয়সা দিত। ফুটপাথে ঘুরতে-ঘুরতে পায়ধুনির কাছে এক ব্যান্ডপার্টির মালিকের নজরে পড়ে গিয়েছিল জোহন। সেই বাজনার দলটা—'শবনম ব্যান্ডপার্টি' এবং তার মালিক মুর্তাজা সাহেব আর নেই। মুর্তাজা সাহেব মারা যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যান্ডপার্টি উঠে গেছে। তবে এই লোকটির কাছে জোহন আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

মুর্তাজা সাহেবের কানটা ছিল দারুণ সজাগ। জোহনের মাউথ অর্গান শুনেই সে বুঝেছিল, ছোকরার দমে সুর আছে; তালিম দিলে ভালোই দাঁড়াবে। সে ডেকে বলেছিল, 'কার কাছে বাজাতে শিখেছিস?'

জোহন বলেছিল, 'কারও কাছে না; নিজে-নিজেই শিখেছি।'

'বহুত আচ্ছা। গান শুনলেই সুর তুলতে পারিস?'

'পারি।'

'তোল দেখি—' বলে তখনকার দিনের একটা চটকদার ছবির গানের দু-কলি গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল মুর্তাজা সাহেব।

দু-চারবার চেষ্টা করেই মাউই অর্গানে গানটা বাজিয়ে দিয়েছিল জোহন।

মুর্তাজা সাহেব দারুণ অবাক এবং খুশিও। জোহনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, 'শাবাশ বেটা, তুই দেখছি আসলি সোনা, পাক্কা চব্বিশ ক্যারেট।'

তখনই খাবারের দোকান থেকে পেস্তা-কিসমিল লাগানো বম্বে হালুয়া, মোতিচুর আর ছোলার ডালের লাড্ডু আনিয়ে খাইয়েছিল।

খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গল্পও চলছিল। জোহনের কে-কে আছে,কোথায় থাকে, ইত্যাদি শোনবার পর মুর্তাজা সাহেব আরও খুশি। বলেছিল, 'তোর আর কাটন গিরিনের (কটন গ্রিনের) গুদামে ফিরতে হবে না। আমার দলে তুই ভিড়ে যা।'

জোহন জিগ্যেস করেছিল, 'আপনার দলে কী করতে হবে?'

'ফুলুট (ফ্লুট) বাজাবি। আমার একটা ফুলুটবালা দরকার।'

'আমি কি পারব?'

'জরুর পারবি। তোর খুনে সুর আছে; যা বাজাবি তাতেই সুর বেরুবে। তা ছাড়া আমি তো আছি।'

সুতরাং সেদিন সেই মুহূর্তে 'শবনম ব্যান্ডপার্টি'-তে ঢুকে গিয়েছিল জোহন। সেই যে একবার সে বাজনার দলে ঢুকল তারপর আর বেরুনো গেল না। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছরে ষোলো-সতেরোটা দল ঘুরে এখন সে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-তে এসেছে। সব চাইতে বেশিদিন এখানেই তার কাটল। ছ-সাত বছর ধরে জোহন এই দলটায় আছে। দল উঠে না গেলে, ব্যান্ডমাস্টার-কাম-প্রোপ্রাইটর

ইফতিকার সাহেব কিংবা সে মরে-টরে না গেলে এ-দলটা সে ছাড়ছে না।

পায়ধুনিতে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র অফিসে জোহন যখন পৌঁছল, আটটা বেজে গেছে। ফার্স্ট ট্রেন ধরে সাড়ে ছ'টার মধ্যে তার এখানে পৌঁছবার কথা ছিল। তার মানে পুরো দেড়টি ঘণ্টা লেট।

দলের আর সবাই, যারা সাইড ড্রাম, বিগ ড্রাম এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজায় তারা এসে গেছে। ব্যান্ডমাস্টার-কাম-প্রোপ্রাইটর ইফতিকার সাহেব ছটফট করছিল আর ঘন-ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কলপ মাখার জন্য চুল, জুলপি এবং ছুঁচলো দাড়ি লালচে হয়ে গেছে। বেশ শৌখিন মানুষ। বাজাবার সময় ছাড়া চুস্ত আর লক্ষ্ণৌর কলিদার পাঞ্জাবি পরে। গা থেকে ভুর ভুর করে আতরের গন্ধ বেরোয়, চোখে সুর্মার সরু টান।

এমনিতে লোকটা চমৎকার—ভোলাভালা, বিরাট দিল তার। পয়সা নিয়ে দলের বাজনাদারদের সঙ্গে খ্যাচাখেচি করে না। তবে প্রচুর পরিমাণে ব্যাওড়া এবং ঠার্‌রা (দুটোই দেশি চোলাই মদ) খেয়ে থাকে সে। চোখদুটো সর্বক্ষণ আরক্ত, মুখ থেকে ভক-ভক করে গন্ধ বেরুতে থাকে। নেশায় যাতে বেশিক্ষণ ইন্টারভ্যাল না পড়ে, সেজন্য সবসময় তার পকেটে একটা ঠার্‌রার বোতল মজুত থাকে।

এ-লাইনের সবাই ড্রিংকটা করে থাকে। ইফতিকার সাহেবও করে। ওটা এমন কিছু ব্যাপারই না।

সে যাকগে, লোকটা এমনিতে ভালো ঠিকই, কিন্তু কাজকর্মের গাফিলতি করলে তার মাথার ঠিক থাকে না; তখন দারুণ খেপে যায়। ইফতিকার সাহেবের কথা হল, আগে কাম, পরে আরাম।

জোহনকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইফতিকার সাহেব। হাত-পা ছুড়ে সমানে চেঁচাতে লাগল। খই ফোটার মতো চড়বড় করে তার মুখ থেকে এক ঝলক খিস্তি বেরিয়ে এল।

জোহন চুপ করে রইল। এই খিস্তির সময়টা কেউ টুঁ শব্দটি করে না। বাধা দিলেই খিস্তির মাত্রা বেড়ে যাবে। তাতে অকারণ সময় নষ্ট। তা ছাড়া ব্যান্ডপার্টির সকলেই জানে, গালাগালটা সে মন থেকে দেয় না। মনটা তার ধবধবে সাদা।

তোড়ে একচোট খিস্তি দিয়ে ইফতিকার সাহেব চুপ করল। হাওয়া বেরিয়ে গেলে বেলুনের অবস্থা যেরকম হয়, এখন তাকে অনেকটা সেইরকম দেখাচ্ছে। আসলে খিস্তির মুখে তার উত্তেজনা রাগ, সব বেরিয়ে গেছে। আর ওটা একবার বেরিয়ে গেলেই সে একেবারে মাটির মানুষ।

ইফতিকার সাহেব ব্যাওড়া-ঠার্‌রা যে পরিমাণে সেবা করে থাকে, সেই পরিমাণেই পান-জর্দা খায়। দু-তিন খিলি পান এবং এক খাবলা জর্দা একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে-চিবুতে নরম গলায় বলল, 'এখানে আয়—'

জোহন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, 'ফাস টিরেন (ফার্স্ট ট্রেন) ধরে তোর আসার কথা; এত দেরি করলি?'

এক মিনিট আগে ক্ষিপ্তের মতো ইফতিকার সাহেবই যে খিস্তি করছিল, তার গলার স্বর শুনে এখন তা বুঝবার উপায় নেই।

জোহন বলল, 'কী করব, ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম যে—'

'কীসের ঝামেলা?'

এত লোকের সামনে মেরির কথা বলা ঠিক হবে না। বললে, সবাই একসঙ্গে হামড়ে পড়বে। জোহন শুধু বলল, 'তোমাকে পরে বলব চাচা।'

ইফতিকার সাহেব আর কিছু জিগ্যেস করল না। নিজের থেকে না বললে খুঁচিয়ে কিছুই সে জানতে চায় না। অকারণ কৌতূহল তাব নেই। সে বলল, 'ঝামেলায় পড়েছিস, আগে

বলিসনি কেন?'

'তুমি বলতে দিলে কোথায়? আমাকে দেখেই তো খিস্তি ঝাড়তে শুরু করলে।'

পাশ থেকে খড়কে তুলে নিয়ে দাঁত খুঁটতে-খুঁটতে সরল নিষ্পাপ শিশুর মতো হাসল ইফতিকার সাহেব। বলল, 'তা বটে, তা বটে—' বলতে-বলতেই তার চোখের দৃষ্টি আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কর্কশ গলায় সে বলল, 'অ্যাই হারামি, ড্রেসে এগুলো কী লাগিয়েছিস? কীসের দাগ ওগুলো?'

চমকে জোহন লক্ষ্য করল, আঙুল বাড়িয়ে তার ড্রেসে রক্তের ছ্যাকরা-ছ্যাকরা দাগগুলো দেখাচ্ছে ইফতিকার সাহেব। জোহন উত্তর দেবার আগেই আরেকবার লাফিয়ে উঠল সে। হাত-পা ছুড়ে খানিক আগের মতো তোড়ে গালাগাল দিয়ে যেতে লাগল, 'দেড়শো টাকা দিয়ে কাল নয়া ড্রেস বানিয়ে দিয়েছি, আজই হারামি বরবাদ করে দিলি! এ শালে কুত্তা, এ উল্লুকা পাঠ্ঠে—'

ব্যান্ডপার্টির ড্রেস মালিকরাই দিয়ে থাকে। অন্য দলের প্রোপ্রাইটররা এ-বাবদে কিছু-কিছু ভাড়া নিয়ে থাকে। ইফতিকার সাহেব কিন্তু সিকি পয়সাও নেয় না। যাই হোক চুপচাপ ইফতিকার সাহেবের নতুন খিস্তিগুলো শুনে যেতে লাগল জোহন।

কিছুক্ষণ বাদে উত্তেজনা কেটে গেলে ইফতিকার সাহেব আর-এক দফা পান-জর্দা মুখে পুরল। চিবুতে-চিবুতে কোমল গলায় বলল, 'দাগগুলো তো ইচ্ছে করে লাগাসনি। নিশ্চয় কিছু হয়েছিল, তাই না রে?'

'হাঁ।

'ইচ্ছে করে যে লাগাসনি, এ-কথাটা আগে বলিসনি কেন?'

'তুমি কি আগে কারওকে কিছু বলতে দাও চাচা?'

জোহনের পিঠে চাপড় মারতে-মারতে শব্দ করে হেসে উঠল ইফতিকার সাহেব, 'ঠিক বলেছিস।'

জোহন চুপ করে রইল।

ইফতিকার সাহেব এবার বললেন, 'দাগটা কী করে লাগল, বল—'

'পরে শুনো।'

'আচ্ছা। এখন তাহলে রিহার্সাল দিতে চল—'

ব্যান্ডপার্টির অফিসটার ঠিক পেছনেই অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া একটা চালা আছে; চারদিক অবশ্য খোলা। এটাই 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র রিহার্সাল রুম। সবাইকে নিয়ে ইফতিকার সাহেব সেখানে চলে এল। বাজনদারদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আসছে হপ্তায় কর্পোরেশনের যে ভোট হয়েছে, তার রিজাল (রেজাল্ট) বেরুবে।' তারপর একটা রাজনৈতিক দলের নাম করে বলল, 'ওই পার্টির পাটিল সাহেব আমাদের ব্যান্ডপার্টি বায়না করে গেছে। রিজালেব দিন উনি জিতলে জুলুস বেরুবে। জুলুসের আগে-আগে আমাদের বাজিয়ে যেতে হবে। এখন একটা কথা—'

পাটিল সাহেব অর্থাৎ মাধবরাও পাটিলকে জোহনরা ভালো করেই চেনে। এর আগেও ওঁর পার্টির নানা বিজয়োৎসবে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি' বাজিয়ে এসেছে। সমস্বরে সবাই বলে উঠল, 'কী কথা?'

'পুরোনো যেসব গান আছে ওতে চলবে না। নয়া মশালাদার ফিল্মি গানের সুর বাজাতে হবে।'

'কোঈ বাত নেহী। নয়া গানার সুরই বাজাব। কী বাজাতে হবে বলো।'

পকেট থেকে একগাদা হিন্দি ছবির বুকলেট বার করে ইফতিকার সাহেব তিনটে গান পড়ল —'প্রেমনগর হ্যায় আপনা', 'ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি' এবং 'হাম তুম এক কামরেমে বন্ধ হো'— পড়া হয়ে গেলে বাজনদারদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই গান ক'টা আমি পসন্দ্ করেছি; তোরা

কী বলসি?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফাস কিলাস (ফাস্ট ক্লাস)।'

ইফতিকার সাহেব দারুণ খুশি। কেন না তার নির্বাচিত গানগুলো সবারই ভালো লেগেছে। সে বলল, 'তোরা একটু দাঁড়া, আমি দু-মিনিটের মধ্যে আসছি।'

কিছুক্ষণ বাদে ব্যাটারি-দেওয়া একটা রেকর্ডপ্লেয়ার আর রেকর্ড নিয়ে এল ইফতিকার সাহেব। প্লেয়ারটা চালিয়ে 'ঝুম বরাবর' গানটা প্রথমে কয়েকবার শুনিয়ে দিল। তারপর সবার কানে যখন গানটা বসে গেছে তখন বলল, 'সুরটা তুলে ফেল—' বলেই একটা বিগ ড্রাম বুকের কাছে ঝুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, 'রেডি, ওয়ান টু থ্রি—'

কর্নেটওলা, ক্লারিওনেটওলা, ড্রাম-ব্রাসওলারা আস্তে-আস্তে যে-যার বাদ্যযন্ত্রে সুরটা বাজাতে লাগল। পুরো গানটা তুলতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সিজনের সময় অর্থাৎ বিয়ে কিংবা উৎসবের মরশুমে যেদিন-যেদিন কোথাও বাজাবার অর্ডার থাকে না, সেই দিনগুলো ইফতিকার সাহেব দলের লোকদের নিয়ে নতুন গানের রিহার্সাল দেয়। এজন্য সবাইকে পুরো দিনের মজুরি দিয়ে থাকে সে।

আজ কোথাও বাজাবার বায়না নেই; তাই নতুন গানের রিহার্সাল দিচ্ছে ইফতিকার সাহেব। একটা গান তুলবার পর সে বলল, 'দুপুর হয়ে গেছে, যা তোরা খেয়ে-টেয়ে আয়। দুটোর সময় আবার রিহার্সাল শুরু করব। আজকের মধ্যে বাকি গান দুটো তুলে ফেলতেই হবে। কাল থেকে একটানা পনেরো দিন রোজ বায়না আছে। সুরগুলো তুলে না নিলে আসছে হপ্তায় ভোটের রিজালের দিন নতুন গান বাজানো যাবে না।'

বাজনদারেরা নিজের পছন্দমতো হোটেলে খেতে চলে গেল। যোহন গেল উদিপিদের লাঞ্চ হোমে; ওখানে সস্তায় পেট ভরে খেতে পাওয়া যায়। তবে সব খাবারই ওখানে নিরামিষ; উদিপিদের হোটেলে মাছ-মাংসের কারবার নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁটায়-কাঁটায় দুটোয় রিহার্সাল শুরু হল। বাকি গানদুটো তুলতে সন্ধে হয়ে গেল।

গান-টান তোলা হলে বাজনদারেরা যে যার মজুরি নিয়ে নিল। ব্যান্ডপার্টিতে সবাই এক মজুরি পায় না। বাদ্যযন্ত্রের গুরুত্ব অনুযায়ী কম-বেশি পেয়ে থাকে। যারা ক্ল্যারিওনেট বা ফ্লুট বাজায়, তারা ড্রামওলাদের চাইতে বেশি মজুরি পায়। সেদিক থেকে জোহন দলের সবচেয়ে দামি আর্টিস্টদের একজন।

মজুরি নিয়ে একে-একে অন্য বাজনদারেরা চলে গেল। জোহন কিন্তু গেল না। সে মজুরিও নেয়নি। ইফতিকার সাহেব বলল, 'তোর টাকাটা নে। অফিস বন্ধ করে আমাকে বেরুতে হবে।'

তাকে বেশ চনমন করতে দেখা গেল।

জোহন ইফতিকার সাহেবের এই চনমনে ভাবটার কারণ জানে। লোকটা বিয়ে টিয়ে করেনি, তাই বলে ঝাড়া হাত-পা ফকির-টকির নয়। কোলাবার ওদিকে তার বাঁধা একটি মেয়েমানুষ আছে। যেদিন কোথাও বাজাবার বায়না থাকে না, সেদিন আরব সাগরে সূর্য ডুবতে-না-ডুবতেই ইফতিকার সাহেব কানে আতর দিয়ে, লক্ষ্ণৌয়ের কলিদার পাঞ্জাবিটি চড়িয়ে, চোখে সুর্মাটি টেনে, ছুঁচলো দাড়ি আর গোঁফ চুমরোতে-চুমরোতে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসে; তারপর সিধে কোলাবা। একটা সেকেন্ডও তখন তাকে আটকে রাখা যায় না।

জোহন বলল, 'বাহ্, এখন যাবে কী, আমার ঝামেলার কথা শুনবে না?'

এবার মনে পড়ে গেল ইফতিকার সাহেবের। বলল, 'হাঁ-হাঁ বল, তবে একটু তাড়াতাড়ি করিস। দেরি করে গেলে আওরতটা আবার হুজ্জুত করে।'

ইফতিকারের মেয়েমানুষের কথা সবাই জানে। নিজেই রসিয়ে-রসিয়ে সকলকে সে বলেছে।

এ-বিষয়ে তার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই।

জোহন মেরির ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানিয়ে বলল, 'এবার বুঝলে তো, সকালে আসতে কেন দেরি হয়েছিল আর ড্রেসে কেন দাগ লেগেছিল।'

দেরি হওয়া বা ড্রেসে দাগ লাগা, এ-সব কানে যায়নি ইফতিকার সাহেবের। মেরির নাম শুনেই তার চোখ গোলাকার হয়ে গিয়েছিল। এক গাদা পান জর্দা মুখ ছুড়ে দিয়ে চিবুতে-চিবুতে বলল, 'যাক অ্যাদ্দিনে তোর একটা হিল্লে হল। শাদি করলি না, বাঁধা আওরত রাখলি না। ঠার্রা গিলে আর ফ্লুট মুখে পুরে জিন্দেগি বরবাদ করে দিলি। যেভাবেই হোক তোর ঝোপড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকে পড়েছে। আমার কী ইচ্ছে করছে জানিস?'

সন্দিগ্ধ চোখে ইফতিকার সাহেবের দিকে তাকালো জোহন। বলল, 'কী?'

'নাঙ্গা হয়ে পুরা বড়ী বন্দর, মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিল্স্ আর ওরলি ঘুরে আসি।'

'যাঃ, তোমাকে নিয়ে শালা পারা যায় না।'

ইফতিকার সাহেব হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল, 'লড়কি একবার যখন ঢুকে পড়েছে আর বেরুতে দিস না। শাদি ফাদি করে যদি আটকে ফেলতে পারিস, বিশ টাকার জায়গায় পঁচিশ টাকা মজুরি করে দেব।'

কাঁধ এবং হাত ঝাঁকিয়ে হতাশভাবে জোহন বলল, 'সব কথায় তোমার খালি মাজাক।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন আমাকে ছেড়ে দে। তোর মেরি ভালো হয়ে উঠলে ভেবেচিন্তে কিছু একটা করা যাবে। এক্ষুনি আমার না বেরুলেই নয়। আওরতটা চটে গেলে দরজা খুলবে না। তামাম রাত বাইরে বসে থাকা এই বুড্ঢা বয়েসে পোষায়? এই নে তোর মজুরি—' বলে কুড়িটা টাকা বাড়িয়ে দিল সে।

জোহন টাকাটা নিতে-নিতে দ্রুত একবার ভেবে নিল। কাল মজুরির যে বিশ টাকা পেয়েছিল, তার সবটাই খরচ হয়ে গেছে। হাতে একটা পয়সাও আর নেই। আজকের মজুরির টাকাটা অবশ্য আছে। কিন্তু মেরির জন্য ওষুধ, ইঞ্জেকশান এবং ফল-টলের খরচা রয়েছে। কুড়িটা টাকা নিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঝোঁকের মাথায় মেয়েটাকে ঘরে এনে ঢুকিয়েছে, কতদিন ভোগাবে কে জানে। যতদিনই ভোগাক, এখন আর বার করে দেওয়া যাবে না। কী ঝঞ্ঝাটেই যে পড়া গেছে! জোহন ভেবে দেখল, কিছু বাড়তি টাকা হাতে থাকা ভালো। মেরির জন্যে কখন কী দরকার হবে কে জানে।

নিজের জন্য কখনও ভাবে না জোহন। তার জমানো একটা পয়সাও নেই। কাল কী খাবে, কীভাবে চলবে, এসব নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। মোটামুটি আজকের দিনটা চলে গেলেই হল। কালকের কথা কালকে ভাবা যাবে। আসলে সে নিজের সম্বন্ধে খুবই উদাসীন। অথচ ব্যান্ডপার্টিতে ফ্লুট বা ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে কম পয়সা কামায় না সে। রোজ এক বোতল ঠার্রা আর দু-বেলা উদিপি কি সিন্ধিদের হোটেলে খেতে কত আর লাগে। বাকি পয়সা সে লোককে দিয়ে দেয়। ঝোপড়পট্টির বাসিন্দা বা ব্যান্ডপার্টির বাজিয়েরা কতবার তার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছে, জোহনের খেয়াল নেই। হাত পাতলেই হল, পকেটে পয়সা থাকলে সে কারওকে ফেরায় না। আর কেউ একবার নিলে ফেরত দেবার নাম নেই। অবশ্য ফেরত পাবার আশা কখনও করে না জোহন।

আজ কিন্তু মেরির কথা ভেবে, টাকার চিন্তা করতে হল জোহনকে। সে বলল, 'চাচা একটা কথা বলছিলাম—'

ক্যাশবাক্সে আর বাদ্যযন্ত্রের আলমারিতে তালা লাগাতে-লাগাতে ইফতিকার সাহেব বলল, 'বলে ফেল।'

'আমাকে পঞ্চাশটা টাকা অ্যাডভান্স দাও। পাঁচ টাকা করে রোজ মজুরি থেকে কেটে নিও।'

কুড়ি-বাইশ বছর 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-তে বাজিয়ে যাচ্ছে জোহন। আগাম টাকা কখনও

সে চায়নি। ঘাড় ফিরিয়ে একটু অবাক হয়েই ইফতিকার সাহেব বলল, 'অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে কী হবে?'

কারণটা বলল জোহন।

আবার ক্যাশবাক্স খুলে পঞ্চাশটা টাকা জোহনকে দিতে-দিতে ইফতিকার সাহেব মুখ মুচকে হাসল। চাপা গলায় বলল, 'দরদ! শালা বিলকুল খতম হয়েগেছিস। ও লড়কি পুরা জিন্দগি তোর কাঁধেই চেপে থাকবে। কথাটা বলে রাখলাম, মনে করে রাখিস।'

জোহন বলল, 'এরকম বলে-বলে তুমিই আমাকে খতম করবে।' বলে আর দাঁড়াল না।

ব্যান্ডপার্টির অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে ক্রফোর্ড মার্কেটের পেছনে চলে গেল জোহন। সেখানে পাকস্থলী বোঝাই করে ঠার্‌রা খেয়ে মার্কেট থেকে মেরির জন্য আঙুর, মুসম্বি আর চিকু কিনল। তারপর ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে গিয়ে হারবার লাইনের ট্রেনে উঠে বসল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন সে ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টিতে তার ঘরটিতে পৌঁছল তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। ঠার্‌রার নেশাটা রক্তের ভেতর ঝুমঝুম করছিল, পা অল্পস্বল্প টলছিল; তবে মাথাটা পরিষ্কার আছে। এক বোতল ঠার্‌রা তার কাণ্ডজ্ঞান ঝাপসা করে দিতে পারেনি।

ঝোপড়িতে আলো জ্বলছিল। মেরি দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে; সোমবারি একটা আধভাঙা টুলের ওপর বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। জোহন ঢুকতেই সোমবারি উঠে পড়ল। বলল, 'এই যে ফ্লুটবালা, সন্ধেবেলা ফেরার কথা, এত দেরি করলে?'

ফলের ঠোঙাগুলো একধারে নামিয়ে রেখে জোহন বলল, 'রিহার্সাল ছিল, অনেগুলো গান তুলতে হয়েছে, তাই দেরি হয়ে গেল।'

'ঠিক আছে। সারাদিন তোমার জিনিস পাহারা দিয়েছি, নিজের মাল বুঝে নাও।'

মেরিকে দেখিয়ে-দেখিয়ে কথাটা বলল সোমবারি। জোহন হাসল।

সোমবারি এবার বলল, একটু আগে ডাক্তারসাব এসে সুঁই (ইঞ্জেকশান) দিয়ে গেছে। আর তুমি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলে, তার থেকে পাও, দুধ আর সান্তারা কিনে মেরিকে খাইয়েছি। দু-টাকা আশি পয়সা খরচা হয়েছে। বিশ পয়সা রয়েছে, এই নাও। এবার আমাকে যেতে হবে।' কুড়িটা পয়সা জোহনের হাতে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সোমবারি।

জোহন বলল, 'এখনই যাবে?'

'সেই সকাল থেকে তোমার ঝোপড়িতে বসে আছি। আমার ঘর-সংসার নেই! সেই লোকটা ঘোড়ার জুয়া খেলে এসে এখন নিশ্চয়ই লাফাচ্ছে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

চোখ মটকে হাসল সোমবারি। অশ্লীল একটা ছড়া কেটে চাপা গলায় বলল, 'তুমি এসে গেছ। এখন আমি থাকলে তোমার ভালো লাগবে না ফ্লুটবালা। ফাঁকা ঘরে দুজনে এবার টমটম চালিয়ে যাও।'

জোহন বলল, 'মাজাক করছ!'

ডাইনে-বাঁয়ে জোরে-জোরে মাথা নাড়ল সোমবারি। চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে হাসতে লাগল, 'মাজাক না, সচ্ বলছি!'

কথা বলতে-বলতে ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। জোহন এবার জিগ্যেস করল, 'মেয়েটাকে কেমন দেখলে ভাবী?'

'একেবারে আনারের দানা। বহুত ভারী জখম হয়ে আছে। দেখ ফ্লুটবালা, আজ রাত্তিরেই ওকে আবার খেয়ে ফেল না।'

'ফির মাজাক।'

সোমবারি হাসতে লাগল।

জোহন বলল, 'মেয়েটার কথা কিছু জানতে পারলে?'

সোমবারি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী কথা?'

'এই কোথায় থাকে, কী করে এখানে এল, ওই লোকগুলো ছুরি মেরেছে কেন—এই সব?'

'করেছিলাম।'

দারুণ আগ্রহের সঙ্গে জোহন জিগ্যেস করল, 'কী বললে?'

সোমবারি বলল, 'কিচ্ছু না। আমাকে বোধহয় বলতে চায় না। তুমিই ওগুলো জেনে নিও।'

একটু চুপ করে থেকে জোহন বলল, 'সারাদিন একসঙ্গে রইলে। মুখ বুঁজে তো আর থাকোনি। কী কথা হল তবে?'

'স্রিফ তোমার কথা। তুমি ওর জান বাঁচিয়েছ, এই কথাটা হাজার বার বলেছে মেরি। আচ্ছা যাই—' ঝোপড়পট্টির আঁকাবাঁকা গলির ভেতর দিয়ে সোমবারি চলে গেল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জোহন। তারপর ঘরে ফিরে আসতেই মেরির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। এখন মেয়েটাকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে। রক্তপাতজনিত চোখমুখের সেই অসুস্থ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। জোহন জিগ্যেস করল, 'এখন কেমন লাগছে?'

মেরি বলল, 'ভালো।'

'ওষুধগুলো সময়মতো খেয়েছিলে তো?'

'হাঁ।'

'ভাবী তোমাকে রাত্তিরের খাবার খাইয়ে দিয়ে গেছে?'

'হাঁ।'

মেরির খাওয়ার কথায় জোহনের মনে পড়ল, তার নিজেরই খাওয়া হয়নি এ-বেলা। অন্য দিন হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেরে সে।

যাক গে, পাঁউরুটি টুটি কিনে নিয়ে এসেছে। একটা রাত ওতেই চলে যাবে। মেরিকে আপাতত আর কিছু না বলে পায়জামা আর গেঞ্জি নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেল জোহন। ব্যান্ডপার্টির ড্রেসটা বদলে একটু বাদে আবার ঘরে এসে ঢুকল। ড্রেসটা কোণের দড়িতে ঝুলিয়ে মেরির কাছাকাছি সেই আধভাঙা টুলটায় গিয়ে বসল।

মেরি কী ভাবছিল, হঠাৎ বলল, 'আমি এখানে এলাম কী করে?'

সকালেও এই প্রশ্নটা করেছিল সে। জোহন তখন উত্তরটা দেয়নি, এবার দিল। কীভাবে কোন অবস্থায় রাস্তা থেকে মেরিকে তুলে এনেছিল, সব জানালো।

মেরি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গাঢ় কৃতজ্ঞ সুরে বলল, 'রাস্তা থেকে তুমি তুলে না আনলে মরে যেতাম।'

যোহন লক্ষ্য করল, মেয়েটা তাকে 'তুমি' করে বলছে। সে ব্যান্ডপার্টিতে ফ্লুট বাজায়। সে শরাবি এবং ঝোপড়পট্টিতে থাকে, খুব সম্ভব তাকে এর বেশি মর্যাদা দেবার কথা ভাবছে না মেরি। জোহন কিছু বলল না।

মেরি আবার বলল, 'না আনলেই ভালো করতে। মরতে পারলে বেঁচে যেতাম।'

জোহন বলল, 'কেন?'

মেরি উত্তর দিল না।

একটু ভেবে জোহন জিগ্যেস করল, 'ওই লোক দুটো কারা?'

মেরি বুঝতে পারল যারা তাকে ছুরি মেরেছে, তাদের কথা জানতে চাইছে জোহন। সে বলল, 'ওরা বদমাশ, ডাকু, গুন্ডা, ফরেবি—'

এক নিশ্বাসে এতগুলো শব্দ উচ্চারণ করে উত্তেজনায় সে হাঁপাতে লাগল।

মাথার ভেতর ঠার্‌রার নেশাটা ফিকে হয়ে আসছিল জোহনের। সে একটু অবাক হয়ে বলল, 'ওরা তোমায় পেল কি করে?'

মেরি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল না, চোখ দুটো অন্যদিকে ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল। জোহন আবার বলল, 'কী হল, বললে না?'

মেরি মুখ ফেরাল না। একইভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে-মনে উত্তরটা ঠিক করে নিল হয়তো। তারপর বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তোমার কাছে লুকোব না, আমি খারাপ মেয়ে।'

হতভম্বের মতো মেরিকে দেখতে-দেখতে জোহন বলল, 'খারাপ মেয়ে! মানে?'

একটু চুপ করে থেকে মেরি বলল, 'পেটের জন্যে আমাকে নোংরা রাস্তায় নামতে হয়েছে।'

এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। এই বোম্বাই শহরে হাজার-হাজার মেয়ে পেটের জন্য শরীর বেচে বেড়াচ্ছে, জোহন সে খবর রাখে। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, নরিম্যান পয়েন্ট কি জুহুতে দশ গজ হাঁটলেই পাঁচটা করে এরকম মেয়ে চোখে পড়বে। সাজসজ্জা, চাউনি ইত্যাদি দেখেই তাদের আসল পরিচয়টা টের পাওয়া যায়। কিন্তু জোহনের একটা কথা ভেবে অদ্ভুত লাগছিল, যে-মেয়েরা শরীর বেচে খায়, তাদের কেউ মেরির মতো এভাবে নিজের নোংরা গ্লানিকর পেশার কথা বলে না। সেদিক থেকে মেয়েটা খুবই অকপট, কিংবা হয়তো নির্বিকার আর বেপরোয়াও। এমন সরল স্বীকারোক্তি শোনবার পর কী বলা উচিত, জোহন ভেবে পেল না।

মেরি বলতে লাগল, ওই বদমাশ দুটো কথাবার্তা ঠিক করে আমাকে ডাঙার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন কী জানতাম ওদের মতলব অন্যরকম। সমুদ্রের দিকে আসতে-আসতে অন্ধকার রাস্তায় আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, টাকাপয়সা আর একটু-আধটু গয়না যা গায়ে ছিল কেড়ে-কুড়ে নিতে লাগল। আমি দিতে চাইনি, হাত-পা ছুড়ে চেঁচিয়ে ওদের ঠেকাতে চেয়েছিলাম। ওরা তখন সোজা ছুরি চালিয়ে দিল।

কোনও ব্যাপারেই তেমন আকর্ষণ নেই জোহনের, দারুণ উদাসীন আর নিস্পৃহ টাইপের মানুষ সে। পৃথিবীর বাইরের স্তরে আলতোভাবে ভেসে থাকে। কোনও কিছুতেই অভিভূত হয়ে পড়ে না।

ঠার্‌রার নেশাটা ক্রমশ আরও ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল এমন পবিত্র-নিষ্পাপ চেহারার মেয়েটা বেশ্যা না হলেই ভালো হতো। বুকের ভেতর আবছাভাবে একটু কষ্ট অনুভব করতে লাগল জোহন।'

কথা বলতে-বলতে জোহনের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গিয়েছিল মেরি। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কী ভাবছ?'

জোহন দূরমনস্কর মতো বলল, 'কিছু না তো।'

'খুব ঘেন্না হচ্ছে?' মেরির গলা এবার চাপা এবং গভীর।

জোহন প্রায় চমকে উঠল, 'ঘেন্না হবে কেন?'

'একটা নোংরা খারাপ মেয়ে ঘরে এনে তুলেছ বলে।'

'এসব তুমি কী যা-তা বলছ।'

মেরি হাসল। একটু পরে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী?'

'আমি বাজে মেয়ে, এটা আগে জানলে নিশ্চয়ই রাস্তা থেকে তুলে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিতে না!'

জোহন বলল, 'তোমার এ-কথাটা ভেবে দেখিনি। যে-ই হোক, রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখলে তুলে নিয়ে আসতাম।'

মেরি উত্তর দিল না, পলকহীন স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

জোহনের হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বলল, 'সকালবেলা তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি।'

'কী?'

'তুমি যে জখম হয়ে আমার এখানে আছ, এ-খবরটা কারওকে দিতে হবে?'

'কাকে দেবে?'

জোহন একটু ভেবে বলল, 'এই ধরো তোমার বাবা-মাকে।'

মেরি বলল, 'আমার বাপ-মা নেই।'

'তবে আর কেউ—ভাই, বোন, দাদা, মাসি।'

'আমার কেউ নেই।'

একটু চুপ। তারপর জোহন জানতে চাইল, 'তুমি কোথায় থাকো?'

মেরি পাশ ফিরে তাকাল, 'কেন?'

'সেখানে নিশ্চয়ই তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

জোহনকে বেশ চিন্তান্বিত দেখাল।

মেরির মুখে বিষণ্ণ ছায়ার মতো কিছু একটা পড়ল যেন। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ, রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল সে।

জোহন বলল, 'হাসছ যে?'

'তোমার কথা শুনে। মেয়েমানুষের মাংস না কামড়ালে যাদের চলে না—তেমন কতকগুলো শরাবি, লুচ্চা ছাড়া কেউ আমার খোঁজ করে না। আমার কথা যারা সত্যি-সত্যি ভাবত, তারা কেউ বেঁচে নেই।'

বিমূঢ়ের মতো বসে রইল জোহন, তার গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল শুধু।

কী ভেবে মেরি এবার বলল, 'আমার থাকার কিছু ঠিক নেই। রাত্তিরে যে আমাকে ধরে নিয়ে যায়, তার কাছেই থাকি। দিনটা নিয়েই যত ভাবনা। হাতে কিছু পয়সা জমলে কেরানি ছুকরিদের যে হোস্টেল আছে সেখানে চলে যাই। নইলে সস্তার কোনও হোটেলে। এখন আছি কিং সার্কেল স্টেশনের পাশের ঝোপড়পট্টিতে। সেখানে আর না ফিরলেও কেউ চিন্তা করবে না।'

সুতরাং এ-ব্যাপারে আর কিছু বলার বা জিগ্যেস করার মানে হয় না। বড় একটা হাই তুলে হাতের ভর দিয়ে উঠতে-উঠতে জোহন বলল, 'দারুণ খিদে আর ঘুম পেয়েছে। তোমার তো খাওয়া হয়ে গেছে, আমি একটু খেয়ে নিই।'

মেরি বিব্রতভাবে বলল, 'হাঁ-হাঁ নিশ্চয়ই। দেখ দিকি, এতক্ষণ ধরে আমি বকবক করে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে জোহন পাও আর চিনি দিয়ে দ্রুত রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলল। তারপর একটা হাওয়া-বালিশ আর নোংরা চিটচিটে বিছানার চাদর নিয়ে দরজার দিকে গেল।

মেরি ব্যস্তভাবে বলল, 'এ কী, কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরের বারান্দায়।'

'কেন?'

'ওখানে শোব।'

'বাইরে শোবে কেন?'

'এই মানে—'

চট্ করে মানেটা বুঝে নিয়ে মেরি বলল, 'ও, আমি আছি বলে—'

জড়ানো গলায় আবছাভাবে কী বলল জোহন, বোঝা গেল না।

মেরি এবার বলল, 'তুমি তো আমাকে ভারী বিপদে ফেললে।'

জোহন বলল, 'কেন?'

'তুমি ঘরবালা হয়ে বাইরে শোবে, আর আমি কোত্থেকে উড়ে এসে তোমার ঘরে জুড়ে বসলাম। আমার মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়।'

'আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'কিন্তু বাইরে না গিয়ে ঘরেও তো শুতে পার। এখানে জায়গার অভাব নেই।'

'দশ মাইল দূরে তো আর যাচ্ছি না। দরজার বাইরেই থাকছি। ঘরে শোওয়াও যা, বারান্দায় শোওয়াও তাই।'

তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল জোহন। তারপর বিছানার চাদরটা পেতে হাওয়া-বালিশে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে বাতাস পুরে পরিপাটি একটি বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পাতাদুটো আঠার মতো জুড়ে আসতে লাগল।

ঘুমটা তখনও ভালো করে সারা শরীরে ভর করেনি; আচমকা ঘরের ভেতর থেকে মেরির গলা শোনা গেল, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

জড়ানো গলায় জোহন বলল, 'না।'

'আমার খুব খারাপ লাগছে। তুমি কিন্তু ঘরেই শুতে পারতে।'

'এ-ব্যাপারটা নিয়ে আর ভেবো না। অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ো।'

উত্তর না দিয়ে মেরি বলল, 'বুঝেছি।'

জোহন জানতে চাইল, 'কী?'

'তুমি খুব ভীতু, তা না হলে সাধু-মহাত্মা।'

'আমি কোনওটাই না। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ-কথাটা মনে হল?'

'ভীতু কিংবা সাধু-টাধু না হলে ঘরেই শুতে।'

জোহন উত্তর দিল না।

মেরি আবার বলল, 'তোমাকে বেশি কষ্ট দেব না; একটু হাঁটতে পারলেই আমি চলে যাব।'

একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে উঠেই স্নান-টান সেরে ব্যান্ডপার্টির ড্রেস গায়ে চাপিয়ে জোহন কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে চা বানাল। সেই চা এবং কালকের বাসি পাও নিজে খেল, মেরিকে খাওয়াল। তারপর মেরিকে একটা ট্যাবলেট দিল। এক ঢোক জল মুখে পুরে ঢক করে ট্যাবলেটটা গিলে ফেলল মেরি।

আজ মেরিকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে; কালকের তুলনায় সে অনেক বেশি সুস্থ। জোহন বলল, 'আমাকে এবার বেরুতে হবে। কাল তোমাকে বলেছি আমি ব্যান্ডপার্টিতে ফ্লুট বাজাই। মনে আছে?'

মেরি মাথা নাড়ল, 'আছে।'

'আজ আমাদের ব্যান্ডপার্টি ইগতপুরী যাবে। ওখানে এক কারখানার সিলভার জুবিলি ফাংশান হবে; আমাদের বাজাতে হবে। আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি তো আজ ভালোই আছ। তোমার কাছে লোক থাকার দরকার আছে?'

'না।'

'ঘরে পাও আছে, সান্তারা আছে, আঙুর-আনার আছে—খেয়ে নিও। ভাবীকে বলে যাব, মাঝে-মাঝে এসে তোমার খোঁজ নিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা—'

জোহন বেরুতে যাবে, ঝোপড়পট্টির একগাদা মেয়েমানুষ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে হাজির। মেরির খবরটা এর মধ্যে নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে। এমনিতে এখানে কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামায় না, তবু কৌতূহল বলে বস্তুটা তো সবারই আছে। তাদের আসাটা সেই জন্যই।

পাতলা ছিপছিপে চেহারার একটা মেয়েমানুষ, এখানকার এক মাদারি খেলোয়াড়ের আওরত সে—সবার প্রতিনিধি হয়ে বলল, 'তোমার ঘরে নাকি একটা লড়কি এসে ঢুকেছে ফুলুটবালা?'

জোহন বলল, 'গন্দ পেয়ে গেছ?'

'জরুর।' ভিড়ের ভেতর থেকে সিড়িঙ্গে চেহারার একটি বউ চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'আগ (আগুন) আর কতক্ষণ চাপা দিয়ে রাখবে!'

জোহন হাসল, 'ভেতরে এসো, আলাপ-টালাপ করে যাও।'

মেয়েমানুষগুলো হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ঝুলতে-ঝুলতে বাচ্চাগুলোও এল।

এই ঝোপড়পট্টিতে কে কার ঘরে এল, কে কাকে নিয়ে থাকছে, কে কাকে নিয়ে শুচ্ছে, এসব ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায় না। এখানে যে যার নিজেকে নিয়েই অনবরত চরকিকলে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু ফুলুটবালা জোহনের কথা আলাদা। সবার সঙ্গে তার খাতির, সবাই তাকে পছন্দ করে, বিপদে পড়লে অনেকেই তার কাছে হাত পাতে। সুতরাং তার সম্বন্ধে কারওই মুখ ফিরিয়ে উদাসীন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। বিশ-পঁচিশ বছর যে লোকটা একা-একা ঝোপড়পট্টিতে পড়ে আছে, দুম করে তার ঘরে একটি যুবতী মেয়ে এসে হাজির হলে কৌতূহল হবারই কথা। ঝোপড়পট্টির মেয়েমানুষগুলো তাই ছুটে এসেছে।

জোহন সবার সঙ্গে মেরির আলাপ করিয়ে দিল। এই মেয়েমানুষগুলো কেউ মাদারি খেলোয়াড়ের বউ, কারও ঘরবালা দেওয়ালে-দেওয়ালে সিনেমার পোস্টার সেঁটে বেড়ায়, কারও ঘরবালা সাইনবোর্ড আঁকে, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

সাইনবোর্ড আঁকিয়ের বউ আচমকা প্রশ্ন করল, 'মেরি তোমার কে হয়?'

মেরিকে কোথায় কীভাবে পেয়েছে, সে সব গিল্ডার আর সোমবারিদের কাছে বলেছে জোহন। অবশ্য মেরি যে বেশ্যা, গায়ের মাংস বেচে তার পেট চালাতে হয়, এটা আর বলেনি। বলার সুযোগ হয়নি। কেন না কাল রাতেই মেরির আসল পরিচয়টা জানতে পেরেছে সে; তারপর সোমবারিদের সঙ্গে আর দেখাটেখা হয়নি। অবশ্য দেখা হলেও এ-ব্যাপারটা আপাতত গোপনই রাখবে সে। মেরিকে কী অবস্থায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে এবং সে যে তার সম্পূর্ণ অচেনা, গিল্ডারদের একথা জানিয়েছে জোহন। তার বিশ্বাস গিল্ডাররা ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে এ-খবর চাউর করে বেড়াবে না। কিন্তু মেরি সম্বন্ধে আসল কথাটা এই মেয়েমানুষগুলোকে বলতে জোহনের আটকাল। সাইনবোর্ড আঁকিয়ের বউর প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'ও আমার রিস্তাদার (আত্মীয়) হয়।'

ডাক্তার গিল্ডার এই উত্তরটাই তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল।

'কেমন রিস্তাদার?' সাইনবোর্ড আঁকিয়ের বউর ঘাড়ের পাশ থেকে মাদারি খেলোয়াড়ের বউ গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল।

'এই—' এবার তো ঝামেলায় পড়া গেল। কিন্তু ঘাবড়ে গেলে চলবে না। তা হলেই ধরা পড়ে যাবে, মেরি তার আত্মীয়-টাত্মীয় কিছুই হয় না। চোখ কান বুঁজে সে বলল, 'দূর সম্পর্কের রিস্তাদার।'

মেরির ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ দেখিয়ে পোস্টার সাঁটানোর বউ বলল, 'ওর এই অবস্থা হল কী

করে?'

'অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

একটু চুপচাপ। তারপর জোহনই আবার বলল, 'তোমরা মেরির সঙ্গে গল্প-টল্প করো। আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

কাঠের দেওয়াল থেকে ফ্লুটের বাক্স নামিয়ে কাঁধে ফেলল সে।

মেয়েমানুষগুলো বলল, 'এখন গল্প করার সময় নেই; রান্না-বান্না চড়াতে হবে।'

হুড়মুড় করে যেমন তারা ঢুকেছিল, সেইভাবেই বেরিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে যেতে-যেতে জোহন ঘাড় ফিরিয়ে মেরিকে বলল, 'আমি যাচ্ছি—'

'আচ্ছা—'

বাইরে বেরিয়ে বাঁদিকেব রাস্তা ধরল জোহন। আগে সে যাবে সোমবারিদের ঝোপড়িতে; সেখান থেকে আম্বেদকার রোড ধরে বান্দ্রা স্টেশনে।

মেয়েমানুষগুলো সঙ্গে-সঙ্গেই যাচ্ছিল। ওরা ঝোপড়পট্টির বাঁ-ধারে থাকে। যেতে-যেতে পোস্টার সাঁটানোর বউ হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'একটা সত্যি কথা বলবে ফ্লুটবালা?'

জোহন বলল, 'কী কথা?'

'মেয়েটা তোমার রিস্তাদার হয়, না ভাগিয়ে এনেছ?'

জোহন একেবারে হকচকিয়ে গেল। থতিয়ে-থতিয়ে বলল, 'ধুস, কী যে যা-তা বল।'

কোমর বাঁকিয়ে চুরিয়ে চোখ নাচাতে-নাচাতে মেয়েমানুষটা অশ্লীল শব্দ করে হাসতে লাগল।

জোহন আর কিছু বলল না; লম্বা-লম্বা পায়ে মেয়েমানুষগুলোকে পেছনে ফেলে সোমবারিদের ঝোপড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ছ-সাত দিন কেটে গেল। এর মধ্যে অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে মেরি। বিছানায় আর তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে না। গিন্ডার বলে গেছে আর ইঞ্জেকশানের দরকার নেই; তবে ট্যাবলেট আরও কদিন চলবে। তারপর ঘা-গুলো শুকিয়ে গেলে সেলাই কেটে দিয়ে যাবে সে। সোমবারিকেও নিয়মিত হাজিরা দিয়ে ওবুধপত্র খাওয়াতে হচ্ছে না। ওষুধ-টষুধ নিজেই এখন খাচ্ছে মেরি। তবে সোমবারি দিনে দু-একবার এসে খোঁজ নিয়ে যায়।

এ ক'দিন জোহনের সেই একইভাবে কেটে গেছে। সকালে উঠে চান-টান সেরে চা খেয়েই ফ্লুটের বাক্স ঘাড়ে করে সে বেরিয়ে পড়েছে। ঝোপড়পট্টি থেকে মিনিট পাঁচেক গেলেই উদিপিদের হতচ্ছাড়া চেহারার একটা লাঞ্চ হোম। সেখানে মেরির জন্য পয়সা দিয়ে গেছে জোহন। লাঞ্চ-হোমের একটা ছোকরা মেরিকে দুপুর-সন্ধে দু-বেলা খাবার পৌঁছে দিয়েছে। আর যথারীতি ক্রফোর্ডে মার্কেটের পেছনে সিন্ধি কি ইরানিদের হোটেলে পাক্কা এক বোতল ঠার্‌রা গিলে এবং রাতের খাওয়া চুকিয়ে অনেক রাত্রে টলতে-টলতে ফিরে এসেছে। ফিরেই মেরির সঙ্গে দু-একটা এলোমেলো কথা। তার শরীর-টরীর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে সেই হাওয়া-বালিশ আর চিটচিটে চাদরটা বগলে পুরে বাইরের বারান্দায় বিছানা পেতেই লম্বা হয়ে পড়েছে। আর সব ঠিক আছে, কিন্তু এই ব্যাপারটাতেই মেরির দারুণ আপত্তি। আপত্তির কারণটা হল, যার ঘর সে বাইরে পড়ে থাকবে, আর সে একটা উটকো মেয়ে, সে কিনা ঘর দখল করে বসে থাকবে।

সাত-আট দিন বাদে এক সকালে ফ্লুটের বাক্স কাঁধে চাপিয়ে বেরুতে যাবে জোহন, মেরি হঠাৎ বলল, 'আমার একটা কথা ছিল।'

ব্যান্ডপার্টির অফিসে আজ তাড়াতাড়ি পৌঁছুবার কথা। সেখান থেকে তাদের গোটা দলকে দশটার ভেতর কালেক্টারিতে যেতে হবে। কেন না আজই বেলা বারোটার আগে কর্পোরেশন

ইলেকশানের রেজাল্ট বেরুবে। পাটিলসাহেব কাল রাতেও ফোন করে ইফতিকার সাহেবকে বার-বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ঠিক সময়ে ব্যান্ডপার্টি যেন পৌঁছে যায়। তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁর প্রার্থী জিতবেই। রেজাল্ট বেরুবার পর এক মিনিটও দেরি করবেন না তিনি; সঙ্গে-সঙ্গে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে জুলুস বার করবেন। কাজেই এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই জোহনের। ব্যস্তভাবে সে বলল, 'কী কথা?'

'আমি তো এখন ভালো হয়েই গেছি। আর কদ্দিন তোমার ঘাড়ে বসে থাকব! তুমি বললে এবার যেতে পারি।'

'ডাক্তার এখনও তো তোমার সেলাই-টেলাই কেটে দেয়নি; তা ছাড়া ওষুধও চলছে—'

'সেলাই আমি কারওকে দিয়ে কাটিয়ে নেব। ওষুধের আর দরকার হবে না।' বলতে-বলতে একটু থামল মেরি। পরক্ষণেই খুব গাঢ় গলায় শুরু করল, 'তুমি আমার জন্যে যা করলে—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল জোহন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আজকের দিনটা তুমি অন্তত থেকে যাও। যদি যেতেই হয় কাল যেও। আটটা চল্লিশের ট্রেনটা আমাকে ধরতেই হবে। রাত্তিরে ফিরে আসি; তখন কথাবার্তা হবে।'

'আচ্ছা—'

জোহন বেরিয়ে গেল। সাড়ে ন'টা নাগাদ ব্যান্ডপার্টির অফিসে পৌঁছে সে দেখল দলের সবাই হাজির হয়ে গেছে; তার জন্যই অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ইফতিকার সাহেব। অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে তাড়া লাগাল, 'চল-চল, বেরিয়ে পড়া যাক। দশটার ভেতর কালেক্টারি অফিসে না পৌঁছুলে ঘাড়ের ওপর আর শিরটি থাকবে না। পাটিল সাহেব—' এই পর্যন্ত বলেই হাত দিয়ে ছুরি চালাবার কায়দা দেখিয়ে গলার ভেতর চক্ করে একটা শব্দ করল। অর্থাৎ পাটিল সাহেব কচাৎ করে মুন্ডুটি নামিয়ে দেবেন।

একটু পরেই দেখা গেল 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি' পায়ধুনি থেকে বেরিয়ে আবদুল রহমান স্ট্রিট ধরে ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে এসে পড়েছে। সবার হাতেই যার-যার নিজের বাদ্যযন্ত্র। কারও হাতে কর্নেট, কারও ক্লারিওনেট, কারও সোজা পুল, কারও ব্রাস, কারও কাঁধে সাইডড্রাম। স্বয়ং ব্যান্ডমাস্টার-কাম-প্রোপ্রাইটরের বুকে বিগ ড্রাম ঝুলছে।

দূরমনস্কের মতো হেঁটে যাচ্ছিল জোহন। ওধারে একটা উঁচু বাড়ির টাওয়ার-ক্লকে পৌনে দশটা বেজে গেছে। এখন চারদিকে অজস্র মানুষের থিকথিকে ভিড়, হাজার-হাজার প্রাইভেট কার, বাস, ট্রাক, ভ্যান, ট্যাক্সি, আর আছে নানা ধরনের শব্দ, চিৎকার। কিন্তু কিছুই যেন জোহনকে ছুঁতে পারছিল না। বারবার মেরির মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। মেয়েটা মোটে সাত-আট দিন তার কাছে রয়েছে। সারাদিনে ক'টাই বা কথা হয় তার সঙ্গে। সকালে সে বেরিয়ে যায়, ফেরে মাঝরাত্তিরে। তা ছাড়া এমনিতে জোহন, খুবই নিস্পৃহ উদাসীন ধরনের। বম্বে শহরের লক্ষ-লক্ষ মানুষ, চিৎকার, হট্টগোল, কোটি-কোটি টাকার ধাঁধিয়ে দেওয়া ঐশ্বর্য, সব কিছুর ওপর শ্যাওলার মতো সে ভেসে বেড়ায়। তবু মেরির সম্বন্ধে কোথায় যেন মায়া অনুভব করে সে। মেরি তাকে জানিয়েছে, সে খারাপ মেয়ে; পেটের জন্য তাকে শরাবি-ফরেবি-চোর-জুয়াচোর নানা জাতের লোকের সঙ্গে শুতে হয়। তার অকপট, সরল স্বীকারোক্তি শোনার পরও ঘেন্না করতে পারেনি জোহন, ধীরে-ধীরে তার সম্বন্ধে কখন যেন নিজের অজান্তে খানিকটা সহানুভূতি বোধ করেছে। সেই মেয়েটা আজ চলে যেতে চেয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। জখম অবস্থায় তাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল জোহন; এখন সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার আর থাকার মানে হয় না। তবু কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগছে জোহনের।

আচমকা গায়ের পাশ থেকে হাবিবের গলা শোনা গেল, 'চাচা—'

একটু চমকে উঠল জোহন। ঘাড় ফিরিয়ে হাবিবের দিকে তাকাল, 'কী বলছিস?'

হাবিবের বয়েস খুব বেশি না—সতেরো-আঠারো হবে। ওরা গরিব মোপ্‌লা অর্থাৎ মালাবারি মুসলমান। সুদূর মালাবার থেকে পেটের ধান্দার জন্য এই বম্বে শহরে এসেছে। এক বছর হল সে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-তে আছে। এখানে সে হোল্ডার। ব্যান্ডপার্টির নিজস্ব ইডিয়মে যাকে ফল্‌স্ বলে, হাবিব তা-ই। অর্থাৎ বাজনার দলে থেকেও সে বাজনদার নয়। জিলিপির প্যাঁচ-খেলানো যে বাদ্যযন্ত্রটির নাম 'সোজা পুল' বাজনার সময় ঘাড়ের ওপর সেটা তুলে মুখটা নিজের মুখের কাছে সেঁটে রাখে হাবিব। এটা ধাপ্পার ব্যাপার। যারা ব্যান্ডপার্টি বায়না করে নিয়ে যায়, তারা দেখে হাবিবও বাজাচ্ছে। আসলে সে বাজায় না, বাজাতে জানেই না। সব দলেই এরকম দু-চারটে ফল্‌স্ বা ভুয়ো বাজনদার থাকে। তাদের দেখিয়ে ব্যান্ডপার্টিওলা খদ্দেরের কাছ থেকে পুরো টাকা আদায় করে, অথচ ফল্‌স্‌কে চার-পাঁচ টাকার বেশি মজুরি দেয় না।

হাবিব বলল, 'আমার কথাটা মনে আছে?'

জোহনের চিন্তার মধ্যে মেরির মুখ তখনও ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে বলল, 'কী কথা রে?'

'বা রে, তুমি বলেছিলে না আমাকে ফুলুট বাজাতে শেখাবে।'

এবার মনে পড়ে গেল জোহনের; শেখাবার কথা সে বলেছিল বটে। অবশ্য এর জন্য কিছুদিন ধরে ছোকরা খুবই ধরাধরি করছে। তার কারণও আছে। ব্যান্ডপার্টিতে ঢুকলে দু-চার বছর ফল্‌স্ হয়ে থাকা মানে দিনে চার-পাঁচ টাকা রোজগার, তা-ও যখন ব্যান্ডপার্টির হাতে বাজাবার বায়না থাকে। বাজাতে শিখলে মজুরি অবশ্য ঝট করে অনেকটা বেড়ে যায়। তাই ফল্‌স্‌রা দলের বাজনদারদের ধরে, যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে মালিক বা ব্যান্ডমাস্টারকে না জানিয়ে বাজনাটা শিখে নেওয়া যায়। একবার মোটামুটি বাজনা শিখে নিতে পারলে তখন অন্য দলেও যাওয়া যায়। কিন্তু ফল্‌সের কদর কোথাও নেই। তাই যে দলে ফল্‌স্ হয়ে ঢোকে, তাকে সেখানে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হয়।

জোহন বলল, 'হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

মুখটা করুণ করে হাবিব এবার বলল, 'ইফতিকার সাহেব মোটে চার টাকা মজুরি দেয়। এই বোম্বাই শহরে চার টাকায় কী হয় বলো। দু-বেলা খেতেই চার টাকা লেগে যায়। তারপর জামা-কাপড় আছে বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া আছে। সকালে-বিকেলে কতকাল যে টিফিন করি না।' একটু থেমে আবার বলল, 'ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে ঘুরবার পর অন্য কাজ যে করব তার সময়ও নেই। তুমি যদি না শেখাও বিলকুল মরে যাব চাচা!'

'ঠিক আছে, শিখিয়ে দেব।'

'ইফতিকার সাহেব যেন জানতে না পারে। তাকে কিন্তু বোলো না।'

ইফতিকার সাহেব এমনিতে বেশ ভালোমানুষ, দরাজ দিল। কিন্তু লুকিয়ে একজন ফল্‌স্‌কে বাজনার তালিম দেওয়াটা বরদাস্ত করবে না। সব ব্যান্ডপার্টির মালিকেরই এক মনোভাব—রাতারাতি একজনকে বাজনদার বানিয়ে টং-এ চড়িয়ে দিতে নেই। তাতে মাথার ঠিক থাকে না। আগের বাজনদাররা যখন কষ্ট করে কোনওদিন আধপেটা খেয়ে দু-চার বছর মাটি কামড়ে পড়ে থাকার পর বাজনা শিখেছে, তখন আজকালকার ছোকরাদের অত তাড়াহুড়ো কীসের? একটু কষ্ট করুক তারা; কিঞ্চিৎ ধৈর্যের পরীক্ষা দিক। এই রীতিটা কোনও ব্যান্ডপার্টির মালিকই সহজে ভাঙতে চায় না।

কিন্তু জোহনের মনটা খুব নরম। অবশ্য সে ব্যান্ডমাস্টারও না, মালিকও না। তার মনোভাবটা এইরকম। আমরা কষ্ট করেছি—করেছি; তাই বলে নতুন ছোকরারা কেন কষ্ট পাবে। সে হেসে-হেসে বলল, 'আরে না-না, ইফতিকার সাহেবকে আমি বলতে যাচ্ছি না। বললে তোর ওপর তো চটবেই, আমার ওপরেও খেপে যাবে।'

হাবিব বলল, 'কবে থেকে শেখাবে বলো?'

'কবে আমাদের দলের বায়না নেই জানিস?'

'সামনের সপ্তাহে শেষ তিনটে দিন ফাঁকা আছে। তখন আমরা বেকার।'

'বহুত আচ্ছা।'

'সেই সময়টা শিখিয়ে দাও না।'

'ঠিক আছে।'

একটু ভেবে নিয়ে হাবিব বলল, 'কোথায় শেখাবে? মালিকের চোখের সামনে তো হবে না। দলের অন্য কেউ জানলেও চলবে না; মালিকের কানে চুকলি কেটে দেবে।'

জোহন বলল, 'আসছে সপ্তাহে ওই তিনদিন আমার ঝোপড়পট্টিতে চলে যাবি। সমুদ্রের পাড়টা খুব নিরিবিলি, ওখানে গিয়ে শেখাব।'

'আচ্ছা।'

এরপর আর কোনও কথা হল না।

দশটার দু-তিন মিনিট আগেই 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি' কালেক্টরের অফিসে পৌঁছে গেল।

এখানে এখন দারুণ ভিড়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অগুনতি জিপ, ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, প্রাইভেট কার এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকে জায়গাটা এত ঠাসা, যে ভেতরে ছুঁচ ফেলবার ফাঁক নেই। এরই মধ্যে আরও ক'টা ব্যান্ডপার্টি দেখা গেল। 'শফি ব্যান্ড', 'এলিগেন্ট ব্যান্ড', 'এমব্যাসি ব্যান্ড', 'গ্যালাক্সি ব্যান্ড', 'ইউসুফ ব্যান্ড' ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজনীতিক দল এবং তাদের প্রার্থীর এজেন্টরা ওদের নিয়ে এসেছে।

সবারই ধারণা এবং বিশ্বাস তাদের ক্যান্ডিডেটরা নির্বাচনে জিতবেই। ফলাফল একবার জানিয়ে দিলেই হয়, বম্বে শহরের তেলতেলে কংক্রিটের রাস্তা চৌচির করে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে জুলুস বেরিয়ে পড়বে।

'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র বাজিয়েরা, বিশেষ করে ইফতিকার সাহেব ডিঙি মেরে-মেরে ভিড়ের ভেতর পাটিল সাহেব কিংবা তার লোকজনদের খুঁজছিল। আরও অনেকবার নির্বাচনী বিজয়োৎসবের সময় পাটিল সাহেবের ডাকে তারা বাজাতে গেছে। তাঁর দলের লোকজনদের অনেককেই চেনে ইফতিকার সাহেব।

খানিকক্ষণ ডিঙি মারার পর খোদ পাটিল সাহেবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে 'গেল ইফতিকার সাহেবের। মধ্যবয়সি, পাতলা চেহারার মানুষ পাটিল সাহেব। গায়ের রং তামাটে। চুল কাঁচাপাকা। তিনি খুবই ব্যস্ত। একবার কালেক্টারের অফিসে যাচ্ছেন, আবার ফিরে এসে দলের কর্মীদের কী নির্দেশ দিচ্ছেন। চোখাচোখি হতেই হাত তুলে ইফতিকার সাহেবকে একটু দাঁড়াতে বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। বললেন, 'তোমরা এসে গেছ। ভেরি গুড। তবে রেজাল্ট দশটায় বেরুচ্ছে না; ঘণ্টাখানেক দেরি হবে! তোমরা কাছাকাছি থেকো। রেজাল্ট বেরুলেই প্রসেশান বার হবে।'

'জি—' ইফতিকার সাহেব মাথা হেলাল।

'আমি যাচ্ছি—' পাটিল সাহেব দু-হাতে ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে চলে গেলেন। আর ইফতিকার জোহনদের সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি একফালি পার্কের কাছে চলে এল। বাদ্যযন্ত্রগুলো পার্কের রেলিঙের গায়ে হেলিয়ে রেখে তারা চওড়া কংক্রিটের ফুটপাথের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল। তবে সবার চোখ রইল কালেক্টরের অফিসের দিকে। অন্য ব্যান্ডপার্টিগুলোও এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের কেউ সিগারেট ফুঁকছে, কেউ ঝিম মেরে খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে, কেউ বা দলের অন্য বাজিয়েদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পর থেকেই ফলাফল ঘোষণা শুরু হল। কালেক্টর অফিসের দোতলায় একটা লাউডস্পিকার লাগানো রয়েছে। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে, অমুক কেন্দ্রে অমুক দলের অমুক প্রার্থী এত ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। এই কেন্দ্রের অন্যান্য প্রার্থীরা অমুক-অমুক দলের অমুক-

অমুক ব্যক্তি এই-এই ভোট পেয়েছেন। হিন্দি, মারাঠি গুজরাতি এবং ইংরেজিতে ফলাফল জানানো হচ্ছিল।

যে দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছে, রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে তার সমর্থক এবং দলীয় কর্মীরা মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি আর স্লোগান দিয়ে আরবসাগর থেকে উঠে আসা হু-হু বাতাসের শরীর চিরে-চিরে দিচ্ছে। তার পরেই দেখা যাচ্ছে প্রার্থীকে খোলা জিপে দাঁড় করিয়ে, পঞ্চাশটা জুঁই বা রজনীগন্ধার মালা তার গলায় চাপিয়ে আগে পিছে ব্যান্ডপার্টি বাজাতে-বাজাতে শোভাযাত্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ঘন-ঘন পতাকারি (আতসবাজি) ফাটছে, আর রঙিন ফাগ উড়ে-উড়ে বাতাস লাল হয়ে যাচ্ছে।

সাত-আটটা রেজাল্ট বেরিয়ে যাবার পর একসঙ্গে দুটি পাশাপাশি কেন্দ্রের ফলাফল বেরুল। দুই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দলের দুজন প্রার্থী এই কেন্দ্র দুটিতে জিতেছেন। তাঁদের একজন হলেন পার্টিল সাহেবের পার্টির ক্যান্ডিডেট।

রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য দলের ব্যান্ডপার্টি বেজে উঠল। সেই সঙ্গে দুমদাম আতসবাজি ফাটতে লাগল। একটু পর দেখা গেল গলায় ফুলের মালার পাহাড় নিয়ে, ওই দলের প্রার্থী খোলা জিপে এসে দাঁড়িয়েছেন।

জোহনরা এখন কী করবে, ভাবছে। ইফতিকার সাহেব পায়ের বুড়ো আঙুলে ডিঙি মেরে-মেরে কালেক্টর অফিসের সামনের দিকের ভিড়টা দেখতে-দেখতে বলতে লাগল, 'পাটিল সাহেবের পার্টি জিতল, কিন্তু ওদের কারওকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ ডাকতেও তো এল না।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখা গেল বুকে পাটিল সাহেবদের পার্টির ব্যাজ আঁটা একটা ছোকরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে আসছে। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'চলে এসো, চলে এসো—'

দু-মিনিট বাদেই চোখে পড়ল, ইফতিকার সাহেব 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-কে কালেক্টরের অফিসের সামনে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড় করিয়ে নিয়ে ব্যান্ডমাস্টার হিসেবে বিগ ড্রামে ঘা দিতে-দিতে বলছে, 'বাজাও ভাই—ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি—'

ফল্‌স্‌রা বাদে অন্য বাজিয়েরা যে যার বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগল। পাটিল সাহেবদের প্রার্থীও মালা ঘাড়ে করে ফাগ বৃষ্টির মধ্যে জোড়হাতে একটা জিপে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পাশে স্বয়ং পাটিল সাহেব। তাঁদের দলের কর্মী এবং সমর্থকরাও পটকা ফাটিয়ে আর উন্মাদের মতো জয়ধ্বনি দিয়ে-দিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

একটু পর ব্যান্ডপার্টি বাজাতে-বাজাতে দুই দলের দুই বিজয়ী প্রার্থীর জুলুস বেরুল। দু-দলের নির্বাচন কেন্দ্র পাশাপাশি। আপাতত তাঁরা নিজের-নিজের কেন্দ্রে গিয়ে ভোটদাতাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবে।

কালেক্টরের অফিস থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রা দুটো গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে। পি-এম মেটো রোড, দাদাভাই নওরোজি রোড পেরিয়ে কারনাক রোড আর ক্রফোর্ড মার্কেট পিছনে ফেলে ঘণ্টাখানেক পর তারা সেনট্রাল বম্বেতে এসে পড়ল। তাদের নির্বাচন কেন্দ্র এখানেই।

এতক্ষণ তারা সৎ প্রতিবেশীর মতো পাশাপাশি ভালোই এসেছিল। কালেক্টরের অফিস থেকে এতদূর পর্যন্ত রাস্তা ছিল বেশ চওড়া। দুই জুলুস পাশাপাশি আসতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এবার সামনে একটা সরু গলি পড়ল। এই গলি দিয়ে কিছুটা গেলে পাটিল সাহেবদের বিজয়ী প্রার্থীর নির্বাচন কেন্দ্র। সেটা পার হলে অন্য বিজয়ী প্রার্থীটির কনস্টিটিউয়েন্সি।

এখন প্রশ্ন, কার জুলুস আগে গলিতে ঢুকবে? পাটিল সাহেবের সমর্থকরা চায় তাদের শোভাযাত্রা আগে যাবে; অন্য দলটির সমর্থকরা চাইছে তাদের শোভাযাত্রা আগে যাবে। এই নিয়ে তর্কাতর্কি চিৎকার শুরু হয়ে গেল। ক্রমশ উত্তেজনা চরমে উঠল। কোনও দল অন্য দলটিকে আগে

যেতে দেবে না।

পাটিল সাহেবের মতো অন্য দলটিতেও বয়স্ক ঠান্ডা মাথার লোক আছে। এই সামান্য কারণে তাঁরা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট চান না। দু-হাত তুলে তাঁরা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'কী হচ্ছে এসব? শান্ত হও—'

কিন্তু কমবয়েসি মাথা-গরম সমর্থক এবং কর্মীদের কানে এসব ঢুকল না। ফুটপাথের ওপর রাস্তা মেরামতের জন্য বড়-বড় পাথরের টুকরো স্তূপাকার হয়ে ছিল। আচমকা দুই দলই পাথর তুলে ছুড়তে লাগল। মুহূর্তে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার বেধে গেল। যে যেদিকে পারছে এখন ছুটছে। জোহন হঠাৎ লক্ষ করল, তার আশেপাশে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র একটি বাজনদারও নেই। সবাই হুটহাট সরে পড়েছে। দূর থেকে ইফতিকার সাহেবের গলা একবার শোনা গেল, 'জোহন পালা, পালা—'

উড়ন্ত চাকির মতো চারদিক থেকে পাথরের চাঁইগুলো ছুটে আসছিল। দিশেহারার মতো এক দিকে—উত্তর না দক্ষিণ, পুবে না পশ্চিমে, জোহন জানে না, দৌড় লাগাল। কিন্তু দশ গজও যায়নি, তার আগেই মনে হল, মাথায় ধাঁ করে এক কেজি ওজনের কিছু একটা এসে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে জোহনের চোখের সামনে কয়েক কোটি হলুদ ফুল ফুটে উঠেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। মাথার যেখানটায় লেগেছে অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে একবার ছুঁল সে; টের পেল ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। টলতে-টলতে আরও দু-পা এগিয়ে যেতেই, মুখের ওপর আবার একশো মাইল স্পিডে আরেকটা পাথরের টুকরো এসে পড়ল। জোহনের মনে হল তার নাকটা ছ'ইঞ্চি ভেতরে বসে গেল। পরক্ষণে হুড়মুড় করে রাস্তার ওপর ঘাড়মুখ গুঁজে পড়ে গেল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

জোহনের যখন জ্ঞান ফিরল, বেশ রাত হয়েছে। সে দেখল, ঝোপড়পট্টিতে নিজের দড়ির খাটিয়ায় সে শুয়ে আছে, আর তাকে ঘিরে অনেকে বসে আছে। যেমন ইফতিকার সাহেব, ডাক্তার গিল্ডার, ব্যান্ডপার্টির দুজন বাজনদার, সোমবারি আর মেরি।

স্নায়ুগুলো এখন খুবই দুর্বল আর ক্লান্ত, তবু আস্তে-আস্তে টুকরো টুকরোভাবে পাটিল সাহেব, জুলুস, ব্যান্ডপার্টি, সেনট্রাল বম্বের সেই সরু গলি, দু-দলের সমর্থকদের পাথর ছোড়াছুড়ি, সব মনে পড়ে গেল। জোহন আন্দাজ করল, অজ্ঞান হবার পর ইফতিকার সাহেবরাই তাকে ডান্ডা কোস্টের এই ঝোপড়পট্টিতে নিয়ে এসেছে।

ইফতিকার সাহেব বলল, 'যাক, জ্ঞান ফিরেছে, বাঁচলাম।'

বলতে-বলতেই ডাক্তার গিল্ডারের দিকে তাকাল, 'ভয়ের কিছু নেই তো ডাক্তারসাব?'

গিল্ডার বলল, 'না। পাঁচ-সাতদিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে ঠিকমতো ওষুধ-টোষুধ খেতে হবে, আর ঠার্রা একেবারেই না।'

পুরোনো আমলের একটা ঢাউস পকেটঘড়ি আছে ইফতিকার সাহেবের। সেটা বার করে এক পলক দেখে সে বলল, 'সাড়ে ন'টা বাজে। অনেক রাত হল, এবার উঠি।' জোহনকে বলল, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমি আবার এসে দেখে যাব—' বলতে-বলতে উঠে পড়ল। তারপর আচমকা কী মনে পড়তেই পকেটে হাত পুরে একতাড়া নোট বার করে জোহনের বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে বলল, 'শ' দেড়েক আছে। দরকার হলে পরে আবার দিয়ে যাব।'

ইফতিকার সাহেব তার ব্যান্ডপার্টির অন্য দুই বাজনদার স্টিফেন আর আবদুলকে নিয়ে চলে গেল।

গিল্ডার বলল, 'আমিও এবার যাই। বলেই সোমবারির দিকে ফিরল, 'ফ্লুটবালাকে একটু

দেখো, ঠিক সময়ে ওষুধ খাইয়ে দিও। ও শালা যা শরাবি, নজর রেখো। উঠে গিয়ে যেন আবার ভাটিখানায় না ঢোকে।'

সোমবারিদের সঙ্গে জোহনের সম্পর্কটা ভালো করেই জানে গিল্ডার। জোহনের অসুখ-বিসুখ হলে সোমবারিই দেখাশোনা করে থাকে।

সোমবারি ঠোঁট কামড়ে বলল, 'আমি কেন, ফুলুটবালার ঘরে ওষুধ খাওয়াবার লোক তো আছে—' চোখের কোণ দিয়ে মেরিকে দেখিয়ে দিল সে।

একটু থতিয়ে গেল গিল্ডার। দ্রুত একবার মেরিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ও, তাহলে তো—আচ্ছা, ঠিক আছে। রাত হল, আমিও যাই।' সে চলে গেল।

ঘরের ভেতর এখন জোহন, মেরি এবং সোমবারি ছাড়া আর কেউ নেই। সোমবারি উত্তরপ্রদেশের মজাদার অশ্লীল একটা ছড়া কেটে চোখ নাচিয়ে বলল, 'তোমরা কিন্তু বেশ লাগিয়েছ ফুলুটবালা—'

দুর্বল গলায় জোহন জানতে চাইল, 'কী লাগিয়েছি?'

'একবার তোমার মেরি জখম হয়ে আসছে, একবার তুমি জখম হয়ে আসছ। মেরিকে আমি দেখাশোনা করেছি। মেরি এবার তোমার দেখাশোনা করুক। রোজ-রোজ নিজের ঘর-সংসার ফেলে আমি তোমার ঝোপড়িতে এসে বসে থাকতে পারব না।' বলতে-বলতে একটু থামল সোমবারি। পরক্ষণে নিজের স্বামীর কথা তুলে আবার শুরু করল, 'যাই, জুয়াড়িটা সাট্টা-ফাট্টা খেলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরে এসেছে। সে যা-ই হোক, শরাবি-ফরেবি-জুয়াড়ি, তবু তো আপনা মরদ, ঘরবালা। তাকে দানাপানি দিতে হবে।' সোমবারি চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মেরি বলল, 'তোমার জন্যে ভাবী দুধ কিনে রেখে গেছে। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

জোহন কিছু বলল না।

ওধারে সেই সস্তা টেবিলটার ওপর প্লাস্টিকের একটা মগে দুধ ছিল। কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে সেই দুধটা গরম করে জোহনকে খেতে দিল মেরি। খাওয়াবার পর বলল, 'তুমি আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে ফুলুটবালা?'

জোহন জানতে চাইল, 'কীরকম?'

'ভেবেছিলাম কাল সকালে চলে যাব। আর তোমার ঘাড়ে বসে থাকব না। কিন্তু তুমি যা কাণ্ড বাধিয়ে এলে তাতে যাই কী করে?'

জোহনের ক্লান্ত, নির্জীব চোখ জোড়া পলকের জন্য চকচকিয়ে উঠল, 'তোমাকে কে যেতে বলছে?'

দ্রুত ঘাড় ফেরাল মেরি। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'থেকে যেতে বলছ?'

'হাঁ।'

'কদ্দিন?'

'তোমার যদ্দিন ইচ্ছে।'

'কোথাও থাকতে পেলে তো আমি বেঁচে যাই। কিন্তু—' মেরিকে খুবই দ্বিধান্বিত দেখাল।

'কী?' আস্তে করে জিগ্যেস করল জোহন।

মেরি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাকে তো বলেছি আমি খারাপ মেয়ে।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'তাছাড়া আর-একটা কথা—হুট করে আমি তোমার কাছে এলাম, থাকছি, লোকে কী বলবে?'

'ঝোপড়পট্টির লোকেদের এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর মেরি হঠাৎ বলল, 'আগে তুমি ভালো হয়ে ওঠ। তারপর ভেবে দেখব কী করা যায়।'

জোহন উত্তর দিল না।

মেরি কী চিন্তা করে বলল, 'আমি যখন জখম হয়েছিলাম ঘরে শুয়েছি; তুমি শুয়েছ বাইরে। তোমার তো এখন নড়াচড়ার সাধ্যি নেই। আমি বাইরে শুতে যাচ্ছি।'

'না-না, তুমি মেয়েমানুষ; খোলা বারান্দায় শোওয়া ঠিক না।'

'তাহলে?'

জোহন চোখ-কান বুঁজে বলে ফেলল, 'তুমি এই ঘরেই থাকো, নীচে বিছানা করে নাও।'

সেই যে জোহন জখম হয়ে এসেছিল, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তার বেশ সময় লেগে গেল। এই অবস্থায় তাকে ফেলে মেরির পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব হল না। যে লোকটা একদিন রাস্তা থেকে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর তুলে এনে প্রাণে বাঁচিয়েছে, তাকে এভাবে ফেলে যাওয়া যায় না।

যাই হোক কোনদিনই নিয়ম-টিয়মের ধার ধারে না জোহন। আজ বেলা বারোটায় খেল, তো কাল খেল বিকেল পাঁচটায়, পরশু হয়তো খেলই না আর খাওয়াটাও কি রোজ একরকম জোটে! একদিন উদিপিদের লাঞ্চ হোমে খেলে, পরের দিন সে ইরানি কিংবা পাঞ্জাবিদের হোটেলে গিয়ে ঢোকে, তার পরের দিন হয়তো যায় গুজরাতিদের শাকাহারী ভোজনালয়ে। মোট কথা, তার যে-ধরনের কাজ, তাতে জীবনটাকে ঠিকঠাক নিয়মে বাঁধা যায় না। যতরকম অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা থাকতে পারে, তার মধ্যে দিয়ে জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে জোহনের। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, ওষুধ-টোষুধ খেতে চিরদিনই তার দারুণ আপত্তি।

কিন্তু তার আপত্তি শুনছে কে? ডাক্তার গিল্ডার যেমন-যেমন বলে গেছে, ঠিক সেইভাবে ঘড়ির কাঁটা ধরে গাদা-গাদা ট্যাবলেট আর মিক্সচার খাইয়ে যাচ্ছে মেরি। শুধু কি তাই, সকাল সাতটায় দুধ আর পাও, বারোটায় উদিপি হোটেলের অর্ধেক ভাত, অর্ধেক পুরি, বিকেল চারটেয় ফল আর দুধ, রাত্রি ন'টায় উদিপি হোটেলের চাপাটি তরকারি খেতে হচ্ছে।

এত নিয়মে চলা জোহনের ধাতে নেই। তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু আপত্তি করলেই কখনও বালিকা-বধূর মতো গাল ফুলিয়ে, কখনও বহুকালের অভিজ্ঞ ঝানু হাউস-ওয়াইফের মতো ধমকে-ধামকে খাইয়ে যাচ্ছে মেরি। এরকম শেকলে বাঁধা থাকার জন্য খুবই অস্বস্তি হচ্ছে জোহনের। তবু ভালোই লাগছে ব্যাপারটা। তার জীবনে এটা একেবারে নতুন। মেরির মতো এভাবে রাগ বা অভিমান করে কিংবা ছেলে-ভুলনোর মতো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গভীর মমতায় কেউ তাকে কাছে বসিয়ে কখনও খাওয়ায় নি। মেয়েটা বিলকুল তার ক্যারেক্টার খারাপ করে দিচ্ছে।

এরই মধ্যে দিনে তিনবার করে সোমবারি আসছে। চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে একবার মেরিকে দেখে সে, আর-একবার দেখে জোহনকে। তারপর উত্তরপ্রদেশের অশ্লীল একটি ছড়া কেটে বলে, 'ভালোই চালাচ্ছ ফুলুটবালা।' বলেই একচোখ বুঁজে, ঠোঁট কামড়ে, হাসতে-হাসতে চলে যায়।

ইফতিকার সাহেবও রোজ একবার করে আসে। তবে তার আসার নির্দিষ্ট সময় নেই। কোনও-কোনও দিন সকালের দিকে আসে সে, কোনওদিন বা বায়না অনুযায়ী ব্যান্ড বাজাবার পর মাঝ রাত্তিরে এসে হাজির হয়। তাকে কাছে বসিয়ে জোহন বলে, 'আজ কোথায় বাজাতে গিয়েছিলে?'

ইফতিকার সাহেব বলে, 'যোগেশ্বরীতে। এক গুজরাটি শেঠের মেয়ের সাল-গিরা (জন্মদিন) ছিল।'

'আজকাল সাল-গিরাতেও ব্যান্ডপার্টিও ডাকছে নাকি?' জোহন অবাক হয়।

চড়বড়িয়ে একনাগাড়ে খানিকক্ষণ খিস্তি করল ইফতিকার সাহেব। খিস্তিটার কোনও কারণ

বা গুরুত্ব নেই। ওটা তার কথার মাত্রা। খিস্তি-ফিস্তির পর জানালা দিয়ে পিচিৎ করে পানের পিক ফেলে এসে বলল, 'বিয়ে শাদি, ভোটের রিজাল (রেজাল্ট), এসব তো আছেই। মানুষ মরে গেলেও এখন সামনে-পেছনে ব্যান্ড বাজিয়ে গোরস্থানে কি শ্মশানে নিয়ে যাবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'এরপর দেখবি বড়লোকদের পেচ্ছাপ পেলেও ব্যান্ডওলাদের ডাক পড়বে।'

জোহন অন্যমনস্কের মতো বলল, 'হাঁ। আচ্ছা চাচা, আমার জায়গায় এখন কে ফ্লুট বাজাচ্ছে?'

'আসলাম।'

'কে আসলাম? 'নবি ব্যান্ডপার্টি'-র সেই দুব্‌লা পাতলা ছোকরাটা নাকি?'

'হাঁ। তুই নেই, কাজ চালাবার জন্যে ওকে ধার করে এনেছি।'

'কীরকম বাজাচ্ছে?'

'শালে হারামি কী বাজাবে! 'নবি ব্যান্ড'-এর ব্যান্ডমাস্টার মুবিন নবি নিজে কিছু বাজাতে জানে যে ওর দলের লোক বাজাবে!' ঢল নামানোর মতো একগাদা খিস্তি করে ইফতিকার সাহেব বলল, 'তুই জখম হয়ে বিছানায় পড়ে আছিস; ওকে ঠেকা দেবার জন্যে আনতে হল। নইলে ওর যা বাজনা, ওতে আমি পেচ্ছাপ করে দিই। ছোঃ—' বলেই আবার পানের পিচ ফেলে এল!

জোহন বলল, 'জখম হয়ে তোমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি, তাই না চাচা?'

'তা একটু ফেলেছিস। কিন্তু ও-নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ। তুই খাড়া হলে আমি বেঁচে যাই।' বলতে-বলতে একটু থামে ইফতিকার সাহেব। তারপর আবার বলে, 'তুই যা হারামি, গাধ্‌ধেকা পাঠ্‌ঠে, ঠিকমতো ওষুধ-টোষুধ খাচ্ছিস?'

মেরিকে দেখিয়ে দিয়ে জোহন বলে, 'এর পাল্লায় পড়েছি, না খেয়ে উপায় আছে! লাইফ একেবারে অ্যাসিড করে দিচ্ছে।'

এতক্ষণ যেন মেরিকে দেখতে পায়নি ইফতিকার সাহেব। চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একপলক তাকে দেখে মুখটা জোহনের কানের কাছে নিয়ে এল সে। চাপা গলায় বলল, 'ওহী লড়কি?'

'হাঁ।'

'এখনও আছে?'

ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে জোহন বলে, 'হাঁ।'

ইফতিকার সাহেব বলল, 'বিলকুল জমে গেছিস মনে হচ্ছে। শালে শুয়ারকা বাচ্চা, ছোকরি যখন তোর ঝোপড়িতে ঢুকেই পড়েছে, আর ছাড়িস না।' বলেই ঝট কর খাড়া হয়ে সে মেরিকে বলল, 'এ চিটমবাজ ছোকরি—' চিটমবাজ কথাটার কী অর্থ একমাত্র ইফতিকার সাহেবই বলতে পারবে! খিস্তি-টিস্তির ব্যাপারে নতুন কিছু-কিছু শব্দ সে উদ্ভাবন করেছে। মানে থাক বা না-ই থাক, কথায়-কথায় সেগুলো সে অনর্গল বলে যায়।

মেরি ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে বলে, 'কী বলছেন?'

'জোহন শালেকে জলদি সারিয়ে তোলো। যদি সাতদিনে সেরে ওঠে, তোমাকে একটা দারুণ তওফা (উপহার) দেব।'

বলেই চোখের তারা দুটো দ্রুত একবার এ-কোণে, একবার ও-কোণে নিয়ে জোহন আর মেরিকে দেখে নিল।

মেরি উত্তর দিল না।

ইফতিকার সাহেব আবার বলল, 'আর এখানে এসে যখন একবার ঢুকেছ, এখানেই জমে যাও। সমঝী?'

মেরি এবারও চুপ।

ইফতিকার সাহেব বলতে থাকে, 'অনেক রাত হল। ট্যাক্সি ধরে এখন আমাকে কোলাবা

ছুটতে হবে। বারোটার সময় সেই আওরতটার কাছে পৌঁছনোর কথা।' বুক পকেট থেকে চেনে-বাঁধা ঢাউস-পকেট ঘড়িটা বার করেই আঁতকে উঠল ইফতিকার সাহেব, 'আরে বাপ, পৌনে বারোটা বাজে। আমার বারো বাজ গিয়া। আজ বাকি রাত মাগিটা জরুর আমাকে দরজার বাইরে ফেলে রাখবে। যাই রে, কাল আবার আসব।' যাবার আগে মেরির থুতনিতে টোকা দিয়ে বলে যায়, 'চিটমবাজ ছোকরি, আমার কথাটা ইয়াদ রাখিস।'

সোমবারি বা ইফতিকার সাহেবই না, সোমবারির ঘরবালা জুয়াড়ি রেসুড়ে আজবলাল, ডাক্তার গিল্ডার, 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র সেই ফল্স্ বাজনদার ছোকরা হাবিব এবং ঝোপড়পট্টির অন্যান্য লোকজনও জোহনের খোঁজখবর নিতে আসে।

দিন কয়েকের মধ্যে অনেকটা ভালো হয়ে উঠল জোহন। তবে প্রচুর রক্তপাতের ফলে শরীরটা এখনও বেশ দুর্বল। একটু চললে ফিরলেই মাথা ঘোরে। নাকে-মুখে এবং মাথায় ব্যান্ডেজটা আছেই। গিল্ডার বলে গেছে এখনও অন্তত পনেরো দিন তার ঘর থেকে বেরুনো চলবে না।

এখন সকাল সাতটার মতো বাজে। দড়ির খাটিয়ায় নিজের বিছানাটার ওপর বসে ছিল জোহন। নীচে বসে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুধ গরম করছিল মেরি। হঠাৎ সে বলল, 'এভাবে আমার ভালো লাগছে না।'

একটু অবাক হয়েই জোহন তাকাল। মেরি কী বলতে চায় সে বুঝতে পারছে না।

মেরি আবার বলল, 'রোজ-রোজ উদিপিদের হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাচ্ছে, এর কোনও মানে হয়?'

জোহন বলল, 'উদিপিদের খাবার তোমার ভালো না লাগলে এক কাজ করি। একটু দূরে একটা খালসা হোটেল আছে। তাদের বরং খাবার দিয়ে যেতে বলি।'

'আমি কী বললাম আর তুমি কী বুঝলে! হোটেল থেকে কিছু আনতে হবে না।'

জোহন বিমূঢ়ের মতো জিগ্যেস করল, 'তা হলে?'

মেরি বলল, 'কাজ নেই, কর্ম নেই, দিনরাত হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে বাতে ধরে গেল।'

'কী করতে চাও?'

তক্ষুনি উত্তর দিল না মেরি। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কোরোসিন স্টোভ তো আছেই। আমাকে হাঁড়ি-কড়া আর দু-একটা বাসন-কোসন কারোকে দিয়ে কিনিয়ে দাও না। টাকা-পয়সা দিলে আমিও কিনে আনতে পারি।'

একটু অবাক হয়ে জোহন বলল, 'রান্নাবান্না শুরু করবে নাকি?'

'কত আর বেকার বসে থাকা যায়!'

সত্যি-সত্যিই জোহনকে দুধ-পাও এবং ওষুধ খাইয়ে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে তিন মাইল দূরের খারের বাজার থেকে বাসন-কোসন, প্লাস্টিকের বালতি, চাল-ডাল আর কিছু সবজি কিনে আনল মেরি। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে কোমরে শক্ত করে শাড়ি জড়িয়ে, প্রথমে ঝোপড়পট্টির মাঝখানের সেই কলটা থেকে জল নিয়ে এল। তারপর সামনের ঘেরা বারান্দাটার একধারে কেরোসিনের স্টোভ ধরিয়ে রান্না চড়িয়ে দিল।

দড়ির খাটিয়ায় বসে অবাক চোখে দেখেই যাচ্ছে জোহন, দেখেই যাচ্ছে, আর যত দেখছে বিস্ময়টা ততই বেড়ে যাচ্ছে। কুড়ি-বাইশটা বছর ঝোপড়পট্টির এই ঘরে কেটে গেল তার। কিন্তু এই দৃশ্যটা জোহনের কাছে একেবারে নতুন এবং চমকপ্রদও। কোনও মেয়ে তার ঘরে এসে এভাবে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবে, কোনওদিন সে এসব ভেবে দেখেনি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্না হয়ে গেল মেরির। ভাত-ডাল ইত্যাদি বাটি এবং ডেকচিতে করে

ঘরের ভেতর এনে রাখল মেরি। স্টোভটা নিভিয়ে দিয়েছে; আপাতত সেটা বারান্দাতেই থাকল।

হাতের কাজ-টাজ শেষ করে মেরি জোহনের দিকে তাকাল। তার কপালে এবং গলায় দানা-দানা ঘাম জমেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘাম মুছতে-মুছতে একটু হাসল সে। বলল, 'ডেকচি-কটোরা, থালা-গেলাস কিনে তোমার অনেক খরচ করিয়ে দিলাম।'

জোহন জখম হয়ে আসার পর, বেশ কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল ইফতিকার সাহেব। তার থেকে ষাট-সত্তরটা টাকা খরচ করেছে মেরি। যোহন বলল, 'আরে না-না—'

মেরি বলল, 'খরচ তোমার একদিনই একটু বেশি হল। তারপর দেখবে ঘরে রান্না করে খেলে হোটেলের চাইতে ঢের সস্তায় হবে।'

'আমার পয়সা বাঁচাবার জন্যে বুঝি তোমার ঘুম হচ্ছিল না?'

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার কথা আমার তো একটু ভাবতেই হবে।'

ঠিক এরকম স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব আশা করেনি জোহন। তবু তার ভালোই লাগল।

মেরি আবার বলল, 'ঠিক পয়সা বাঁচাবার জন্যে নয়; আসলে আমার একটা কাজ তো দরকার। দেখ তো ক'টা বাজে?'

জোহন যেখানে বসে আছে তার বাঁ-পাশের ছোট জানালা দিয়ে দূরে একটা গির্জার মাথায় টাওয়ার-ক্লক দেখা যায়। চট করে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে জোহন বলল, 'বারোটা বাজতে দশ মিনিট—'

মেরি ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'বারোটায় তোমার খাবার সময়। যাই, চানটা সেরে আসি—' বলেই কোণের দিকে টাঙানো দড়িটা থেকে একটা বিছানার চাদর আর বড়সড় পুরোনো একটা তোয়ালে নিয়ে কাঁধে চাপাল।

হঠাৎ জোহনের মনে পড়ে গেল, মেরি যে শাড়ি-ব্লাউজ পরে আছে সেগুলো ছাড়া তার আর বাড়তি পোশাক নেই। যেদিন রাস্তা থেকে তাকে তুলে এনেছিল, সেদিনও এগুলোই তার গায়ে ছিল। একটা শাড়ি আর একটা ব্লাউজ দিয়ে দিনের-পর-দিন চালানো যায়? তা ছাড়া ওগুলোর যা হাল! রক্তের দাগড়া-দাগড়া ছোপ লেগে রয়েছে। জোহন লক্ষ্য করেনি। তবে তার মনে হল, মেয়েটা চান-টান করে বিছানার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে থাকে; তারপর শাড়ি শুকোলে পরে নেয়। এত কষ্ট করার কোনও মানে হয়! সে বলল, 'তুমি কী বলো তো!'

মেরি হতভম্বের মতো বলল, 'কী আমি!'

'খারে গিয়ে গোটা বাজারটাই কিনে আনলে। আর আসল জিনিসটাই আনতে ভুলে গেলে?'

'মানে?'

'নিজের জন্যে শাড়ি-ব্লাউজ তো কিনে আনবে। আমার ঘরে কি মেয়েমানুষ আছে যে এসব ব্যাপারে আমার হুঁশ থাকবে; তোমাকে কিনতে বলে দেবার কথা কি আমার মাথায় ছিল? এক শাড়ি এক ব্লাউজে কি চালানো যায়!'

মেরি জানালো, নতুন শাড়ি-টাড়ি কেনবার দরকার নেই। কিং সার্কেল স্টেশনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টিটা, সেখানে তার অনেক জামাকাপড় রয়েছে। সে ভেবেই রেখেছিল একটু ভালো হয়ে উঠলে তার জিনিসপত্র নিয়ে আসবে। আজ তো জোহন অনেকটা সুস্থ, আজই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে কিং সার্কেলে যাবে।

পৃথিবীর কোনও কিছু সম্বন্ধে বিশেষ টান বা আকর্ষণ বোধ করে না জোহন। তবু এই মুহূর্তে তার মনে হল, বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'তুমি ফিরে আসবে তো?'

তার বলার ভঙ্গিতে উদ্বেগের মতো কিছু একটা জড়ানো।

মেরি হাসল, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ; তোমাকে এভাবে ফেলে আমি পালাব না। তবে তুমি একেবারে ভালো হয়ে গেলে আর থাকা কি ঠিক হবে?'

জোহনের চোখ এবার চকচকিয়ে ওঠে। সে বলল, 'তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। যাও, চান করে এসো।'

মেরি চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে বেড কভারে গা ঢেকে ফিরে এল সে। ভেজা শাড়ি আর জামাটা শুকোতে দিয়ে চুল-টুল আচড়ে জোহনকে খেতে দিল।

খাবারের আয়োজন সামান্যই। ভাত, আমটি (টক ডাল), কিছু ভাজা-টাজা আর পাঁপড়।

জোহন মনে করতে পারছে না, কেউ কখনও এভাবে নিজের হাতে রেঁধে-টেঁধে কাছে বসে তাকে খাইয়েছে কি না। বাবা বেঁচে থাকতে ডক-ইয়ার্ড রোড স্টেশনের গায়ের সেই ঝোপড়পট্টিটায় যখন তারা থাকত তখন কচড়া জ্বালিয়ে বেশিরভাগ দিন তাকেই রাঁধতে হয়েছে। বাবা মরে গেলে পাঞ্জাবি-গুজরাতি-সিন্ধি-ইরানি-উদিপি নানা জাতের হোটেলে খেয়ে-খেয়েই তিরিশ-বত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিল সে। নিজের ঘরে বসে একটি যুবতী মেয়ের রান্না ভাত-সবজি সে কোনওদিন খেতে পাবে, কখনও কি তা ভাবতে পেরেছিল! অদ্ভুত এক আবেগ ফুটন্ত দুধের মতো বুকের ভেতর উথলে-উথলে উঠতে লাগল জোহনের।

মেরি বলল, 'কি হল, চুপচাপ বসে কেন? খাও—'

জোহন গাঢ় গলায় বলল, 'হাঁ, খাচ্ছি।' বলেই আমটির বাটিটা ভাতের ওপর ঢেলে দিল।

মেরি এবার বলল, 'তোমার হোটেলে খাওয়া অভ্যেস; আমার রান্না নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।'

ভাত মুখে দিয়ে জোহন বলল, 'কোন শালে বললে ভালো লাগবে না! ফাইন রেঁধেছ। তোমার হাত দুটো চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।'

মেরি খুবই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। খুশিতে তার মুখটা ঝকমকিয়ে উঠল। কিছু না বলে একটু লাজুক হাসি হাসল সে। হোটেলে এর চাইতে অনেক ভালোই খায় জোহন। কিন্তু মেরির এই রান্না, কাছে বসিয়ে খাওয়ানো উদিপি হোটেলের গাদা-গাদা লোকের ভিড়, ভনভনে হট্টগোল কিংবা বয়দের ছোটাছুটি আর দায়সারা সারভিসের ভেতর পাওয়া যায় না। খুব ভালো লাগছে তার, খুবই ভালো লাগছে।

জোহনের খাওয়া হয়ে গেলে নিজেও খেয়ে নিল মেরি। এর মধ্যে তার শাড়ি-টাড়ি শুকিয়ে গিয়েছিল। বারান্দার কোণে গিয়ে বেড-কভার ছেড়ে শাড়িটা পরে নিল। তারপর ঘরে এসে জোহনকে বলল, 'আমি তা হলে কিং সার্কেল থেকে ঘুরে আসি?'

জোহন ঘাড় কাত করল, 'আচ্ছা—'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা ঢাউস কাপড়ের ব্যাগে যাবতীয় জামাকাপড় এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল মেরি।

সেই যে মেরি রান্না-বান্না শুরু করেছিল, এখন সেটা দু-বেলাই চালিয়ে যাচ্ছে। ভোরে উঠে প্রথমেই সে ঘর-টর পরিষ্কার করে ফেলে। তারপর ঝোপড়পট্টির কল থেকে জল নিয়ে আসে। এসেই আধ মাইল দূরে মিল্ক বুথ থেকে, দুধ আর বাজার থেকে পাও কিনে আনে। তারপর দুধ-টুধ গরম করে জোহনকে খেতে দেয়, নিজেও এক কাপ চা করে খেয়েই ছোটে খারের বাজারে। তবে বাজারে সে রোজ যায় না; একদিন অন্তর যায়। যেদিন বাজারে যায় সেদিন ফিরে এসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে রান্না চাপায়। যেদিন যায় না সেদিন টুকিটাকি ঘরের কাজ সেরে কিংবা জোহন ও তার ময়লা কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করে রাঁধতে বসে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বড় জোর ঘণ্টাখানেক শুয়ে নেয় মেরি। তারপরেই আবার স্টোভ ধরিয়ে এটা-সেটা করে জোহনকে খাওয়ায়। সন্ধে হতে-না-হতেই আবার রাতের খাবার তৈরি করতে

বসে। ন'টা বাজতে-না-বাজতেই জোহনকে খাইয়ে জোর করে শুইয়ে দ্যায়।

জোহ্‌ন অবাক চোখে মেয়েটাকে শুধু দেখেই যাচ্ছে, দেখেই যাচ্ছে। মেরি তাকে বলেছে, সে খুবই বাজে মেয়ে। এই বম্বে শহরে কোলাবা থেকে বোরিভিলি পর্যন্ত যে কয়েক হাজার বেশ্যা পোকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—মেরি তাদেরই একজন। সে একটা নোংরা ফ্লাইং প্রস্টিটিউট। যত রাজ্যের বদমাশ-লম্পট-গুন্ডার সঙ্গে তার নাকি কারবার। কিন্তু এই মেয়েটা যে রাঁধে-বাড়ে এবং পরম মমতায় জোহনকে খাওয়ায়, তার সঙ্গে শরাবি-ফরেবিদের সঙ্গিনী বেশ্যা মেরির আদৌ কোনও মিল নেই। ঝোপড়পট্টির পেটা টিন আর প্যাকিং বাক্সের এই ঘরটায় একটু-একটু করে গভীর আবেগে একটা সংসারের ছাঁদ ফুটিয়ে তুলছে সে।

জোহনের ভালোই লাগছে। তার জীবনে এ-এক নতুন এবং আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এক-এক সময় জোহ্‌ন ভাবে সে পুরোপুরি সুস্থ হলে মেয়েটা হয়তো চলে যাবে। তাকে চিরকাল তো আর আটকে রাখা যাবে না। তবু যদ্দিন থাকে এই নোংরা জঘন্য গন্ধা ঝোপড়পট্টিতে সে নিজের মনে ফুল ফুটিয়ে যাক।

দেখতে-দেখতে আরও দিনসাতেক কেটে গেল। জখম হয়ে আসার পর জোহ্‌ন তার দড়ির খাটিয়াটায় শুতো, আর মেরি নীচে বিছানা পেতে নিত। কিন্তু জোহ্‌ন এখন অনেক সুস্থ। দু-তিন দিন ধরে রাত্রিবেলা সে বাইরের বারান্দায় শুচ্ছে, মেরি থাকছে ঘরে।

মেরির অবশ্য এতে খুবই আপত্তি। সে বলেছে, 'এটা কী হচ্ছে ফুলুটবালা!'

ঝোপড়পট্টির অন্য সবার দেখাদেখি আজকাল জোহনকে সে ফুলুটবালাই বলে থাকে।

জোহ্‌ন হেসে-হেসে বলেছে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'দেখ ফুলুটবালা, তোমার এখানে আসার আগে এই বম্বে শহরের কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটাতে হয়েছে আমাকে। তুমি আর আমি একঘরে থাকলে আমার গায়ের চামড়া অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

ঠিক এই কথাগুলোই আরও একবার বলেছিল মেরি। কিন্তু হাজার আপত্তি বা জোর করেও রাত্রিবেলা জোহনকে ঘরে শোওয়ানো যায়নি।

যাই হোক, এরই মধ্যে একদিন দুপুরের দিকে ইফতিকার সাহেব আর সেই ফল্‌স্‌ বাজনদার ছোকরা হাবিব এসে হাজির। ইফতিকার সাহেব মাঝখানে বেশ কয়েকদিন আসেনি। খুব সম্ভব নানা জায়গায় বাজাতে গিয়ে আসার সময় করে উঠতে পারেনি।

মেরি তখন বারান্দায় বসে রান্না করছিল। কোমরে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ তাকে ঘুরে-ফিরে দেখল ইফতিকার সাহেব। দেখতে-দেখতে একচোট বগবগিয়ে হাসল। তারপর আচমকা এক হ্যাঁচকায় হাসিটা থামিয়ে দিয়ে গমগমে গলায় বলে উঠল, 'বাহ্‌, বহুত আচ্ছা—'

ক'দিন যাতায়াতের ফলে মেরির সঙ্গে তার ভালোই আলাপ হয়েছে। মেরি বুঝে ফেলেছে লোকটা আমুদে, হাসিখুশি আর দারুণ মজাদার। ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, 'কী বহুত আচ্ছা?'

ইফতিকার সাহেব বলল, 'এই যে রান্না করে ওই শালেকে খাওয়াচ্ছিস।' আজ মেরিকে 'তুই' করেই বলতে শুরু করে দিল সে, 'চিটমবাজ ছোকরি, চালিয়ে যা টমটম, চালিয়ে যা—'

মেরি হাসতে-হাসতে বলল, 'দেখা যাক।' বলে একটু চুপ করল। তারপর আবার বলল, 'এবার কিন্তু তুমি অনেকদিন পর এলে চাচা।'

ইফতিকার সাহেব বলল, 'হাঁ, রোজ সকাল থেকে মাঝরাত্তির অব্দি দু-শিফটে বাজাতে হয়েছে। আসি কী করে? সেই গাধ্‌ধে কা পাঠ্‌ঠেটা কোথায়?'

এই মধুর সম্ভাষণটা কার উদ্দেশ্যে মেরি বুঝতে পারল। বলল, 'যাও, ঘরেই আছে। চা আর পকোড়া নিয়ে যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে ঢুকল ইফতিকার সাহেব। তার পিছু-পিছু ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো হাবিবও।

ঘরে ঢুকেই চড়বড়িয়ে মিনিট তিনকে খিস্তি দিয়ে গেল ইফতিকার। তারপর জানলা দিয়ে পানের পিচ ফেলে এসে বলল, 'এখন কেমন আছিস?'

জোহন বলল, 'অনেক ভালো।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ছোকরিকে নিয়ে রোল্‌স্‌ রয়েস চালিয়ে যাচ্ছ।'

'কিন্তু চাচা, একটা ঝামেলা হয়েছে। ক'দিন ধরে গলায় এক ফোঁটা ঠার্‌রা পড়ছে না। জিভ-টিভ শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে।'

'শালে উল্লু-কা-বান্দর! ঠিক আছে, তোর ঠার্‌রার বন্দোবস্ত করে যাব। লেকিন আমার কী হবে? কবে বাজাতে আসছিস?'

জোহন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আরেক প্রস্থ খিস্তি দিয়ে ইফতিকার সাহেব আবার যা বলল তা এইরকম—'নবি ব্যান্ড'-এর সেই ক্লারিওনেটওলাকে কাজ চালাবার জন্য ডেকে এনে দলের মান ইজ্জত ডুবতে বসেছে। শালার কলিজায় না আছে দম, গলায় না আছে সুর। সে একটা ফুঁ দিলে ক্ল্যারিওনেট থেকে একসঙ্গে বাইশ রকম আওয়াজ বেরোয়। এই নিয়ে তিন চার জায়গায় যা-তা কাণ্ড হয়ে গেছে। কাস্টমাররা দলের পাওনা টাকা থেকে টাকা কেটে নিতে চেয়েছে। কাটার কথাই। নগদ পয়সা দেবে; বাজনা খারাপ হলে তারা ছেড়ে দেবে কেন? তিন-চার জায়গায় খিস্তি করে-করে কাস্টমাররা তার বাপ-মা-চোদ্দো-পুরুষকে জাঁহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা কি ইফতিকার সাহেবের বাপের সম্বন্ধী না ভায়রাভাই, যে যা বাজাবে তাতেই তাদের মেজাজ তর হয়ে যাবে! এখন মেহেরবানি করে জোহন যদি বাজাতে যায় তো দলের মুখরক্ষা হয়। আর সে গেলেই 'নবি ব্যান্ড'-এর ওই গাধ্ধেকা পাঠ্‌ঠের পাছায় গুনে-গুনে বারোটা লাথি হাঁকিয়ে ভাগিয়ে দেবে।

সব শুনে চুপ করে রইল জোহন। কেন না আজই সকালে ডাক্তার গিল্ডার এসে বলে গেছে, আরও আট-দশ দিন তার বেরুনো চলবে না। ক্ল্যারিওনেট বাজানো খুবই পরিশ্রমের কাজ। ফুসফুস থেকে হাওয়া বের করে একনাগাড়ে সাত-আট ঘণ্টা বাজাতে হলে মাথার দুর্বল শিরাগুলো ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদিকে 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র সুনাম যেতে বসেছে।

ইফতিকার সাহেব এবার অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'কি রে, স্ক্রু দিয়ে মুখটা আটকে রাখলি যে। কিছু বলবি তো—'

জোহন খানিকটা ইতস্তত করে কাঁচমাচু মুখে গিল্ডারের কথাগুলো বলে একটু থামল। তারপর বলল, 'এখন তুমি আমাকে কী করতে বলো?'

তিন মিনিট ধরে নতুন উদ্যমে তার স্বভাবসিদ্ধ খিস্তিটিস্তি করে ইফতিকার সাহেব বলল, 'কুত্তাকে বক্‌রা, আমি একটা মানুষ না জানোয়ার—আগে তাই বল?'

জোহন হকচকিয়ে গেল, 'কী বলছ চাচা!'

কিন্তু কে কার কথা শোনে, ইফতিকার সাহেব চিৎকার করে সেই একই কথা বলে গেল। অর্থাৎ সে মানুষ না জানোয়ার, এই প্রশ্নটার উত্তর জোহনকে দিতেই হবে। জোহনকে স্বীকার করতেই হল, ইফতিকার সাহেব অবশ্যই একটা মানুষ, জানোয়ার নয়।

ইফতিকার সাহেব এবার বলল, 'আমি যদি মানুষই হই তোকে এই অবস্থায় যেতে বলতে পারি? যদ্দিন ডাক্তার তোকে বাজাতে না দিচ্ছে, তদ্দিন বাজাতে হবে না। এতে যদি আমার ব্যান্ডপার্টি উঠে যায় তো যাবে।'

কৃতজ্ঞতায় চোখে প্রায় জল এসে গেল জোহনের। সে কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই একসময় চা-পকোড়া দিয়ে গেল মেরি।

আরও কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে জোহনকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে একসময় উঠে পড়ল ইফতিকার সাহেব। যখনই সে আসে, কিছু টাকা দিয়ে যায়।

একধারে চুপচাপ বসে ছিল হাবিব। ইফতিকার সাহেব তাকে বলল, 'চল আমার সঙ্গে।'

তারপর জোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছোকরাকে নিয়ে গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যে ওকে দিয়ে একটা জিনিস পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিমূঢ়ের মতো যোহন বলল, 'কী জিনিস?'

'শালে গাধ্‌ধে কা পাঠ্‌ঠে।' বলেই ঝপ করে গলার স্বরটা নামিয়ে দিল ইফতিকার সাহেব, 'তখন বলছিলি না গলা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে। একটা ঠার্‌রার বোতল দরকার হবে না?'

'চাচা তোমার জবাব নেই।' জোহন হাত বাড়িয়ে ইফতিকার সাহেবের কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

আলতো করে চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ইফতিকার সাহেব। আদরের সুরে বলল, 'কুত্তা কা বকরি! ছোড় শালে, ছোড়।'

একটু পরে হাবিবকে নিয়ে চলে গেল ইফতিকার সাহেব। আধঘণ্টা নয়, পুরো ঘণ্টা দেড়েক বাদে খবরের কাগজে মুড়ে একটা পেটমোটা ঠার্‌রার বোতল হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এল হাবিব। এর মধ্যে জোহনদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জোহন তার দড়ির খাটিয়াটায় শুয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দূরে ছবির মত ধূ-ধূ সমুদ্র দেখছিল; দিগন্তের ফ্রেমে আটকানো একটা নীল কাচের মতো সেটা পড়ে আছে। অগুনতি জেলে নৌকো, দু-চারটে স্পিড বোট—যতদূর চোখ যায় কালো-কালো ফুটকির মতো ছড়িয়ে আছে। আর দেখা যাচ্ছে সি-গাল পাখিগুলোকে। ঝকঝকে নীলাকাশে দুপুরের ঝলমলে রোদ গায়ে মেখে পাখিগুলো দাঁড়ের মতো ডানা ছড়িয়ে দিয়ে বাতাস কেটে-কেটে উড়ছিল। মেরি বাইরের বারান্দায় তেরপলের একটা টুকরো পেতে শুয়ে পড়েছে। দিনের বেলাটা মেরি বাইরের বারান্দায় শোয়; তখন ঘরে থাকে জোহন। রাত্রে অবশ্য তারা জায়গা বদলে নেয়। এখন এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

হাবিব ঘরে ঢুকে ঠার্‌রার বোতলটা জোহনের হাতে দিয়ে খাটিয়ার একধারে হাত-পা গুটিয়ে বসল।

কাগজের মোড়ক খুলে বোতলটা বার করে সস্নেহে হাত বোলাতে লাগল জোহন। জখম হয়ে ঝোপড়পট্টিতে ঢোকার পর এই প্রথম সে মদের বোতলের চেহারা দেখল। ঠার্‌রার অভাবে এ ক'দিন সে সাধু-মাহাত্মার জীবন যাপন করছিল। ইফতিকার চাচার দারুণ বিবেচনা; ঠার্‌রা বিহনে তার যে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, সেটা ঠিকই ধরে ফেলেছে সে। এইজন্যে লোকটাকে তার এত ভালো লাগে। যাক, অনেকদিন বাদে আজকের সন্ধেটা জমবে ভালো।

কিছুক্ষণ হাত-টাত বুলিয়ে বোতলটা খাটিয়ার তলায় রাখল জোহন। তারপর হাবিবের দিকে ফিরে বলল, 'তোর খবর বল।'

হাবিব বলল, 'আমার সব খবরই তো তুমি জানো; নতুন কিছু নেই।' একটু থেমে আবার বলল, 'চার টাকা মজুরি পাই; এতে কী হয় বলো। নিজে খাব, না বাড়িতে পাঠাব? বাড়িতে কিছু না পাঠালে বাপ-মা ভূখা মরে যাবে।'

এসব খবর জোহন জানে। তবু নতুন করে ছেলেটার জন্য আর-একবার সহানুভূতি বোধ করল সে।

হাবিব এবার বলল, 'এখন তুমিই ভরোসা চাচা। তুমি যদি তাড়াতাড়ি তালিম দিয়ে ফ্লুট বাজনাটা শিখিয়ে দাও বেঁচে যেতে পারি; নইলে খুদকুশি (আত্মহত্যা) হয়ে মরতে হবে।'

একটু চুপ করে থেকে জোহন ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তোকে তালিম দেব। যে ক'দিন ঘরে আটকে আছি, রোজ আসতে পারবি?'

'আসছে সপ্তাহে দু-দিন দলের বায়না আছে। একদিন বাজাতে যেতে হবে কল্যাণ, আর-একদিন অম্বরনাথ, তার পরের সপ্তাহে বায়না নেই। ওই দু-দিন বাদ দিয়ে দু-সপ্তাহের সব দিন আসতে পারব। তবে এর মধ্যে যদি নতুন বায়না এসে পড়ে তো আসা যাবে না।'

'ঠিক আছে, দু-দিন বাদ দিয়ে আপাতত আসতে থাক। নতুন বায়না এলে পরে ভাবা যাবে।'

হাবিবের দু-চোখ আশায় খুশিতে চকচক করতে লাগল। ঝুঁকে জোহনের পা ছুঁয়ে সে বলল, 'চাচা গোটা জিন্দেগি আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।'

দু-কাঁধ ধরে হাবিবকে তুলতে-তুলতে জোহন বলল, 'গোলাম আবার কী। তুই তালিম নিয়ে পয়সা কামাতে শিখলেই আমি খুশি। তবে একটা কন্ডিশান—'

এই হাজার জাতের কসমোপলিটান বম্বে শহরে সবাই কথায় কথায় ইংরেজির খই ফোটায়। জোহন গোয়াঞ্চি ক্রিশ্চান অর্থাৎ পিদ্রু। ইংরেজিটা আজন্ম তার রক্তের মধ্যেই রয়েছে, তবে সেটা ভুল-ভাল ইংরেজি। অন্য সবার মতো ইংরেজি মেশানো হিন্দিটাই সে বেশি বলে থাকে।

হাবিব বলল, 'তুমি যে কন্ডিশান বলবে, আমি তাতেই রাজি।'

'আমি তোকে তালিম দিচ্ছি এ-কথা যেন কেউ জানতে না পারে। জানিসই তো এ-লাইনে এভাবে কেউ তালিম দেয় না; দু-চার বছর মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হয়। ইফতিকার চাচার কানে যদি কথাটা যায় দারুণ ঝামেলা হয়ে যাবে। আমি সাদাসিধা ভোলাভালা একটা লোক। আমি কিন্তু কোনও লাফড়ায় যেতে পারব না।'

হাবিব বলল, 'ব্যান্ড বাজিয়ে হয়ে আমি ইফতিকার চাচাকে একথা বলতে যাব, এটা তুমি ভাবতে পারলে! আমার কি মাথা খারাপ! কীসে আমার ভালো, কীসে বুরা (মন্দ), জানি না!'

'ঠিক আছে, কাল সকালে চলে আসিস। দুপুরে ফিরতে হবে না। আমার এখানেই খাবি।'

কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল হাবিবের। জোহনের মনে হল, ছোকরা বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। বুঝবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে বলল, 'যা, এবার ভাগ, আর হাঁ—একটা কথা, তোর ফ্লুট আছে?'

'পয়সা জমিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড ফ্লুট কিনেছি, তবে খুব ভালো না—'

'ভেরি গুড। ওতেই চলবে।'

হাবিব চলে যাবার পর জানালার বাইরে আবার তাকাল জোহন। তারপর সমুদ্র আর আকাশের ফ্রেমে আটকানো একটু আগের সেই ছবিটা দেখতে-দেখতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

টানা একটা ঘুম লাগিয়ে জোহন যখন উঠল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ডান্ডা কোস্টের এই দিকটার ওপর পাতলা ওড়নার মতো আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। সমুদ্র বা আকাশ, কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না; সব ঝাপসা।

সে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গে মেরি খুট করে আলো জ্বেলে দুধ-টুধ খেতে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঠার্‌রার বোতলটার কথা জোহনের মনে পড়ল। খাটিয়ার তলায় সেটি মজুত রয়েছে। ঘরে আস্ত একটা বোতল থাকতে দুধ খেতে কারও ভালো লাগে, না দুধ খাওয়ার মানে হয়? কিন্তু সে-কথাটা মেরিকে বলা গেল না। কেন না এই ক'দিনের মধ্যেই সে বুঝে ফেলেছে, মেয়েটা ভীষণ একরোখা আর জেদি। সে যা বলবে তাই করতে হবে, যা করবে তাই মেনে নিতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত অন্যায় বা অসঙ্গত কোনও জেদ সে ধরেনি। যেটুকু করেছে সবই জোহনকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করবার কথা ভেবে।

বাইরে থেকে মুখ-টুখ ধুয়ে এসে জোহন গুচ্ছের চিরতা গেলার মতো মুখ করে এক নিশ্বাসে দুধটা খেয়ে ফেলল; তারপর শুকনো স্টোন চিপ্‌স্ চিবুনোর মতো করে চিকু আর পেঁপে খেতে লাগল।

জোহনকে খেতে দিয়ে মেরি এক কাপ চা আর কড়কড়ে টোস্ট বিস্কুট নিয়ে মেঝেতে বসে ছিল। দু-জনের খাওয়া হয়ে গেলে অ্যালুমিনিয়মের প্লেট গেলাস-টেলাস নিয়ে বাইরে চলে গেল।

একটু পর জোহন দেখতে পেল মেরি বারান্দায় বসে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করছে।

খাটিয়া থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল জোহন। মেরির সঙ্গে এলোমেলো দু-একটা কথা বলে ঝোপড়পট্টির রাস্তায় গিয়ে নামল।

মেরি পিছন থেকে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

জোহন বলল, 'সারাদিনই তো ঘরে বসে আছি, একটু ঘুরে-টুরে আসি। হাত-পায়ে জং ধরে যাচ্ছে।'

'বেশি দূরে যেয়ো না।'

'আরে না-না—'

ঝোপড়পট্টির ভেতর এলোমেলো ঘুরতে লাগল জোহন। এর মধ্যে ঘরে-ঘরে এবং দূরে রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো জ্বলে উঠেছে। ঘুরতে-ঘুরতে মাদারি খেলোয়াড়ের ঘরে একবার ঢুঁ মারল জোহন। মাদারি খেলোয়াড় নেই, তার বউ রয়েছে। তার সঙ্গে দু-একটা মজার কথা বলে পোস্টার সাঁটিয়ের ঘরে উঁকি দিল। সেখানে এক কাপ চা খেয়ে গেল সোমবারিদের ঘরে। খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে আবার নিজের আস্তানার দিকে চলল।

ঘুরছে-ফিরছে লোকের সঙ্গে গল্প-টল্প করছে, মজার-মজার কথাও বলছে, তবু মাথার মধ্যে সেই ঠার্‌রার বোতলটা আটকে আছে। দুধ খেয়েই ওটার ছিপি খুলবে ভেবেছিল; কী ভেবে খোলেনি। এখন মুখ থেকে দুধের গন্ধ মিলিয়ে গেছে। ঝুপড়িতে ফিরে এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করবে না জোহন, বোতল খুলে ফেলবে।

ঘরে এসে সত্যি-সত্যিই বোতলটা খুলে ফেলল জোহন। টেবিলের ওপর একটা হাতল-ভাঙা কাপ উপুড় করা ছিল, সেটা চিত করে ঠার্‌রা ঢেলে নিল। তারপর মেরিকে ডেকে পাঁপড় সেঁকে সঙ্গে পেঁয়াজ কুচিয়ে দিতে বলবে, ঠিক সেই সময় মেরি নিজে এসেই হাজির। খুব সম্ভব রান্নার জন্য মশলাপাতি নিতে ঘরে ঢুকেছে সে। কাপ-ভর্তি ঠার্‌রা এবং পাশে একটা খোলা বোতল দেখে প্রথমে চক্ষুস্থির। পরমুহূর্তে আঙুল বাড়িয়ে ঠার্‌রা দেখিয়ে বলল, 'ওটা কী?'

জোহন এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বলল, 'ওটার জন্যেই তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম; তার আগেই গড্‌ তোমাকে পাঠিয়ে দিলে। এক কাজ করো, চট করে ক'টা পাঁপড় সেঁকে, পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়ে এসো।'

চোখ দুটো এখনও স্থির হয়েই আছে মেরির। সে বলল, 'ঠার্‌রা পেলে কোথায়?'

'সে পেয়েছি—'

'ওটা কেনবার জন্যেই বুঝি বাইরে যাওয়া হয়েছিল?'

'আরে না-না, ওটা ঘরেই ছিল।'

'ঘরে এল কী করে—উড়ে? বোতলটার ডানা আছে নাকি?'

জোহন ভেতরে-ভেতরে টের পেল, লক্ষণ ভালো নয়। সে মিটিমিটি হাসতে লাগল; তবে তার সঙ্গে একটু ভয়ের ভাবও মেশানো।

মেরি এবার বলল, 'ডাক্তার না তোমাকে সেদিন বলে গেল এখন শরাব খাবে না!'

মেয়েটার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ। গিল্ডার সত্যি-সত্যি তাকে ঠার্‌রা-ফার্‌রা খেতে বারণ করে গেছে। কিন্তু বেছে-বেছে এই কথাটা মনে রাখার কী এমন দরকার ছিল? চুরি ধরা পড়ে যাবার মতো গলায় জোহন বলল, 'বারণ করেছিল নাকি?'

'মনে পড়ছে না?' সোজাসুজি জোহনের দিকে তাকাল মেরি।

জোহন উসখুস করতে লাগল, 'না ঠিক, তবে—'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মেরি জিগ্যেস করল, 'তবে কী?'

'বললেও গিল্ডার ডাক্তারের কথা মেনে চলার দরকার নেই।'

'কেন?'

'শরাবিকে শরাব খেতে বারণ করছে, এ-কথা মানতে হবে? তা ছাড়া ও নাম-কাটা ডাক্তার। ওর রেজিস্ট্রেশন কেড়ে নিয়েছে। ওর সব কথা না মানলেও চলে।।'

এবার চাপা গলায় মেরি বলল, 'তোমার মতলব খুব খারাপ।'

দম-আটকানো স্বরে জোহন জিগ্যেস করল, 'কেন?'

'ভেবেছিলাম, তুমি আর-একটু ভালো হয়ে উঠলেই চলে যাব। ভালো হবার কোনও ইচ্ছাই তোমার দেখছি না। ঠার্‌রা গিলে আবার শরীর খারাপ করে বোসো; তা হলেই আমাকে আরও কিছুদিন ফাঁসাতে পারো। কিন্তু ও চালাকি তোমার চলবে না।'

এই ঝোপড়পট্টিতে এসে বেশ পোষ মেনে যাচ্ছিল মেরি। এতদিন কোলাবা থেকে বোরিভিলি পর্যন্ত শরাবি-ফরেবি-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বেড়াত সে; সেই উড়ুক্কু ভাবটা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল তার। এখানে, এই নোংরা জঘন্য কুৎসিত ঝোপড়িতে একটা সংসারের চেহারা একটু-একটু করে ফুটিয়ে তুলতেও শুরু করেছিল। আচমকা আবার এখান থেকে চলে যাবার কথা কেন বলছে, কে জানে! মনটা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল জোহনের। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দুম করে এক কান্ড করে বসল মেরি; ঠার্‌রার বোতলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল। তারপর কাপটা নিয়ে গিয়ে সবটুকু ঠার্‌রা বাইরে ঢেলে ফেলল।

পরের দিন সকালে আটটা বাজতে না বাজতেই হাবিব তার সেকেন্ড হ্যান্ড ক্ল্যারিওনেটখানা নিয়ে হাজির। আসামাত্র দেরি করল না জোহন; নিজের ক্ল্যারিওনেটের বাক্সটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, 'চল, সি-র ধারে যাই।

জোহনের ইচ্ছা, সমুদ্রের পাড়ে নিরিবিলিতে হাবিবকে তালিম দেবে। তা ছাড়া ঝোপড়পট্টিতে বাজনা শেখাতে বসলে লোকের চোখে পড়বে। জানাজানি হতে-হতে হয়তো ইফতিকার সাহেবের কানে চলে যাবে খবরটা। তাছাড়া দুম করে ইফতিকার সাহেব নিজেই কখন এসে হাজির হয়।

জোহনরা যখন ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছে, মেরি বলল, 'কোথায় চললে?'

জোহনের হঠাৎ খেয়াল হল, মেরিকে হাতে রাখা দরকার। সংক্ষেপে হাবিবের ব্যাপারটা জানিয়ে সে মেরিকে বলল, 'সমুদ্রের দিকে যাচ্ছি। হাবিবের তালিম নেবার কথা কারওকে বোলো না।'

'আচ্ছা। কিন্তু ডাক্তার বলছিল, ফ্লুট বাজালে মাথার শিরে চোট লাগবে।'

'অনেকক্ষণ বাজালে চোট লাগবে বলেছে। হাবিবকে একটু-আধটু দেখিয়ে দেব। খুব আস্তে-আস্তে বাজাব— নিজেকে বাঁচিয়ে। তুমি ভেবো না।'

মেরি আর কিছু বলল না। হাবিবকে নিয়ে জোহন ঝোপড়পট্টির ভেতর দিয়ে সি-কোস্টের দিকে চলল। তার কাঁধে ক্ল্যারিওনেটের বাক্স দেখে ঝোপড়পট্টির দু-ধারের ঘর থেকে গাদা-গাদা বাচ্চা ছুটে এসে তাকে মাছির মতো ছেঁকে ধরতে লাগল। তাকে ঘিরে ধরে যেতে-যেতে ভ্যানভেনে গলায় বলতে লাগল, 'জোহনচাচা, আজ কিন্তু বাজনা শোনাতে হবে। কিছুতেই তোমাকে ছাড়ছি না।

সময় পেলেই ঝোপড়পট্টির, বাচ্চাদের সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে গিয়ে ক্ল্যারিওনেট শোনায় জোহন। মাঝখানে 'আনারকলি ব্যান্ড'-এর হাতে এত বায়না ছিল যে, অনেকদিন ওদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাওয়া হয়নি। জোহন বলল, 'আচ্ছা চল। কিন্তু একটার বেশি গান বাজাব না কিন্তু। আমাদের কাজ আছে।'

ছেলের দল তাতেই রাজি।

সি-কোস্টে এসে প্রথমে একটা চটকদার হিন্দি ছবির গান বাজিয়ে শোনাল জোহন। একটি গান বাজিয়েই বেশ হাঁপিয়ে গেল সে। মাথার পিছন দিকটা দপদপ করছে। নাঃ, শরীরটা ভালো রকমই জখম হয়েছে। গিল্ডার ঠিকই বলেছে, আরও কিছুদিন তাকে ঝোপড়পট্টিতে চুপচাপ পড়ে থাকতে হবে।

খানিকটা জিরিয়ে দমবন্ধ ভাবটা আর মাথার দপদপানি কমলে বাচ্চাগুলোকে আগে ঝোপড়পট্টিতে পাঠিয়ে দিল জোহন। তারপর ছোট্ট একটা গত বাজিয়ে হাবিবকে বলল, 'বাজা—'

একবারেই সুরটা তুলতে পারল না হাবিব। তিন-চারবার দেখাবার পর সুরটা তুলে নিল।

ইতিমধ্যে বেলা বেশ চড়ে গেছে। আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে-বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ভোরবেলা যে জেলে-নৌকা আর স্পিডবোটগুলো বেরিয়ে পড়েছিল, সমুদ্রের দূর দিগন্ত থেকে সেগুলো একে-একে ফিরে আসতে শুরু করেছে। আকাশের কোথাও একটা সি-গাল দেখা যাচ্ছে না; সাগরপাখিগুলো অনেক আগেই উধাও হয়ে গেছে। আরবসাগর এই মুহূর্তে জুন মাসের গনগনে রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে। সেদিকে কেউ তাকিয়ে থাকবে, সাধ্য কী।

জোহন বলল, 'চল, এবার ফেরা যাক। ওবেলা আবার আসব।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল জোহন। হাবিবের দুপুরে ঘুমনোর অভ্যেস নেই। সে মেঝেতে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে গেল। তারপর বেলা হেলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে রোদের রং যখন ঘন হয়ে এল, সূর্য যখন আরবসাগরের জল ছুঁই-ছুঁই করছে, সেই সময় ঘুম ভাঙল জোহনের। তাড়াতাড়ি মুখ-টুখ ধুয়ে হাবিবকে নিয়ে আবার সমুদ্রের পাড়ে এল। তাকে অন্য একটা গত তালিম দিতে-দিতে সন্ধে হয়ে গেল। একসময় ক্ল্যারিওনেটখানা মুখ থেকে নামিয়ে বাক্সে পুরতে-পুরতে জোহন বলল, 'আজ থাক, কাল আবার আসিস।'

হাবিবও তার ক্ল্যারিওনেটটা খাপে পুরে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব, তবে খাব না।'

জোহন হাসল, 'কেন রে?'

'একে তো বাজনা শেখাচ্ছ। তার ওপর রোজ-রোজ খেলে তোমার ওপর জুলুম করা হবে চাচা। তা আমি পারব না।'

'বহুত পয়সা হয়েছে বুঝি তোর? টিকিট কেটে ভেন্ডিবাজার থেকে এখানে আসছিস; তার ওপর হোটেলে খাবি! একটা কথা শুনে রাখ উল্লুকা বান্দর—'গালাগালটা ইফতিকার সাহেবকে নকল করেই দিল জোহন।

'কী কথা?'—ভয়ে-ভয়ে তাকাল হাবিব।

'যদি না খাস, তালিম দিতে পারব না। সাফ বাত।'

'ঠিক আছে, খাব।' ঘাবড়ে গিয়ে এবার বলে ফেলল হাবিব।

'বহুত আচ্ছা—' হাবিবের পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিল জোহন।

একটু পর দেখা গেল ঝোপড়পট্টির কাছাকাছি এসে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে সোজা ঘোড়বন্দর রোডের দিকে চলে গেল হাবিব। ওখান থেকে বাসে উঠে সোজা বান্দ্রা স্টেশনে গিয়ে হারবার লাইনের ট্রেন ধরবে। আর জোহন ক্ল্যারিওনেটের বাক্সখানা কাঁধে চাপিয়ে দুর্মনস্কর মতো হাঁটতে-হাঁটতে ঝোপড়পট্টিতে এসে ঢুকল। নিজের ঘরের কাছে আসতেই তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ঘরের ভেতর তার ট্রানজিস্টর রেডিওটা চলছে হয়তো। আশ্চর্য সুরেলা একটা গান সেখান থেকে ভেসে আসছে। মেরিকে বারান্দায় দেখা গেল না। খুব সম্ভব ঘরে বসে ট্রানজিস্টরটা চালিয়ে দিয়ে সে শুনছে।

বাইরে থেকে জোহন আস্তে করে ডাকল, 'মেরি—' ডেকেই সে বারান্দায় উঠে এল। সঙ্গে-সঙ্গে গানটা থেমে গেল। আর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মেরি।

জোহন বলল, 'এ কী, রেডিওটা বন্ধ করে দিলে কেন। ফাইন গান হচ্ছিল।'

একটু অবাক হয়ে মেরি বলল, 'রেডিও বাজছিল না।'

হঠাৎ জোহনের মনে পড়ে গেল, রেডিওটা চলার কথা নয়। কয়েক মাস আগে ওটার ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর আর নতুন ব্যাটারি কিনে এনে লাগানো হয়নি। ওই অবস্থাতেই ওটা টেবলে পড়ে আছে। বিমূঢ়ের মতো জোহন বলল, 'তা হলে?'

'তা হলে কী?'

'গান শুনলাম যে!'

মেরি দ্রুত একবার জোহনের দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল। তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেলল জোহন। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে বিস্ময়ের সুরে বলল, 'তুমি গাইছিলে নাকি!'

মেরি উত্তর দিল না। তার মুখটা এখন দেখার মতো। লজ্জায় সেখানে লালচে ছোপ ধরেছে। যে মেয়ে অকপটে নিজের গ্লানিকর পেশার কথা বলেছে, বেপরোয়া ভঙ্গিতে যে জানিয়েছে সে একটা দারুণ খারাপ মেয়ে, একটা বাজে টাইপের প্রস্টিটিউট—তার এখনকার মুখ দেখে কিন্তু অবাক হতে হয়। আচমকা তার সব চাইতে গোপন লজ্জার কারণটা যেন জোহনের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

জোহন আবার বলল, 'চুপ করে আছ কেন? তুমিই গাইছিলে?'

মুখ তুলল না মেরি। সেই অবস্থাতেই আধফোটা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতের মুঠোয় গাদা-গাদা সোনার মোহর পেয়ে গেলে যেমন হয়, জোহনের এখনকার মনের অবস্থা অনেকটা সেইরকম। মেরির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতে লাগল। মিনিটখানেক এইভাবেই কাটল। তারপর মেরির একটা হাত ধরে তাকে প্রায় উড়িয়েই ঘরের ভেতর নিয়ে এল জোহন। কাঁধ থেকে ক্ল্যারিওনেটের বাক্সটা নামিয়ে রেখে মেরিকে খাটিয়ায় বসিয়ে দিল। পরক্ষণে নিজের কোমরে হাত দুটো রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা কীরকম হল?'

প্রশ্নটা বুঝতে না পেয়ে মেরি জিগ্যেস করল, 'কোনটা?'

'পনেরো-ষোলো দিন তুমি এখানে আছ। কই আমাকে বলোনি তো এত ভালো গাইতে পারো তুমি!'

লাজুক হেসে মেরি বলল, 'যাঃ! একে আবার ভালো গাওয়া বলে নাকি!'

মোটা এবং গাঁট-পাকানো তর্জনীর ডগা দিয়ে মেরির থুতনিটা তুলে ধরে জোহন বলল, 'তোমার গলায় আনারের দানা বসানো আছে। তুমি গাইলে লতা মঙ্গেশকর আর আশা ভোঁসলের মতো নাম করতে পারবে।'

জোহনের আঙুলটা সরিয়ে দিয়ে মেরি বলল, 'কী যে বল! কাদের সঙ্গে কার তুলনা। তোমার মাথা খারাপ।'

জোহন বলল, 'আমি একটা গরিব আদমি—এ পুওর ম্যান। ব্যান্ডপার্টিতে ফুলুট বাজাই, ঠার্‌রা খাই আর ঝোপড়পট্টিতে পড়ে থাকি বলে আমার কথা কানে তুলতে চাইছ না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ছোকরি—দিস ম্যান, দিস 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র ফুলুটবালা, হাঁ করে একটা আওয়াজ বার করলে বলে দিতে পারে, কার গলায় সুর খেলবে, আর কার গলায় খেলবে না।'

রগড়ের গলায় মেরি এবার বলল, 'তুমি দেখছি খুব সমঝদার আদমি।'

'জরুর, হাজারবার। একটু আগে যে গানটা গাইতে-গাইতে থেমে গিয়েছিলে, সেটা পুরো গেয়ে ফ্যালো দেখি।'

'হ্যাঁ, এটা তো গান গাইবারই সময়। আমার বলে এখন রান্না চড়াতে হবে।' বলেই উঠে পড়ল মেরি।

তার দু-কাঁধ ধরে আবার বসিয়ে দিল জোহন। বলল, 'রান্না-টান্না ফায়ার করে দাও। নো

কুকিং বিজনেস নাউ, এখন শুধু গান—স্টার্ট।'

'তুমি কি খেপে গেলে ফ্লুটবালা?'

'হ্যাঁ, খেপেই গেলাম—স্টার্ট।'

খানিকক্ষণ জোরজার করতে সেই গানটা গোটা গেয়ে ফেলল মেরি। ফিল্মেরই গান ওটা—স্নিগ্ধ প্রেমের গান। রেকর্ডে রেডিওতে আগেও গানটা শুনেছে জোহন। কিন্তু ফিল্মে যে প্লে-ব্যাক করেছিল, তার চাইতে ঢের ভালো গাইল মেরি। প্লে-ব্যাকে প্রচুর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু খালি গলায় গেয়ে তার চাইতে অনেক বেশি এফেক্ট এনে দিয়েছে মেরি।

চোখ বুঁজে শুনে যাচ্ছিল জোহন। তার সমস্ত স্নায়ুর ওপর দিয়ে প্রথম বর্ষার বৃষ্টিপাতের মতো রিম-ঝিম করে কী বেজে যাচ্ছিল। গান থামলে চোখ মেলে সে বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস!'

মেরি একটু হাসল।

জোহন বলল, 'আর একটা হোক।'

মেরি এবার আপত্তি করল না। তার সংকোচ বা লজ্জা অনেকটাই কেটে গেছে।

মেরির দ্বিতীয় গানটাও ফিল্মের গান এবং প্রেমেরও। এটাও দারুণ গাইল সে; চড়ায় এবং খাদে দু-জায়গাতেই তার গলায় সমান কারুকাজ।

দ্বিতীয় গানটি শোনার পর জোহন বলল, 'কামাল করে দিয়েছ ছোকরি।'

প্রশংসার কথাটা ভালো লাগল মেরির। এবারও সে হাসল, কিছু বলল না। জোহন আবার বলল, 'তুমি কার কাছে গান শিখেছ?'

মেরি বিষাদের সঙ্গে কৌতুকের ঝাঁজ মিশিয়ে বলল, 'ভালো কথাই বলছ! খেতে পেতাম না, তার ওপর আবার গান শিখব! যেটুকু শিখেছি রেডিও কি মাইকে রেকর্ড বাজানো শুনে।'

বলতে-বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল মেরির। ঈষৎ গলা চড়িয়ে দিল সে, 'ও ভালো কথা—'

'কী?'

'বছর কয়েক আগে ইউ-পির এক পয়সাওলা ঘরের রইস ছোকরা ব্যান্ড স্ট্যান্ডে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে আমাকে রেখেছিল। ছোকরার গান-বাজনার ঝোঁক ছিল; আর্টিস্টিক মেজাজ। আমার গান শুনে দুম করে একটা গানের মাস্টার রেখে দিয়েছিল; সঙ্গে একটা তবলচি। গদগদ হয়ে সব সময় সে বলত, আমাকে লতা মঙ্গেশকর বানিয়ে ছাড়বে। তখন কিছুদিন গানের তালিম নিয়েছিলাম।'

'তারপর—'

'তারপর আর কী। আমি তো তখন সুখের বাতাসে ডানা মেলে উড়ছি। কিন্তু ডানাটা একদিন আচমকা বিনা নোটিশেই কাটা গেল; আর আমি ঝুপ করে আবার ব্যান্ড স্ট্যান্ডের ষোলো-তলা বাড়ির মাথা থেকে যে ফুটপাথে ছিলাম, হাড়গোড় ভেঙে সেই ফুটপাথেই এসে পড়লাম।'

'তার মানে?'

'তার মানে হল, কীভাবে খোঁজখবর করে ছোকরার বাপ ইউ-পি থেকে ব্যান্ড স্ট্যান্ডের সেই অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির। তখন গানের জমজমাট আসর চলছে। সেই ছোকরার বাপ ওখানকার এক বড় বিজনেসম্যান, বিরাট পাকানো গোঁফ, বাঘের মতো চোখ, ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, প্রায় সাত ফুট লম্বা—আমার চুলের ঝুঁটি ধরে পেছনে তিনটে লাথি মেরে বাইরে বের করে দিল। তারপর তবলচি আর গানের মাস্টার লাথি খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। সেদিন আবার লিফটে কী একটা গোলমাল ছিল; আমরা তিনজন প্রসেশান করে ষোলো-তলা থেকে নীচে নেমে এলাম।' বলতে-বলতে একটু থামল মেরি। এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে তার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দম নিয়ে সে আবার বলল, 'সেই আমার প্রথম আর শেষ গান শেখা।'

জোহন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। বলল, 'দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো।'

মেরি উত্তর দিল না।

একটু চিন্তা করে জোহন এবার জিগ্যেস করল, 'কোনও মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন ধরো সেতার, সরোদ, ভায়োলিন—এই সব বাজাতে পারো?'

মেরি বলল, 'ব্যান্ড-স্ট্যান্ডে থাকার সময় ওই তিনমাসে হারমোনিয়াম বাজাতে শিখেছিলাম।'

'ওতেই হবে।'

'কী হবে?'

'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি।'

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী জোহন আজও বাইরের বারান্দায় শুয়েছে, মেরি শুয়েছে ঘরে।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও ঘুম আসছিল না জোহনের। মেরির সেই দুটো গানের আশ্চর্য সুর তার রক্তের মধ্যে, স্নায়ুর মধ্যে এখনও বেজে যাচ্ছে। সে গান-বাজনার লোক। যদিও সাদাসিধে ভোলাভালা বাউন্ডুলে এবং শরাবি, জগতের সব ব্যাপারেই উদাসীন, নির্লিপ্ত, তবু তার মনে হচ্ছিল মেরির গলাটা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। এমন সুরেলা কণ্ঠস্বর হাজারে একটি মিলবে কি না সন্দেহ। এপাশ-ওপাশ করতে-করতে হঠাৎ জোহন ডাকল, 'মেরি—'

সাড়া পাওয়া গেল না।

জোহন আবার ডাকল, 'এই মেরি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

এবার ঘুমজড়ানো গলায় মেরি জবাব দিল, 'কী বলছ?'

'তোমার ব্যাপারে একটা কিছু করা দরকার।'

'কী করবে?'

'অলমাইটি তোমার গলায় এমন খুশবু ঢেলে দিয়েছে। ঝোপড়পট্টিতে পড়ে থেকে ওটা নষ্ট হয়ে যাক—এ আমি চাই না।'

'কী চাও তা হলে?'

'হোল ওয়ার্ল্ড তোমার গান শুনুক।'

মেরি এবার বলল, 'মাথায় বুঝি পোকা কামড়াচ্ছে। অনেক রাত হল, এবার চুপচাপ ঘুমিয়ে পড় তো। বেশি রাত জাগলে শরীর আবার খারাপ হবে।'

জোহন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'হচ্ছে একটা কাজের কথা। তার ভেতর ঘুম এনে ঢোকাতে বলেছে কে? আরে বাবা হোল লাইফ, ঘুম তো আছেই, কিন্তু কাজের কথাটা তো বসে থাকবে না।'

'আচ্ছা, কী বলতে চাইছ বলো।'

'তোমার গান রেকর্ডে রেডিওতে সবসময় বাজবে, এটা আমি দেখতে চাই।' শব্দ করে হেসে উঠল মেরি।

জোহন রেগে উঠল, 'হাসলে যে! এটা কি হাসির কথা হল?'

'হল না!'

'কেন হল, সেটা মেহেরবানি করে বুঝিয়ে দাও দিকি।'

'আরে বাবা, তুমি হলে ব্যান্ডপার্টির ফ্লুটবালা, আর আমি হলাম দশ টাকা মজুরির এক বেশ্যা। দু-জনে দশ জন্ম চেষ্টা করলেও আমার গান রেডিও কি রেকর্ডে বাজবে না। স্বপ্ন-টপ্ন একটু-আধটু আমিও দেখতাম; তাই বলে তুমি হাওয়ায় এয়ার ইন্ডিয়া বিল্ডিংয়ের মতো একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলবে?'

এবার উত্তেজিতভাবে উঠে বসল জোহন। ঘরের দরজাটা ভেজানো থাকে। যদিও সে মেরিকে ওটা বন্ধ করে খিল আটকে শুতে বলেছে, মেরি তা করে না। মেরির মনোভাব এইরকম—পুরুষমানুষকে তার ভয় নেই; দেহের ক্ষতি যেটুকু হবার তা আগেই হয়ে গেছে। তবে জোহনের মনোভাবটা এইরকম—শরীর বলে কথা। কখন কোনও উত্তেজনার মুহূর্তে সে ঘরে ঢুকে পড়বে। তারপর একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাক আর কি। অবশ্য তেমন দুর্ঘটনা এখনও ঘটেনি। এখন উত্তেজিত হয়েই আছে জোহন; তবে সে উত্তেজনাটা অন্যরকম।

যাই হোক, ঝড়াং করে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে ফেলল জোহন। বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমি চারদিক তোলপাড় করে ফেলব—দেখি কিছু হয় কি না। ওয়ার্ল্ডটা এখনও বিলকুল বুরা (খারাপ) হয়ে যায়নি; সাচ্চা জিনিসের দাম চেষ্টা করলে আজও পাওয়া যায়।'

আলো জ্বালতেই মেরি দ্রুত উঠে বসেছিল। কয়েক পলক জোহনের দিকে তাকিয়ে থেকে গলার স্বরে মজা এবং বিদ্রূপ মিলিয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

'ইয়েস। তার আগে তোমাকে তালিম নিয়ে তৈরি হতে হবে।'

'কে তালিম দেবে?'

'সেটা কাল বলব।' আলো নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল জোহন।

কথামতো পরের দিন সকালে হাবিব আবার এল। আসামাত্র যোহন তাকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে চলে গেল। ঝোপড়পট্টির কাচ্চাবাচ্চারা আজও বাজনা শোনার বায়না ধরেছিল; জোহন তাদের সঙ্গে নেয়নি। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝোপড়পট্টিতেই রেখে গেছে।

দুপুর পর্যন্ত তালিম দিয়ে দুটো গত্ হাবিবকে মোটামুটি শেখাতে পারল জোহন। তারপর ঝোপড়পট্টিতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বলল, 'আজ আর ওবেলা শেখাচ্ছি না; তুই এখন ভেন্ডিবাজারে ফিরে যা।'

আসলে মেরির চিন্তাটাই তার মাথার ভেতর কাল থেকে আটকে আছে। নেহাত হাবিবকে কথা দিয়েছে তালিম দেবে, তাই শেখানো। তা ছাড়া ছোকরা দারুণ আশা করে আছে—ক্ল্যারিওনেট বাজাতে শেখাটা তার কাছে বাঁচা-মরার প্রশ্ন। ওটা তাকে শেখাতেই হবে। জোহন ঠিক করে নিয়েছে, যে ক'দিন ঘরে পড়ে আছে সকালের দিকটা হাবিবকে তালিম দেবে আর দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমের কয়েক ঘণ্টা বাদ দিলে, বাকি যে সময় থাকে, সে সময়টা মেরির পেছনে লেগে থাকবে।

হাবিব চলে যাবার পর জোহন মেরিকে বলল, 'নাও, শুরু করো।'

একটু অবাক হয়েই মেরি জিগ্যেস করল, 'কী?'

'কী আবার—গান। কাল রাত্তিরে তোমার সঙ্গে সেই কথাই তো হল।'

সূর্যটা আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে-বেয়ে এখন সোজা বম্বে শহরের মাথার ওপর এসে উঠেছে। জুন মাসের এই গোড়ার দিকটায় রোদের তেজ সাংঘাতিক; চারদিক ঝলসে যাচ্ছে। সকালে সমুদ্রের দিক থেকে উলটোপালটা ঝোড়ো হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়াটা পড়ে গেছে। অসহ্য গুমোটে ঝোপড়পট্টির এই ঘরে বসে গলগল করে ঘামতে-ঘামতে কেউ যে গান গাইবার কথা বলতে পারে, শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না মেরি। সে বলল, 'এই গরমে গান গাইব! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

এই ঝলসে-যাওয়া দুপুরে মেরিকে দিয়ে কিছুতেই গান গাওয়ানো গেল না। কিন্তু বিকেলে তাকে ছাড়ল না জোহন। দু-চারটে গান শোনার পর সে বুঝতে পারল এ-সবই ফিল্মের গান। রেকর্ড কিংবা রেডিওর বিবিধ ভারতীতে শুনে-শুনে গলায় তুলে নিয়েছে মেরি। কিন্তু অন্যের

গান নকল করে তো নাম করা যাবে না। নকলনবিশকে কে আর শিল্পীর সম্মান দেয়, তার জন্য নিজস্ব কিছু দরকার। এই কথাগুলো ঠিক এইভাবে ভাবেনি জোহন, তার নিজের মতো করে নিজের নিয়মে ভেবেছে। সে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, যে-কোনও গান শুনলে তুমি গলায় তুলে নিতে পারো?'

মেরি ঘাড় হেলিয়ে দিল, অর্থাৎ পারে। তারপর বলল, 'হারমোনিয়াম পেলে গানটা বাজাতেও পারি।'

'ভেরি গুড। একটা হারমোনিয়াম শিগগিরই জোগাড় করে ফেলছি।' একটু চুপ করে থেকে কী ভাবল জোহন। তারপর বলল, 'লিখতে পড়তে পারো?'

একটু-আধটু পারি। এক সময় অরফ্যানেজে ছিলাম, সেখানে টু-থ্রি স্টান্ডার্ড পর্যন্ত পড়েছি।'

জোহনের চোখ শ্রদ্ধায় এবং খুশিতে চকচকিয়ে উঠল, 'আরে, তুমি তো দারুণ বিদ্বান দেখছি। আমার পেটে আস্ত একখানা ড্যাগার চালিয়ে দিলেও এ-বি-সি-ডি'র পর আর কিছু বেরুবে না।'

মেরি হেসে ফেলল। জোহন আবার বলল, 'কাগজ আর ডট পেন নাও।'

মেরি কাগজ-কলম নিয়ে বসল।

খুব ছেলেবেলায় অর্থাৎ বাপ মারা যাবার পর জোহন যখন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, তখন প্রায়ই তার চোখে পড়ত ইউ-পি থেকে, এম-পি থেকে, রাজস্থান কি গুজরাট থেকে নানা গান-বাজনার দল বম্বে সিটিতে এসে হাজির হতো। সেই সব দলে মেয়ে এবং পুরুষ দুই-ই থাকত। আজাদ ময়দান, ক্রস ময়দান কিংবা ওভাল অথবা গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছে রাস্তার ধারে ওরা রাত কাটাত। আর দিনের বেলাটা দলবল নিয়ে মেরিন ড্রাইভ, চৌপট্টি, বড়ীবন্দর কিংবা ভেন্ডিবাজারে, যখন যেখানে সুবিধা গানের আসর বসিয়ে দিত। ওরা ফিল্মটিল্মের গান গাইত না; তখনকার দিনে ফিল্মের এত হুজুগও ওঠেনি। ওরা ওদের নিজেদের বাঁধা গান নিজেরাই সুর দিয়ে গাইত। কিছুদিন ওই সব দলে ভিড়ে গিয়েছিল জোহন। অবশ্য এক দলে সে বেশিদিন থাকত না। দশ দিন হয়তো এ দলে, পনেরো দিন ওই দলে—এই করে করেই কেটে যেত। সেই ছেলেবেলা থেকেই স্মৃতিশক্তিটা তার ভালো। একবার যা শুনত, তা আর ভুলত না। সুর বোঝার মতো কান ছিল জোহনের, গানের দলগুলোর সঙ্গে ঘুরতে -ঘুরতে প্রচুর গান এবং সেই সব গানের সুর মনে করে রেখেছিল সে, পরে ক্ল্যারিওনেট বাজাতে শিখে সুরগুলো তুলে নিয়েছিল। এখনও সেই-সেই গানগুলো এবং তাদের সুর তার স্পষ্ট মনে আছে। জোহন বলল, 'লেখো—ও পুরবৈঁয়া মাত যা, মাত যা—'

এই গানটা তার সবচাইতে প্রিয়। প্রিয় গানটা দিয়েই সে শুরু করল। তারপর আরও তিন-চারটে গানের কথা বলে গেল।

গানগুলো লিখে নেবার পর জোহন বলল, 'আমি তো আর গেয়ে শোনাতে পারব না; হাঁ করলে আমার গলা থেকে আঠারো রকমের আওয়াজ এক সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। ফুলুটে সুরগুলো বাজাচ্ছি, গানের কথাগুলো দেখে গানগুলো গলায় তুলে নাও—' বলেই প্রথম গানটার সুর আস্তে-আস্তে ক্ল্যারিওনেটে বাজাতে লাগল।

খুব মন দিয়ে সুরটা শুনল মেরি। তারপর বার দুই তিন জোহনের ক্ল্যারিওনেটের সঙ্গে গেয়ে সুরটা তুলে ফেলল। শুধু একটা নয়, পর পর চারটে গানই তুলল; এবং জোহনের সাহায্য ছাড়া একা গেয়ে শুনিয়েও দিল।

জোহন খুশিতে কী যে করবে, প্রথমটা ভেবে পেল না। পরক্ষণেই প্রায় ছোঁ মেরে মেরিকে কাঁধে তুলে এক চক্কর ঘুরিয়ে বলল, 'তুনে কামাল কর দিয়া, কমপ্লিট কামাল কর দিয়া—'

ঘুরপাক খেতে-খেতে মেরি চেঁচাতে লাগল, 'ছাড়ো-ছাড়ো, পড়লে হাড় গোড় ভেঙে যাবে।'

মেরিকে নামিয়ে দিয়ে জোহন বলল, 'একদিনে পাঁচটা গান তুলেছ, দেখেশুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মাথাটা তুমি বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছ।'

পরের দিন থেকে সকালে হাবিবকে তালিম দিয়ে বিকেল থেকে মেরিকে নিয়ে পড়ল জোহন। এবং চোদ্দো দিনে ইউ পি, এম পি-র সেই পরিচয়হীন ভবঘুরে গানের দলগুলোর কাছ থেকে যত গান মনে করে রেখেছিল, সব মেরিকে শিখিয়ে দিল।

পুরো একুশ দিন বাদে ডাক্তার গিন্ডারের কাছ থেকে আবার ব্যান্ডপার্টিতে বাজাবার অনুমতি পাওয়া গেল। এখন জুনের মাঝামাঝি। আরব সাগর পাড়ি দিয়ে বম্বে সিটিতে বর্ষা এসে গেছে। প্রায়ই ঝেঁপে-ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। আকাশ জুড়ে চাংড়া-চাংড়া জলবাহী ভারী মেঘ অনড় হয়ে আছে। এ-সময়টা ব্যান্ডওলাদের পক্ষে অফ্ সিজন অর্থাৎ ব্যাবসাপত্র খুবই মন্দা চলছে। এখন ক্বচিৎ কখনও এক-আধটা বায়না আসে। যা-ও আসছে, বর্ষাটা পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে তা-ও আসবে না। জোহন এবং আর দু-চারজন বাজিয়ে ছাড়া বাদবাকিদের পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে দেবে ইফতিকার সাহেব। সেদিকে এখন আর মন নেই জোহনের। মেরিকে নতুন গান-টান কী শেখানো যায়, সেই চিন্তাটাই সর্বক্ষণ তাকে পেয়ে বসেছে। অবশ্য এ-নিয়ে অনেক ভেবেছে সে এবং কিছু-কিছু উপায়ও ঠিক করে ফেলেছে।

এর মধ্যে মেরিকে ইনস্টলমেন্টে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছে জোহন। আর যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেই দিনগুলো বাদে অন্য দিনগুলো নতুন গানের জন্য গোটা বম্বে শহর চষে বেড়ায় সে। কোথাও গানের আসর বসেছে খবর পেলেই হল। সময় পেলে মেরিকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে চলে যায়; নইলে একাই ছোটে। অবশ্য কোনও আসরেই তারা ঢুকতে পায় না। তার মতো ব্যান্ডপার্টির এক ফ্লুটবালার পক্ষে টিকিট কেটে গানের আসরে ঢোকা সম্ভব নয়। তবে সব আসরেই মাইক-টাইক লাগানো থাকে। যারা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে পারে না, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। এর জন্য আসরের উদ্যোক্তাদের মনে-মনে হাজারবার ধন্যবাদ দেয় জোহন। যেদিন সে একলা আসে বাইরে কোনও নির্জন কোণে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে খাপ থেকে ক্ল্যারিওনেটখানা বার করে আস্তে-আস্তে বাজিয়ে গানটা তুলে নেয়। তারপর ঝোপড়পট্টিতে ফিরে মেরিকে শিখিয়ে দেয়। যেদিন মেরিকে সঙ্গে আনে, সেদিন আসরের গায়ক বা গায়িকার সঙ্গে নীচু গলায় গেয়ে-গেয়ে গানটা তুলে নিতে বলে।

নতুন গানের সন্ধানে শুধু আসরে-আসরেই ঘুরে বেড়ায় না জোহন। বম্বে শহরে এখনও ভবঘুরে গানের দল ইউ পি, এম পি বা রাজস্থান থেকে এসে হাজির হয়। রাস্তা, ময়দান বা বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপের ভেতর থেকে তাদের খুঁজে-খুঁজে বার করে গান তুলে আনে। তা ছাড়া তাদের আনারকলি ব্যান্ডপার্টিতে হরিয়ানার একটা বাজনদার আছে। জোহনেরই সমবয়সি হবে, নাম শৈলেন্দ্র। দলে সে সাইড ড্রাম বাজায়। শৈলেন্দ্রর একটা বড় গুণ, সে ভালো গান লিখতে পারে। তার খাতা থেকে গাদা-গাদা গান লিখিয়ে এনে, মেরি আর সে দুজনে মিলে সুর দিয়ে নিয়েছে। এতেও খুশি না জোহন। মেরির জন্য আরও—আরও আরও নতুন ধরনের, নতুন মেজাজের গান তার চাই। তারই খোঁজে সে আরও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন এই নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

জোহন খবর পেয়েছিল বম্বের এক ক্রোড়পতি বিজনেসম্যান পালি হিলের এক বাংলো বাড়িতে লক্ষ্ণৌয়ের এক খুবসুরত বাঈজিকে এনে রেখেছে। সন্ধ্যায় সেখানে গজল আর ঠুংরি গানের আসর বসে। শোনামাত্র জোহন আর দেরি করল না। ক্ল্যারিওনেটের বাক্সটি কাঁধে চাপিয়ে সেখানে হানা দিল। বিরাট কম্পাউন্ডওলা বাংলোটার চারধারে খাড়া পাঁচিল। লোহার ফটকে রাইফেল ঘাড়ে সাত ফুট লম্বা, ইয়া চওড়া, গালে গালপাট্টা এক রাজপুত দারোয়ান খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং ফটক দিয়ে ঢোকার কোনও আশাই নেই। এদিকে বাইরে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছিল, ভেতরে আসর জমে উঠেছে।

অস্থিরভাবে বাড়িটার চারপাশে বার দুই চক্কর দিল জোহন। তারপর ফটকটা যেদিকে, তার উল্টোদিকের কম্পাউন্ড-ওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বাংলোটা একতলা, ওপরে টালির ছাদ। সামনের দিকের একটা গোটা ঘরের সবটুকু মেঝে জুড়ে লাল গালিচা পাতা। তার মাঝখানে চৌধবি কি চাঁদের মতো বসে লক্ষ্ণৌবালী বাঈজি একটা চটকদার ঠুংরি গাইছিল। তার দু-ধারে দুই সারেঙ্গিদার আর তবলচি। বাঈজির সামনে ক্রোড়পতি ব্যাবসাদার আর তার দু-চারজন বন্ধুবান্ধব; সবারই হাতে হুইস্কির গেলাস।

বাইরে কেয়ারি করা ফুলের বাগান, চমৎকার লন, পাম আর ঝাউ গাছ, নানারকম অর্কিড আর দুষ্প্রাপ্য ক্যাক্টাস।

একটা বড় সিলভার পামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভেতরে একবার উঁকি দিল জোহন। তার পক্ষে বাঁচোয়া, বাইরের লনে বা বাগানে এখন আলো-টালো জ্বলছে না।

দারুণ গাইছে বাঈজি। গলায় আতশবাজির ফুলকি না কি খুসবুওলা রক্তগোলাপ ফুটিয়ে যাচ্ছে সে। সম্মোহিতের মতো ক্ল্যারিওনেটটা বার করে আস্তে-আস্তে বাজিয়ে গান এবং সুর তুলতে লাগল জোহন। তুলতে-তুলতে এমন বুঁদ হয়ে গেল যে, কোথায় কীভাবে এসে ঢুকেছে সব বেমালুম ভুলে গেল। প্রায় নাচের ভঙ্গিতে দুলে-দুলে এবং বেশ জোরে-জোরেই বাজাতে লাগল সে।

জোহনের ক্ল্যারিওনেটের বাজনা বোধহয় ভেতরের লোকেরা শুনতে পেয়েছিল। কেউ একজন ভারী মোটা জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কৌন রে—'

নেশাচ্ছন্নের মতো বাজিয়ে যাচ্ছিল জোহন। মুখ থেকে ক্ল্যারিওনেটটা নামিয়ে সে বলল, 'ম্যায়—জোহন ফ্লুটবালা। বাহ্, ক্যা সঙ্গীত! ওয়ান্ডারফুল!' বলেই ক্ল্যারিওনেটটা তুলে আবার বাজাতে শুরু করল।

পাঁচ সেকেন্ডও কাটল না, বাইরের লনে বাগানে পাঁচশো ওয়াটের দশ-বারোটা আলো পটাপট জ্বলে উঠে জোহনের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। পরক্ষণেই অনেক লোকের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল। দেখা গেল, বিজনেসম্যান এবং তার বন্ধুরা টলতে-টলতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারা চেঁচাচ্ছিল, 'এ শুয়ারকা বাচ্চা, কৌন তু? এ দারোয়ান চোট্টা ঘুষা। পাকড়ো শালেকো, সন অফ বিচ্‌কো। ফায়ার—শুট্ হিম—'

ওধার থেকে সাত ফুট লম্বা রাজপুত দারোয়ান রাইফেল উঁচিয়ে হই-হই করতে-করতে ছুটে আসছে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল জোহনের। ক্ল্যারিওনেটটা আর খাপে পোরার সময় পাওয়া গেল না; কোনওরকমে সে দুটো কাঁধে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফুলবাগান মাড়িয়ে অর্কিডের মাথা গুঁড়িয়ে পেছন দিকে ছুটল; তারপর পাঁচিল টপকে বাইরের রাস্তায়। রাস্তায় নেমেও সে থামল না। প্রায় মাইলখানেক দৌড়ে সমুদ্রের ধারে এসে জলের কাছাকাছি একটা উঁচু টিবির ওপর বসে আধঘণ্টা হাঁপাল। তারপর পুরো ঘটনাটা আগাগোড়া একবার ভেবে নিয়ে খুব একচোট হাসল।

জুনের মাঝামাঝি থেকে গোটা আগস্ট মাস অর্থাৎ বম্বে শহরে বর্ষার আয়ু মোট আড়াই মাস। দেখতে-দেখতে এ বছরের মতো এ-শহর থেকে বর্ষা বিদায় নিল। এই আড়াই মাসে কয়েক শো গান শিখেছে মেরি। আর বর্ষা কাটবার পর আবার ব্যান্ডপার্টিগুলোর নতুন মরশুম শুরু হয়েছে। দুটো একটা করে বায়না আসছে। তার মানে মেরির গান-টানের ব্যাপারে এখন রোজ সময় দিতে পারছে না জোহন।

একদিন কল্যাণে জোহনদের দল বাজাতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঝোপড়পট্টিতে ফিরতে

বেশ রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি সে বাইরের বারান্দায় শুয়েছে, মেরি শুয়েছে ঘরের ভেতরে।

রোজই ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুজনে দু-জায়গায় শুয়ে কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে। ব্যান্ডপার্টির সঙ্গে বাজাতে বেরিয়ে কোথায় তারা গিয়েছিল, সারাদিনে কী-কী ঘটেছিল, রাত্রে শুয়ে-শুয়ে সব মেরিকে বলে জোহন।

আজ কল্যাণের যাবতীয় ঘটনা বলে যাচ্ছিল জোহন। সেখানে এক মাড়োয়ারি শেঠের নাতনির জন্মদিনে তারা বাজাতে গিয়েছিল। সেখানে কী-কী মজাদার ঘটনা ঘটেছে, তার ফিরিস্তি দিতে-দিতে হঠাৎ তার মনে হল মেরি বোধহয় শুনছে না। একটু থেমে সে বলল, 'কি, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

মেরি উত্তর দিল না।

আরও দু-চারবার ডাকাডাকির পর মেরির যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন চুপ করে গেল জোহন। পাক্কা বারো ঘণ্টা পরিশ্রমের পর তার চোখ বুঁজে আসছিল। নেহাত সারাদিনের ঘটনা মেরি জানতে চায় বলেই সে বলে যাচ্ছিল। এখন মেরিই ঘুমিয়ে পড়েছে; কাকে আর বলবে।

ঘুমটা যখন প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে, সেইসময় কানের কাছে অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল জোহন, 'এই ফুলুটবালা, ঘুমোলে নাকি?'

ধড়মড় করে উঠে বসল জোহন। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে জড়ানো গলায় কিছুটা উদ্বেগ মিশিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি।'

প্রায় তিন মাসের মতো এই ঝোপড়পট্টিতে তার এই ঘরখানায় আছে মেরি। একটা পলকা ভেজানো দরজার এধারে ওধারে দুজনে শুয়ে থাকে। কিন্তু কোনওদিনই দরজা খুলে রাত্রিবেলা বেরিয়ে আসেনি মেরি। আজ কী হয়েছে তার? বিমূঢ়ের মতো জোহন জিগ্যেস করল, 'তা হলে?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মেরি। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলো। তার আগে আলোটা জেলে দাও।'

'আলো জ্বাললে বলতে পারব না।'

হতভম্বের মতো জোহন এবার জিগ্যেস করল, 'কী এমন কথা যে আলোতে বলা যায় না?'

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তারপর মেরি বলল, 'তোমার কাছে অনেকদিন থেকে গেলাম। ভেবেছিলাম, তুমি ভালো হয়ে গেলে চলে যাব। কিন্তু গান-টান শিখতে-শিখতে যাবার কথা মনে ছিল না। এখন আমি কী করব?'

'কী আবার করবে, আমি কি তোমাকে যেতে বলেছি!'

'কিন্তু আমাব এভাবে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

'তবে কীভাবে থাকতে চাও?'

'বলতে সাহস হচ্ছে না।'

হঠাৎ জোহনের মনে পড়ল, এই আড়াই মাসে গান শেখাবার ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে থেকেছে মেরি এবং কী যেন বলতে চেয়েছে। তখন খেয়াল করেনি জোহন। সে বলল, 'আমি আবার একটা মানুষ! আমাকে যা ইচ্ছে বলা যায়।'

'তুমি তো শুনেছ আমি খুব খারাপ। তবু মেয়েই তো। আমার কি কোনও সাধ-টাধ থাকতে নেই?'

বুঝতে না পেরে অন্ধকারে অবাক তাকিয়ে রইল জোহন।

মেরি যেন ঘোরের মধ্যে বলে যেতে লাগল, 'এতগুলো বছর চোর-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার এখানে আসার পর দিনের পর দিন ভাবছি, অন্য মেয়েদের মতো আমারও তো ঘর-সংসার হতে পারে। আমার মতো একটা নোংরা গান্ধা মেয়েকে তুমি বাঁচাবে

ফুলুটবালা?'

জোহন অন্ধকারেই তার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'তুমি কি বিয়ের কথা বলছ?'

আচমকা একরোখা জেদী পোড়-খাওয়া মেরি জোহনের বুকে মুখটা ঘষতে-ঘষতে ফুঁপিয়ে উঠল, 'হাঁ—হাঁ—হাঁ—'

জোহনের কাছে এসে যে মমতা, যে নিরাপত্তা সে পেয়েছে, তা আর ছেড়ে যেতে চায় না। বহুকাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর তার সাধ আর ইচ্ছা বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছে।

জোহন হকচকিয়ে গেল। সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছরের জীবনে কোনও যুবতী মেয়ে তাকে এ-জাতীয় কথা কখনও বলেনি। প্রথম চমকটা কেটে যাবার পর, জলোচ্ছ্বাসের মতো দুরন্ত এক আবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল যেন। সে বলল, 'কিন্তু আমি একটা ওল্ড ম্যান, চুল দাড়িতে পাক ধরে গেছে। ক'দিনই বা বাঁচব।'

হাত দিয়ে জোহনের মুখটা চেপে মেরি বলল, 'ওসব কথা বলতে হবে না; ওল্ড ম্যানই আমার ভালো। তুমি যদি বিয়ে না করো বুঝব আমি খারাপ মেয়ে বলে তুমি আমাকে নফরত (ঘেন্না) করছ।'

'আরে না-না। তোমাকে আমি নফরত করব! কী বলছ মেরি! জখম হয়ে আসার পর আমার জন্যে তুমি যা করেছ, কেউ কখনও তা করেনি। কিন্তু আমি যে অন্য কথা ভাবছিলাম—'

'কিছু ভাবতে হবে না। আগে আমাকে কথা দাও।'

জোহন বার-বার বোঝাতে চেষ্টা করে সে বুড়ো মানুষ, জীবনের লম্বা দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছে, মেরির মতো একটা টাটকা তাজা কলাকার মেয়ের উচিত হবে না তার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া। তাকে বিয়ে করা মানে জীবনটাকে ডাহা নষ্ট করা। জোহনই একটা ভালো রোজগেরে যুবক খুঁজে পেতে মেরির বিয়ে দেবে। ঝোঁকের মাথায় কোনও কাজ করা ঠিক না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মেরি ক্রমাগত জোহনের বুকে মুখ ঘষতে-ঘষতে বলে যেতে লাগল, 'কথা দাও, আগে কথা দাও।'

জোহন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। নিজের দীর্ঘ নারীসঙ্গহীন জীবনের সমস্ত উদাসীনতা দিয়ে একটা একরোখা দুঃখী মেয়ের প্রবল ইচ্ছা আর জেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে-করে একসময় হেরে গেল সে। হাল ছেড়ে দেবার মতো করে বলল, 'ঠিক আছে, কথা দিলাম। পরে কিন্তু তোমাকে আপশোশ করতে হবে। আর একটা কথা—'

'কী?'

'বিয়েটা কিন্তু এখন হবে না।'

বুকের ভেতর থেকে মুখটা বার করে এনে উৎকণ্ঠিতের মতো তাকাল মেরি। জোরে শ্বাস টেনে বলল, 'কবে হবে?'

জোহন বলল, 'এত গান শিখলে, এখনও তো অনেক কাজ বাকি।'

'কী কাজ?'

'তুমি যে এত ভালো গাও, সেটা তো শুধু আমি একলা জানি। হোল ওয়ার্ল্ডকে তা জানাতে হবে না? বিয়ে-ফিয়ের চক্করে এখনই ফেঁসে গেলে এতদিনের এত খাটুনি সব জলে যাবে।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। দেখি কিছু একটা প্ল্যান এসে যাবে। যাও, অনেক রাত হয়েছে, এখন শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

মেরির ভাবনাটা ক'দিন ধরে অস্থির করে রেখেছে জোহনকে। ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টিতে ষাট স্কোয়ার ফুটের একটা ঝোপড়িতে ওইরকম চমৎকার একটা গানের গলা নষ্ট হয়ে যাবে, কিছুতেহ সে এটা মেনে নিতে পারছিল না। এই আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠস্বরটিকে সারা ইন্ডিয়ার ঘরে-ঘরে পৌঁছে

না দেওয়া পর্যন্ত, কোনও কিছুতেই জোহন আরাম বোধ করছিল না। কিন্তু তার মতো ব্যান্ডপার্টির এক নগণ্য ফ্লুটবালার পক্ষে কতটুকু কী করাই বা সম্ভব! ভাবতে-ভাবতে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো পাটিল সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল। 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র ইফতিকার সাহেবের দৌলতে তাঁর সঙ্গে জোহনের আলাপ হয়েছে। পাটিল সাহেব একটা রাজনৈতিক দলের লিডার স্থানীয় লোক; বড়-বড় জায়গায় তাঁর যাতায়াত; অনেক মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। জোহনকে তিনি ভালোই চেনেন; বহুবার তার বাজনার তারিফ করেছেন।

মনে-মনে সঠিকভাবে একটা কিছু ভেবে প্রভাদেবীতে পাটিল সাহেবের বাড়ি গিয়ে হাজির হল জোহন। পাটিল সাহেব বাড়িতেই ছিলেন এবং মেজাজটাও তাঁর তখন বেশ ভালোই মনে হচ্ছিল। তবে জোহনের বেশ ভয় হচ্ছিল পাটিল সাহেব এখন তাকে চিনতে পারবেন কি না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জোহন জেনেছে অনেকে বাইরে একরকম, বাড়িতে আরেক রকম। বাইরে হেসে-হেসে কথা বললেও বাড়িতে গেলে বিরক্ত হন। সেই কারণে তার বুকটা ঢিবঢিব করছিল।

কিন্তু জোহনের ভয়ের কোনও কারণ পাটিল সাহেবের ক্ষেত্রে অন্তত ছিল না। দেখামাত্রই তিনি তাকে চিনতে পারলেন এবং একটু অবাকও হলেন। জোহন যে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আসতে পারে, এটা বোধহয় কখনও তিনি ভাবেননি।

যাই হোক হাসিমুখেই পাটিল সাহেব বললেন, 'আরে জোহন যে! আয়-আয়, বোস।'

পাটিল সাহেব তাঁর বসবার ঘরে একটা সোফায় বসেছিলেন। জোহন মেঝেতে পাটের তৈরি কার্পেটের ওপর বসল।

পাটিল সাহেব এবার বললেন, 'শুনেছিলাম ইলেকশানের রেজাল্ট বেরুবার দিন পাথরের ঘায়ে তুই জখম হয়েছিলি। এখন কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

'জি।'

'বলে ফ্যাল।'

মেরিকে নিজের রিস্তাদার অর্থাৎ আত্মীয় এই পরিচয় দিয়ে, জোহন সংক্ষেপে তার গানের গলা সম্বন্ধে দশগুণ রং চড়িয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলে গেল। এই ভূমিকাটুকু করে সেই সঙ্গে যা জুড়ে দিল, তা এইরকম—তারা নেহাতই গরিব মানুষ, ভেরি পুওর পিপল। সে কারণে মেরি কোথাও কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। এখন মেহেরবানি করে পাটিল সাহেব যদি একটা সুযোগ করে দেন তো, তারা চিরদিন তাঁর গোলাম হয়ে থাকবে। এই জন্যেই সে তাঁকে বিরক্ত করতে এসেছে।

সব শুনে পাটিল সাহেব বললেন, 'কিন্তু তুই তো জানিস আমি পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, পার্টি-টার্টি করে বেড়াই। গান-বাজনার ব্যাপার কিছুই জানি না।'

'আপনার সঙ্গে তো অনেকের আলাপ। মেহেরবানি করে যদি কোনও রেকর্ড কোম্পানি কি সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টরকে বলে দ্যান। একটা চান্স পেলে মেরি কামাল করে দেবে।'

'রেকর্ড কোম্পানি বা ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর—কারও সঙ্গেই তো আমার জানাশোনা নেই রে।'

অনেক আশা নিয়ে পাটিল সাহেবের কাছে ছুটে এসেছিল জোহন। তাঁর কথায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করল সে। হতাশ সুরে বলল, 'তা হলে?'

পাটিল সাহেব উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। আচমকা কী মনে পড়তে একটু থেমে বললেন, 'এক কাজ কর না—'

জোহন উৎসুকভাবে তাকাল।

পাটিল সাহেব বলতে লাগলেন, ' 'ব্লু হেভেন' হোটেলের নাম শুনেছিস?'

'ওরলির সেই বিরাট হোটেলটা তো?'

'হ্যাঁ। ওর ম্যানেজার সামতানি সাহেব আমার খুব বন্ধু। তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি; মেরিকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা কর। হোটেলে তো ক্রুনার মানে গাইয়ে-টাইয়ে দরকার হয়। দ্যাখ যদি একটা গাইয়ের কাজ ওখানে হয়ে যায়। নানা ধরনের লোক হোটেলে আসে, তেমন কারও নজরে পড়ে গেলে বড় চান্স পেয়ে যাবে। তখন তোরা, যা চাস তাই হতে পারে।'

পাটিল সাহেবের এই কথাটা মনে ধরল জোহনের। ঝোপড়পট্টিতে পড়ে থাকার চাইতে হোটেলে গাইলেও, অনেক লোক মেরির গান শুনতে পাবে। মেরি যে একজন দারুণ গুণী কলাকার, সে-কথা সবাই একসঙ্গে জানতে না পারলেও কিছু লোক অন্তত জানুক। অত্যন্ত আগ্রহের সুরে সে বলল, নিশ্চয়ই হতে পারে। আপনি মেহেরবানি করে চিঠিটা লিখে দিন।'

দিনতিনেক বাদে মেরিকে সঙ্গে করে ওরলির 'হোটেল ব্লু হেভেনে'-র সামনে এসে হাজির হল জোহন। নতুন এই হোটেলটার নামই শুনেছে সে, চোখে এই প্রথম দেখল। আর দেখেই ভিরমি খাবার জোগাড়। কেন না ফাইভ স্টার এই হোটেলটা প্রকাণ্ড এবং ফুল্‌লি এয়ার কন্ডিশন্ড। জোহন গুনে-গুনে দেখল বাড়িটা আঠারো তলা। গোনা শেষ হলে নিজের দিকে তাকাল সে; গায়ে রক্তের ছ্যাকড়া দাগ ধরা ব্যান্ডপার্টির সেই ড্রেসটা রয়েছে। এই পোশাকে ভেতরে যাওয়া যাবে কি না, ভাবতে-ভাবতে গলগল করে ঘামতে লাগল জোহন। আড়চোখে সে লক্ষ করল মেরিও ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে, সেও দারুণ ঘামছিল।

জোহন একবার ভাবল ফিরেই যায়। পরক্ষণে তার মনে হল, এতদূর যখন চলে এসেছে দেখাই যাক কী হয়। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হয়তো বার করে দিতে পারে, কিন্তু মেরে তো আর ফেলবে না। বুক, কপাল আর বাহুসন্ধি ছুঁয়ে গুনে-গুনে বার তিনেক ক্রস এঁকে, ভেতরে-ভেতরে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করে নিল সে। তারপর মেরির একটা হাত ধরে হোটেলের বিশাল ফটকে চলে এল। দারোয়ানরা কিম্ভূত পোশাকের জোহনকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না; জোহনও ঢুকবেই। শেষ পর্যন্ত পাটিল সাহেবের চিঠিখানা মুশকিল আসানের কাজ করল। ওটার জোরেই ম্যানেজারের বিশাল কম্পার্টমেন্টে ঢুকতে পারল জোহনরা।

ম্যানেজার সামতানি সাহেবের বিশাল মাংসল শরীর, চৌকো মুখ, গোল চোখ, লালচে পাতলা চুল, ভারী থুতনি, হাত-পায়ের হাড় মোটা-মোটা, গায়ের রং লালচে। দেখেই বোঝা যায় লোকটার হাই ব্লাড প্রেসার।

জোহন এবং মেরির পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিয়ে সামতানি সাহেব বললেন, 'তুমি জোহন আর তুমি মেরি?'

'জি—' মেরি ও জোহন মাথা নাড়ল।

'পাটিল সাহেব কাল আমাকে তোমাদের সম্বন্ধে ফোন করেছিলেন। আজই এবং এখনই মেরির দু-একটা গান শুনতে চাই; মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গাইতে হবে। জানোই তো, হোটেলের ক্রুনারদের কাস্টমারদের সামনে মাইকে দাঁড়িয়ে গাইতে হয়। যাক, যদি গান ভালো লাগে, আজই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যাবে। ভালো না লাগলে কিন্তু আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না।'

চিঠি লেখার পরও পাটিল সাহেব সামতানি সাহেবকে ফোন করেছিলেন। এর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করল জোহন। কিন্তু সেই সঙ্গে বুকের ভেতর ঢিবঢিবানিটা হঠাৎ বেড়ে গেল। মেরির গান যদি সামতানি সাহেবের ভালো না লাগে? ঘাড় ফিরিয়ে জোহন দেখল, মেরির কপালে ঘাড়ে গলায় এই এয়ার-কন্ডিশন্ড ঘরে বসেও দানা-দানা ঘাম জমে উঠেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলছে সে; পরক্ষণেই আবার ঘামের দানা জমে উঠছে। মেয়েটা খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে, বোঝা

যাচ্ছে। তাকে সাহস দেবার জন্য তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জোহন বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আরে আমি তো সঙ্গে আছি।' বলতে-বলতে নিজেরই গলাটা শুকিয়ে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনাতে লাগল।

ওদিকে সামতানি সাহেব টেলিফোনের ইন্টারন্যাল কানেকশনে কাকে যেন কী নির্দেশ দিলেন। তারপর দু-মিনিট যেতে-না-যেতেই যোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।'

সামতানি সাহেবের গায়ের সঙ্গে ছায়া হয়ে একটা লিফটে কিছুক্ষণের মধ্যে জোহনরা যেখানে এসে ঢুকল, সেটা ছ'ইঞ্চি পুরু কার্পেটে মোড়া একটা ব্যাঙ্কুয়েট হল। আপাতত সেখানে একজন তবলচি, একজন হারমোনিয়ামওয়ালা এবং একটা মাইক রয়েছে। ডাইনে-বাঁয়ে এবং সামনের দেওয়াল ঘেঁষে সারি-সারি ফোমের চেয়ার।

মাইকের উলটোদিকের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন সামতানি। মেরিকে বললেন, 'মাইকে গিয়ে গাও—'

অর্থাৎ এখন তিনি মেরির ভয়েস টেস্ট করে নিতে চান।

জোহন একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মেরি এক পলক তার দিকে তাকাল। নিজের অবস্থাই তার শোচনীয়, তবু তারই মধ্যে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে জোহন সাহস দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, গাও।'

বলেই নিজেই অজান্তে কপাল বুক ছুঁয়ে ক্রস আঁকল।

মেরি মাইকের পেছনে গিয়ে খানিকক্ষণ দম বন্ধ করে রইল; তারপর চোখ বুঁজে জোহনের সেই প্রিয় গানটা 'ও পুরবৈঁয়া মাত্ যা, মাত্ যা' দিয়ে শুরু করল। প্রথম দিকে দু-এক সেকেন্ডের জন্য তার স্বরটা কেঁপে উঠেছিল; তারপরেই তার গলায় কে এক জাদুকরী ভর করে ম্যাজিক দেখিয়ে যেতে লাগল।

মেরির দিক থেকে চোখে সরিয়ে রুদ্ধশ্বাস সামতানি সাহেবের দিকে তাকাল জোহন। তাঁর ওপর মেরির গানের প্রতিক্রিয়াটা কী হচ্ছে সেটাই জানার ইচ্ছা আর কি। দেখা গেল চোখ বুঁজে সামতানি সাহেব গানের সঙ্গে তাল দিয়ে পা দোলাচ্ছেন। অর্থাৎ লোকটা ইঁদুরকলে পড়ে গেছে; সেখান থেকে আর বেরুবার উপায় নেই।

গান থামলে সামতানি সাহেব চোখ বুঁজেই বললেন, 'আরেকটা হোক—'

আরেকটাই শুধু নয়, পরপর আরও সাতটা গান গাইতে হল মেরিকে। তারপর সামতানি সাহেবের সঙ্গে আবার তারা নীচে তাঁর কম্পার্টমেন্টে এল। সামতানির মনোভাবটা কী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বলেই জোহনের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে পারছে না। এই শহরে আরব সাগরের এত অফুরন্ত বাতাস, তবু জোহনের মনে হচ্ছে বুক ভরে শ্বাস টানার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

নিজের কম্পার্টমেন্টে এসে প্রথমেই জোহনরা কোথায় থাকে, তাদের ঠিকানা কী, মেরির পুরো নাম ইত্যাদি জেনে নিয়ে ইন্টারন্যাল কানেকশনে কাকে যেন কী নির্দেশ দিলেন সামতানি। তারপর জোহনদের দিকে ফিরে বললেন, 'কী খাবে বলো? সফ্‌ট ড্রিংক আনতে বলি?'

লক্ষণগুলো ভালোই মনে হচ্ছে। বুক ভরে শ্বাস টেনে জোহন বিগলিত হাসল, 'স্যার, আপনি যা খাওয়াবেন, তাই খাব।'

সামতানি সাহেব বোতাম টিপে একটা বয়কে ডেকে সফট ড্রিংক দিয়ে যেতে বললেন। তার একটু বাদেই একটা মধ্যবয়সি লোক টাইপ-করা একটা কাগজ নিয়ে এল। ম্যানেজার তাতে সই করে মেরিকে দিতে-দিতে বললেন, 'এটা তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। তিন মাস তোমার ট্রেনিং পিরিয়ড, এখন চারশো টাকা করে পাবে। তারপর দু-মাস প্রবেশনার হয়ে থাকবে। সেটা কাটাবার পর তোমাকে পার্মানেন্ট করে নেওয়া হবে। প্রবেশনার হিসেবে তোমার মাইনে হবে ছ'শো, পার্মানেন্ট হলে আটশো। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

খুশিতে উত্তেজনায় মেরি এবং জোহন একইসঙ্গে বলে উঠল, 'থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ্।'

সামতানি সাহেব খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখালেন না। সহজভাবে বললেন, 'ডিউটি আওয়ার্সটা মনে রাখবে; বিকেল পাঁচটা থেকে রাত এগোরোটা।'

মেরি জোহন সমস্বরে এবারও বলল, 'ও-কে স্যার।'

এবার সোজা জোহনের দিকে তাকালেন সামতানি সাহেব, 'অ্যান্ড ইউ—তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। আমার এই হোটেলটা ফাইভ-স্টার। তোমার এই ইউনিফর্ম পরে এখানে আসা চলবে না কিন্তু।'

জোহন তৎক্ষণাৎ বলল, 'আমার ভেতরে ঢোকার কী দরকার। আমি স্যার, উলটোদিকের ফুটপাথে এসে বসে থাকব। মেরির ডিউটি শেষ হলে ও আমার কাছে চলে আসবে।'

'ও-কে।'

কিছুক্ষণ পর বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে মেরি বলল, 'এ সবই তোমার জন্যে। শরাবি-ফরেবি-গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। নরক থেকে তুমি আমাকে কোথায় তুলে এনেছ!'

জোহন জোরে-জোরে হাত এবং মাথা নেড়ে বলল, 'ছাড়ো ওসব কথা। আজ আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে! ইচ্ছা করছে তোমাকে কাঁধে তুলে নাচতে-নাচতে ঝোপড়পট্টিতে ফিরে যাই।'

নকল ভয়ে মেরি বলল, 'আরে বাপরে, অমন ইচ্ছায় দরকার নেই।'

বাস স্ট্যান্ডে এসে লম্বা কিউর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ল জোহনরা।

মেরি গলা নীচু করে বলল, 'সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা?'

'তোমরা ইচ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে; আমার গান এবার লোকে শুনতে পাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে কিন্তু।'

'সবে তো তোমার চাকরি হল। রেকর্ড হোক, রেডিওতে গাও, সিনেমায় প্লে-ব্যাক করো। তারপর তো আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

মেরি রেগে গেল, 'আমি তোমার কোনও কথা শুনব না। এক মাসের মধ্যে বিয়েটা যদি না হয়, আমি ঠিক চলে যাব।'

মেয়েটা যেমন জেদী আর একরোখা, তেমনি অদ্ভুত এক ছেলেমানুষিও আছে তার। জোহনের বেশ ভালোই লাগল। এই মেয়েটা তাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এই ভেবে কিছুটা মজাও অনুভব করল সে। কিছু না বলে জোহন হেসে ফেলল।

মেরি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'হাসলে চলবে না। যা বললাম মনে রেখো।'

জোহন তখনও হাসতেই লাগল।

চাকরি হবার পর রোজ বিকেলে মেরি হোটেলে চলে আসে। যেদিন ব্যান্ডপার্টির কোনও বায়না থাকে না, সেদিন মেরির সঙ্গেই ঝোপড়পট্টি থেকে বেরিয়ে পড়ে জোহন। তারপর এদিক-সেদিক ঘুরে রাত এগোরোটা নাগাদ উলটোদিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়। আর যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেদিন বাজিয়ে-টাজিয়ে কথামতো ঠিক এগোরোটাতেই চলে আসে।

চাকরি পাবার পর রাতের খাবারটা হোটেল থেকেই দেবার কথা। হোটেলে বসে খায় না মেরি। প্যাকেটে করে নিয়ে আসে। তারপর জোহনের সঙ্গে ঝোপড়পট্টিতে ফিরে গিয়ে দুজনে ভাগাভাগি করে খায়। হোটেল থেকে যে খাবারটা দেওয়া হয় একজনের পক্ষে তা যথেষ্টই। ওই

খাবারে মোটামুটি দুজনের কুলিয়ে যায়।

দিন দশেক কাটবার পর হোটেল ম্যানেজার মেরিকে একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর কিছু ওয়েস্টার্ন মিউজিকের রেকর্ড দিয়ে বলেছিল, 'মেরি যে ধরনের গান গায় সেগুলো খুবই ভালো, তবে হোটেল কাস্টমারদের ঝোঁক উগ্র ওয়েস্টার্ন সং এবং মিউজিকের দিকে। ওই রেকর্ডগুলো থেকে সুরটুর চুরি করে মেরি যদি তার গানে ওয়েস্টার্ন টাচ্ দিতে পারে, তা হলে মাত করে দিতে পারবে।'

রেকর্ড পাবার পর মেরি আর জোহন যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়ে যায়। জোহন তার দলের সেই লোকটিকে দিয়ে, যার নাম শৈলেন্দ্র, অনেক গান লিখিয়ে এনেছে। তারপর সেই গানগুলোতে ওয়েস্টার্ন ঢঙে মিউজিক বসাচ্ছে। দিনকতক পর সেই সব গান হোটেলে গেয়ে দারুণ নাম করে ফেলল মেরি।

এ-সবের ফাঁকে-ফাঁকে মেরি কিন্তু সেই কথাটা ভোলেনি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে বিয়ের নোটিশ দেবার জন্য রোজ জেদ ধরছে।

শেষ পর্যন্ত মেরির ইচ্ছাই জয়ী হল। সান্তাক্রুজে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়ের নোটিশ দিয়ে এল জোহন। আর দিয়েই প্রথমে খবর দিতে গেল ইফতিকার সাহেবকে। ইফতিকার সাহেব সব শুনে প্রথমে একচোট হেসে নিল। তারপর বলল, 'বহুত খুশিকা বাত। লেকিন গাধ্ধে কা পাঠ্‌ঠে একটা ছোকরিকে হাতের মুঠোয় পেয়েও নোটিশ দিতে চার মাহিনা কাটিয়ে দিলি।'

জোহন ঘাড় চুলকোতে লাগল।

ইফতিকার সাহেব আবার বলল, 'শাদি করছিস, ঠিক আছে। লেকিন এইটা তো দরকার।'

আঙুল দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করল সে।

জোহন হাসল, 'হাঁ চাচা, ওটা ছাড়া কিছু হয় নাকি?'

'কোই বাত নেই, হাজার রুপেয়া অ্যাডভান্স পাবি। আর শাদির পরে পাঁচ রুপেয়া করে মজুরি বাড়িয়ে দেব।'

কৃতজ্ঞতায় গলা বুঁজে গেল জোহনের। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল সে, পারল না।

ইফতিকার সাহেবের পেটে কোনও কথা থাকে না। মুহূর্তে তার মারফত এই খবরটা গোটা 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-তে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য বাজিয়েরা তাকে ছেঁকে ধরল এবং নাচানাচি আর হুলুস্থুল জুড়ে দিল। সবাই দারুণ খুশি।

সমস্বরে তারা চেঁচাতে লাগল, 'শাদি মুবারক হো, লেকিন ভোজটা না খাওয়ালে ছাড়চি না চাচা—'

যোহনকে দলের অন্য বাজনদাররা চাচা বলেই ডাকে।

হেসে-হেসে জোহন বলল, 'ঠিক আছে, ভোজ দেব।'

এরপর ঝোপড়পট্টিতে ফিরে সে সোমবারিকে খবরটা দিতে গেল। সব শুনে গালে একটা হাত রেখে চোখ গোল করল সোমবারি, 'হাঁ!'

জোহন হেসে মাথা নাড়ল, 'হাঁ।'

উত্তর প্রদেশের একটা অশ্লীল ছড়া কেটে সোমবারি বলল, 'তা হলে শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেলে ফুলুটবালা! আমি কিন্তু পয়লা দিনই বলেছিলাম, মনে আছে?'

'আছে।'

সোমবারির পর গিন্ডারকে খবরটা দিয়ে নিজের ঝোপড়িতে ফিরল জোহন। ফিরেই মেরিকে বলল, 'একটা কাগজ কলম নাও।'

মেরি অবাক। বলল, 'কেন?'

বিয়ের নোটিশের খবরটা দিয়ে জোহন বলল, 'কাকে-কাকে ইনভাইট করবে, কী-কী খরচ হবে, তার লিস্ট করতে হবে না?'

দুজনে মিলে অনেক খেটে-খুটে একটা তালিকা করে ফেলল। তারপর মেরি বলল, 'আমি একটা কথা ভেবে রেখেছি।'

'কী?'

'বিয়েটা হয়ে গেলে তোমাকে আমি ব্যান্ডপার্টি থেকে ছাড়িয়ে আনব। আর ওই ব্যান্ডপার্টির ড্রেসটা পরে ঘুরে বেড়াতে দেব না।'

'ও ক্রাইস্ট, ব্যান্ডপার্টি ছাড়লে খাব কী!'

'আমাদের হোটেলের ম্যানেজারকে বলে মিউজিক হ্যান্ডের একটা চাকরি জোগাড় করে দেব।'

'মরে যাব।' জোহন বলতে থাকল, 'বিলকুল ডেথ্ হয়ে যাবে আমার। ব্যান্ডপার্টি ছাড়া লাইফে আর কিছু জানি না। এখন যদি অত বড় হোটেলে বাজাবার চাকরি নিই, স্রেফ দম আটকে যাবে।'

'সে দেখা যাবে।'

বিয়ের আর দিন পনেরো বাকি।

এর মধ্যে ঠিক হয়েছে, বিয়ের তারিখে ঘুম থেকে উঠে ওরা সোজা সান্তাক্রুজের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যাবে। এ-বিয়ের তিনজন সাক্ষী থাকবে—ডাক্তার গিল্ডার, আজবলাল আর ইফতিকার সাহেব। তারা অবশ্য যে-যার সুবিধামতো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে চলে যাবে। সেখানে সই সাবুদ চুকিয়ে সবাই যাবে মাহিম চার্চে। চার্চে ব্যান্ডপার্টির লোকেরা এবং অন্যান্য গেস্টরা এসে অপেক্ষা করবে, শুভেচ্ছা জানাবার জন্য। সেখান থেকে সবাই যাবে মাঝারি গোছের একটা হোটেলে। ভোজ-টোজের ব্যবস্থা সেখানেই।

দিনগুলো যেন নেশার ঘোরে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিয়ের ঠিক পনেরো দিন আগে হঠাৎ তাল কেটে গেল।

সেদিন রাত এগারোটায় 'ব্লু হেভেন হোটেল-এর উলটোদিকে যথারীতি দাঁড়িয়ে ছিল জোহন। মেরি তার ডিউটি শেষ করে বেরিয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে এধারে আসার আগেই জোহন দেখতে পেল, খুশি আর উত্তেজনায় মেরির চোখ চকচক করছে। ইদানীং সর্বক্ষণই দারুণ এক আনন্দের জোয়ারে ভাসছে মেরি। কিন্তু তার এই উত্তেজনাটা অন্যরকম। স্থির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল জোহন।

রাস্তা পেরিয়ে এপারে এল মেরি। জোহন কিছু বলবার আগেই উচ্ছ্বাসের গলায় সে বলে উঠল, 'জানো ফুলুটবালা, আজ একটা দারুণ ব্যাপার হয়েছে। তোমার আমার দু-জনের লাক এবার খুলে যাবে।'

'আচানক (হঠাৎ) কী ব্যাপার ঘটে গেল!'

জোহন রীতিমতো অবাক।

মেরি বলল, 'আন্দাজ করো না।'

'পারছি না।'

'আজ এক রেকর্ড কোম্পানির ম্যানেজার হোটেলে এসেছিল। আমার গান শুনে সে একেবারে যাকে বলে ম্যাড। তার ইচ্ছে আমাকে দিয়ে রেকর্ড করাবে।'

জোহনের ইচ্ছা হল, সে এখুনি এই রাস্তায় হাত-পা ছেড়ে বন-বন করে কয়েক পাক নেচে নেয়। দারুণ খুশিতে তার হৃৎপিণ্ড যেন লাফাতে লাগল। সে বলল, 'সচ্!'

'সচ্।' মেরি ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'সেবাস্টিয়ান সাহেব আমাদের ঠিকানা নিয়েছে। দু-চার দিনের মধ্যে কনট্রাক্ট করতে আসবে।'

জোহন বলল, 'মেরি, তোমাকে কাঁধে তুলে নেচে নেব?'

'এই না-না, খবরদার না।'

দু-চারদিন পর নয়, ঠিক তার পরের দিনই একটা দামি বিদেশি গাড়িতে করে সেবাস্টিয়ান সাহেব সকালের দিকে জোহনদের ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টিতে এসে হাজির। গাড়িটা অবশ্য ঝোপড়পট্টির ভেতর পর্যন্ত আসতে পারেনি। কেন না এখানকার গলি এত সরু যে, অত বড় ইমপোর্টেড কার ঢোকার মতো জায়গা নেই। তা ছাড়া ঝোপড়পট্টিটা এমনই নোংরা আর আবর্জনায় বোঝাই যে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তাঁকে আসতে হয়েছে।

আজ জোহন ঝোপড়পট্টিতেই ছিল। কারণ 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র হাতে আজকের দিনটার কোনও বায়না নেই। থাকলে ঢের আগেই সে বেরিয়ে যেত।

সেবাস্টিয়ান সাহেবের বয়েস তিরিশ-বত্রিশ। গায়ের রং বেশ কালো। লম্বাটে মুখ। প্রায় ছ'ফুটের মতো হাইট। মেরুদণ্ড টান-টান। আজকালকার ছোকরাদের মতো চওড়া জুলপি তাঁর, ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়া বড়-বড় চুল, পরনে দামি বেল-বট্‌স ও হাওয়াই শার্ট। লোকটা কেরালার ক্রিশ্চান।

সেবাস্টিয়ান সাহেবকে কোথায় বসাবে, তাঁকে নিয়ে কী করবে, প্রথমটা ভেবে পেল না জোহন। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে। ঘরের একমাত্র হাতল-ভাঙা চেয়ারটাকে ভালো করে মুছে-টুছে শেষ পর্যন্ত তাতেই তাঁকে বসিয়ে দৌড়ে কাছের একটা দোকান থেকে সফ্‌ট ড্রিংকের বোতল আর স্ট্র নিয়ে এল।

সেবাস্টিয়ান সাহেব কিছুতেই খাবেন না। জোহন বলল, 'প্রথম দিন এলেন, এটা না খেলে আমরা খুব দুঃখ পাব।'

এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 'হোটেল ব্লু হেভেন'-এর মতো একটা ফাইভ-স্টার হোটেলের রূপসি ক্রুনার মেরি যে থাকতে পারে, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সেবাস্টিয়ান সাহেব। যাই হোক, জোহনের বারবার অনুরোধে বিষ গেলার মতো করে সফ্‌ট ড্রিংকটা গিলতে হল তাঁকে।

এতক্ষণ জোহন তাঁকে নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে ছিল যে, সেবাস্টিয়ান সাহেব বিশেষ কোনও কথা বলার সুযোগ পাননি। এবার মেরির দিকে তাকিয়ে জোহন সম্বন্ধে জিগ্যেস করলেন, 'ইনি কে?'

মেরি জোহনের পরিচয় দিয়ে জানাল, 'সে তার ভাবী স্বামী।'

সেবাস্টিয়ান সাহেব অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে জোহনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার মেপে নিল। তারপর বলল, 'ভাবী স্বামী বলতে—বিয়ে হয়নি?'

মেরিই উত্তরটা দিল, 'না। তবে শিগগিরই হচ্ছে।'

জোহন বাজাতে বেরোয়নি, তার পরনে আধময়লা একটা পাজামা আর গেঞ্জি। সেবাস্টিয়ান তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন, বিয়ে হয়নি অথচ এই দুটি অসমবয়সী নারী-পুরুষ একসঙ্গে ঝোপড়পট্টির এই ঘরে থাকে কি না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা অশোভন। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনি কি করেন?'

জোহন উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মেরি বলে উঠল, 'উনি খুব বড় মিউজিসিয়ান, বম্বের সবচেয়ে নাম করা ব্যান্ডপার্টিতে ক্ল্যারিওনেট বাজান।'

সেবাস্টিয়ান সাহেবের চোখে তাচ্ছিল্যের মতো কিছু ফুটে উঠল। কিন্তু মুখে তিনি বললেন, 'আপনার মতো একজন গুণী লোকের সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল। যাক, এবার কাজের কথাটা সেরে ফেলি।'

খুব আগ্রহের গলায় জোহন বলল, 'হাঁ-হাঁ, নিশ্চয়ই।'

আর কোনওরকম ভণিতা-টণিতা না করে সেবাস্টিয়ান সাহেব যা বললেন, তা মোটামুটি এইরকম। মেরিকে তাঁদের কোম্পানি তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করতে চান। এর জন্যে মাসে তাঁরা দেড় হাজার টাকা করে দেবেন। অবশ্য এই শর্তে রাজি হলে মেরিকে হোটেলের চাকরিটা ছাড়তে হবে।

দেড় হাজার টাকা। বিমূঢ়ের মতো জোহন মেরির দিকে তাকাল। মেরির চোখেও সেই একই বিমূঢ়তা। কথাটা নিজেদের কানে শুনেও তারা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

সেবাস্টিয়ান জিগ্যেস করলেন, 'কি, রাজি?'

জোহন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে যেন লাফিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই রাজি। হাজার বার রাজি।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'মেরিজির নামটা ভারী সিম্পল, তেমন ড্র নেই। রেকর্ড বাজারে বেরুবার আগে নামটা বদলে দিতে হবে।'

সেবাস্টিয়ান সাহেবের সব কথা বুঝতে পারল না জোহন। তবে এটুকু আন্দাজ করল, 'নাম করার খাতিরে মেরির নতুন নামকরণ দরকার।'

সেবাস্টিয়ান সাহেব আবার বললেন, 'ভাবছি মেরিজির নাম বদলে সুজাতা রাখব। আপনি কি বলেন জোহন সাহেব?'

মেরির ভালো হলে সব কিছুতেই রাজি জোহন। সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'দারুণ খুবসুরত নাম। আপনি ওই নাম দিয়ে দিন।'

'ভেরি গুড—' সেবাস্টিয়ান সাহেব খুশি হয়ে পকেট থেকে ছাপানো কনট্রাক্ট ফর্ম বার করে মেরিকে বলল, 'এটা পড়ে নীচে একটা সই করে দিন।'

জোহন ব্যস্তভাবে বলল, 'পড়বার দরকার নেই। মেরি, সই লাগাও।'

মেরি সই করে দিলে ফর্মটা ভাঁজ করে পকেটে পুরতে-পুরতে সেবাস্টিয়ান সাহেব উঠে পড়লেন। মেরির হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশনস! আমার বিশ্বাস এক বছরের মধ্যে হোল ইন্ডিয়া আপনার নাম জেনে ফেলবে। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।' জোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা চলি। আবার দেখা হবে।'

সেবাস্টিয়ান সাহেব চলে গেলে মেরি আর জোহন একটা অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে রইল।

রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে মেরিকে। এ মাস ফুরোতে সামান্য ক'টা দিন বাকি। মেরি সেবাস্টিয়ান সাহেবকে বলে দিয়েছে, মাসের এ ক'টা দিন কাজ করেই হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দেবে।

যাই হোক, চুক্তিতে সই করার পর তিনটে দিন কেটে গেছে। আজও ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিক রাত এগোরোটায় জোহন 'হোটেল ব্লু হেভেন'-এর উলটোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে দেখল, সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে মেরি বেরিয়ে আসছে। মেরি জেব্রা লাইন দিয়ে রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে এল। সেবাস্টিয়ান সাহেব কিন্তু এলেন না। তাঁর গাড়ি রাস্তার গা ঘেঁষে পার্ক করা ছিল; উঠে কাম্বালা হিলের দিকে চলে গেলেন।

জোহন জিগ্যেস করল, 'সেবাস্টিয়ান সাহেবকে তোমার সঙ্গে দেখলাম না?'

মেরি আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'হাঁ—' বলেই জোহনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ নামাল।

অন্যদিনের মতো তাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে না। কেমন যেন একটু চিন্তিত আর বিষণ্ণ মেরি।

জোহন তাকে লক্ষ করতে-করতে বলল, 'কী ব্যাপার, তোমাকে কীরকম দেখাচ্ছে। শরীর খারাপ নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'চলো, বাড়ি ফিরে বলব।'

বাসে উঠে চুপচাপ পাশাপাশি বসে ওরা ঝোপড়পট্টিতে ফিরে এল। সারাটা রাস্তা দারুণ এক উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে জোহনের। তার ভয়, রেকর্ড কোম্পানি এর মধ্যে মেরি সম্বন্ধে মত বদলে ফেলেছে কি না। তা হলে যে সুযোগটা এসেছিল, সেটা কি হাতছাড়া হয়ে যাবে? ঘরে ঢুকেই জোহন বলল, 'কী হয়েছে এবার বলো।'

তক্ষুনি কিছু বলল না মেরি। জোহনের উদ্বেগ দশগুণ বাড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'সেবাস্টিয়ান সাহেব একটা কথা বলছিল—'

'কী?'

'শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। আমি কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না। কথাটা তোমাকে বলতে সাহস হচ্ছে না, আবার না বললেও নয়।'

জোহন শ্বাসরুদ্ধের মতো বলল, 'ওরা তোমাকে দিয়ে গান গাওয়াবে না?'

মেরি বলল, 'না-না, সেসব কিছু নয়।'

'তা হলে?'

'সেবাস্টিয়ান সাহেব এখন আমাদের বিয়েটা বন্ধ রাখতে বলছেন।'

'কেন?'

মেরি এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। সেবাস্টিয়ান সাহেব বলেছেন, মেরি বিয়ে না করলে রেকর্ড কোম্পানির পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। কেন না গায়িকা যদি রূপসি এবং তরুণী হয়, তাতেই লোককে আকর্ষণ করা যায়। তার ওপর অবিবাহিত হলে তো কথাই নেই। মেরি এমনিতেই সুন্দরী, যুবতী এবং ভালো তো গায়ই। এখন সেবাস্টিয়ান সাহেবের অনুরোধ রেখে, সে যদি বিয়েটা অন্তত বছর দুয়েকের জন্য স্থগিত রাখে, রেকর্ড কোম্পানি তা হলে কুমারী মেরির রূপ-যৌবন ইত্যাদিকে গ্ল্যামার হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। এমন স্টান্ট তারা দেবে, যাতে হু-হু করে মেরির রেকর্ড বাজারে পড়তে-না-পড়তেই বিক্রি হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে দেশ জুড়ে রাতারাতি তার নামও হবে।

হৃৎপিণ্ডের তলায় কোথায় যেন তীক্ষ্ণ ব্যথার মতো অনুভব করল জোহন। কিন্তু মেরির যাতে ভালো হয়, তার জন্য সব কিছুতেই সে রাজি। হেসে-হেসে দারুণ উৎসাহের গলায় বলল, 'এই ব্যাপার? আমি ভেবেছিলাম না জানি কি। সেবাস্টিয়ান সাহেব যা বলেছে, তা-ই হবে। এতে যখন তোমার ভালো হচ্ছে, ওদেরও সুবিধে হচ্ছে, বিয়েটা দু-বছর পিছিয়ে দিতে আমার আপত্তি নেই।'

'কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে। তা ছাড়া—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল মেরি।

জোহন জিগ্যেস করল, 'তা ছাড়া কী?'

'আমাদের বিয়ের কথা সবাই জেনে গেছে। অনেককে নেমন্তন্নও করা হয়েছে। এখন বিয়েটা না হলে লোকে কী বলবে।'

'এর জন্যে ভেবো না। সবাইকে বুঝিয়ে আমি ম্যানেজ করে নেব।'

এ-ব্যবস্থায় সায় দিতে পারছিল না মেরি। সে বলল, 'তার চাইতে হোটেলের চাকরিটাই আমার থাক। সেবাস্টিয়ান সাহেবকে বলে দেব রেকর্ড করে আমার দরকার নেই।'

জোহন প্রায় আঁতকে উঠল, 'ও কাজও কোরো না—ফর গডস্ সেক। সুযোগ বারবার আসে না মেরি।'

মেরি কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কিছুই বলতে দিল না জোহন।

পরের দিন ব্যান্ডপার্টির হাতে বায়না-টায়না ছিল না। তবু জোহন ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়ল। বিয়েতে যাদের-যাদের নেমন্তন্ন করে এসেছিল, তাদের সবার কাছে গিয়ে জানিয়ে এল, আপাতত এ-বিয়ে হচ্ছে না। তাই নেমন্তন্নটা নাকচ করতে হচ্ছে। মেহেরবানি করে তারা যেন ক্ষমা করে দেয়।

সবাই বিয়ে পেছোবার কারণ জিগ্যেস করল। স্পষ্ট করে কোনও উত্তর দিল না জোহন। তবে সোমবারি আর ইফতিকার সাহেবকে কারণটা খুলে বলল। সব শুনে ইফতিকার সাহেব একদমে মিনিট পাঁচেক খিস্তি করে বলল, 'শালা গাধ্‌ধে কি পাঠ্‌ঠে। ভয়েস গাড়িকা ভয়েস। ঘাড়ে করে তোর শক্কর (চিনি) টেনে বেড়ানোই সার। সেই শক্কর খাবে আরেকজন।'

সোমবারিও দাঁতের ফাঁক দিয়ে পানের পিচ্ কেটে চোখ কোঁচকাল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি একটা পুরুষ মানুষ কি না। হিজড়ে-টিজড়ে নও তো? নইলে হাতের খাবার নিজের মুখে না পুরে কেউ অন্যের মুখে ঢোকায়! শালে ক্যা মুরদ রে—'

বলেই ভারী কোমরে অশ্লীল লছক তুলল। জোহন হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, 'কী যা-তা বলছ ভাবী। কারও খাবারে কেউ দাঁত বসাতে পারবে না। মেরি যেমন আছে, তেমনই থাকবে। তবে বিয়েটা এখন না হলে ওর পক্ষে ভালো হবে কিনা, তাই।'

'ভালো হলেই ভালো।' সোমবারি দুটো হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো শেষ পর্যন্ত এ-দুটো যেন চুষতে না হয়।'

দেখতে-দেখতে মাসটা কাবার হয়ে গেল। আর নতুন মাসের পয়লা তারিখেই হোটেলের চাকরিটা ছেড়ে দিল মেরি। চাকরি ছাড়ার পরদিন থেকেই রেকর্ড কোম্পানির রিহার্সাল শুরু হল।

কোলাবার কাছে কোম্পানির একটা রিহার্সাল রুম আছে। রোজ সকালে সেবাস্টিয়ান সাহেব নিজে এসে ঝোপড়পট্টি থেকে মেরিকে সেখানে নিয়ে যান; আবার রাত্রে নিজে ফেরত দিয়ে যান। এই নিয়ে আসা এবং পৌঁছে দেবার কাজটা কোম্পানির যে-কোনও ড্রাইভার বা একজন সাধারণ কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। তাঁর মতো একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এ-কাজ খুবই দৃষ্টিকটু। কিন্তু সেবাস্টিয়ান সাহেবের মতে মেরি একজন নতুন শিল্পী; তাঁকে সর্বক্ষণ সঙ্গ এবং উৎসাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি নিজেই ছুটে-ছুটে আসেন।

যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেদিন ভোরেই বেরিয়ে যেতে হয় জোহনকে। সেদিন আর সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেন না সে বেরুবার পর সেবাস্টিয়ান সাহেব আসেন। রাতে ফিরে অবশ্য মেরিকে ঝোপড়পট্টিতে দেখতে পায়। দু-একটা কথাও হয় তার সঙ্গে। উদ্দীপনা ভরা গলায় জোহন জিগ্যেস করে, আজ কীরকম রিহার্সাল হল, সেবাস্টিয়ান সাহেব কী বললেন, কার-কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, ইত্যাদি।

তবে যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে না, সেদিন সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। মেরি যখন তাঁর সঙ্গে ঝোপড়পট্টির বাইরে গিয়ে গাড়িতে ওঠে, সেও সঙ্গে-সঙ্গেই যায়। তারপর ওরা চলে গেলে হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে কেমন এক শূন্যতা অনুভব করে জোহন।

পুরো দেড় মাস রিহার্সালের পর মেরি—না-না মেরি নয়, সুজাতার রেকর্ড বেরুল। আর তার আগে খবরের কাগজে তার ছবি দিয়ে, রেডিওতে পাবলিসিটি করে বাজার গরম করে রেখেছিলেন সেবাস্টিয়ান। সত্যি-সত্যিই রেকর্ডটা বেরুতে না বেরুতেই হু-হু করে বিক্রি হয়ে গেল। চাহিদা মেটাবার

জন্য নতুন করে আবার রেকর্ডটার প্রিন্ট করতে হলো। দু-পিঠে দু-খানা গান দিয়ে রেকর্ড করেছিল মেরি। প্রথম গানটা হল—'ও পুরবৈঁয়া মাত্ যা, মাত্ যা—'। দ্বিতীয় গানটা হল—'আচানক এক মুসাফির আয়া থা, ও চলে গয়ে—'। দুটো গানই তাকে শিখিয়েছিল জোহন।

রেকর্ডটা যাতে বাজারে চলে, যাতে মেরির খুব নাম হয়, সেইজন্য মাহিম চার্চে পর-পর চার বুধবার জোহন মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে, আর ঈশ্বরের কাছে বার-বার প্রার্থনা করেছে।

যাই হোক, রেকর্ড বেরুবার পর সত্যি-সত্যি দারুণ নাম হয়ে গেল মেরির। কাগজগুলো লিখল, এমন 'গোল্ডেন ভয়েস' গত পঁচিশ বছরে শোনা যায়নি।।

মেরি খুবই অভিভূত। সে জোহনকে বলে, 'আমার এই নাম, এই খাতির—সব, সব তোমার জন্যে।'

জোহন যেমন খুশি তেমনই উত্তেজিত। মেরিকে কাঁধে তুলে নাগরদোলার মতো সে বন-বন পাক খেতে থাকে। এদিকে সেবাস্টিয়ান সাহেবও দারুণ উত্তেজিত। রেকর্ড বেরুবার তিন দিন বাদে ঝোপড়পট্টিতে এসে তিনি বললেন, 'পুরোনো কনট্রাক্টটা বাতিল করতে হবে।'

মেরি আর জোহন চমকে উঠল, 'কেন?'

'প্রথম রেকর্ড বেচে কোম্পানি কম করে এক লাখ টাকা প্রফিট করবে। আপনাকে মাসে দেড় হাজার টাকা দিয়ে কোম্পানি ডিপ্রাইভ করতে চাইছে না। ভাবছি, এখন থেকে মাসে চার হাজার টাকা পাবেন আর লাভের ওপর ফাইভ পারসেন্ট।'

জোহন ও মেরি বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল। সেবাস্টিয়ান সাহেব পুরোনো চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলে নতুন কনট্রাক্টে সই-টই করিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'এক রেকর্ডেই আপনার নাম হয়ে গেছে; পিপ্‌ল এখন আপনাকে চায়। এই সুযোগ ছাড়া হবে না। এখন রেকর্ডের পর রেকর্ড বাজারে ছাড়তে হবে।'

জোহন প্রতিটি অক্ষরে জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করল, 'নিশ্চয়ই।'

'এবার আমার একটা কথা আছে।'

'কী?'

'বলতে লজ্জা হচ্ছে জোহন সাহেব। তবে আপনি বুদ্ধিমান লোক, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন।'

জোহন বলল, 'আপনি বলুনই না।'

সেবাস্টিয়ান সাহেব বললেন, 'মেরিজির এখন নাম হয়েছে, আরও হবে। সিনেমার লোক, রেডিওর লোক, টেলিভিশনের লোক ঝাঁক বেঁধে তখন ওঁর কাছে আসতে থাকবে। এই ঝোপড়পট্টিতে আমি আসি কারণ, আমি আপনাদের ঘরের লোক হয়ে গেছি। কিন্তু অন্য লোকেরা একদিন এলে, আর দ্বিতীয় দিন আসতে চাইবে না। এতে মেরিজির ক্ষতি হবে। তাই ভাবছিলাম—'

'কী?'

'মেরিন ড্রাইভে আমাদের কোম্পানির একটা ফ্ল্যাট আছে। মেরিজি যদি সেখানে থাকেন, সব দিক থেকেই সুবিধে হয়। আপনি কী বলেন?'

শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জোহন। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন—'

মেরি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ফ্লুটবালা সেখানে যাবে তো?'

সেবাস্টিয়ান সাহেব থতিয়ে গেলেন। বিব্রতভাবে বললেন, 'রোজ নিশ্চয়ই ওখানে একবার করে যাবে। তবে ওটা তো কাজের জায়গা। মানে বেশি লোক থাকলে—' বলতে-বলতে থেমে গেলেন।

মেরি বলল, 'তাহলে আমি ওখানে কী করে থাকব? ফ্লুটবালা এখানে থাকবে, আমি

অত দূরে—

জোহন শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। মেরির জীবনে যে সুযোগ এসেছে, তার জন্যে সেটা নষ্ট হয়ে যাক, সে তা চায় না। দ্রুত বলে উঠল, 'সেবাস্টিয়ান সাহেব,.মেরির কথা আপনি শুনবেন না। এটা যখন বিজনেসের ব্যাপার, ও মেরিন ড্রাইভে গিয়ে থাকবে। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা।'

সেবাস্টিয়ান সাহেব বললেন, 'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই তো বুদ্ধিমান লোকের মতো কথা।'

জোহন এবার বলল, 'আমি কিন্তু রোজই একবার করে যাব।'

'সে তো আমি আগেই বলেছি। আপনি যাবেন, মেরিজিও রোজ একবার করে এখানে আসবেন। আচ্ছা, আজ চলি।'

এর দিন তিনেকের মধ্যে মেরিন ড্রাইভের ফ্ল্যাটে চলে গেল মেরি। ওখানে যাবার পর সমস্ত জীবনটাই যেন শূন্য মনে হতে থাকে জোহনের। এতদিন সে ছিল ভবঘুরে, চালচুলোহীন বাউন্ডুলে। তার দিনগুলো ছিল নারীসঙ্গহীন, নিরুৎসাহ। দুম করে এই মেয়েটা ক'দিনের জন্য এসে সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। ঝোপড়পট্টিতে এই নোংরা ঘরটা জুড়ে যেন ছড়িয়ে ছিল মেরি। সে চলে যাবার পর অনুভব করা যাচ্ছে, কতটা জায়গা সে ফাঁকা করে দিয়ে গেছে।

যাই হোক, প্রথম দিকে রোজই একবার করে মেরিন ড্রাইভের ঝকঝকে দামি ফ্ল্যাটে গেছে জোহন। যখনই গেছে চোখে পড়েছে, সেবাস্টিযান সাহেব ওখানেই আছেন। আর দেখা গেছে গান-টানের ব্যাপারে মেরি খুবই ব্যস্ত। এখন রিহার্সাল-টিহার্সাল ওখানেই হচ্ছে। তার নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। তবু তার মধ্যে কাছে ছুটে এসেছে মেরি। সামনে বসিয়ে গল্প করেছে, দামি-দামি খাবার খাইয়েছে। জানিয়েছে, এভাবে তার ভালো লাগছে না। জোহন তাকে বুঝিয়েছে, এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। তাতে সেবাস্টিয়ান সাহেব চটে যাবেন, সুযোগটা হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে। চারদিকে নাম আরও ছড়িয়ে যাক, পয়সা-টয়সা হোক, তখন দু-জনে একসঙ্গে থাকার অসুবিধে হবে না।

কিন্তু কিছুদিন পর মেরির কাজকর্মের চাপ এত বেড়ে গেল যে, তাকে ধরাই মুশকিল। দশ দিন এলে একদিন হয়তো দেখা হয়। বাকি দিনগুলো এসে জোহন শোনে, সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে মেরি। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে থেকেও তাকে ধরা যায় না।

এর মধ্যে মেরির আরও রেকর্ড বেরিয়েছে; রেডিওতে তার গান শোনা যাচ্ছে। টি-ভি প্রোগ্রামেও তার ডাক পড়ছে। টেলিভিশনে তার চেহারা এখন দেখা যায়। তা ছাড়া প্লে-ব্যাকের জন্য সিনেমার লোকেরা হানা দিচ্ছে। সিনেমার পত্রিকাগুলোতে, ফ্যাশন বা ইভ ম্যাগাজিনে আর দৈনিক পত্র-পত্রিকার ফিল্ম বা গান-বাজনার জন্য নির্দিষ্ট কলামে তার ইন্টারভিউ ও ছবি বেরুচ্ছে।

জোহন জানে চারদিকে মেরির এত নামের মূলে রয়েছে একটি মাত্র লোক—তিনি সেবাস্টিয়ান সাহেব। সে খবর পেয়েছে সেবাস্টিয়ান সাহেব নাকি এখন মেরির বিজনেস ম্যানেজার। রেডিও-টিভি-ফিল্ম—যেখান থেকেই লোকজন আসুক না, সেবাস্টিয়ান সাহেবই তাদের সঙ্গে ব্যাবসা-সংক্রান্ত কথা বলে থাকেন।

জোহন অনুভব করতে থাকে, মেরির যতই নাম হচ্ছে, ততই সে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। যে মেরিকে জোহন একদিন রাস্তা থেকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তুলে এনেছিল, যে মেরি ডান্ডা কোস্টের ঝোপড়পট্টিতে একদিন তাকে ঘিরে ছোট্ট একটা সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিল, সে যেন অন্য কেউ। একেক দিন ঝোপড়পট্টিতে সোমবারির সঙ্গে আচমকা দেখা হলে সে বিদ্রূপের সুরে বলে, 'শাদিটা কবে হচ্ছে?'

জোহন বিব্রত হয়, উশখুশ করতে থাকে। কোনও উত্তর দেয় না।

অশ্লীল ছড়া কেটে আঙুলের ডগা দিয়ে জোহনের থুতনিটা নাড়তে-নাড়তে সোমবারি এবার বলে, 'প্যানটুল-পাজামা ছেড়ে এবার ঘাঘরা আর শাড়ি পরো ফুলুটবালা। শালে ক্যায়সা মরদ তুমি! জওয়ান লড়কিটাতে হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিলে!'

ব্যান্ডপার্টির ইফতিকার সাহেবের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, তখনই এক কথা বলে যায় সে, 'গাধ্‌খে কা পাঠ্‌ঠে, ভয়েস গাড়ি-কা-ভয়েস, ঘাড়ে করে গুড়ই বয়ে গেলি! আর সেই গুড় খাচ্ছে এখন অন্য লোকে। তখন বিয়েটা করে ফেললে রাজার হালে থাকতে পারতিস। শালে উল্লুকা বান্দর।'

জোহন উত্তর দেয় না। সোমবারি বা ইফতিকার সাহেবের মতো করে না বললেও, চেনাশোনা লোকেরা তাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসে।

দেখতে-দেখতে একটা বছর কেটে গেল। এর মধ্যে আরও নাম হয়েছে মেরির। এখন রেডিওর বিবিধ ভারতী খুললেই তার গলা শোনা যায়, টিভি খুললেই তার মুখ, পত্র-পত্রিকায় আর পোস্টারে-পোস্টারে তার ছবি, ফিল্মের হিরোইনদের গলায় তার গান। ফিল্মের গান বাদ দিলে অন্য সব গানই জোহনের শেখানো গান। আশ্চর্য, আজকাল আনারকলি ব্যান্ডপার্টিকে যারা বায়না করতে আসে, তারা সুজাতা অর্থাৎ মেরির গানই বাজাবার কথা বলে। যে হাউইটাকে জোহন আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল, ক্রমশ সেটা অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। এখন আর তাকে কোনওরকমেই ছোঁয়া যাবে না।

অবশ্য এই এক বছরে বেশ কয়েকবার মেরিন ড্রাইভে এসেছে জোহন। যতবার এসেছে, দেখেছে মেরিদের প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে দামি-দামি ইম্পোর্টেড কার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে জানে এই গাড়িগুলো যাদের, তারা মেরির কাছেই এসেছে। এই সব চোখ-ঝলসানো গাড়ি দেখবার পর ব্যান্ডপার্টির ড্রেস পরে জোহন ভেতরে যেতে ভরসা পায়নি; বেশির ভাগ দিনই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেছে সে। তারপর বাইরে থেকেই ফিরে গেছে। এক আধদিন সাহসে ভর করে ভেতরে ঢুকলেও মেরির সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও দেখা হয়েছে। যখনই সে সাহস করে ওপরে এসেছে, সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেবাস্টিয়ান সাহেব তাঁকে দেখলে ইদানীং খুবই বিরক্ত হচ্ছেন। রূঢ়ভাবে বলেছেন, 'মেরি এখন ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে দেখা হবে না।'

জোহন কষ্ট পেয়েছে, তবু এসেছে। মেরির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে সে অবশ্য বিরক্ত হয়নি, রূঢ়তাও প্রকাশ করেনি, তবে বিব্রত মুখে বলেছে, 'আজ বড় ঝামেলায় আছি, তুমি আরেক দিন এসো।'

জোহন টের পাচ্ছিল, প্রচুর টাকা, প্রচুর নাম আর গ্ল্যামার মেরিকে একটু-একটু করে যেন বদলে দিচ্ছে। সে ঠিক করে ফেলেছিল, মেরিন ড্রাইভে আর যাবে না। কী হবে গিয়ে? সত্যি-সত্যিই এক বছর বাদে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছে জোহন।

সেবাস্টিয়ান সাহেব মেরিকে সেই যে ঝোপড়পট্টি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তারপর দু-বছর কেটে গেছে।

এই দু-বছরে জোহনের চেহারায় হঠাৎ যেন বয়সের ছাপটা বড় বেশি করে পড়ে গেছে। পিঠটা ঈষৎ বেঁকে গেছে, চুলের বেশির ভাগই সাদা, চামড়া কুঁচকে মুখে এখন অসংখ্য রেখা। চোখদুটো ঘোলাটে আর বিষণ্ণ দেখায়।

জীবনটা মেরি আসার আগের সেই পুরনো দিনগুলোর মতোই আজকাল কেটে যাচ্ছে। যেদিন ব্যান্ডপার্টির বায়না থাকে, সেদিন সকালে উঠেই স্নান-টান করে বেরিয়ে পড়ে জোহন। আগের মতোই

দুপুরে ইরানি কি পাঞ্জাবিদের হোটেলে খেয়ে নেয়। তারপর রাত্রেও হোটেলে গিয়ে এক বোতল ঠার্‌রা এবং রুটি মাংস কিংবা ইডলি সম্বর খেয়ে লাস্ট ট্রেনে ঝোপড়পট্টিতে ফিরে আসে। আর যেদিন বাজাবার ব্যাপার থাকে না, ঝোপড়পট্টিতেই পড়ে থাকে সে। অবশ্য এই অলস দিনগুলোতে বস্তির বাচ্চাকাচ্চারা তাকে ধরে সমুদ্রের পাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে জোহনকে একটা-না-একটা ফিল্মের গান বাজিয়ে শোনাতে হয়। আর সেই গানগুলোর বেশির ভাগই মেরির গাওয়া। কিন্তু এতে আর কতটা সময় কাটে! কিছুক্ষণ বাদে ঝোপড়পট্টিতে ফিরে দড়ির খাটিয়ায় চুপচাপ শুয়ে থাকে জোহন। মেরি চলে যাওয়ার পর এই ঝোপড়িতে রান্না-বান্নার পাট চুকে গেছে। যেদিন সে ঘরে থাকে, উদিপিদের সেই হোটেলটা থেকে দু-বেলা খাবার দিয়ে যায়।

মেরি চলে গেছে ঠিকই কিন্তু এখানে তার কিছুদিন কাটিয়ে যাবার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন-কোসন, দু-চারটে শাড়ি-জামা-টামা পড়ে আছে। দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে-শুয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনটা ভারী হয়ে যায় জোহনের। বুকের গভীর তলদেশ থেকে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস নানা স্তর ঠেলে-ঠেলে উঠে আসে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন জোহনদের বাজনার দল পেডার রোডের এক বিয়ে বাড়িতে বাজনার বায়না পেল।

সকালে নয়, বিকেলের কিছু আগে তাদের বাজাতে যেতে হবে।

বিকেলবেলা 'আনারকলি ব্যান্ডপার্টি'-র সঙ্গে পেডার রোডে এসে অবাক হয়ে গেল জোহন। দারুণ ভিড় চারদিকে। ডজন-ডজন ইম্পোর্টেড দামি কার এখানে ওখানে পার্ক করা রয়েছে। ভিড়ে এবং গাড়িতে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। চারপাশের স্কাই-স্ক্রেপারগুলোর ব্যালকনি আর জানলায় অগুনতি মুখ দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে কোনওরকমে একেকটা গাড়ি থেকে দু-একজন নাম-করা ফিল্মস্টার নেমেই ছুটে সামনের একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ঢুকে যাচ্ছে। কিছু যুবক-যুবতী হল্লা করে তাদের পিছুপিছু ছুটছে।

যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ফিল্মস্টাররা ঢুকছে, সবার দৃষ্টি সেদিকেই। বাড়িটা আলো আর ফুলে চমৎকার করে সাজানো। দেখেই বোঝা যায় এটা উৎসবের বাড়ি। জোহনরা এখানেই বাজাতে এসেছে।

কার বিয়ে, কে ইফতিকার সাহেবকে বায়না দিয়ে গেছে, কিছুই জানে না জোহন। ভিড়ের ভেতর পথ করে-করে ইফতিকার সাহেবের পিছু-পিছু ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো, তারা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার ভেতর ঢুকে পড়ল।

ভেতরে বিরাট ব্যাপার। বিশাল প্যান্ডেলে গেস্টদের অনেকেই এসে গেছে। জোহনরা অবশ্য প্যান্ডেলে ঢুকতে পেল না। একটা লোক এগিয়ে এসে তাদের উলটোদিকে একটা শামিয়ানার নীচে অপেক্ষা করতে বলল। সেখানে আরও চার-পাঁচটা ব্যান্ডপার্টি বসে ছিল। লোকটা বলল, 'আমি যখন বাজাতে বলব, তখন বাজাবে।'

বলেই চলে গেল।

জোহনরা বসেই আছে, বসেই আছে। চারদিকে ভিড়, চিৎকার এবং জ্যাম বেড়েই চলেছে। ইফতিকার সাহেব হঠাৎ বলল, 'বসে-বসে বাত ধরে যাবে দেখছি; উঠে একটু ঘুরে-টুরে আসি।' বলে চলে গেল।

দশ মিনিটও কাটল না, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে-ছুটতে চলে এল ইফতিকার সাহেব। এসেই জোহনের হাত ধরে এক টানে তুলে ফেলল তাকে। বলল, 'আজ আর তোকে এখানে বাজাতে হবে না; তুই ঝোপড়পট্টিতে ফিরে যা।'

জোহন অবাক। বলল, 'বাজাব না কেন?'

'পরে শুনিস, এখন চলে যা—'

জোহন কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল; তার আগেই চারপাশের হই-চই পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গেল,

অনেক লোক একসঙ্গে সামনের দিকে দৌড়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল ভিড়ের ভেতর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ইমপোর্টেড গাড়ি পথ করে খুব আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছে। গাড়িটার পিছনের সিটে সেবাস্টিয়ান আর মেরি। তাদের দু-ধারে দুজন নাম-করা চিত্রতারকা। মেরি আর সেবাস্টিয়ান সাহেবের পরনে বিয়ের পোশাক; গলায় ধবধবে জুঁইয়ের মালা। সম্ভবত ওরা চার্চ থেকে আসছে।

শরীরের সব রক্তস্রোত যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেল জোহনের। আরব সাগরের কূলে এত পর্যাপ্ত বাতাস, তবু তার মনে হল শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ পাশ থেকে ইফতিকার সাহেব খুব চাপা গলায় বলে উঠল, 'চলে যা জোহন, চলে যা। কার বিয়েতে বাজাতে এসেছি আগে জানলে, কিছুতেই বায়না নিতাম না। যা, এখনই চলে যা।'

জোহন যেতে পারল না, শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

এদিকে গাড়িটা প্যান্ডেলের কাছে এসে থামল। সেবাস্টিয়ান সাহেবের সঙ্গে নামতে-নামতে হঠাৎ মেরির চোখ এসে পড়ল জোহনের দিকে। কয়েক সেকেন্ড সে যেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেল, তারপরেই মুখ নামিয়ে সেবাস্টিয়ান সাহেবের পিছুপিছু প্যান্ডেলে গিয়ে ঢুকল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেই লোকটা দৌড়তে-দৌড়তে এসে দারুণ তাড়া লাগাল, 'বাজাও, বাজনা শুরু করে দাও—'

ইফতিকার সাহেব জোহনকে বারবার চলে যেতে বলেছে; জোহন কিন্তু যায়নি। ব্যান্ডপার্টির বাজনদারদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে প্রায় উন্মাদের মতো ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে গেল।

ব্যান্ডমাস্টার কাম-মালিক ইফতিকার সাহেব তাকে লক্ষ করতে-করতে ভাবতে লাগল, গাধধেকা পাঠ্‌ঠের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল কি না।

তারপর সময় কাটতে থাকে। শরীর ভাঙতে থাকে জোহনের। মুখটা রেখায়-রেখায় আরও জটিল হয়ে যায়; পিঠ ধনুকের মতো বেঁকতে থাকে। কিন্তু জীবন পুরোনো নিয়মেই বয়ে যায়। তবে একেকদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ঝোপড়পট্টির লোকেরা শুনতে পায়, জোহন ক্ল্যারিওনেটে সেই গান দুটো বাজাচ্ছে—

'আচানক এক মুসাফির আয়া থা, ও চলে গয়ে' কিংবা 'ও পুরবৈয়া মাত্‌ যা, মাত্‌ যা—'

বিষাদ-মাখানো এই করুণ গান দুটো জোহন মেরিকে প্রথম শিখিয়েছিল। আর এই গানের রেকর্ড করেই রাতারাতি মেরির নাম হয়ে গেছে।

মাঝরাতে জোহনের ক্ল্যারিওনেটের সুর বিশাল বম্বে শহরের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ একসময় বাজনা থামিয়ে জোহন ভাবতে থাকে, সত্যিই কি তার জীবনে কেউ কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল! আগাগোড়া সব ব্যাপারটাই তার কাছে একটা ঝাপসা হয়ে-আসা বিষণ্ণ স্বপ্নের মতো মনে হয়।



আপন মনে

ট্রেন ছাড়তে খুব একটা দেরি নেই; বড়জোর চার-পাঁচ মিনিট। একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার ক্যুপের জানলার ধার ঘেঁষে বসে থাকতে-থাকতে রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠছিলেন মণিমোহন। কবজি উলটে দ্রুত একবার প্রকাণ্ড চৌকো ঘড়িটা দেখে নিলেন; তারপর মুখের মোটা সিগারটা দাঁতে চেপে বাইরে তাকালেন।

মণিমোহনের বয়স ষাট-বাষট্টি, তবে অতটা দেখায় না। গায়ের রং লালচে, চামড়া প্রায় নির্ভাঁজ, মেরুদণ্ড টান-টান, হাইট ছ'ফুটের মতো, চোখের তারা নীলাভ। এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই কোথাও। চওড়া-চওড়া হাড়ের ফ্রেমে দৃঢ় মজবুত শরীর তাঁর, চ্যাটালো বুক, মাংসল কাঁধ। পাতলা করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল সযত্নে ব্যাক-ব্রাশ করা। লম্বাটে মুখ তাঁর, খাড়া নাক, চোখে মোটা ফ্রেমের বাই-ফোকাল চশমা। সব মিলিয়ে মণিমোহনকে অভারতীয় মনে হয়।

ক্যুপের বাইরে বোম্বাইয়ের সুবিশাল স্টেশন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের আধমাইল লম্বা প্ল্যাটফর্মে এখন গাদা-গাদা মানুষের ভিড়। মণিমোহনদের এই গাড়িটা অর্থাৎ ক্যালকাটা মেলে যত যাত্রী উঠেছে তার দশগুণ লোক এসেছে সি-অফ করতে। একটু আগেও এই ট্রেনের সবক'টা কামরা বোঝাই করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ঘিরে ওরা বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন ছাড়ার মুখে-মুখে নেমে গেছে কিন্তু স্টেশন থেকে চলে যায়নি। ক্যালকাটা মেল ছাড়ার পর রুমাল উড়িয়ে তবে ফিরবে।

দূরে স্টেশনের ঘড়িতে এখন সাতটা বেজে একান্ন। আরব সাগরের পারের এই শহরে এক ঘণ্টা আগে সন্ধ্যা নেমে গেছে। এখন গোটা স্টেশন জুড়ে যেদিকে যতদূর চোখ যায় নিওন সাইনে বড়-বড় কোম্পানি আর তাদের প্রোডাক্টের চোখধাঁধানো বিজ্ঞাপন। ডানপাশে উঁচু রেলিং-এর ওধারে সাবার্বন ট্রেনের জন্য সারি-সারি প্ল্যাটফর্ম। সবক'টা প্ল্যাটফর্মের মাথায় কালো বোর্ডে কমপিউটারে ট্রেন ছাড়ার সময় ফুটে উঠছে। ওখানে শহরতলির হাজার-হাজার প্যাসেঞ্জার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। কে আগে ট্রেন ধরতে পারে তার জন্য একটা উন্মত্ত 'ডগ-রেস' চলছে যেন।

মণিমোহন বিজ্ঞাপনের আলো, কমপিউটারে সাবার্বন ট্রেনের সময়-সংকেত বা চারিদিকের থিকথিকে ভিড়, কিছুই দেখছিলেন না। অগুনতি মানুষের ভেতর একজনকেই শুধু খুঁজছিলেন। কিন্তু না, তাঁদের এই ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে সেই লোকটিকে উঠতে দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা চিন্তাগ্রস্তের মতো কামরার ভেতরে মুখ ফেরালেন মণিমোহন। সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, 'নাঃ, ভদ্রলোক বোধহয় এলেন না।'

উলটোদিকের একটা সিটে বসে বাবার অস্থিরতা লক্ষ করে যাচ্ছিল সুজয়া। দারুণ মজা লাগছিল তার, চোখের তারায় এবং ঠোঁটে কৌতুকের একটু আভা চকচকিয়ে উঠেছিল। সুজয়া আস্তে করে বলল, 'তোমার ভীষণ একটা ক্ষতি হয়ে গেল।'

সুজয়ার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় সে যথেষ্ট লম্বা; প্রায় পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চি। গায়ের রং আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো, মসৃণ ত্বক, ঘন পালকে ঘেরা টানা চোখ, পাতলা ফুরফুরে নাকটা সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। সোনার ফুলদানির মতো গলা, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে কোঁকড়ানো ঘন চুলের ঘের। সারা শরীরে অজস্র স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্য তার সবচাইতে দামি অলঙ্কার।

সুজয়ার পরনে মেরুন রঙের মাইশোর সিল্ক, কানে দক্ষিণীদের মতো সাদা পাথরের কানফুল, আঙুলে সাদা পাথরের লম্বা আংটি, বাঁ-হাতে সোনার ব্যান্ডে গোল ঘড়ি, ডান হাতে একটা মাত্র

রুলি। সব মিলিয়ে তাকে অলৌকিক মনে হয়।

মণিমোহনের সিগার নিভে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ক্ষতি, ক্ষতি আবার কি? এতটা রাস্ত যাব। একজন বাঙালির কোম্পানি পাওয়া যাচ্ছিল, গল্প করতে-করতে যাওয়া যেত।'

সুজয়া হাসল, কিছু বলল না।

মণিমোহন ফের বললেন, 'কতদিন কলকাতার বাইরে পড়ে আছি। ভদ্রলোককে পেলে ওখানকার খবরটবর জানতে পারতাম।'

সুজয়া এবার বলল, 'ছত্রিশ ঘণ্টা পরেই তো আমরা কলকাতা পৌঁছে যাচ্ছি। একটু ধৈর্য ধরে থাকো না। একবার কলকাতায় পৌঁছুলে অন্যের মুখ থেকে খবর শুনবার দরকার হবে না।'

'তা যা বলেছিস। তবু—' মণিমোহন আস্তে করে সিগারে টান দিলেন।

সুজয়া বলল, 'ধরো যদি ভদ্রলোক আমাদের মতো কলকাতার বাইরের লোক হন?'

'সেটা অবশ্য অসম্ভব নয়। কোয়াইট পসিবল। তবু একজন বাঙালিকে সঙ্গী পেলে আমি কমফোর্টেবল ফিল করব। আই মিন কমুনিকেশনের অনেক সুবিধা হয়।'

সুজয়া হেসে ফেলল, 'তুমি ভীষণ সেকটারিয়ান বাবা।'

মণিমোহন হাসতে-হাসতে বললেন, 'আই অ্যাডমিট। ওই দেখ—' বলেই আঙুল বাড়িয়ে সামনের একটা বার্থ দেখিয়ে দিলেন।

এটা চার বার্থের ক্যুপ। মণিমোহন আর সুজয়া ছাড়া আপাতত আরও একজন এখানে রয়েছে। লোকটা গোয়াঞ্চি পিদ্রু; নাম যোহন সেবাস্টিয়ান, বয়স চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন। গাড়িতে উঠেই লোকটা জানিয়ে দিয়েছিল সে ভয়ানক ঘুমকাতুরে। তার ওপর ট্রেনে চড়লেই ঘুমটা দশ-পনেরো গুণ বেড়ে যায়। কলকাতা পর্যন্ত সে যাবে এবং রাস্তার ছত্রিশটা ঘণ্টা টানা ঘুম লাগাবে। একমাত্র ট্রেনে আগুন না লাগলে বা অন্য কোনও অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট না ঘটলে কোনও কারণেই তাকে যেন ডিসটার্ব করা না হয়। বলেই টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

সুজয়া মুখ ফিরিয়ে একবার যোহন সেবাস্টিয়ানকে দেখল, তারপর হাসতে লাগল।

মণিমোহন বললেন, 'এরকম একজন থাকলে গোটা জার্নিটাই মাটি। তুই-ই বল এমন লোকের সঙ্গে র‍্যাপোর্ট হয়? হরিবল!'

সুজয়া বলল, 'তুমি যাঁর জন্য অস্থির হয়ে উঠেছ তিনিও তো এঁর কার্বন কপি হতে পারেন।'

'ডোন্ট বি পেসিমিস্ট।'

সুজয়া উত্তর দিল না, হাসতেই লাগল।

আসলে মণিমোহন যাঁর সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত, তাঁকে কিন্তু আগে কখনও দেখেননি। তাঁর এই আগ্রহের একমাত্র কারণ লোকটা বাঙালি।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

মণিমোহন মানুষ হিসেবে কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। পঁচিশ বছর বয়সে রেকর্ড মার্ক পেয়ে এমবিবিএস পাস করেছিলেন। তারপর মিলিটারিতে বড় চাকরি পেয়ে পুণায় চলে যান। সেটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে।

সেই যে পুণায় গিয়েছিলেন, তারপর ছত্রিশটা বছর কেটে গেছে। মিলিটারির মেডিক্যাল সারভিসে অনেকগুলো প্রমোশন পেয়েছেন মণিমোহন। ক্যাপ্টেন হয়েছেন, মেজর হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কর্নেলের র‍্যাঙ্কও পেয়েছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতায় ঢাকুরিয়ার কাছে গথিক পিলার-বসানো পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ি তাঁদের। তিন বিঘে জায়গা জুড়ে বিশাল কম্পাউন্ড। সেখানে মা-বাবা-ভাইরা থাকতেন। মা-বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তবে ভাইরা আছেন।

মিলিটারিতে ছুটিছাটা নেই বললেই হয়; ছত্রিশ বছরে পাঁচ-সাত বারের বেশি কলকাতায়

আসতে পারেননি মণিমোহন। মা-বাবার মৃত্যুতে দু-বার এসেছিলেন, নিজের বিয়ে এবং ছোট তিন ভাইয়ের বিয়ে, মোট চারটে বিয়ে ছাড়া আরও চার বার এসেছিলেন। অন্য কোনও পারিবারিক শোকে বা উৎসবে আর এসেছেন কিনা এতকাল পর মণিমোহনের মনে নেই।

যাওয়া-আসা না থাকলেও তেরোশো মাইল দূরে থেকেও কলকাতা বা বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগটা তিনি বারবরই রেখে গেছেন। কলকাতায় যতগুলো মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিপত্রিকা বেরোয়, মণিমোহন তার সবগুলোর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। প্রিয় কোনও কবি বা ঔপন্যাসিকের বই বেরুলে ভিপি করে তিনি তক্ষুনি আনিয়ে নিতেন। এ ছাড়া সে-আমলের কনক দাসের, মালতী ঘোষালের, পঙ্কজ মল্লিকের রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড কিংবা আঙুরবালা-ইন্দুবালা-কমলা ঝরিয়া-শচীনদেবের গানও আনতেন। এ-আমলের গুণী গাইয়েদের মধ্যে তাঁর প্রিয় হচ্ছেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা, অশোকতরু, দেবব্রত বিশ্বাস এবং আরও অনেকে। তাঁদের কত যে লং প্লেয়িং রেকর্ড তিনি কলকাতা থেকে আনিয়েছেন তার হিসেব নেই। শুধু কি রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুল থেকে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, বাউল—বাংলাদেশের নরম মাটি থেকে যতরকমের গান উঠে এসেছে তার প্রায় সবই রয়েছে মণিমোহনের সংগ্রহে।

যুদ্ধের পরপর সেই সময়টায় পুণা আর কতটুকু শহর! ক'জন বাঙালির মুখই বা তখন দেখা যেত! চারিদিকে তখন পাহাড়, জঙ্গল, নির্জনতা। কল নেই, কারখানা নেই, কর্কশ চিৎকার বা ভিড় নেই। শুধু অগাধ প্রাগাঢ় প্রশান্তি আর ঘুম। সেই ঘুমন্ত শহর তার প্রাচীন বাসিন্দা কিছু চিৎপাবন ব্রাহ্মণ নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকত।

বাংলায় একটু কথা বলার জন্য প্রায়ই মণিমোহন ছিয়ানব্বই মাইল পাড়ি দিয়ে চলে যেতেন বোম্বাই। বোম্বাইতেও সে আমলে বাঙালি খুব একটা ছিল না; বড়-বড় কোম্পানির বড়-বড় কিছু অফিসার; এ ছাড়া মুম্বাদেবীর মন্দিরের কাছে ছিল বাঙালি জহুরিদের উপনিবেশ। সারাদিন তাদের সঙ্গে চুটিয়ে গল্পটল্প করে রাত্রে আবার পুণা।

কয়েক বছর বাদে সব কিছু বদলে গেল। ততদিনে দেশ ভাগ হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে হুড়মুড় করে বাঙালিরা ছুটে যাচ্ছিল বোম্বাই-এর দিকে, পুণার দিকে। তখন এ-দুটো শহর ঘিরে দেশের সবদিক থেকে ইন্ডিয়ান ক্যাপিটাল জড়ো হতে শুরু করেছে। আজ যেখানে মাঠ কি পাহাড়, কি আশ্চর্য, কাল সকালে চোখ মেলতেই দেখা যাচ্ছিল একটা কারখানা গজিয়ে উঠেছে; মাটি ফুঁড়ে তার লম্বা চিমনি সোজা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। বোম্বাই আর পুণা তখন বছরে তিন মাইল করে তার শরীর বাড়াতে শুরু করেছে।

ততদিনে হিন্দি ফিল্মের টানে কলকাতা থেকে বোম্বাইতে চলে গেছেন শচীনদেব বর্মন, গেছেন বিমল রায়, নীতিন বসু এবং নিউ থিয়েটার্সের আরও অনেকে। পুণার তিন হাজার ফুট উচ্চতা থেকে তাঁদের আকর্ষণে আরব সাগরের পারে বোম্বাই নামে সেই শহরে নেমে আসতেন মণিমোহন। নিজেই তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলেন; প্রীতি এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কও হয়েছিল। এর পুরো কৃতিত্ব তাঁর। তা ছাড়া উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান কি এরিয়ান ক্লাব ওখানে রোভার্স খেলতে যেত। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র তাঁদের বহুরূপী গ্রুপ নিয়ে রক্তকরবী কি রাজা অয়দিপাস করতে যেতেন। কলকাতার নাটক বা ফুটবল এলে যত জরুরি কাজ থাক, মণিমোহন বোম্বাই ছুটতেন। তা ছাড়া শিবাজি পার্কের বেঙ্গলি ক্লাবে দুর্গাপুজোর পাঁচটা দিন তিনি ওখানে থাকতেনই।

আসল কথা বাংলা গান, বাংলা কালচার, বাংলা থিয়েটার, বাংলা লিটারেচার—এই সব কিছু নিয়েই মণিমোহনের প্রচণ্ড মাতামাতি। এমনকী রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় যে-নতুন শব্দটি যুক্ত হয়েছে বা তরুণ লেখকের লেখায় কলকাতার এখনকার ছোকরাদের মুখে যে ইডিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে তার খবর পর্যন্ত তিনি রাখেন। মণিমোহনের এই ব্যাপারটাকে কেউ বলবে পাগলামি, কেউ বা বলবে বাতিক। অন্য প্রভিন্সের বন্ধুরা মজা করে বলতেন, 'তুমি ফ্যানাটিক বেঙ্গলি।' মণিমোহন

হাসতেন, উত্তর দিতেন না।

দীর্ঘকাল কলকাতা থেকে অনেক দূরে নানা জাতের পাঁচমিশালি মানুষের মধ্যে থাকলে যে কেউ খানিকটা কসমোপলিটান হয়ে যায়। সেদিক থেকে মণিমোহনের কোনওরকম সংস্কার নেই। মিলিটারি সার্ভিসে ভারতবর্ষের সব প্রভিন্সের মানুষই রয়েছে। তাদের ভাষা, কালচার, সামাজিক রীতিনীতি, সব কিছু সম্পর্কেই মণিমোহনের গভীর শ্রদ্ধা। তবু তাঁর মধ্যে বাংলাদেশ কী আশ্চর্যভাবেই না কাজ করে যায়। পুণায় থাকলেও তাঁর শিকড় বাংলাদেশের মাটিতেই থেকে গেছে।

জীবনের প্রথম পঁচিশটা বছর মণিমোহন কলকাতায় কাটিয়েছেন। তার চাইতে অনেক বেশি, পুরো ছত্রিশ বছর থেকেছেন পুণায়। পুণা কিন্তু আগের পঁচিশটা বছর রবার ঘষে-ঘষেও মুছে দিতে পারেনি। সেই পঁচিশ বছরের রং খুবই পাকা।

নিজের ভেতরকার এই বাঙালিয়ানা আর বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, স্ত্রী এবং মেয়ের মধ্যেও সংক্রামক কোনও ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন মণিমোহন। স্ত্রী অবশ্য অনেক কাল আগেই মারা গেছেন, তখন সুজয়ার বয়স মোটে আট।

সুজয়াকে নিজের রুচি, ইচ্ছা এবং পছন্দের মাপে একটু-একটু করে তৈরি করে নিয়েছেন মণিমোহন। পুণায় ইংলিশ মিডিয়াম মিলিটারি স্কুলে বাংলা পড়ার সুযোগ ছিল না। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আনিয়ে বাড়িতে সুজয়াকে বাংলা শিখিয়েছেন। সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়েছেন। কলকাতা থেকে স্কুল-কলেজের কোশ্চেন পেপার আনিয়ে নিয়মিত বাংলার পরীক্ষা নিতেন মণিমোহন।

পার্টিশনের পর হু-হু করে যখন বোম্বাইতে বাঙালি বাড়তে লাগল তখন কয়েকটা রবীন্দ্রসংগীতের স্কুলও খোলা হল। ফি সপ্তাহে একবার করে সুজয়াকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাবার জন্য বোম্বাই নিয়ে আসতেন মণিমোহন। সুজয়া রবীন্দ্রসংগীত ভালোই শিখেছে; তার গলা ভরাট এবং মিষ্টি।

এমনিতেই বোম্বাইয়ের ওপর বহুকাল ধরে ইউরোপের হাওয়া বয়ে আসছে। বোম্বাইকে তো বলাই হয় ওয়েস্টার্ন সিটি অফ ইন্ডিয়া। স্বাধীনতার পর করাচি থেকে সিন্ধিরা যখন এসে হাজির হল তখন সেই পশ্চিমা বাতাস আরও জোরদার হয়ে উঠল। সেই হাওয়ায় মেয়েকে ভেসে যেতে দেননি মণিমোহন। বাবার জন্যই প্যারালাল আর বেলবটম পরে ম্যাক্সফ্যাক্টরে নখ-মুখ পেইন্ট করে নিজেকে একটি বিচিত্র জীব তৈরি করেনি সুজয়া।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হাসপাতালের ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার, রোগী ইত্যাদি বাদ দিলে বাংলা কালচার আর মেয়েকে নিয়েই কেটে গেছে মণিমোহনের। সপ্তাহখানেক আগে তিনি রিটায়ার করেছেন। আর রিটায়ারমেন্টের পরই ঠিক করেছেন কলকাতায় ফিরে যাবেন। জীবনের শেষ বছরগুলো কলকাতায় কাটিয়ে দেবেন।

তিনদিন আগে সব লাগেজ 'বুক' করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন মণিমোহন। আজ সুজয়াকে নিয়ে ডেকান কুইনে দুপুরবেলা বোম্বাই এসেছেন। তারপর মেরিন লাইনসের একটা ভালো রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সেরে এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ ঘুরে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে চলে এসেছেন। ক্যালকাটা মেলে তাঁদের এই রিজার্ভ-করা কামরায় উঠবার সময় চোখে পড়েছিল বাইরে প্যাসেঞ্জারদের একটা লিস্ট টাঙানো রয়েছে। তাতে এই ক্যুপের চারজন যাত্রীর নামও আছে। মণিমোহন, সুজয়া এবং যোহন সেবাস্টিয়ান ছাড়া কলকাতার চতুর্থ যাত্রীটির নাম এইচ মুখার্জি। এই বাঙালি নামটি দেখেই লাফিয়ে উঠেছিলেন মণিমোহন।

বাইরে গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে।

সুজয়া মণিমোহনকে মজা করে কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় কনডাক্টর গার্ড সাতাশ-আটাশ

বছরের একটি যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে এল। বলল, 'হিয়ার ইজ ইওর ক্যুপ—'

যুবকটি বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

কনডাক্টর গার্ড আর দাঁড়াল না; মাঝখানের করিডর ধরে কামরার শেষ প্রান্তে চলে গেল। আর যুবকটি ততক্ষণে ক্যুপের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তার এক হাতে ফোমের দামি সুটকেস আরেক হাতে হোল্ড-অল। শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরার জন্য খুব সম্ভব পোর্টার-টোর্টার ডাকতে পারেনি; নিজের মালপত্র নিজেই হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে।

মণিমোহন একদৃষ্টে যুবকটিকে লক্ষ করছিলেন। যার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন হঠাৎ সে আসায় তিনি খুশি হয়েছেন। তাঁর চোখ চকচক করছিল। পরিষ্কার বাংলায় মণিমোহন বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এইচ মুখার্জি—'

যুবকটির চোখেমুখে চমক খেলে গেল। মণিমোহনের দিকে ফিরে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি হীরক মুখার্জি। কিন্তু আমার নাম আপনি জানলেন কি করে?'

মণিমোহন উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন; তার আগেই হীরক হেসে ফেলল, 'ও বুঝেছি, প্যাসেঞ্জার লিস্টে আমার নাম দেখেছেন।'

'একজাক্টলি।' মণিমোহনও হাসলেন।

হীরক মণিমোহনের সম্বন্ধে খানিকটা উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিছু একটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল সে, তাকে থামিয়ে দিয়ে মণিমোহন বললেন, 'মালপত্র হাতে ঝুলিয়ে কথা হয় নাকি? আগে ওগুলো নামান। ছত্রিশ ঘণ্টা একসঙ্গে যাব। গল্প করার অনেক সময় হাতে আছে।'

হীরক খুবই স্মার্ট। হেসে বলল, 'রাইট।'

মোট চারটি বার্থ এই ক্যুপেতে। ওপরে দুটো, নীচে দুটো। নীচের বার্থ দুটো সুজয়া আর মণিমোহনের। সুজয়ার মাথার ওপরকার বার্থটা দখল করে আছে যোহন সেবাস্টিয়ান। মণিমোহনের মাথার ওপরেরটা এখনও ফাঁকা। ফাঁকা বার্থের একধারে সুটকেসটা রেখে হোল্ড-অল খুলে চটপট বিছানা পেতে ফেলল হীরক। তারপর মণিমোহনের দিকে ফিরে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না। নীচে আপনার কাছে বসলে অসুবিধা হবে?'

মণিমোহন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'অসুবিধা! অসুবিধা কীসের? ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আসুন আসুন—' নিজে সরে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আরাম করে বসুন—'

বসতে-বসতে হীরক বলল, 'ধন্যবাদ।' একটু হেসে আবার বলল, 'আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব—'

মণিমোহন তার মুখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

'আপনি আমার চাইতে বয়েসে অনেক বড়। এলডারলি লোকেরা 'আপনি-আপনি' করে বললে আমি ভীষণ আনকমফোর্টেবল ফিল করি।'

'ঠিক আছে, 'তুমি' করেই বলব।'

হীরক একটু হাসল।

মণিমোহন আবার বললেন, 'লিস্টে তোমার নামটা দেখার পর থেকে তোমার জন্যে আমরা ভীষণ কিউরিয়াস হয়েছিলাম। ভালো কথা, আমাদের পরিচয়টাই তোমাকে দেওয়া হয়নি। আমি মণিমোহন বসু, ইন্ডিয়ান আর্মির একজন রিটায়ার্ড ডাক্তার। আর ও আমার মেয়ে সুজয়া; পুণা ইউনিভার্সিটি থেকে মডার্ন হিস্ট্রিতে এ-বছর এমএ পাস করেছে।'

সংক্ষেপে মণিমোহন এটাও জানিয়ে দিলেন একটানা ছত্রিশ বছর বাদে জন্মভূমির টানে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। এখন থেকে জীবনের বাকি অংশটা ওখানেই কাটাবেন।

হীরক সুজয়ার দিকে ফিরে দু-হাত জড়ো করল। সুজয়াও নিঃশব্দে প্রতি নমস্কার জানাল। হীরককে প্রথম থেকেই লক্ষ করছিল সে। মণিমোহনের চাইতেও হীরক লম্বা। বাঙালিদের মধ্যে এরকম

হাইট সহজে চোখে পড়ে না। মুখচোখ কাটা-কাটা, নাকটা খাড়া কপাল থেমে নেমে এসেছে। শরীর বেতের মতো নমনীয় অথচ দৃঢ়, চওড়া কাঁধ, হাত দুটো খুব সম্ভব হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে গেছে। গায়ের রং পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো চকচকে। পাশ থেকে প্রোফাইল দেখলে তাকে গ্রিক বলে মনে হয়। বাঙালিদের মধ্যে মোঙ্গলীয়, গোর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ব্রিটিশ—কত রকমের চেহারা যে রয়েছে ভাবা যায় না।

হীকের পরনে 'মড' যুবকদের মতো পোশাক—পায়ের দিকে ছত্রিশ ইঞ্চি ঘেরের টু-পিস ট্রাউজার্স আর ইজিপসিয়ান কটনের ফ্যাশনেবল স্পোর্টস গেঞ্জি, কোমরে চওড়া বেল্ট, পায়ে উঁচু হিলের শ্যু। হীরক ঝকঝকে স্মার্ট মড যুবক। তাকে দেখতে বেশ ভালো লাগছিল সুজয়ার। তবে জন্মের পর থেকে বাইরে-বাইরে পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন অ্যাটমসফিয়ারে বড় হয়ে উঠলেও সুজয়া কিছুটা চাপা ধরনের মেয়ে। বেশ অন্তর্মুখী; ইংরেজিতে যাকে বলে ইনট্রোভার্ট। ভেতরে তার যা-ই থাক, যে স্রোতই বয়ে যাক, বাইরে এতটুকু ঢেউ নেই। সুজয়া হ্রদের ওপরে নিস্তরঙ্গ জলের মতো।

মণিমোহন ওপাশ থেকে আবার বলতে লাগলেন, 'তুমি কি বম্বেতে থাকো?'

হীরক সুজয়ার দিক থেকে চোখ ফেরাল। মণিমোহনকে দেখতে দেখতে বলল, 'না। কেন বলুন তো?'

'বম্বে থেকে যাচ্ছ; তাই জিগ্যেস করলাম।'

'আমি কলকাতায় থাকি। একটা ব্যাপারে বম্বে এসেছিলাম; আজ ফিরে যাচ্ছি।'

'কোনও কাজ এসেছিলে?'

'কাজ? না, তেমন কিছু নয়। প্রত্যেক বছর বম্বে টু গোয়া মোটর রেসিং হয়; আমি তাতে নাম দিয়েছিলাম।'

গলার স্বরে খানিকটা বিস্ময় মিশিয়ে বেশ জোর দিয়েই মণিমোহন বলে উঠলেন, 'আচ্ছা! দেন ইউ আর আ স্পোর্টসম্যান—'

হীরক হাসল; কিছু বলল না।

মণিমোহন খুব উৎসুকভাবেই জিগ্যেস করলেন, 'রেসিং-এ কী হল?'

হীরক বলল, 'আমি সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছি।'

মণিমোহন প্রায় উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠলেন, 'কনগ্র্যাচুলেশনস। কলকাতা থেকে একটি ছেলে এসে এখান থেকে ট্রফি নিয়ে যাচ্ছে। আমি রিয়েলি হ্যাপি, ভেরি হ্যাপি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

সুজয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। নিজের অজান্তেই সে হঠাৎ বলে উঠল, 'জানেন, বাবা ভীষণ সেকটারিয়ান। কলকাতার কেউ কিছু একটা করে ফেললে একেবারে নাচানাচি জুড়ে দেয়।'

হীরক হাসতে লাগল, 'তাই নাকি?'

এদিকে ট্রেনটা অনেকক্ষণ আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। মাঝখানে বোম্বাইয়ের মাঝামাঝি দাদারে মিনিট পাঁচেকের জন্য থেমেই আবার দৌড় লাগিয়েছে।

বোম্বাই শহরের তো শেষ নেই। অফুরন্ত শহরতলি আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মধ্যে সেটা ছড়িয়ে আছে। দু-ধারে ঝলমলে আলোকিত মেট্রোপলিস আর বিরাট-বিরাট সব স্কাইস্ক্রেপার কিংবা গভর্নমেন্ট হাউসিং স্কিমের হাজার-হাজার বাড়ি এবং বিশাল-বিশাল ফ্যাক্টরির কম্পাউন্ড। মাঝখান দিয়ে ক্যালকাটা মেল প্রকাণ্ড সরীসৃপের মতো ছুটে যাচ্ছিল।

মণিমোহন বললেন, 'তুমি কি এখনও স্টুডেন্ট?'

হীরক মাথা নাড়ল, 'না। বছর চারেক আগেই ওই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে। আমি যাদবপুর থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা ডিগ্রি কোনওরকমে জুটিয়ে নিতে পেরেছি।' বলে হাসল সে।

'গুড। সারভিসে আছ?'

'না। হাওড়ায় আমাদের ফ্যাক্টরি আছে। নানারকম ইলেকট্রিক্যাল কমপোনেন্ট তৈরি হয়। মাঝেমধ্যে ওখানে যাই। তবে সময়-টময় একদম পাই না।'

মণিমোহন সস্নেহে বললেন, 'সময় পাও না কেন?'

হীরক বলল, 'স্পোর্টস আর হান্টিং, এ-দুটো আমার 'হবি'। ওই নিয়েই বছরের দশ মাস কেটে যায়! ফ্যাক্টরিতে যাব কখন?'

'আই সি।' হীরককে মণিমোহনকে বেশ ভালো লাগছিল। ছেলেটি বেশ সরল আর অকপট। যা সে করে সোজাসুজি তাই বলে; কোনওরকম লুকোচুরি নেই। একটু ভেবে মণিমোহন জিগ্যেস করলেন, 'শিকারের কথা বলছিলে; সবই বিগ গেম?'

'ঠিক নেই কিছু, যখন যা পাই। তবে গভর্নমেন্ট শিকারের ব্যাপারে যেরকম রেসট্রিকশান চাপিয়েছে, তাতে ওর মজা আর নেই।'

একটু চুপচাপ। তারপর মণিমোহন জিগ্যেস করলেন, 'এবার কলকাতার খবর বলো।'

'তেমন কোনও খবর নেই। যেমন চলছিল তেমনই চলে যাচ্ছে।'

'কয়েক বছর আগে তো খুবই গোলমাল খুনোখুনি গেছে।'

'হ্যাঁ; সমস্ত পলিটিক্যাল ব্যাপার। তবে এখন সেসব ডিসটারব্যান্স আর নেই।'

'ওই সময়টায় বড়-বড় অনেক ইন্ড্রাস্ট্রি আর অফিস বম্বেতে উঠে এসেছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের তাতে প্রচুর ক্ষতি করে গেছে বলে আমার মনে হয়।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। সিকিউরিটির তখন অভাব ছিল।'

'যাই হোক, খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ি—আজকাল ক্যালকাটার প্রচুর ডেভলাপমেন্ট হচ্ছে। কথাটা ঠিক?'

'হ্যাঁ; নানারকম কাজকর্ম চলছে।'

'ওখানে লোক অনেক বেড়ে গেছে, না?'

'হ্যাঁ, প্রায় এইট মিলিয়ন।'

'ইট'স আ প্রবলেম। ভেরি বিগ প্রবলেম।'

হীরক বলল, 'এত বড় সিটি, এত পপুলেশন, প্রবলেম তো হিউজ হবেই।'

আস্তে-আস্তে ঘাড় হেলালেন মণিমোহন, 'রাইট।' একটু থেমে, ভেবে নিয়ে আবার বললেন, 'ক্যালকাটার ফুটবলের স্ট্যান্ডার্ড এখন কেমন?'

'অনেক নেমে গেছে। তবু ইন্ডিয়ার বেস্ট।'

'ফুটবল নিয়ে মাতামাতি কীরকম?'

'দারুণ। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা হলে এসপ্ল্যানেডে তিন ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যাম থাকে।'

মণিমোহন বললেন, 'মাতামাতিটাই শুধু আছে। রহিম-রশিদ-মুর্গেশ-লক্ষ্মীনারায়ণ-কে. দত্ত-পি চক্রবর্তী-মান্না-আপ্পারও, এদের মতো প্লেয়ার আর হল না।'

হীরক হাসল, 'আমি ওদের খেলা দেখিনি। কমপেয়ার করা আমার পক্ষে মুশকিল।'

'কারেক্ট। তবু আমার কথা যদি শোনো, বলব ক্যালকাটা ফুটবলের গোল্ডেন এজ হচ্ছে নাইনটিন থার্টি ফোর থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টিফাইভ সিক্সটি পর্যন্ত।'

উলটো দিকের সিট থেকে সুজয়া লক্ষ করল, হীরক কোনওরকম তর্কবিতর্কে গেল না। বয়স্ক মানুষদের নস্টালজিয়া সম্পর্কে এক ধরনের দুর্বলতা আছে। হীরক তাকে সম্মান দিতে জানে। সুজয়ার মনে হল ছেলেটি ভদ্র।

মণিমোহন এবার বললেন, 'যাই বলো, ক্রিকেটে কিন্তু ক্যালকাটার স্ট্যান্ডার্ড খুবই পুওর।'

সঙ্গে-সঙ্গে কথাটা স্বীকার করে নিল হীরক; বলল, 'হ্যাঁ। অল ইন্ডিয়া, পারটিকুলারলি বম্বে

দিল্লি কি মাদ্রাজ যতটা এগিয়েছে আমরা তার কাছাকাছিও যেতে পারিনি।'

'আমার খুব খারাপ লাগে কখন জানো?'

'কখন?'

'যখন দেখি টেস্ট টিমে ভাস্ট ইস্টার্ন জোন থেকে একজনও রিপ্রেজেনটেটিভ নেই। পঙ্কজ রায়ের পরই সব শেষ।'

হীরক কী বলবে, চুপ করে থাকল।

মণিমোহন বলতে লাগলেন, 'আসলে ক্যালকাটা ক্রিকেটকে সেইভাবে নেয়নি। বম্বেতে সারা বছর ক্রিকেট চলে। এনি সিজন অফ দা ইয়ার ইউ কাম, দেখবে আজাদ ময়দান, ক্রস ময়দান, ওভাল আর যত জিমখানা আছে—হিন্দু, পার্শি, খার—সব জায়গায় ক্রিকেট চলছে। কলকাতাতেও সারা বছর ক্রিকেট প্র্যাকটিসের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকা দরকার। নইলে ভালো প্লেয়ার তৈরি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে একমত?'

'নিশ্চয়ই—'

ওদের কথার মধ্যেই রেলওয়ে কেটারিং-এর উর্দি-পরা বেয়ারা এসে হাজির। ডিনারের অর্ডার নিতে এসেছে।

হীরক কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মণিমোহন বলে উঠলেন, 'কী তোমার পছন্দ বল—ইওরোপিয়ান, না ইন্ডিয়ান ডিশ?'

মণিমোহনের মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিল হীরক। বিব্রতভাবে বলল, 'না, মানে—'

তাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে মণিমোহন বললেন, 'আজ রাত্তিরে তুমি আমার গেস্ট—' একটু থেমে, প্রায় তক্ষুনি আবার বললেন, 'শুধু আজই না, পরশু ভোরে হাওড়ায় পৌঁছনো পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে—'

'কিন্তু—'

'সংকোচের কারণ নেই। তোমাকে আমাদের ভালো লেগেছে। খাওয়ার সময়ে তোমাকে পেলে আরও ভালো লাগবে। যদি রিফিউজ করো, খুব দুঃখিত হব।'

স্রোতে হাত-পা ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হীরক বলল, 'ঠিক আছে। কলকাতায় গিয়ে আমাদের বাড়িতে কিন্তু একদিন আপনাদের আসতে হবে।'

মণিমোহন গলার স্বরে অনেকখানি জোর দিয়ে বললেন, 'অবশ্যই। এবং উইদ প্লেজার। ইন ফ্যাক্ট, তুমিই প্রথম ক্যালকাটান যে আমাদের নেমন্তন্ন করল। নেমন্তন্ন আমরা মিস করি না।' বলেই সুজয়ার দিকে ফিরলেন, 'না কি বলিস—'

সুজয়া হাসল শুধু।

মণিমোহন আবার হীরকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী অর্ডার দেব বলো?'

হীরক বলল, 'আপনার যা ইচ্ছে। আই হ্যাভ নো চয়েস।'

নিজের মনের কি একটু চিন্তা করে পুরো ভারতীয় ডিনারের অর্ডার দিলেন মণিমোহন। বেয়ারাটা নোটবুকে টুকে নিয়ে বলল, 'সাব, আপলোগোকা খানা কামরেমে সার্ভ করেগা, ইয়া আপলোগ রেস্টুরেন কামরা পর যায়েঙ্গে?'

মণিমোহন বললেন, 'তোমাকে আর খানা আনতে হবে না; আমরা রেস্তোরাঁ কারেই যাব।'

'ন' বাজে খানা লাগায়েগা—'

'ঠিক হ্যায়—'

বেয়ারা চলে গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর মণিমোহন আবার শুরু করলেন, 'সত্যজিৎ রায়ের লাস্ট ছবি কী?'

হীরক বলল, 'জন অরণ্য।'

'এখন উনি কী করছেন?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'আচ্ছা, কোন গ্রুপ থিয়েটারগুলো এখন ভালো ড্রামা করছে?'

'আমার কোনও আইডিয়া নেই।'

'তুমি বোধহয় সিনেমা থিয়েটারের ব্যাপারে তেমন ইনটারেস্টেড নও।'

হীরক কিছুটা বিব্রতভাবে বলল, 'না। মানে ওসব তেমন একটা দেখা হয়ে ওঠে না। তবে আমার এক বন্ধু আছে মৃণাল। তার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দেব। সে এসব বিষয়ের অথরিটি।'

মণিমোহন উৎসাহের সুরে বললেন, 'নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দেবে। কত কাল বাংলা ছবি, বাংলা নাটক দেখি না।'

'আমার বন্ধু মৃণাল কলকাতার যত কালচারাল ব্যাপার আছে, সব খবর রাখে। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিল; প্রফেসরি করে। লিটারেচার থেকে শুরু করে ফোক মিউজিক পর্যন্ত, যা বলবেন সমস্ত কিছুর এনসাইক্লোপিডিয়া।'

'ফাইন। তোমার বন্ধুকে কলকাতায় আমাদের কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের গাইড করে নেব। না কি বলিস টুকু—' বলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন মণিমোহন।

সুজয়াও হাসল, 'ভালোই তো।'

হীরক বলল, 'ওর সঙ্গে আলাপ হলে আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে। হি ইজ সো নাইস।'

মণিমোহন বললেন, 'বন্ধুর হয়ে ঢালাও পাবলিসিটি দিচ্ছ?'

হীরক খুব আন্তরিক গলায় জোর দিয়ে বলল, 'একটুও বাড়িয়ে বলছি না। মৃণালের মতো কালচার্ড, ডিসেন্ট, সোবার, হৃদয়বান ছেলে আমি আর দেখিনি। আলাপ হলে দেখবেন আমার কথার প্রত্যেকটা সিলেবল সত্যি।'

'তুমিও নাইস বয়।'

'ওর সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না।'

'সেটা কলকাতায় গিয়ে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখব।'

'আমার কথা বিশ্বাস করুন।'

আদরের ভঙ্গিতে হীরকের পিঠে একটা হাত রেখে মণিমোহন বললেন, 'অবিশ্বাস তো করছি না। তবে এমন করে যে অন্যের প্রশংসা করতে পারে সেও খুব ভালো।'

হীরকের মতো ঝকঝকে স্মার্ট ছেলেও একটু লজ্জা পেয়ে গেল।

উলটো দিকের সিটে বসে সুজয়ারও বেশ ভালো লাগছিল হীরককে। হীরক সম্পর্কে তার মনোভাব মণিমোহনের মতোই। যে নিজের জন্য হাতে কিছু না রেখে বন্ধু সম্বন্ধে এমন ঢালাও সার্টিফিকেট দিতে পারে তার হৃদয় যথেষ্টই উদার।

কথায়-কথায় ন'টা বেজে গিয়েছিল। মণিমোহন হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন, 'চলো, রেস্তোরাঁ-কারে যাওয়া যাক। ডিনারের সময় হয়ে গেছে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

দেখাদেখি সুজয়া আর হীরকও উঠে পড়ল।

দু-ধারে পরপর ক্যুপ। মাঝখানে টানা সরু করিডর। কিছুক্ষণ পর করিডর হয়ে তিনজনে রেস্তোরাঁ-কারে এসে পড়ল।

এর মধ্যেই এখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। তবু এক কোণে জানলার ধার ঘেঁষে ওরা একটা ফাঁকা টেবল পেয়ে গেল।

একদিকে সুজয়া একা বসেছে। টেবলের উলটোদিকে মুখোমুখি বসেছেন মণিমোহন আর হীরক। ওরা বসবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লিস্ট মিলিয়ে বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল।

খেতে-খেতে কলকাতা আর পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন মণিমোহন।

বোম্বাইয়ের রাস্তায় আট-দশটা পাহাড়ি টানেল পড়ে। ট্রেন এক-একটা টানেলের ভেতর ঢুকছে; সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর গমগম শব্দ এবং তার প্রতিধ্বনি টানেলের দেওয়ালে-দেওয়ালে আর আবদ্ধ বাতাসে ধাক্কা মেরে যেতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই সবগুলো টানেল আর বোম্বাই শহরের সীমানা পেরিয়ে ক্যালকাটা মেল বিশাল মাঠের মাঝখানে এসে পড়ল।

এখন পূর্ণিমা চলছে। রুপোর থালার মতো গোল একটি চাঁদ দিগন্তের তলা থেকে কখন লাফ দিয়ে আকাশের মাঝমধ্যিখানে উঠে এসেছে এতক্ষণ টের পাওয়া যায়নি। জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে চারিদিকে। আর তাতে মহারাষ্ট্রের ধু-ধু মাঠ, মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পাহাড়, তাদের উপত্যকা, বুনো গাছের জটলা—সব একাকার হয়ে কোনও এক অলৌকিক পরির দেশ হয়ে গেছে।

নিজেই প্রায় সব কথা বলে যাচ্ছিলেন মণিমোহন। ফাঁকে-ফাঁকে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল হীরক। হঠাৎ কি মনে পড়তে মণিমোহন সুজয়ার দিকে ফিরলেন, 'দিস ইজ ব্যাড টুকু।' সুজয়ার ডাকনাম টুকু।

সুজয়ার চোখ মণিমোহনদের দিকেই ছিল। তাঁর কথা বুঝতে না পেরে সে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে বাবা?'

'হীরক আমাদের গেস্ট। তুই কিন্তু তার সঙ্গে একটা কথাও বলছিস না।'

'তুমিই তো বলছ। আমি আর কি বলব?'

'যা হোক কিছু।'

'ফর্মালিটি!'

মণিমোহন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'না না, ফর্মালিটি করতে হবে কেন? ক্যালকাটা, বেঙ্গল—এসব সম্পর্কে তো ওর কাছে কিছু জানতেও পারিস।'

সুজয়া হেসে ফেলল, 'তুমি জিগ্যেস করছ, উনি উত্তর দিচ্ছেন। মাঝখান থেকে আমার জানা হয়ে যাচ্ছে। এর ওপর আমি যদি আবার কোশ্চেন পেপার সাজিয়ে বসি, উনি ডেফিনিটলি বিরক্ত হবেন।'

হীরক ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'না না, বিরক্ত হব কেন?'

সুজয়া উত্তর দিল না, সামান্য হাসল।

হীরক জিগ্যেস করল, 'আপনি আগে আর কখনও কলকাতায় গেছেন?'

'ছেলেবেলায় তিন-চারবার বাবার সঙ্গে গেছি। আমার একটা আবছা ইমপ্রেশান আছে।'

এলোমেলো আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। তার ফাঁকে রাতের খাওয়া শেষ করে ওরা নিজেদের ক্যুপেতে যখন ফিরে এল, দশটা বাজে।

মণিমোহন বললেন, 'রাত হয়ে গেছে। তোমার ওপর অনেক উৎপাত করেছি। এবার শুয়ে পড়ো। কাল সকালে আবার কথা হবে। গুড নাইট।' আসলে কাঁটায়-কাঁটায় দশটায় শুয়ে পড়ার অভ্যাস মণিমোহনের। এ-ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক।

হীরক প্রথমে মণিমোহনের, পরে সুজয়ার দিকে ফিরে বলল, 'গুড নাইট।' তারপর ওপরে তার বার্থে উঠে গেল এবং টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

নীচে মণিমোহন তাঁর বিছানায় শুয়ে পড়েছেন; সুজয়াও একটু পরে শুয়ে পড়ল।

শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চোখ জুড়ে আসছিল মণিমোহনের। ঘুমটা তাঁর চোখের পাতায় বসানোই থাকে। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। জড়ানো গলায় বললেন, 'বেশি পাওয়ারের আলোটা নিভিয়ে জিরো পাওয়ারেরটা জ্বেলে দাও হীরক। চোখে ভীষণ লাগছে।'

হীরকের মাথার কাছেই সুইচ বোর্ড। হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপে একটা আলো জ্বালল সে, আরেকটা নেভাল। জিরো পাওয়ারের নীলাভ আবছা আলোয় গোটা ক্যুপটা মুহূর্তে ভরে গেল।

ট্রেন চলছে তো চলছেই। কল্যাণ, ইগতপুরী এবং আরও গোটাকয়েক স্টেশন অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে গেছে। এরপর হয়তো নাসিক।

নীচের বার্থে শুয়ে-শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসছে না সুজয়ার। সে মণিমোহনের উলটো। এত তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস তার কোনওকালেই নেই। রাত্তিরে বারোটা-একটা পর্যন্ত চিরকালই সে কিছু না কিছু পড়ে। সুজয়া রাত জাগলে মণিমোহন অবশ্য রেগে যান। তাই লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকে পড়তে হয়।

আলো নিভে গেছে; এখন আর পড়ার উপায় নেই। এদিকে ঘুমও আসছে না। একধারে কাত হয়ে সে চোখ বোজার চেষ্টা করল। কিন্তু ট্রেনের একটানা দোলানিতে ঘুমের কোনও আশাই নেই। মনে হচ্ছে সে যেন উঁচু-নীচু ঢেউ-এর মাথায় ভাসছে। তা ছাড়া ওধার থেকে মণিমোহনের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। হারমোনিয়ামের রিডগুলো খাদে বাজালে যেরকম হয়, মণিমোহনের নাক থেকে সেইরকম আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। ওপরে যোহন সেবাস্টিয়ানের নাকও ডাকছে। হারমোনিয়াম চড়ায় তুলে বাজালে যেমন হয় সেবাস্টিয়ানের নাকের আওয়াজ অনেকটা সেইরকম। দুই নাকের মিলিত অর্কেস্ট্রায় ক্যুপের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম কোনও একরোখা গোঁয়ার জন্তুর মতো গাঁক-গাঁক করতে-করতে রাতের ক্যালকাটা মেল মহারাষ্ট্রের প্রান্তর চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ছোট-বড় ওভারব্রিজ পড়ে। ট্রেনের আওয়াজ তখন দশগুণ বেড়ে যায়। কর্কশ ঝড়াং ঝড়াং শব্দটা তখন কানের পরদা ছিঁড়ে দিতে থাকে।

ওপাশ থেকে এপাশে ফিরল সুজয়া। তারপর ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। এইভাবে হঠাৎ একসময় তার চোখ পড়ল কোনাকুনি উলটোদিকের ওপরের বার্থে। আবছা আলোতেও সে দেখতে পেল হীরক একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হল, অনেকক্ষণ ধরেই ওইভাবে সে তাকে লক্ষ করছে।

কিছুটা অবাকই হল সুজয়া। সে জানে যে-কোনও যুবক তাকে একবার দেখলে চোখ ফেরাতে পারে না। কলেজে বা ইউনিভারসিটিতে যখন পড়েছে অগুনতি মুগ্ধ এবং লোভী চোখ সবসময় তার গায়ে আটকে থাকত যেন। শুধু তাদের ক্লাসের ছেলেরাই নয়, সিনিয়ার ক্লাসের ছেলেরা এবং তরুণ কোনও-কোনও প্রফেসর তাকে খুশি করার বা তার চোখে পড়ার জন্য দাঁতে দাঁত চাপা অদৃশ্য খ্যাপাটে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেত। ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মধ্যে তাকে ঘিরে এক ধরনের ডগ-রেস চলতে থাকত যেন। সুজয়া কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় যত প্রেমপত্র পেয়েছে সেগুলো ছাপালে পাঁচ ভলুমের বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সুজয়া কাউকে পাত্তা দেয়নি। কুকুরের মতো হ্যাংলামি, লালা-ঝরানো লোভ সে ঘৃণা করে। তার মধ্যে আশ্চর্য এক মর্যাদাবোধ, দৃঢ়তা এবং আভিজাত্য রয়েছে। আর আছে রহস্যময় এক দূরত্ব। নিজের চারপাশে পরিখা তৈরি করে সে সবার নাগালের বাইরে থাকে। সুজয়া উত্তেজিত বা বিচলিত হয় না; মাছির মতো ভ্যানভেনে কোনও স্তাবকদের কথাতেই সে ভেসে যায় না। শান্ত, শীতল উপেক্ষায় সবকিছু সে দূরে সরিয়ে রাখতে জানে। পৃথিবীকে অবজ্ঞা করার মতো বিপুল শক্তি তার মধ্যে রয়েছে।

সুজয়ার মনে পড়তে লাগল, হীরক এই ট্রেনে ওঠার পর বাবার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে

গেছে। তার সঙ্গেও অল্পস্বল্প দু-একটা কথা বলেছে। কিন্তু কখনও তার দিকে অন্যদের মতো তাকিয়ে থাকেনি। হীরককে অত্যন্ত শোভন, ভদ্র এবং মার্জিতই মনে হয়েছে তার। কিন্তু রাতের অন্ধকারে দুরন্ত গতিতে ছুটে যাওয়া ট্রেনের এই ক্যুপেতে সবাই যখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে তখন তাকে লুকিয়ে না দেখে পারছে না হীরক। সুজয়া আপন মনেই হাসল। তবে একটুও রাগল না বা উচ্ছ্বসিত হল না। এভাবে না দেখলে হীরককে কিছুটা অস্বাভাবিকই মনে হত সুজয়ার।

হীরক কিন্তু বিন্দুমাত্র বিব্রত হল না। সহজভাবে বলল, 'ঘুম আসছে না। এপাশ-ওপাশ করছিলাম; দেখি আপনিও এপাশ-ওপাশ করছেন।'

সুজয়া বলল, 'আমি এভাবে ঠিক ঘুমোতে পারি না।'

'তবু ঘুমের চেষ্টা করতে হবে।'

এলোমেলো আরও দু-একটা কথার পর হীরকের চোখ এবং গলার স্বর ক্রমশ জড়িয়ে আসতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ বাদে সুজয়াও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই

ছত্রিশ ঘণ্টা কতটুকু আর সময়! দুটো গোটা রাত এবং একটা গোটা দিন। হীরকের সঙ্গে গল্প করে করেই কাটিয়ে দিলেন মণিমোহন। সুজয়া বেশির ভাগ সময় চুপচাপ ওঁদের কথা শুনে গেছে, নিজে বলেছে খুব কম। তবে প্রথম রাতের মতো দ্বিতীয় রাতেও সে লক্ষ করেছে ক্যুপের আলো নিভে গেলে জিরো পাওয়ারের আবছা নীলাভ অন্ধকারে ওপরের বার্থে শুয়ে-শুয়ে হীরক তার দিকেই তাকিয়ে থেকেছে। প্রথম রাতের মতোই দ্বিতীয় রাতেও দু-একটা এলোমেলো কথা তার সঙ্গে হয়েছে। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটানা এই ছত্রিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ক্যুপের চার নম্বর যাত্রী গোয়াঞ্চি পিদ্রু যোহন সেবাস্টিয়ানের অস্তিত্ব খুব বেশি টের পাওয়া যায়নি। বার দুই-তিন টয়লেটে যাওয়ার জন্য সে উঠেছে এবং তখনই দ্রুত নাকে মুখে কিছু গুঁজে আবার সটান শুয়ে পড়েছে। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে দু-ঘণ্টাও সে চোখ মেলে থেকেছে কি না সন্দেহ।

দেড় দিন বাদে ক্যালকাটা মেল এইমাত্র হাওড়া পৌঁছে গেল।

এখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। বাংলা ক্যালেন্ডারে খুব সম্ভব আশ্বিন মাস শেষ হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ আগেই সকাল হয়েছে; প্ল্যাটফর্মের উঁচু শেডের ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল সোনালি রোদের ঢল নেমে এসেছে।

মণিমোহন এই বয়সেও খুবই চটপটে এবং ব্যস্তবাগীশ মানুষ। আর্মির মেডিক্যাল ইউনিটের তিনি কর্নেল। তবু নিজের কাজ নিজের হাতে করতে ভালোবাসেন; কারও জন্য কিছু ফেলে রাখেন না। প্রায় আধ ঘণ্টা আগে, ট্রেন যখন সাঁত্রাগাছিরও অনেক ওধারে, হোল্ড-অল বেঁধে, শেভ করে ফিটফাট হয়ে বসে আছেন। হীরকও এর মধ্যে উঠে পড়েছিল। সেও তার মালপত্র গোছগাছ করে ফেলেছে।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর যোহন সেবাস্টিয়ানের ঘুম ভেঙেছিল। আস্তে-আস্তে উঠে আড়মোড়া ভেঙে এখন সে তার লাগেজ-টাগেজ গোছাচ্ছে। দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টার মেয়াদি ঘুমের পর এই প্রথম টের পাওয়া গেল, ঘুম, খাওয়া এবং টয়লেটে যাওয়া ছাড়া তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও কিছু কাজকর্ম করতে পারে।

মণিমোহন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিলেন। বাড়িতে ভাইদের খবর দেওয়া আছে; তাঁরা নিশ্চয়ই নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশনে আসবেন। মণিমোহন তাঁদের খুঁজছিলেন।

উলটোদিকের বার্থ থেকে সুজয়া বাবার কাছে উঠে এসে জানলার ধার ঘেঁষে বসে ছিল। সেও বাইরে মুখ বাড়িয়ে আছে। যদিও বাংলা দেশেরই মেয়ে সে, তার জন্ম পুণায়। জীবনের প্রথম পঁচিশ-ছাব্বিশটা বছর সেখানে কাটিয়ে সুজয়া কলকাতায় এল। এর আগে বাবার সঙ্গে বার তিন-চারেক এখানে এসেছে। কোনওবারই চার-পাঁচ দিনের বেশি থাকা হয়নি। তবে ঠাকুমা-ঠাকুরদার মৃত্যুর সময় দু-বারে পনেরো দিন পনেরো দিন করে থেকে গিয়েছিল। কয়েকবার এলেও কলকাতা সম্পর্কে তার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। এ-শহর তার কাছে ভূগোল বা ইতিহাসে-পড়া অন্য কোনও দূরদেশের একটি নগরের মতোই আধ-চেনা, অস্পষ্ট।

এতদিন পর এখানে তারা থাকতে এসেছে। নিজের মধ্যে আশ্চর্য এক উত্তেজনা অনুভব করছিল সুজয়া।

প্ল্যাটফর্মে গাদা-গাদা মানুষের ভিড়। অনেকে তাদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে যেতে এসেছে। তা ছাড়া গলগল করে লোক নামছিল। মণিমোহন বললেন, 'একটু লক্ষ রাখ। অবু, বিজু, কি রামুকে দেখলে ডাকবি।'

মণিমোহনের তিন ভাইয়ের নাম অবনীমোহন, রামমোহন এবং বিজয়মোহন। ডাকনাম অবু, বিজু আর রামু।

সুজয়া তিন কাকাকেই চেনে। ফি বছরই ছুটিছাটায় তিন কাকার কেউ না কেউ পুণায় যেতেনই। তা ছাড়া মণিমোহন তাঁদের ফ্যামিলিতে আরেকটা ব্যাপার চালু করেছেন। প্রত্যেক বছর ভাইদের এবং তাদের স্ত্রী-ছেলেমেয়ের গ্রুপ ফোটো তুলে তাঁর কাছে পাঠাতে হত। মণিমোহন নিজেও তাঁর এবং সুজয়ার ফোটো পাঠাতেন। যতদিন সুজয়ার মা বেঁচে ছিলেন তাঁর ফোটোও কলকাতায় পাঠিয়ে গেছেন মণিমোহন। কার চেহারা বদলে কীরকম দাঁড়াল, এইসব ফোটো থেকে তা শনাক্ত করা যায়।

চোখের পাতা টান করে থেকেও ভিড়ের ভেতর কাকাদের কাউকে দেখতে পেল না সুজয়া।

এদিকে লাল জামা-পরা ঝাঁকে-ঝাঁকে কুলি কামরায়-কামরায় হানা দিতে শুরু করেছিল। দুটো নাছোড়বান্দা কুলি ট্রেন থামার সঙ্গে-সঙ্গে সুজয়াদের ক্যুপেতে ঢুকে পড়েছিল। ওরা তাদের আর হীরকের মালপত্রের গায়ে মাছির মতো আটকে আছে আর সমানে নামার জন্য ডুয়েটে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাইদের না-দেখা পর্যন্ত মণিমোহন নামতে পারছেন না।

হঠাৎ মণিমোহনের মনে হল, তাঁদের জন্য খুব সম্ভব হীরক আটকে আছে। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ তোমাকে নিতে আসবেন?'

হীরক বলল, 'গাড়ি পাঠাবার কথা আছে। অবশ্য যদি আমার টেলিগ্রাম পেয়ে থাকে—'

'আমাদের বাড়ি থেকেও ভাইদের আসার কথা আছে। কিন্তু কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। ভাবছি আরেকটু ওয়েট করে একটা ট্যাক্সি নেব। তুমি কী করবে?'

'আমার খুব তাড়া নেই। আর কিছুক্ষণ ওয়েট করে দেখি।'

মিনিট দুয়েক কাটল না, জানলার ওধারে প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে সরু খ্যানখেনে গলার ডাক ভেসে এল, 'ছোটা সাব আয়ে হ্যায়? ছোটা সাব আয়ে হ্যায়—'

গলা শুনেই হীরক চিনে ফেলেছিল—তাদের ড্রাইভার লাখু সিং। হীরক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে লাখু, এই ক্যুপেতে—' বলেই মণিমোহনের দিকে ফিরল, 'আমার লোক এসে গেছে।'

ততক্ষণে জানলায় ডিগডিগে ঢ্যাঙা চেহারার লাখু সিং তার লম্বাটে চোয়াড়ে মুখ, মোটা গোঁফ, সরু চোয়াল এবং গোলাকার চোখ নিয়ে দেখা দিয়েছে। আর তার ঠিক গা ঘেঁষেই আরেকটি যুবকের মুখ চোখে পড়ল। হীরক তাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, 'মৃণাল, তুই। লাখু তোকে কোথায় পেল?'

তার গলার স্বরে একই সঙ্গে খুশি এবং বিস্ময়।

মৃণাল বলল, 'দাঁড়া, আসছি।'

একটু পর মৃণাল আর লাখু সিং ক্যাপের ভেতর চলে এল।

মৃণাল হীরকেরই সমবয়সি। হাইট অতটা না হলেও বেশ লম্বাই। রোগা পাতলা চেহারা। নাকমুখ কাটাকাটা। গায়ের রং কালোও না, ফরসাও না—দুয়ের মাঝামাঝি। চওড়া কপাল মৃণালের। অনেকদিন চুল কাটা হয়নি; অযত্নে এবং অবহেলায় সেগুলো উলটে দেওয়া। ঘন জোড়া ভুরু। পরনে ধুতি আর বাফতার পাঞ্জাবি।

সব চাইতে আশ্চর্য মৃণালের চোখ। অত্যন্ত সরল, নিষ্পাপ এবং অন্যমনস্ক। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায় তার চোখেমুখে, সমস্ত চেহারায় কি এক পবিত্রতা যেন মাখানো রয়েছে। তবে সে ভীষণ রোগা। আর তাকে এক ধরনের বিষণ্ণতা যেন ঘিরে আছে।

মৃণাল বলল, 'কাল তোদের বাড়িতে ফোন করেছিলাম। মাসিমা বললেন, তুই আজ বম্বে থেকে আসবি; লাখু সিং তোকে নিতে স্টেশনে আসবে। আমি বললাম, লাখু যেন হাওড়ায় আসার সময় আমাকে তুলে আনে। সে আমাকে নিয়ে এল।'

'এসে খুব ভালো করেছিস। কেমন আছিস?'

'ভালোই তো।'

'ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেক-আপ করাবার কথা ছিল?'

'করিয়েছি।'

'রিপোর্ট ভালো।'

'ভালোই। তারপর তোর খবর বল। মোটর র‍্যালিতে কী হল?'

'সেকেন্ড প্রাইজ।'

'ফার্স্ট হতে পারলি না!'

'না। বাঙ্গালোরের একটা মেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ফার্স্ট হয়ে গেল। ড্রাইভিং-এ দারুণ হাত মেয়েটার। তেমনি এলার্ট।'

বলতে-বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল হীরকের, ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'তোর সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি কর্নেল মণিমোহন বোস, ইনি কর্নেল বোসের মেয়ে সুজয়া বোস—'

আলাপ-পরিচয়ের পর মণিমোহন বললেন, 'তুমিই তা হলে মৃণাল? ভারী খুশি হলাম তোমাকে দেখে, তোমার কথা আগেই শুনেছি।'

একটু অবাক হয়েই মৃণাল বলল, 'আমার কথা আগে শুনেছেন!' বলেই অল্প হাসল, 'বুঝেছি, হীরক বলেছে।'

মণিমোহন বললেন, 'তোমার বন্ধুটি তো তোমার কথা শুরু করলে আর থামতেই চায় না। বম্বে টু ক্যালকাটা, থার্টি-সিক্স আওয়ার্স আমরা একসঙ্গে এলাম। এর মধ্যে তোমার সম্বন্ধে কম করে ছত্রিশটা সার্টিফিকেট দিয়েছে।'

মৃণাল লাজুক হাসল। বলল, 'ও আমার সম্বন্ধে সবসময় বাড়িয়ে বলে। হাইপারবোল। আসলে ও নিজে এত ভালো—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মণিমোহন বললেন, 'ব্যাপারটা কী বল তো? তোমরা কি নিজেদের মধ্যে প্যাক্ট করে নিয়েছ?'

বুঝতে না পেরে মৃণাল কিছুটা হকচকিয়ে গেল। বলল, 'আজ্ঞে—'

'বলছিলাম, তোমরা চুক্তি করেছ একজন আরেকজনকে ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়ে যাবে; এই তো?'

কিছু বলতে গিয়ে হেসে ফেলল মৃণাল। হীরকও ঠোঁট কামড়ে কামড়ে হাসছিল।

একপাশে মণিমোহনের বার্থে বসে ছিল সুজয়া। এই সকালবেলায় মৃণালের পবিত্র নিষ্পাপ চোখ এবং সরল হাসি তার বুকের গভীরে কোথায় যেন আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মণিমোহনের মজার কথায় সবাই যখন হাসছে তখন তার চোখে এবং ঠোঁটে হাসির একটি কুঁড়ি ফুটি-ফুটি করছিল।

মণিমোহন এবার বললেন, 'ঠিক আছে। তোমাদের আর আটকাব না। পরে নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমাদের বাড়ি হল ঢাকুরিয়ায়। তোমরা দুজনেই ওখানে আসছ। আমার এবং অন বিহাফ অফ মাই ডটার তোমাদের নেমন্তন্ন রইল। কবে আসবে বলো?'

হীরক বলল,'শিগগিরই একদিন যাব।'

'উঁহু, ওভাবে বললে চলবে না। স্পেসিফিক ডেট দাও।'

হীরক মৃণালের দিকে ফিরে বলল,'তুই কবে যেতে পারবি?'

মৃণাল বলল, 'আমি, মানে—'

মণিমোহন বললেন, 'নো, ডোন্ট ট্রাই টু অ্যাভয়েড।'

হীরক বলল, 'ও কোথায়ও যেতেটেতে চায় না। ঠিক আছে, পরশুদিন আমরা আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি। আমি ওকে নিয়ে যাব।'

'পরশু কখন?'

'বিকেলে।'

'আমরা অপেক্ষা করব।' বলে ঢাকুরিয়ায় তাঁদের বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলেন মণিমোহন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে হীরক জিগ্যেস করল, 'আমরা তো চলে যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের যাওয়ার কী হবে?'

'তাই তো ভাবছি। বাড়ি থেকে এখনও কেউ এল না কেন বুঝতে পারছি না। আরেকটু দেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।'

'আপনি যদি পারমিশান দ্যান একটা কথা বলব?'

'পারমিশানের কী আছে, বলো না—'

'আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। যদি বলেন আপনাদের পৌঁছে দিয়ে যাই।'

'তোমরা কোথায় থাকো?'

'আমরা সল্টলেকে নতুন বাড়ি করেছি। আর মৃণাল কাছেই উলটোডাঙায় থাকে।'

মণিমোহন বললেন, 'সল্টলেক কোনদিকে জানি না; তবে উলটোডাঙার কথা জানা আছে। সে তো এক্সট্রিম নর্থ। আমরা থাকি এক্সট্রিম সাউথে। তোমাদের অনেক অসুবিধা হবে।'

'একটুও না। আপনি আমাদের জন্যে ভাববেন না।'

কী ভেবে মণিমোহন বললেন, 'ঠিক আছে; চলো তা হলে। কতক্ষণ আর স্টেশনে ওয়েট করব। মনে হচ্ছে আমার টেলিগ্রাম বাড়িতে পৌঁছয়নি। নইলে অন্য কোনও গণ্ডগোল হয়েছে।'

সেই নাছোড়বান্দা কুলি দুটোর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে একটু পর সবাই লম্বা প্ল্যাটফর্ম এবং হাওড়া স্টেশনের বিশাল চত্বর পেছনে ফেলে বাইরে আসতেই দেখা গেল তিনজন মধ্যবয়সি পুরুষ এবং তিনজন মোটাসোটা ফরসা সুখী চেহারার মধ্যবয়সি মহিলা ওধারের পার্কিং জোন থেকে প্রায় দৌড়ুতে-দৌড়ুতে মণিমোহনের দিকে এগিয়ে এলেন। পুরুষদের চেহারা মণিমোহনের মতোই। দেখেই বোঝা যায় ওঁরা তাঁর ভাই। মহিলারা তাঁদের স্ত্রী।

সুজয়া কাকা এবং কাকিমাদের চিনতে পেরেছিল। সে জানে কাকারা সবাই খুব কৃতী এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বড় কাকা অবনীমোহন, বাবা যাঁকে অবু বলেন, একটা মাল্টিন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ওয়ার্কস ম্যানেজার। মেজোকাকা বিজয়মোহন (ডাকনাম বিজু) নামকরা সলিসিটর, ছোটকাকা রামমোহন (ডাকনাম রামু) একটা কলেজের প্রিন্সিপাল।

কাকা-কাকিমারা কাছে এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই মণিমোহনকে প্রণাম করলেন। সুজয়াও

কাকা-কাকিমাদের প্রণাম করল। এর ফাঁকে-ফাঁকে কথা হচ্ছিল।

অবনীমোহন বলছিলেন, 'ট্রেন কখন এসেছে?'

মণিমোহন বললেন, 'অনেকক্ষণ। তোদের জন্যে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট ওয়েট করেছি। ভাবলাম শেষ পর্যন্ত আর এলিই না। আমার টেলিগ্রাম পাসনি?'

'পেয়েছি।'

'তা হলে?'

'বাড়ি থেকে দুটো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় একটা গাড়ির এঞ্জিন এমন ট্রাবল দিতে লাগল যে দেরি হয়ে গেল। অবশ্য একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কী?'

'ট্রাবল-ফ্রি ভালো গাড়িটা নিয়ে কেউ চলে এলেই হতো।'

হীরক আর মৃণাল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দেখিয়ে মণিমোহন বললেন, 'কতক্ষণ আর ওয়েট করব। তোদের দেরি দেখে এদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। এরা আমাদের ঢাকুরিয়া পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল।' বলতে-বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ওই দ্যাখ, তোদের সঙ্গে আলাপই করিয়ে দেওয়া হয়নি। এ হচ্ছে—'

ভাই এবং তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে হীরক এবং মৃণালের পরিচয় করিয়ে দিলেন মণিমোহন। তারপর হীরকের দিকে ফিরে বললেন, 'এরা এসে গেছে। তোমাদের আর কষ্ট দেব না।'

হীরক হাসল, 'ঠিক আছে। আজ তা হলে চলি। পরশু বিকেলে আসছি কিন্তু—' বলেই সুজয়ার দিকে তাকাল, 'চললাম।'

সুজয়া আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দিল।

মৃণাল কিছু বলল না। মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর হীরকের পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে ওধারের 'কার পার্কিং জোন'-এর দিকে চলে গেল।

হীরকদের ড্রাইভার লাখু সিং আগেই গাড়ির ক্যারিয়ারে মালপত্র ঢুকিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল।

এধারে হাওড়া স্টেশনের গায়ে দাঁড়িয়ে সুজয়া লক্ষ করল গাড়িতে উঠবার আগে হীরক একবার তার দিকে মুখ ফেরাল; কয়েক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে ভেতরে ঢুকল। মনে-মনে হেসে ফেলল সুজয়া।

হীরকের পর মৃণাল গাড়িতে উঠল। সে কিন্তু একবারও এধারে মুখ ফেরাল না। সুজয়া আবছাভাবে ভাবতে চেষ্টা করল, মৃণাল কি খুবই লাজুক? নাকি সুন্দরী মেয়েদের উপেক্ষা করার মতো অহংকারী? কিন্তু তার পবিত্র নিষ্পাপ মুখ দেখে এসব মনে হওয়া উচিত নয়।

একটু পর হীরকদের গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

এদিকে মেজোকাকা বিজয়মোহনের গলা শোনা গেল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, চলো—'

সবাই রাস্তার ওধারে পার্কিং জোন-এ চলে এল। পুরোনো আমলের একটা ঢাউস ফোর্ড গাড়ি আর নতুন মডেলের ঝকঝকে একটা ফিয়েট সেখানে অপেক্ষা করছিল। কোনও গাড়িতেই ড্রাইভার নেই; ভাইরাই চালিয়ে নিয়ে এসেছেন।

ঠিক হল মণিমোহনরা চার ভাই বড় ফোর্ড গাড়িটা করে ঢাকুরিয়া যাবেন। আর তিন কাকিমা সুজয়াকে নিয়ে যাবেন ফিয়েটে করে। ছোট কাকিমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে; ফিয়েট গাড়িটা তিনিই চালাবেন।

দু-দলে ভাগ হয়ে সুজয়ারা দুই গাড়িতে উঠল। ফোর্ড গাড়িটা আগে ছিল; বড়কাকা অবনীমোহন সেটা মুখ ঘুরিয়ে নতুন সাবওয়ে ঘুরে এগিয়ে চললেন। তার পেছনে চলল ফিয়েটটা।

সুজয়াদের গাড়ির ফ্রন্ট সিটে রয়েছেন ছোট কাকিমা মণিকা আর সুজয়া নিজে। পেছনের সিটে বড় কাকিমা দীপ্তি এবং মেজো কাকিমা শোভা।

তিন কাকিমাই—দীপ্তি, শোভা আর মণিকা দারুণ ফরসা, রূপসি এবং মোটাসোটা। তবে তুলনায় মণিকা অন্য দুই জায়ের মতো অতটা মোটা নন। দীপ্তি আর শোভার পরনে মুগার পাড় আর জলচুড়িবসানো ধবধবে সাদা খোলের টাঙ্গাইল শাড়ি। আর দুধ-রং গরদের ব্লাউজ। কপালের মাঝখানে সূর্যোদয়ের মতো সিঁদুরের প্রকাণ্ড টিপ; সিঁথিতেও ডগডগে সিঁদুর। হাতে গোছা-গোছা সোনার চুড়ি, গলায় পুরোনো আমলের সীতাহার। কানে মুক্তোর টাব, নাকে হীরের নাকফুল। মণিকা কিন্তু তাঁর বড় দুই জায়ের মতো নন। তাঁর সাজপোশাক অনেকটা একালের 'মড' মেয়েদের মতো; ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, স্লিভলেস ব্লাউজ, পায়ে উঁচু হিলের জুতো। জবড়জং গয়না পছন্দ করেন না মণিকা। গয়না বলতে তাঁর গলায় সরু হার, বাঁ-হাতে সোনার ব্যান্ডে ঘড়ি, ডান হাতে একটা রুলি, কানে বা নাকে কিছু নেই। তিন কাকিমার পোশাক-রুচি আলাদ হলেও, সুজয়া জানে তাঁরা সবাই খুব ভালোমানুষ—সরল, স্নেহপ্রবণ। কারও মধ্যেই তেমন ঘোরপ্যাঁচ নেই।

সুজয়া জানে, এ-আমলে সব ফ্যামিলিই যখন ভেঙে-চুরে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে তখন কাকারা একই বাড়িতে একই ছাদের তলায় পুরোনো কালের জয়েন্ট ফ্যামিলির যাবতীয় মর্যাদা বজায় রেখে চলেছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কাকিমারা মানুষ ভালো বলে। নইলে কবেই তাদের ফ্যামিলি চার টুকরো হয়ে যেত। প্রায় ছত্রিশ বছর বাদে মণিমোহন যে দেশে পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এসে পুনর্বাসন পাচ্ছেন সেটাও কাকিমারা ভালোমানুষ বলেই সম্ভব হয়েছে। মণিমোহন প্রায়ই গর্ব করে বলেন, 'পুরোনো আমলের যা কিছু বড় সবই তো ধ্বংস হয়ে গেছে—বড় মানুষ, বড় প্রাণী, বড় কনসেপ্ট, বড় ফ্যামিলি, বড় আইডিয়াল। এখন মিডিওকার আর মিনিকিনদের রাজত্ব। এর মধ্যে আমাদের ফ্যামিলি একসেপশান। ইট'স স্পেসিমেন অফ দা গোল্ডেন পাস্ট। ফ্যামিলির প্যাটার্ন কী হওয়া উচিত, এ-কালের ছেলেছোকরাদের আমাদের বাড়ি এসে দেখা উচিত।'

সুজয়া জানে, বড় কাকার একটিমাত্র ছেলে—সঞ্জীব, ডাকনাম নানু। নানু তার চাইতে দু-বছরের ছোট। তার মানে এখন তার বয়স চব্বিশের মতো। দু-বছর আগে সে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় গেছে। মেজো কাকার এক ছেলে, এক মেয়ে। শান্তনু আর কাকলি। ডাকনাম শানু আর কলি। শানুর বয়স উনিশ-কুড়ি, কলির চোদ্দো-পনেরো। শানু খড়্গপুরে আই আই টিতে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে; এটা থার্ড ইয়ার। কলি আসছে বার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। ছোট কাকার ছেলেপুলে নেই।

গাড়ি দুটো সাবওয়ে ঘুরে বুকে হেঁটে-হেঁটে হাওড়া ব্রিজে উঠে এসেছিল। সুজয়ার চোখ উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে ফেরানো।

এখন সাড়ে আটটার মতো বাজে। শেষ আশ্বিনের অঢেল মায়াবী রোদ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তলায় গঙ্গা এখন জোয়ারের জলে ফেঁপে উঠেছে। দূরে পাতলা সিল্কের মতো আবছা কুয়াশায় বড়-বড় ক'টা জাহাজ। ক্যালকাটা পোর্টের ওপাশে বিরাট-বিরাট স্কাইস্ক্রেপারগুলো সিল্যুয়েট ছবির চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাওড়া ব্রিজ এই সকালবেলাতেই রীতিমতো জমজমাট। সুজয়াদের গাড়ির পাশ দিয়ে ঝড়াং-ঝড়াং করে অগুনতি ট্রাম, ডাবল-ডেকার, লরি, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, ঠেলা, রিকশা ঢলের মতো আসছে যাচ্ছে। আর দু-পাশের ফুটপাথে হাজার-হাজার মানুষের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

কাকা-কাকিমাদের বাদ দিলে এই শহরের কিছুই প্রায় চেনে না সুজয়া। অথচ এখানেই সে চিরকালের জন্য থাকতে এসেছে। উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে এই অপরিচিত শহরের যতটুকু চোখে

পড়ে, দেখে যাচ্ছিল সুজয়া। দেখতে-দেখতে এক ধরনের উত্তেজনাও অনুভব করছিল।

এদিকে কাকিমারা, বিশেষ করে বড় কাকিমা দীপ্তি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। হাওড়া ব্রিজ, দূরে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ক্যালকাটা পোর্ট, ওপারে বড়বাজার—গাইডের মতো সব চিনিয়ে-চিনিয়ে দিচ্ছিলেন সুজয়াকে। অন্যমনস্ককের মতো চারিদিকের দৃশ্যাবলি দেখতে-দেখতে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছিল সুজয়া।

দীপ্তি একটু থামলে মেজো কাকিমা শোভা খুব আন্তরিক গলায় বলে উঠলেন 'বড়দা আর তুই এখন থেকে আমাদের কাছে থাকবি, কি ভালো যে লাগছে! এত কাল পুণায় ছিলি, আমাদের ভীষণ খারাপ লাগত।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোরা এলি, শুধু বড়দিই আর বাড়ি ফিরতে পারল না।'

বড়দি বলতে সুজয়ার মা। তাঁর কথায় সবার মুখে বিষণ্ণ ছায়া পড়ল।

দীপ্তি গভীর গলায় এবার বললেন, 'বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যখন এলাম তার আগেই বড়দি পুণায় চলে গেছে। বড়দিকে নিয়ে একসঙ্গে এক বাড়িতে কোনওদিন আর থাকা হল না।'

মায়ের কথা উঠলেই চোখে জল এসে যায় সুজয়ার। পারতপক্ষে সে তাই মায়ের প্রসঙ্গ তুলতে চায় না। কথাটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্য বলল, 'নানু এখনও আমেরিকাতেই আছে, বড় কাকিমা?'

দীপ্তি বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তিন বছর হয়ে গেল, না?'

'না রে, চার বছরের স্কলারশিপ নিয়ে যা পড়তে গিয়েছিল সেই কোর্সটা শেষ করে একটা চাকরি পেয়েছে। পঁচিশ হাজার টাকা মাইনে।'

'কবে ফিরছে?'

দীপ্তি বললেন, 'আরও এক বছর বাদে। তবে দেশে আসতে চায় না। যতবার আসার কথা লিখি ও জবাব দ্যায়, দেশে গেলে এত টাকার চাকরি কোথায় পাব? আমি বলেছি সেটি হবে না; ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতেই হবে। আমার তাড়ায় শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে।' একটু থেমে বললেন, 'কলকাতাতেই একটা আমেরিকান ফার্মে লেখালিখি করে কথা আদায় করেছে এক বছর পর একটা ভালো ভ্যাকান্সি হবে। তখন আসবে। হাজার দশেকের মতো মাইনে। আমি বলি যথেষ্ট।'

ঠোঁট কামড়ে হাসতে-হাসতে পেছনের সিট থেকে শোভা বললেন, 'জানিস টুকু, মেজদির প্রোমোশন হয়েছে।'

বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে সুজয়া বলল, 'কী ব্যাপার?'

'মেজদি শাশুড়ি হয়েছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ রে, নানু একটা আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

সুজয়া বলল, 'কই, আমাদের জানাওনি তো?'

দীপ্তি বললেন, 'জানাব কি করে? দিন চারেক আগে তো হতভাগা ছেলের চিঠি পেয়েছি। লিখেছে বিয়ে করে বসে আছে। ভাবলাম তোরা তো ক'দিন বাদে আসছিসই; তখন জানাব।' একটু ভেবে, পরক্ষণে দ্রুত বলে উঠলেন, 'হিন্দুমতেই বিয়েটা করেছে; চার্চে গিয়ে না, নিউইয়র্কে আর্য সমাজিদের যে মন্দির আছে সেখানে রীতিমতো মন্ত্রতন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়েছে। চিঠির সঙ্গে বিয়ের ছবিও পাঠিয়েছে। বাড়ি গিয়ে দেখাব।'

শোভা পেছন থেকে আবার বললেন, 'জানিস টুকু, মেজদি এর ভেতর এক কাণ্ড করে বসেছে।'

সুজয়া জিগ্যেস করল, 'কী?'

'মেমসাহেব বউয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে স্পোকেশ ইলিংশের স্কুলে ভরতি হয়ে গেছে।'

সুজয়া হাসতে লাগল।

দীপ্তি বললেন, 'আহা।' বলেই হেসে ফেললেন, 'তোরাই বল, হাজার হলেও ছেলের বউ, তার সঙ্গে দু-একটা কথা তো বলতে হবে। আমি বাপু বোকা বনতে রাজি নই। এক বছর আগে থেকেই তাই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

সুজয়া হাসতে-হাসতে এবার শোভার দিকে ফিরল, শানু আর কলি কেমন আছে মেজো কাকিমা?'

শোভা বললেন, 'শানু ভালোই আছে। ও তো এখন খড়্গপুরে। পুজোতে এসেছিল, ক'দিন থেকেই চলে গেল। কী একটা পরীক্ষা নাকি হবে। কলিটার তিন দিন ধরে জ্বর। স্টেশনে আসবার জন্যে ঘ্যান ঘ্যান করছিল; আমি আনিনি।'

মণিকা এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি স্টিয়ারিং যাঁর হাতে তাঁর পক্ষে অন্যমনস্ক হওয়া বিপজ্জনক। সুজয়াদের দিকে তাঁর কান থাকলেও চোখ ছিল উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে। সেদিকে তাকিয়েই তিনি এবার বললেন, 'জানো টুকু, ছোটদি ভেতরে-ভেতরে মেজদিকে হিংসে করতে শুরু করেছে।' দীপ্তি এবং শোভা তাকে 'তুই' করেই বলেন, কিন্তু ছোট কাকিমা মণিকা অতটা পারেননি; তিনি 'তুমি' করে বলেন। হয়তো তাঁদের বয়সে বেশি তফাত নেই বলে।

সুজয়া, দীপ্তি, এবং শোভা তিনজনেই হকচকিয়ে গেলেন। সুজয়া বলল, 'হিংসে করবে কেন?'

চোখ কুঁচকে মজা করে হাসতে-হাসতে মণিকা বললেন, 'বুঝতে পারছ না, মেজদি আমেরিকান মেয়ের শাশুড়ি হয়ে গেল যে! নিজের কপালে কী আসবে কে জানে! তবে—'

'তবে কি?'

'ছোটদিও সহজে ছাড়ছে না; ভেতরে-ভেতরে একটা দুর্দান্ত প্ল্যান করে ফেলেছে।'

শোভা অবাক হয়ে বললেন, 'আমি আবার কি প্ল্যান করলাম!'

মণিকা বললেন, 'বা রে, তুমি সেদিন বলছিলে না—শানু খড়্গপুর থেকে বেরিয়ে এলে কানাডায়, আর কলি গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর লন্ডনে পাঠিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তাতে কি?'

'প্ল্যানটা তো ওইখানেই। মনে-মনে তোমার ইচ্ছে শানু একটা কানাডিয়ান মেয়ে বিয়ে করুক, আর কলি ব্রিটিশ ছেলে। কানাডা আর ব্রিটেনের শাশুড়ি হয়ে তুমি মেজদির ওপর টেক্কা দিতে পারবে।'

শোভা চোখ গোল করে বললেন, 'ও মা, এই জন্যে আমি শানু-কলিকে বাইরে পাঠাতে চাইছি! কি শয়তান মেয়ে রে তুই!' বলেই আলতো করে মণিকা ধবধবে সাদা ঘাড়ে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

নকল ব্যথায় 'উঃ' করে একটু শব্দ করেই হেসে উঠলেন মণিকা, 'যদি ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি ঘটে যায়, দারুণ একখানা কাণ্ড হয়, না কি বল টুকু।'

সুজয়া হাসছিল। ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—'

মণিকা আবার বললেন, 'আমার তো ছেলেপুলে নেই। থাকলে ঘানা কি মোজাম্বিকে পাঠাতাম। আফ্রিকা থেকে ছেলের বউ কি মেয়ের জামাই আনতাম। তারপর আমাদের বাড়িতে ইন্টারন্যাশনাল শাশুড়িদের একখানা ব্র্যাঞ্চ অফিস খুলে বসতাম।' মণিকার বিয়ে হয়েছে বারো-তেরো বছর। ছেলেমেয়ে না থাকায় জন্য তার মধ্যে এক ধরনের দুঃখ রয়েছে। কিন্তু দুঃখটাকে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসতে দ্যান না; হাসিখুশি এবং নানারকম মজা দিয়ে সবসময় ঢেকে রাখেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুজয়াদের ফিয়েট গাড়িটা হাওড়া ব্রিজ পেছনে ফেলে ব্র্যাবোর্ন রোডের ফ্লাই-ওভারের বিশাল ফ্রেম ছাড়িয়ে ডালহৌসি পেরিয়ে এখন ময়দানে এসে পড়ল। বাঁয়ে

চৌরঙ্গির নতুন স্কাইস্ক্রেপার কমপ্লেক্স; সামনে শেষ আশ্বিনের উজ্জ্বল সূর্যালোকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি দূরে ক্যাথিড্রালের চূড়াকে ছবির মতো মনে হচ্ছে।

কয়েক গজ আগে আগে মণিমোহনদের প্রকাণ্ড ফোর্ড গাড়িটা চলেছে। পেছনের কাচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে চার ভাই সমানে গল্প করে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে কোনও মজার কথায় হুল্লোড় বাধিয়ে হেসে উঠছেন।

দীপ্তি পেছনের সিট থেকে বলে উঠলেন, 'চার ভাই কেমন জমিয়েছে দ্যাখ—'

শোভা বললেন 'হ্যাঁ, এতদিন পর বড়দাকে পেয়েছে তো।'

এই মুহূর্তে কিন্তু কাকিমাদের কথায় মন নেই সুজয়ার। সবুজ কার্পেটের মতো আশ্বিনের ময়দান, সারি-সারি হাই-রাইজ, অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে রাস্তা, ডানদিকে দুরন্ত-গতি গাড়ির স্রোত দেখে যাচ্ছিল সে। নতুন কোনও জায়গায় এলে তার সব কিছুর দিকে চোখ যাওয়া স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে আবছাভাবে অনেক কিছুই মনে পড়ছিল সুজয়ার। যেমন পুণা শহর, তার সুন্দর-সুন্দর রাস্তা, মিলিটারি হাসপাতাল, বিরাট কমপাউন্ড-ওলা তাদের প্রকাণ্ড বাংলো, ফুলের বাগান, টেনিস কোর্ট, বন্ধু-বান্ধবের মুখের প্রোফাইল ইত্যাদি ইত্যাদি। কি আশ্চর্য, এত সব দৃশ্য এবং মানুষের ভিড়ে মৃণাল আর হীরকের মুখও ভেসে উঠছে। অথচ ওদের কথা মনে পড়ার কোনও কারণই নেই। কতক্ষণেরই বা আলাপ। তবু মনে পড়ছে, পরশু ওরা তাদের বাড়ি আসবে। মণিমোহন ঢালাও নেমন্তন্ন করে বসে আছেন।

হঠাৎ ঘাড়ের পাশ থেকে আস্তে করে মণিকা বলে উঠলেন, 'কী ভাবছ?'

চমকে মুখ ফেরাল সুজয়া', কই, কিছু না।'

'দুষ্টু মেয়ে, লুকোলে কি হবে। যা ভাবছ, আমি জানি।'

'কী ভাবছি?'

'পুণার একটি বিশেষ বয়-ফ্রেন্ডের কথা। তাই না?'

সুজয়া জানে ছোট কাকিমার মুখে কোনও কথা আটকায় না। তাঁর ব্যবহার আচরণ একেবারে সমবয়সি বন্ধুর মতো। দু-বছর অগে ছোটকাকার সঙ্গে ছোট কাকিমা পুণায় গিয়েছিলেন, তখনও তার বয়ফ্রেন্ডদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিগ্যেস করেছিলেন।

সুজয়া সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো লাজুক না; খুবই স্মার্ট এবং ঝকঝকে। তবে এক্সট্রোভার্ট ধরনের নয়, অনেকাংশেই অন্তর্মুখী। পুণায় কো-এড কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় অনেক ছেলের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। তার মধ্যে দুটি ছেলে, একজন মারাঠি, আরেকজন সিন্ধি— অমল পুনেকর এবং সুরেশ ভিমানিকে তার খুব ভালো লেগেছিল। দুজনেই খুব ব্রাইট, হৃদয়বান আর হাসিখুশি। ওদের দেখলে ভালো না লেগে উপায় নেই।

একটি ছেলের সঙ্গে আরেকটি সমবয়সি ছেলের বা একটি মেয়ের সঙ্গে আরেকটি সমবয়সি মেয়ের যেরকম বন্ধুত্ব হয়, সুজয়ার সঙ্গে অমল আর সুরেশের সম্পর্ক ছিল সেইরকম। ছোট কাকিমা যে বিশেষ বন্ধুত্বের ওপর জোর দিলেন আদৌ তেমন কিছু নয়। সুজয়া হেসে হেসে বলল, 'বয়ফ্রেন্ড আমার অনেক আছে। তবে স্পেশাল কেউ নেই।'

'বিশ্বাস করতে বলছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে পুণায় হৃদয়টি রেখে আসোনি? পিওর আনটাচড হার্টটি নিয়ে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছ?'

সুজয়ার মজা লাগছিল। সে বলল, 'তাই তো মনে হয়।'

পেছন থেকে দীপ্তি এবার বলে উঠলেন, 'যাক, আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল।'

মুখ ফিরিয়ে সুজয়া জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'মানে?'

'মানে বড়দা ক'মাস ধরেই চিঠি লিখছিলেন তাঁর জন্যে যেন একটা ভালো জামাই খুঁজে রাখা হয়। তা বাপু তুই যখন পুণাতে প্রেম-ট্রেম করে আসিসনি তখন আর কোনও সমস্যাই রইল না। তোর তিন কাকা ভালো ছেলের খোঁজে সারা কলকাতা চষে ফেলেছে। দু-তিনটি মনের মতো ছেলেও পাওয়া গেছে। তোরা এসেছিস; এবার তাদের আসতে বলা হবে। নিজের চোখে দ্যাখ, কথা বল। পছন্দ হলে শিগগিরই শুভকাজ লাগিয়ে দেব।'

সুজয়া অবাক। মণিমোহন তার কাছে কিছুই লুকোনো না। কিন্তু গোপনে-গোপনে তার বিয়ের ব্যাপারে কাকা-কাকিমাদের যে কিছুদিন ধরে চিঠি লিখে যাচ্ছিলেন সেটা কিন্তু একবারও বলেননি। অথচ বিয়ের ব্যাপারে মনের দিক থেকে সুজয়ার এই মুহূর্তে একেবারেই সায় নেই। সব মেয়েই, গেঁয়োই হোক আর শহুরে 'মড'ই হোক, বিয়ের কথা একটা সময়ে ভাবে; সেভাবে তৈরিও হয়। কিন্তু সুজয়া এখনও বিয়ে নিয়ে কিছুই চিন্তা করেনি।

দীপ্তির পাশ থেকে শোভা বলে উঠলেন, 'টুকুর বিয়েতে সানাই আনা হবে, ব্যান্ড-পার্টি আনা হবে। বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে; যত ঘটা করা যায়, করব।' একটু থেমে বললেন, 'নানুটা কোথায়, কতদূরে আর্যসমাজিদের মন্দির গিয়ে বিয়ে করল। আমরা একটু আনন্দও করতে পারিনি। এবার সেটা পুষিয়ে নেব। তিন শাশুড়ি মিলে বাসরঘরে জামাইয়ের সামনে যা নাচ নাচব না!'

মণিকার এক চোখ উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে থাকলেও, আরেকটা চোখ ছিল সুজয়ার দিকে। তিনি বললেন, 'কি, বিয়ের কথায় একেবারে চুপ করে গেলে যে?'

সুজয়া বলল, কী বলব! তোমরাই তো বলে যাচ্ছ।'

দীপ্তি বললেন, 'বড়দা কিন্তু বেশিদিন দেরি করবেন না। কয়েক দিন পরই ছেলেদের বাড়িতে খবর দেওয়া হবে।'

মণিকা মজা করে বললেন, 'আমার তো ইচ্ছে সব ছেলেকে একসঙ্গে ডেকে একেবারে স্বয়ংবর সভা বসিয়ে দেব।'

সুজয়া আস্তে করে বলল, 'বিয়ের কথা কিন্তু এখনও আমি ভাবিনি। ওসব আপাতত থাক।'

তিন কাকিমাই অবাক হয়ে গেলেন। দীপ্তি বললেন, 'থাকবে কি রে!'

'আমার রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে। ডক্টরেট না করে আমি বিয়ে-টিয়ে করছি না।'

'বিয়ের পরও তো রিসার্চ করা যায়।'

'তা হয়তো যায়। তবে আমি রিসার্চ শেষ না করে বিয়ে করছি না।'

কাকিমারা বুদ্ধিমতী। বুঝলেন বহুকাল বাদে কলকাতায় ফিরে যে এখনও বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছয়নি তার ওপর বিয়ে নিয়ে জোরাজুরি করা ঠিক হবে না। তাঁরা প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওসব কথা পরে হবে।'

গাড়ি দুটো কিছুক্ষণ বাদে হাজরা, রাসবিহারী, সার্দান অ্যাভেনিউ আর গড়িয়াহাটা ব্রিজ পেরিয়ে ঢাকুরিয়ায় পৌঁছে গেল।

তিন

যোধপুর পার্কের উলটোদিকে ঢাকুরিয়ার পুরোনো পাড়ায় সুজয়াদের বিরাট কম্পাউন্ডওলা পুরোনো আমলের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি। বাড়িটার গথিক স্ট্রাকচার, মোটা মোটা গোল থাম, বিশাল-বিশাল জানলা, পঙ্খের কাজ করা সিলিং এবং দেওয়াল। ভারী-ভারী নকশা-কাটা দরজায় দামি পরদা। এ-বাড়ির আসবাবপত্রেও পুরোনো আমলের ছাপ। নানারকম কারুকাজ-করা বার্মা টিমের ভারী-ভারী খাট, আয়না-বসানো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আলমারি, শ্বেত পাথরের টেবল, সিংহাসনের মতো একেকটা

চেয়ার, সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠন নেমে এসেছে। এক কালে এগুলোর ভেতর মোম জ্বলত, এখন বিজলি বাতি।

বাড়ির সামনের দিকে একধারে ফুলের বাগান, আরেক ধারে সবুজ ঘাসের লন; ফাঁকে-ফাঁকে পাথরের স্ট্যাচু। 'লন' আর বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়ির রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার গা-ঘেঁষে সারি-সারি পাম গাছ।

দু-পা গেলেই সুবোধ মল্লিক রোডের ওপর এবং ওপারে নতুন আর্কিটেকচারের অগুনতি বাড়ি উঠেছে। যোধপুর পার্কে উঠেছে নানা ধরনের মালটি-স্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। অ্যাসফাল্টে মোড়া বড় রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় ডবল-ডেকার, ট্যাক্সি, মিনিবাস, প্রাইভেট কার। ব্যস্ততা, শব্দ, চিৎকার, হইচই এবং এ-কালের যাবতীয় আক্রমণের মাঝখানে সুজয়াদের বাড়িটা নাইনটিনথ সেঞ্চুরির অলস মন্থর পুরোনো গন্ধ গায়ে মেখে একটা দ্বীপের মতো যেন দাঁড়িয়ে আছে।

পরশু দিন সুজয়ারা এসেছে। তেতলায় দক্ষিণখোলা বড় একখানা ঘর তাকে দেওয়া হয়েছে। ঘরটার সঙ্গেই অ্যাটাচড্ বাথ। তার পাশের ঘরখানা মেজোকাকার মেয়ে কলির। সুজয়া আসার পর কলি ঠিক করেছে সুজয়ার সঙ্গে এক ঘরে থাকবে।

কাল আর পরশু সুজয়াদের আসার খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই এসেছিলেন। শ্যামবাজার থেকে এসেছিলেন বড় মাসি, বড় মেসো আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা। নিউ আলিপুর থেকে মণিমোহনদের খুড়তুতো বোন আভা পিসি, আর পিসেমশাই। এ ছাড়া সুজয়ার দুই মামা এবং মামিরা, অবনীমোহন বিজয়মোহন আর রামমোহনের শ্বশুরবাড়ির অনেক আত্মীয়স্বজনও তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এদের কাউকেই আগে বিশেষ দ্যাখেনি সুজয়া। কিংবা বাবার সঙ্গে দু-চারবার যখন কলকাতায় এসেছে তখন দেখে থাকলেও মনে নেই। তারা পুণা থেকে চলে আসায় সবাই খুব খুশি। ওঁদের আন্তরিকতা সুজয়াকে মুগ্ধ করেছে। যাঁরাই দেখা করতে এসেছেন তাঁরাই সুজয়াদের তাঁদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে গেছেন। মণিমোহন প্রত্যেককে কথা দিয়েছেন, সবার বাড়িতেই যাবেন।

দুটো দিন নানা প্রিয়জনের ভিড়ে কিছু ভাবারই সময় পায়নি সুজয়া। তা ছাড়া ওই ভিড়ের মধ্যেই বড় কাকিমা নানু এবং তার আমেরিকান বউ-এর ছবি দেখিয়েছেন। ছবি কি একটা দুটো! কালারে তোলা কয়েক ডজন! আর্যসমাজিদের মন্দিরে বিয়ে-করা থেকে বউভাত পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা ফোটোতে ধরে রাখা হয়েছে।

ছবিগুলো দেখে মনে হয়েছে নানু বেশ কাজের লোক। কলকাতা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে নিউইয়র্ক শহরে পুরোপুরি একটা বাঙালি বিয়ের আসর কি করে বসালো সেটা ভাবতে বেশ অবাক লেগেছে সুজয়ার। প্রচুর মজাও পেয়েছে সে। ছবিগুলোতে নানু এবং তার আমেরিকান বউকে ঘিরে অগুনতি বাঙালি বা ভারতীয় মহিলার ভিড়। তাদের কেউ শাঁখ বাজাচ্ছেন, কেউ বর-কনেকে বরণ করছেন, কেউ আলপনা দিচ্ছেন। নিউইয়র্ক এবং তার আশেপাশে যেখানে যত ভারতীয় আছে সবাইকেই বোধহয় তার বিয়েতে টেনে এনেছে নানু।

নানুর বউটি ভারি মিষ্টি। ছবি থেকে যেটুকু ধারণা করা যায়, তাতে মনে হয় বেশ হাসিখুশিও। শাঁখা-সিঁদুর এবং বেনারসিতে তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। কে বলবে সে বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়!

এই দু-দিন কাকারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোননি। সবাই অফিস ছুটি নিয়ে মণিমোহন এবং সুজয়ার কাছে কাছে থেকেছেন আর অনর্গল কথা বলেছেন। দুটো দিন তাদের ঘিরে সারা বাড়িতে যেন উৎসব চলেছে। সর্বক্ষণ হইচই, হুল্লোড়, হাসি আর মজা বাড়িটাকে যেন মাতিয়ে রেখেছিল।

আগের দু-দিনের তুলনায় বাড়িটা আজ একেবারে চুপচাপ। কাকারা অফিসে বেরিয়েছেন। আত্মীয়স্বজনরা আজ কেউ তেমন আসেননি। মণিমোহন সকালবেলা ফোর্ট ইউলিয়ামে তাঁর এক

পুরোনো কর্নেল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বাবার এই বন্ধুটি কর্নেল রিখি, আগে ওয়েস্টার্ন কমান্ডে ছিলেন; মাস কয়েক আগে ইস্টার্ন কমান্ডে তাঁকে বদলি করা হয়েছে। সুজয়া কর্নেল রিখিকে চেনে। ভারি ভালোমানুষ। দারুণ খেতে, গল্প করতে আর হাসতে পারেন।

দুপুরবেলা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে টানা একটি ঘুম দিয়েছেন মণিমোহন। দীর্ঘ মিলিটারি সারভিসে একদিনও বাবাকে দিনের বেলা ঘুমোতে দ্যাখেনি সুজয়া; আজই প্রথম দেখল। অর্থাৎ সত্যিকারের রিটায়ার্ড লাইফ বলতে যা বোঝা যায়, আজ থেকে তা-ই শুরু হল মণিমোহনের। দিবানিদ্রা সেরে বাবা এখন বাড়ির সামনের দিকের বাগানে মালিদের নিয়ে পড়েছেন। মণিমোহনের একটা বড় শখ গার্ডেনিং। পুণায় তাদের বিশাল বাংলোর কমপাউন্ডে যে বাগান ছিল সেটা বলতে গেলে বাবার হাতেই গড়া।

এখন বিকেল। পশ্চিমে যোধপুর পার্কের ওধারে যে সবুজ গাছপালার বর্ডার তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড সোনালি বলের মতো শেষ বেলার সূর্য আটকে আছে। শেষ আশ্বিনের ঝিরঝিরে সুখদায়ক বাতাস কখনও বয়ে যাচ্ছে পুবে-পশ্চিমে, কখনও উত্তরে-দক্ষিণে।

তেতলায় তার ঘরের সামনের বিরাট ব্যালকনিতে একটা গোল বেতের চেয়ারে বসে ছিল সুজয়া। পাশের অরেকটা চেয়ারে মেজো কাকার মেয়ে কলি।

কলির বয়স তার চয়ে অনেক কম। পানপাতার মতো মুখ, ভুরু দুটো এত সরু, যেন তুলিতে টানা, পাতলা ফুরফুরে নাক, ছোট্ট কপাল, প্রতিমার মতো বড়-বড় টানা চোখ। গায়ের রং তত ফরসা না হলেও কলির দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তার পরনে এই মুহূর্তে লম্বা ঝুলের স্কার্ট আর হনিকম্বের কাজ-করা 'টপ'। তার ওপর নানা ধরনের নকশা-কাটা মণিপুরি চাদর।

ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল কলি; আজ সকালেই জ্বরটা ছেড়েছে। চুল তার উস্কখুস্ক, রুক্ষ। মুখটা শুকনো, ফ্যাকাসে; চোখের কোল বসে আছে। অসুস্থতার ছাপ সারা গায়ে।

সুজয়ারা যেখানে বসে আছে তার পর থেকে দক্ষিণের স্কাই-লাইন একেবারে ফাঁকা। দোতলার চাইতে উঁচু কোনও বাড়ি সেখানে নেই। ফলে একটানা বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। অনেকটা ফাঁকা পাওয়ার পর প্রথম যে বিশাল বাড়িটার গায়ে চোখ আটকায় সেটা গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চের হেড কোয়ার্টার্স। তারপর যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্স। ইউনিভার্সিটি ছাড়িয়ে শহরের অস্পষ্ট ধু-ধু একটা পেনসিল-স্কেচ আকাশের গায়ে আটকে আছে। তারপর আর চোখ যায় না।

আশ্বিনের এই বিকেলে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ছিল। বাংলাদেশ বা কলকাতা সম্বন্ধে সুজয়ার যেটুকু জানা সবই বই পড়ে বা মণিমোহনের কাছে শুনে। কাজেই ওগুলো কী পাখি সে বলতে পারবে না। তবে সারা গায়ে সোনালি রোদ মেখে অসংখ্য রঙিন কাগজের টুকরোর মতো যে পাখিরা উড়ছে, তাদের দেখতে খুব ভালো লাগছে।

কলি বলছিল, 'আচ্ছা দিদিভাই, তুমি ক'বার বম্বে গেছ?'

সুদূর আকাশের দিকে চোখ রেখেই সুজয়া বলল, 'অনেকবার।' একটু থেমে আবার বলল, 'পুণা থেকে বম্বে আর কতদূর? তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার ড্রাইভ। প্রত্যেক সপ্তাহে বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত কি অতুলপ্রসাদের গান শিখতে আসতাম। বম্বের কথা জিগ্যেস করলি কেন রে?'

'বম্বে খুব বিগ সিটি, না?'

'হুঁ—'

'আমাদের কলকাতার চাইতে বড়?'

'শুনেছি কলকাতা বম্বের থেকে বড়।'

কলি একটু ভেবে বলল, 'বম্বে কলকাতার চাইতে অনেক বেশি বিউটিফুল। তাই না দিদিভাই?'

সুজয়া বলল, 'তা তো বলতে পারব না। আমি সবে কলকাতায় এলাম। এ-শহরের কতটুকুই বা দেখেছি। তবে এটা বলতে পারি বম্বে খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন সিটি। ওটাকে বলা হয় ওয়েস্টার্ন

সিটি অফ দা ইস্ট।'

'ঠিক আছে, আমার শরীরটা একটু ভালো হোক। তোমাকে হোল ক্যালকাটা ঘুরিয়ে দেখাব।'

'দেখাস।'

'তখন বলতে হবে আমাদের কলকাতা ভালো, না তোমাদের বম্বে?'

কলির ছেলেমানুষিতে হেসে ফেলল সুজয়া। এ-কথার কী উত্তর দেবে।

তাড়াতাড়ি কি ভেবে নিয়ে কলি আবার বলল, 'আচ্ছা দিদিভাই—'

'বল—'

হিন্দি ফিল্মের কয়েকজন নামকরা হিরো, হিরোইন, ভিলেন, ভ্যাম্প আর কমেডিয়ানের নাম করে কলি খুব আগ্রহের সুরে জিগ্যেস করল, 'তুমি এদের দেখেছ?'

সুজয়া তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'না তো!'

এরকম একটা উত্তর আশা করেনি কলি। ভীষণ অবাক হয়েই সে সুজয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, 'এভরি উইকে বম্বে গেছে, তবু ওদের দ্যাখোনি!'

'উঁহু—'

'এর কোনও মানে হয়! আমি আমার বন্ধুদের কী বলে রেখেছি জানো?'

'কী?'

'বলেছি আমার দিদিভাই মানে তুমি, সব ফিল্মস্টারকে চেনো।' কয়েকজন হিরোইনের নাম করে কলি বলল, 'বলেছি এরা আমার দিদিভাইয়ের ফ্রেন্ড।'

সুজয়ার মনে পড়ল, তারা যখন পুণায় ছিল কলি অনেকবার তাকে ফিল্ম স্টারদের অটোগ্রাফ জোগাড় করে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছে। একটা কথা ভেবে ভীষণ মজা লাগল, তারা যখন বম্বের একশো মাইলের মধ্যে পুণায় সেই সময় মণিমোহন অনবরত তাকে বাংলা গান, বাংলা থিয়েটার, বাংলা সাহিত্য, বাংলা লিটারেচার, মোটকথা বেঙ্গলি অ্যাটমোসফিয়ারের মধ্যে রেখেছিলেন। কম করে এক হাজার বার সুজয়া বম্বেতে এসেছে, কিন্তু কখনও ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের দেখতে ইচ্ছা হয়নি। আর এদিকে পুরোপুরি বাঙালি আবহাওয়ায় থেকেও হিন্দি ফিল্মের স্টারদের সম্পর্কে কি দুর্দান্ত উৎসাহ কলির। বারোশো মাইল দূর থেকে বম্বে শহর চোরা বানের মতো ঢাকুরিয়ার এই বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। সুজয়া বলল, 'আমার সম্বন্ধে বন্ধুদের আর কী-কী বলেছিস শুনি—'

কলি বলল, 'বলেছি, তুমি স্টুডিয়োতে শুটিং দেখতে যাও। তোমার কী মজা!'

'এইসব বলে বন্ধুদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিস তো!'

'হুঁ। তোমার জন্যে ওরা আমাকে টেরিফিক খাতির করে। কিন্তু তুমি আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে দিদিভাই। আই অ্যাম ফিনিশড। এখন কী করে ম্যানেজ করি, বলো তো?'

বুঝতে না পেরে সুজয়া জিগ্যেস করল, 'কীসের ম্যানেজ?'

'ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এদিকে তুমি শুটিং দ্যাখোনি, স্টারদের দ্যাখোনি। আমার প্রেস্টিজ একদম গেল।'

সুজয়া রগড়ের গলায় বলল, 'তোর বন্ধুদের আসতে বলিস। ভয় নেই, তোর প্রেস্টিজ যাবে না।'

'কোনও কিন্তু না। আমি ম্যানেজ করে ফেলব।'

'ওরা কিন্তু ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ে-পড়ে হিরো-হিরোইনদের সব খবর মুখস্থ করে রেখেছে। ওদের ম্যানেজ করা সোজা না।'

'ঠিক আছে। সে আমি বুঝব।'

কলি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় নীচে মোটরের জোরালো হর্ন বেজে উঠল।

চমকে সেদিকে তাকাতেই সুজয়া দেখতে পেল একটা চাকর প্রকাণ্ড লোহার গেটটা খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন মডেলের একটা ইমপোর্টেড ফিয়েট বাড়ির কম্পাউন্ডে পামগাছের দুই সারির মাঝখানে নুড়ির প্যাসেজে এসে পার্ক করল। গাড়ির দরজা খুলে প্রথমে নামল হীরক, তারপর মৃণাল। তাদের কথা এই মুহূর্তে সুজয়া ভাবছিল না। এই মুহূর্তে কেন, পরশু এ-বাড়িতে ঢোকার পর থেকে হীরকদের কথা তার আর মনে ছিল না। আসলে এই দু-দিনে এত সব আত্মীয়স্বজন এসেছে যে ওদের কথা মনে করে রাখা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া রাস্তায় আলাপ। অনেকেই ঠিকানা নিয়ে পরে দেখা করবে বলে, কিন্তু ক্বচিৎ কখনও তারা আসে।

হীরকরা আসাতে খুশি হয়েছে কি না সুজয়া বুঝতে পারল না। তবে এটুকু টের পেল অখুশি হয়নি।

ওদিকে মণিমোহন বাগানে মালিদের কাজের তদারক করতে-করতে নিজেও হাত লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কখনও বড় কাঁচি দিয়ে গোলাপ গাছের শুকনো ডালপালা ছাঁটছিলেন। কখনও ডালিয়া কি বোগেনভিলিয়ার গোড়া থেকে মুথো ঘাস কি আগাছা তুলে ফেলছিলেন। হীরকদের দেখে তিনি বড়-বড় পা ফেলে নুড়ির রাস্তার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আরে, এসো এসো।' গলা তুলে বেশ চেঁচিয়েই আনন্দটা প্রকাশ করলেন তিনি।

হীরক বলল, 'বলেছিলাম কাল আসব। একটা ব্যাপারে আটকে গিয়েছিলাম। তবে ঠিক এসেছি।'

'তাই তো দেখছি! চলো, ভেতরে যাওয়া যাক।'

হীরকদের নিয়ে নুড়ির রাস্তা মাড়িয়ে বাড়ির দিকে যেতে-যেতে মুখ তুলে মণিমোহন বেশ জোরে চিৎকার করেই বললেন, 'এই দ্যাখ টুকু, কারা এসেছে। নীচে আয়।' মণিমোহন জানতেন তিনতলার ব্যালকনিতে সুজয়া আর কলি বসে আছে।

কলি জিগ্যেস করল, 'ওরা কারা দিদিভাই?'

হীরকদের সম্বন্ধে যা জানা ছিল সুজয়া বলল। এমনকি কীভাবে আলাপ হয়েছে তাও।

কলি বলল, 'ওই ভদ্রলোককে দারুণ দেখতে, তাই না দিদিভাই—'

সুজয়া বুঝল কলি হীরকের কথা বলছে। সে উত্তর দিল না। একটু ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে দেখল মণিমোহনরা সেই নুড়ির রাস্তায় নেই; নিশ্চয়ই ড্রাইংরুমে চলে গেছেন। সুজয়া কলির দিকে ফিরে বলল, 'বাবা ডেকেছেন, আমি নীচে যাচ্ছি। তুই উঠিস না, এখানেই বসে থাক। দুর্বল শরীর নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে হবে না। একটু পরে আমি ফিরে আসছি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

কলি বলল, 'বেশি দেরি করো না কিন্তু—'

দু-মিনিট পর নীচে এসে সুজয়া দেখল ড্রইংরুম জমজমাট। মণিমোহন, হীরক আর মৃণালরা তো রয়েছেই। তিন কাকিমা, দীপ্তি শোভা আর কণিকাও আছেন। তার মানে মণিমোহনই তাঁদের ডাকাডাকি করে নিয়ে এসেছেন।

আসলে মণিমোহন মানুষ হিসেবে খুবই খোলামেলা, সহজ এবং অকপট। চারপাশে দেওয়াল তুলে তিনি নিজেকে কারও কাছ থেকেই দূরে সরিয়ে রাখতে চান না। ভাইরা, তাঁদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা—সবার সঙ্গেই মণিমোহনের ব্যবহার সমবয়সি বন্ধুর মতো। এতকাল দূরে ছিলেন; প্রিয়জনদের সঙ্গ পাননি। এখন বাড়ি ফিরে সবাইকে সর্বক্ষণ কাছে-কাছে রাখতে চান।

সুজয়াকে দেখে হীরক আর মৃণাল উঠে দাঁড়িয়েছিল। হীরক তার মুখের দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন, ঠিক চলে এসেছি।'

সুজয়া সামান্য হাসল, 'ধন্যবাদ।'

মৃণালকে দেখিয়ে হীরক এবার বলল, 'আমার বন্ধু কিন্তু আসতে চাইছিল না। জোর করে

ধরে নিয়ে এসেছি।'

মণিমোহন ওধার থেকে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'কেন আসবে না? আসার কথা তো দিয়েছিল।'

হীরক বলল, 'কলেজ আর উলটোডিঙিতে যেখানে থাকে তার বাইরে ও কোথাও খুব একটা যেতে চায় না।'

মণিমোহন হুংকার দেওয়ার মতো করে বলে উঠলেন, 'নো।' দিস ইজ ব্যাড। ওয়ার্ল্ড ইজ আ ভেরি বিগ প্লেস। এক জায়গায় পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। নানা লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, নানা জায়গায় যেতে হয়। এভাবে মানুষের চেনাশোনার বাউন্ডারি বাড়ে।' একটু থেমে মৃণালকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি না এলে আমাদের খুব খারাপ লাগত।'

মৃণাল অল্প হাসল।

হীরকরা দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুজয়া বলল, 'আপনারা বসুন—'

হীরক আর মৃণাল আবার বসে পড়ল।

সুজয়া যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশেই কাকিমারা বসে আছেন। ছোট কাকিমা মণিকার ডান ধারে পুরোনো আমলের একটা সোফা খালি রয়েছে। সুজয়া সেখানে বসল। বসার সঙ্গে-সঙ্গে মণিকা তার কানের কাছে মুখ এনে খুব আস্তে চাপা গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?'

মণিকার ভাবভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর এই মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারীর মতো। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে সুজয়া বলল,'কীসের?'

'আমার ধারণা ছিল হীরকরা আসবে না। কিন্তু ঠিক এসে গেছে—'

'বাবা বার বার আসতে বলেছিলেন। তাই—'

'আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে—'

'কী?' সোজাসুজি মণিকার চোখের দিকে তাকাল সুজয়া।

মণিকা ঠোঁট কামড়ে রেখে সামান্য কুঁচকে গলার স্বর আরও গভীরে নামিয়ে বললেন, 'বলব?'

'বল না—'

'আমার মনে হয় বাবার জন্যে নয়, বাবার মেয়েটির জন্যেই ওরা এসেছে। ওরা বলতে হীরক। একা এলে কেমন দেখায়, তাই বন্ধুকে জোর করে ধরে এনেছে। ওটা আই-ওয়াশ।'

সুজয়া খুবই স্মার্ট মেয়ে। সে হেসে বলল, 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে দেখলে যে-কোনও ইয়ংম্যানের মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা। হীরকের আর কী দোষ! না এলেই মনে হত ছেলেটা অ্যাবনরম্যাল।'

সুজয়া উত্তর দিল না। ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

মণিমোহন আসর জমিয়ে ফেলেছেন। বাংলা নাটক, গান, সত্যজিৎ রায় ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তার ফাঁকে চাকররা চা এবং প্রচুর খাবারে-দাবার দিয়ে গেল। কাকিমারা প্লেটে-প্লেটে সাজিয়ে সবাইকে খেতে দিলেন।

খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গল্পও চলছে। সুজয়া বিশেষ কোনও কথা বলছিল না। তবে সে না তাকিয়েও টের পাচ্ছিল বার বার ঘুরে-ঘুরে হীরকের চোখ তার দিকে এসে পড়ছে। আরও একটা ব্যাপার সে লক্ষ করছিল, মৃণাল বিশেষ কথা-টথা বলছে না। মুখ নীচু করে চা খেয়ে যাচ্ছে। এরকম পরিবেশে সে খুব স্বচ্ছন্দ হতে পারছে না।

মৃণাল না তাকালেও নিজের অজান্তে দু-একবার সুজয়ার চোখ তার দিকে চলে যাচ্ছিল। সেদিন হাওড়া স্টেশনে তত ভালো করে দেখা হয়নি। এখন মনে হচ্ছে মৃণাল বড় বেশি রোগা, মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে, চোখের কোল বসে গেছে। কণ্ঠার আর চোখের নীচের হাড় গজালের মতো ঠেলে উঠেছে। ভেতরে-ভেতরে সে কি খুবই অসুস্থ?

মণিমোহন এতক্ষণ একাই প্রায় সব কথা বলে যাচ্ছিলেন। অন্য সবাই হুঁ-হ্যাঁ করছিল। হঠাৎ

যেন মণিমোহন এ-বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন। ভীষণ ব্যস্তভাবে 'কী হল, সবাই মুখ বুজে কেন? গল্প করো—হ্যাভ ফান—'

এই সময় আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল সুজয়ার। সে হীরকের দিকে ফিরে বলল, 'আমি আপনাদের কাছে একটা বিষয়ে জানতে চাইছি।'

যেচে সুজয়া তার সঙ্গে কথা বলবে, এতটা খুব সম্ভব ভাবতে পারেনি হীরক। আগ্রহে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে সে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কী বিষয়ে বলুন—

'আমি হিস্ট্রির ছাত্রী; রিসার্চ করতে চাই। এদিকে আমাদের বাড়ির সবাই হয় সায়েন্স, নয় কমার্সের লোক। এমনকি আমার কাকিমারা পর্যন্ত। বলতে পারেন কোন ইউনিভার্সিটিতে কার কাছে রিসার্চ করা যেতে পারে?'

এমএ পাস করার পর থেকে রিসার্চের ব্যাপারটা সুজয়ার মাথায় আটকে আছে।

হীরক হাত উলটে বলল, 'আমি এ-ব্যাপারে টোটালি হেল্পলেস; এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিলাম। ও হ্যাঁ—' বলতে বলতেই মৃণালের দিকে ফিরল, 'মৃণাল আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। ও হিস্ট্রির প্রফেসর।'

অত্যন্ত আগ্রহের সুরে সুজয়া বলল, 'তা হলে তো খুবই ভালো হল।' বলেই মৃণালের দিকে ফিরল, 'আপনি কী পড়ান—অ্যানসিয়েন্ট, না মডার্ন হিস্ট্রি?'

খুব সংকোচের গলায় আস্তে করে মৃণাল বলল, 'দুটোই।'

'তার মানে আপনি দুটোতেই—'

সুজয়ায় কথা শেষ হওয়ার আগেই হীরক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রিতে মৃণাল ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর মডার্ন হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড।'

বিব্রতভাবে মৃণাল বলল, 'না-না, ওর কথা শুনবেন না।'

সুজয়া এমন মানুষ আগে দেখেনি।

সাধারণভাবে কারও যদি একটু রূপ, কিছু অর্থ বা পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যে থাকে, সে প্রচণ্ড অহংকারী হয়। কোনওদিকে কেউ যদি সামান্য কৃতিত্বের কাজও করে থাকে সেটা দশ গুণ জাহির করে। আজকাল সবাই যে যার পাবলিসিটি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে থেকেও মৃণাল নিজেকে শামুকের মতো যেন গুটিয়ে রেখেছে। তার কোথাও এতটুকু অহংকার নেই। বরং সবটাই সংকোচ, হয়তো বিনয়ও। তার বিব্রত ভাবটা ভালো লাগল সুজয়ার। সে বলল, 'ঠিক আছে, শুনব না। এখন বলুন, কার আন্ডারে রিসার্চ করলে ভালো হয়?'

মৃণাল জিগ্যেস করল, 'আপনি কোন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেলে খুশি হবেন?'

'আমার কোনও চয়েস নেই। আপনি যা সাজেস্ট করবেন—'

'দেখুন আমি যাঁদের কাছে পড়েছি তেমন দুজন অসাধারণ অধ্যাপক কলকাতা আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে রয়েছেন। রিসার্চ গাইড হিসেবে দুজনেই আইডিয়াল।'

'আপনি কার আন্ডারে রিসার্চ করতে বলেন—'

তক্ষুনি উত্তর দিল না মৃণাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে যিনি প্রফেসর তিনি থাকেন শ্যামবাজারে, আর যাদবপুরের প্রফেসর থাকেন হাজরা পার্কের কাছে। শ্যামবাজারে যাতায়াত করা আপনার পক্ষে সুবিধা হবে কী?'

সুজয়া বলল, 'কোথায় শ্যামবাজার আর কোথায় হাজরা—আমার কোনও আইডিয়া নেই। আমি কলকাতার কিছুই চিনি না!'

'আরে তাই তো!' বলে একটু থামল মৃণাল। পরক্ষণেই একটু ভেবে আবার শুরু করল, 'হাজরা আপনাদের বাড়ির কাছে; যাতায়াত অনেক সহজ। আমার তো মনে হয়—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মণিমোহন মাঝখানে বলে উঠলেন, 'আমার একটা

কথা আছে।'

সবাই তাঁর দিকে ফিরল। মণিমোহন বলতে লাগলেন, 'আমাদের বাড়ির সবাই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এই ইউনিভার্সিটিটা সম্বন্ধে আমার পার্সোনাল ফ্যান্সি আছে। আমার ইচ্ছে টুকু ফ্যামিলি ট্র্যাডিশানটা বজায় রাখুক। রিসার্চটা ও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেই করুক।'

মৃণাল বলল, 'সেটা ঠিক আছে। আমি ডিসট্যান্সের কথা বলছিলাম—'

'তাতে অসুবিধা হবে না। বাড়িতে গাড়ি আছে।'

সুজয়া বলল, 'বাবা যখন বলছেন তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেই রিসার্চ করি।'

মৃণাল বলল, 'বেশ তো; আপনাদের যেরকম ইচ্ছে—'

সুজয়া বলল, 'এ-ব্যাপারে আপনাকে কিন্তু সবরকম সাহায্য করতে হবে।'

'কী সাহায্য বলুন—'

মণিমোহন বললেন, 'আমরা এখানকার কিছুই জানি না। তুমি যখন হিস্ট্রির লোক আর তোমাকে যখন হাতের কাছে পেয়েই গেছি তখন টুকুর রিসার্চের ব্যাপারটা একটু দেখো।'

মৃণাল কিছু বলার আগেই তাঁর বাঁ-দিক থেকে হীরক খুব ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখবে। রিসার্চ গাইড ঠিক করা থেকে সবকিছু মৃণাল করে দেবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

সুজয়ার রিসার্চের বিষয়ে আরও দু-একটা কথার পর মৃণাল হঠাৎ মণিমোহনকে বলল, 'সন্ধেবেলা বাড়িতে আমার একটা কাজ আছে। আপনারা অনুমতি দিলে এখন যাব।'

মৃণালকে এই মুহূর্তে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না মণিমোহনের। বললেন, 'পেছনে কাজ রেখে গল্প করতে আসার মানে হয়! ভাবলাম জমিয়ে আড্ডা দেব।'

মৃণাল সামান্য হাসল।

মণিমোহন এবার বললেন, 'ঠিক আছে, কাজ থাকলে আর আটকাব না।' বলেই হীরকের দিকে ফিরলেন, 'তুমিও জরুরি কাজ ফেলে রেখে এসেছ নাকি?'

হীরক বলল, 'না, আমার কোনও কাজ নেই।'

মণিমোহন বললেন, 'কাজ না থাকলে তুমি থেকে যাও।'

হীরকের আরও কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ারই হয়তো ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মৃণালকে সঙ্গে নিয়ে সে এসেছে। মৃণাল চলে গেলে তার একার থাকাটা অশোভনতা। সে বন্ধুর দিকে তাকাল।

মৃণাল উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'তুই পরেই আয়। আমি চলি—'

হীরক বলল, 'একটা দিন তোর ওইসব মিশনারি অ্যাকটিভিটি বাদ দিলে, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না।'

মণিমোহন বললেন, 'মিশনারি অ্যাকটিভিটি মানে?'

বিব্রতভাবে তাড়াতাড়ি মৃণাল বলে উঠল, 'না-না, তেমন কিছু নয়। হীরকের কথা শুনবেন না।'

মণিমোহন এ-বিষয়ে আর কোনও কৌতূহল প্রকাশ না করে বললেন, 'আবার কবে আসছ?'

মৃণাল বলল, 'আসব একদিন—'

'একদিন মানে! তুমি টুকুর রিসার্চের দায়িত্ব নিয়েছ—'

'ও-ব্যাপারে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমি ফোনে জানিয়ে দেব।'

'না-না, তুমি নিজে আসবে।' বলে একটু ভেবে বেশ জোর দিয়েই মণিমোহন ফের বললেন, 'মাঝে-মাঝেই আসবে। তুমি এলে আমরা খুব খুশি হব।'

'আচ্ছা, দেখি—' মৃণাল আর দাঁড়াল না। চারিদিকে ঘুরে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মণিমোহনও মৃণালের সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়েছিলেন। তাকে লনের শেষ মাথায় গেট পর্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে আবার ড্রইং রুমে ফিরে এলেন। সোফায় শরীর এলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'তোমার বন্ধুটি বড্ড 'শাই', তাই না?'

হীরক বলল, 'ঠিক তা নয়। আসলে ও বাড়ি থেকে বিশেষ কোথাও বেরুতে টেরুতে চায় না।'

'মৃণাল ম্যারেডে?'

'না।'

'বাড়িতে কে-কে আছে ওর?'

'কেউ না।'

'বাবা-মা ভাই-টাই, কেউ না?'

'না। হি ইজ অ্যালোন।' হীরক বলতে লাগল, 'ডিসট্যান্ট কিছু রিলেটিভ আছে। তারা কলকাতায় থাকে না; লখনউ না বেনারসে কোথায় যেন আছে। মৃণালের সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই।'

মণিমোহন একটা মোটা সিগার ধরিয়ে বললেন, 'আই সি; তা হলে এরকম জমজমাট আড্ডা ছেড়ে বাড়ি চলে গেল? সেখানে অ্যাট্রাকশানটা কীসের?'

হীরক বলল, 'আশেপাশের বস্তির অনেক বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে ওর কাছে থাকে। মৃণাল কলেজ থেকে যা পায় প্রায় সবটাই ওদের জন্যে খরচ করে। সন্ধেবেলা নিজে ওদের পড়ায়।'

'পড়াবার জন্যে চলে গেল বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

মণিমোহন একটু চিন্তা করে বললেন, 'এই জন্যেই তুমি মিশনারি অ্যাকটিভিটি বলছিলে—'

হীরক মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।'

সুজয়া প্রায় পলকহীন হীরকের দিকে তাকিয়ে ছিল। মৃণালের কথা শুনতে-শুনতে তার সম্বন্ধে এক ধরনের কৌতূহল এবং আকর্ষণ বোধ করছিল সে। কিছুটা শ্রদ্ধাও। মিশনারি ফাদার ছাড়া এ-জাতীয় আইডিয়ালিস্ট বা ফিলানথ্রপিস্টদের সে কখনও দ্যাখেনি, বইয়ে তাদের কথা পড়েছে।

মণিমোহন হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মৃণালকে একটা কথা জিগ্যেস করতে একেবারে ভুলে গেছি।'

জিজ্ঞাসু চোখে হীরক তাকাল, 'কী?'

'সেদিন হাওড়া স্টেশনে লক্ষ করেছি, আজও দেখলাম ছেলেটা ভীষণ রোগা। মনে হচ্ছে ও খুব অসুস্থ।'

হীরক কী বলতে যাচ্ছিল, কিছু ভেবে দ্বিধাগ্রস্তের মতো থেমে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, প্রায় সব সময়ই ভোগে।'

মৃণাল সম্পর্কে আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হীরক বলল, 'মা-বাবাকে আপনাদের কথা বলেছিলাম। ওঁদের ইচ্ছে আপনারা একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন। যদি বলেন মাকে বলব আপনাকে ফোন করতে।'

'মাকে আর কষ্ট করে ফোন করতে বলতে হবে না। তোমার ইনভিটেশনই অ্যাকসেপ্ট করলাম।'

'কবে আসবেন?'

'দু-একদিনের মধ্যেই। তোমাদের ফোন নাম্বার আর বাড়ির অ্যাড্রেস দিয়ে যাও। যাওয়ার আগে ফোন করে নেব।'

ওধার থেকে দীপ্তি বললেন, 'দু-একদিনের মধ্যে তো কোথাও যেতে পারবেন না দাদা। শনিবার পর্যন্ত আপনার প্যাকড প্রোগ্রাম। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যাবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

মণিমোহনের মনে পড়ে গেল, 'রাইট, রাইট। না হে হীরক, রবিবারের আগে যাওয়া হবে না।'

'ঠিক আছে, রবিবারই আসবেন।'

'কীভাবে তোমাদের বাড়ি যেতে হবে বলো তো। অনেক দিন কলকাতায় নেই, রাস্তাঘাট সব গোলমাল হয়ে গেছে।'

হীরক বলল, 'রবিবার দুপুর থেকে আমার একটা রোয়িং কমপিটিশন আছে। ব্রিটেন থেকে পাঁচজনের একটা টিম আসছে। তা ছাড়া এখানকারও কয়েকটা টিমও রয়েছে। কমপিটিশনের পর বিকেলের দিকে এসে যদি আপনাদের নিয়ে যাই।'

মণিমোহন বললেন, 'কষ্ট করে তোমাকে আর আসতে হবে না। আমরাই লেকে চলে যাব। তোমার রোয়িং দেখে তোমার সঙ্গে যাওয়া যাবে।'

হীরকের চোখ খুশিতে ঝকমকিয়ে উঠল, 'আপনারা রোয়িং দেখতে আসবেন!'

'সিওর। তুমি যে রোয়িং জানো, এ-কথা তো আগে বলোনি!'

হীরক লাজুক মুখে বলল, 'এ আর কী বলব। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার সময় একটু-আধটু প্র্যাকটিশ করতাম। পরে প্র্যাকটিশটা একবারে ছাড়িনি।'

গল্পে-গল্পে রাত হয়ে গেল। হীরক একসময় বলল, 'আজ চলি। রবিবার আপনারা আসছেন কিন্তু—'

'হ্যাঁ, আসব—'

হীরক উঠে পড়ল। মণিমোহনরা সবাই 'লন' পর্যন্ত তার সঙ্গে-সঙ্গে এল। সেখানে নুড়ির রাস্তায় হীরকের গাড়িটা পার্ক করা ছিল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবার আগে স্থির উজ্জ্বল চোখে সুজয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে হীরক বলল, 'প্লিজ আসবেন।'

আস্তে করে ঘাড় হেলিয়ে দিল সুজয়া—যাবে।

আচমকা পাশ থেকে ছোট কাকিমা মণিকা রগড়ের গলায় বলে উঠলেন, 'কই আমাদের তো আপনাদের বাড়ি যেতে বললেন না।'

হীরকের মতো স্মার্ট ছেলেও হকচকিয়ে গেল, হাতজোড় করে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনারা সবাই যাবেন। নিশ্চয়ই যাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

দীপ্তি, শোভা এবং মণিকাকে বারবার যাওয়ার কথা বলে শেষ পর্যন্ত গাড়িতে উঠল হীরক। সে চলে যাওয়ার পর বাড়ির দিকে ফিরতে-ফিরতে মণিমোহন বললেন, 'হীরক ছেলেটা বেশ ব্রাইট, তাই না?'

শোভা এবং দীপ্তি একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, বেশ ছেলে।'

মণিকা তখন সুজয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলছিলেন, 'একটা নাটকের ফার্স্ট অ্যাক্ট শুরু হল।'

সুজয়া বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করল, 'মানে—'

'হীরক তোমাকে আর দাদাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে। ছোকরা ফিনিশড—'

'কেন, হীরক তো সবাইকেই যেতে বলেছে—'

'ওটা বলতে হয়।' মণিকা ঠোঁট টিপে হাসলেন।

চার

এরপর ক'টা দিন, একেবারে সেই শনিবার পর্যন্ত, প্রোগ্রামে-প্রোগ্রামে ঠাসা। সকালবেলা পিসির বাড়ি গেলে, দুপুরে দূর সম্পর্কের কোনও কাকার বাড়ি, তারপর সন্ধেবেলা মাসির বাড়ি। আসলে

যে আত্মীয়স্বজনরা সুজয়াদের আসার খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলে গেছেন। এই যাওয়াটা ভদ্রতা।

সারাদিন অনবরত ছোটাছুটির ফাঁকে বাড়িতে তিন কাকা, তিনি কাকিমা এবং মণিমোহনের মধ্যে সুজয়া সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। দুই কাকিমা এবং এক কাকার অভিমত সুজয়ার বিয়ে দেওয়া উচিত। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হয়েছে। বিয়েটা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। সুজয়াকে না জানিয়ে মণিমোহন ভাইদের চিঠি লিখে ভালো ছেলে দেখে রাখতে বলেছিলেন। তাঁরা ছেলে পছন্দও করে রেখেছেন।

কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে মনের দিক থেকে এই মুহূর্তে সুজয়ার সায় নেই। তার ইচ্ছা রিসার্চ শেষ করার আগে বিয়ের কথা ভাববে না। নিজের মনোভাব সে মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছে। দুই কাকা আর এক কাকিমা তার পক্ষে। তাঁদের মতে বিয়ে হয়ে গেলে পড়াশোনাটা আর হয়ে ওঠে না। এতদিন যখন বিয়ে হয়নি, আর দুটো বছরে কি এমন আসবে, যাবে।

মণিমোহন সাধারণভাবে কারও ওপর নিজের মতামত খাটান না। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী। তা ছাড়া সুজয়ার যা বয়স তাতে নিজের ভালোমন্দ নিশ্চয়ই বুঝতে শিখেছে। তার যখন রিসার্চ করার ইচ্ছা তখন তাতে তিনি বাধা দেবেন না। আপাতত ঠিক হয়েছে সুজয়া রিসার্চের করে যাক। কাকিমারা মাঝে-মাঝে বিয়ের কথা বলে যাবে। যদি তার হঠাৎ ইচ্ছা হয় বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

রবিবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মণিমোহন, সুজয়া আর কলি হাঁটতে-হাঁটতে গড়িয়াহাটার ওভারব্রিজ পেরিয়ে লেকে চলে এলেন। যদিও হীরক কাকিমাদের আনার জন্য বারবার বলে গিয়েছিল ওঁরা আসতে পারেননি। ছুটির দিন বাড়ির মেয়েদের বেরুনো মুশকিল। আত্মীয়স্বজন এবং স্বামীর বন্ধুবান্ধবরা এসে পড়েন। আজও বড় কাকার কলেজ লাইফের একজন পুরোনো বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী এসেছেন, বিকেলে মেজো কাকার অফিসের কলিগ আর ছোট কাকিমার বাবার আসার কথা আছে। কাজেই ওঁদের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। তবে কলি এসেছে, ওকে সুজয়াই নিয়ে এসেছে। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর কলি এখন বেশ ভালোই আছে।

কাকিমারা কেউ না-আসার জন্য সুজয়া খানিকটা খুঁত-খুঁত করছিল। ছোট কাকিমা মণিকা তাকে বলেছেন, 'এত লোক ডেকে নিয়ে বাজার বসাবার দরকার কি? ভিড় না বাড়িয়ে হীরককে একটু সাহসী হওয়ার অপরচুনিটি দাও।'

সুজয়া হেসে বলেছিল, 'তুমি ভীষণ রোমান্টিক, বানিয়ে-বানিয়ে অনেক কিছু ভাবতে পারো।'

'ঠিক আছে, ধরে নিলাম সবটাই আমার বানানো। তবু একটা কথা বলে রাখি—'

'কী?'

'হীরক কী বলে না বলে তার কারেক্ট রিপোর্ট চাই। হাইড অ্যান্ড সিক চলবে না।'

'আচ্ছা।'

মেজো কাকা বেরুবার সময় গাড়ি নিতে বলেছিলেন। মণিমোহন নেননি। হীরকের সঙ্গে নিশ্চয়ই গাড়ি থাকবে। ঢাকুরিয়া থেকে লেক পর্যন্ত রাস্তাটুকু হেঁটে যাওয়া এমন কিছু পরিশ্রমের কাজ নয়। মণিমোহন হেঁটে বেড়ানো পছন্দ করেন।

আশ্বিনের ঝলমলে আরামদায়ক রোদ গায়ে মেখে লেকে আসতে বেশ ভালোই লাগল সবার। আসতে-আসতে মণিমোহন বলছিলেন, তিনি যখন স্কুলে উঁচু ক্লাসে কিংবা কলেজে ফার্স্ট ইয়ার-টিয়ারে পড়েন তখন বালিগঞ্জের এই লেক কাটা হয়েছিল। তখন চারপাশ এমন জমজমাট ছিল না; সবদিক ছিল খোলামেলা, ফাঁকা। এখন ওধারে সাদার্ন অ্যাভেনিউর ধার ঘেঁষে বিরাট-বিরাট

সব স্কাইস্ক্রেপার সোজা আকাশের গায়ে গিয়ে বিঁধে আছে। গাছপালা অনেক কমে গেছে, ভিড় বেড়েছে প্রচণ্ড। বিশাল-বিশাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, স্টেডিয়াম, সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে অনবরত বাস আর প্রাইভেট কারের ছোটাছুটি জায়গাটার শ্বাসনালি যেন দু-হাতে চেপে ধরেছে।

যুদ্ধের শেষাশেষি যখন মণিমোহন পুণায় চলে যান তার আগেই লেকে দু-একটা রোয়িং ক্লাব হয়েছে। ক্লাবগুলো কোথায়, সে-সম্পর্কে আবছা একটা ধারণা ছিল তাঁর। খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত হীরক এবং তার রোয়িং ক্লাবটা বার করে ফেললেন মণিমোহন।

রোয়িং ক্লাবের সামনের দিকে চমৎকার 'লন'। সেখানে বড়-বড় রঙিন গার্ডেন আমব্রেলার তলায় অগুনতি বেতের ফ্যাশনেবল চেয়ার পাতা রয়েছে। প্রচুর 'মড' ছেলেমেয়ে—তাদের পরনে প্যারালাল কি বেল বটম কি ফ্লেয়ার, চোখে বিশাল গোগো চশমা, দশ ইঞ্চি হিলের শু্য—ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 'পশ' সোসাইটির বয়স্ক মহিলা এবং পুরুষ, বাঙালি-অবাঙালি-অভারতীয়—তাদেরও বিচিত্র সব পোশাক এবং উগ্র আধুনিক সাজসজ্জা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিলেন বা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

'লন' যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকে লেকের জল শুরু হয়েছে। সেখানে পরপর দুটো ক'টা ছিপের মতো নৌকো এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। বাইশ থেকে তিরিশ বছরের কয়েকজন যুবক স্বাস্থোজ্জ্বল চেহারা, পরনে শর্টস, স্পোর্টস গেঞ্জি এবং সাদা কেডস—বোটগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে পাঁচজন ইউরোপিয়ানকেও দেখা গেল। হীরক যে ব্রিটিশ টিমটার কথা বলেছিল খুব সম্ভব এরা তারাই।

হীরক ওদের মধ্যেই ছিল আর অস্থিরভাবে ক্লাবের গেটের দিকে তাকাচ্ছিল। সুজয়াদের দেখে সে দৌড়ে এল। সুজয়া লক্ষ করল, তার সারা মুখ খুশিতে ভরে যাচ্ছে। আলোর মতো কিছু একটা তার চোখের গভীর কালো মণি দুটো থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল যেন।

হীরক খুব নরম গলায় বলল, 'আমি ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত আপনারা আর এলেনই না। হয়তো ভুলে গেছেন।'

সুজয়া কিছু বলবার আগেই মণিমোহন বলে উঠলেন, 'ভুলব মানে! হোয়াট ডু ইউ মিন! বুধবারের কথা রবিবার ভুলে যাব, আমাদের মেমোরি এত খারাপ ভাবো নাকি?'

হীরক হাসল, 'আসুন আসুন। জলের ধারে চেয়ার আছে, ওখানে বসবেন। এখনই রোয়িং শুরু হবে।' গার্ডেন আমব্রেলার তলায় নিয়ে সুজয়াদের বসিয়ে দিল সে। তারপর একটা বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'কী খাবেন বলুন?'

সুজয়া বলল, 'এখন কিছু দরকার নেই। এইমাত্র আমরা খেয়ে এসেছি।'

'কিছু একটু খান—কফি কি ফ্রুট জুস আনতে বলি?'

মণিমোহন বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার যখন এত ইচ্ছে, পাইন-অ্যাপেল জুস আনতে বলো।'

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে কলির দিকে ফিরল হীরক। বলল, 'একে তো সেদিন দেখিনি—'

সুজয়া বলল, 'ও আমার খুড়তুতো বোন কলি। ভালো নাম কাকলি। এবার সেকেন্ডারি একজামস দেবে।'

হীরক কলিকে বলল, 'এখন তো সময় নেই। পরে তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করব। ও-কে?'

কলি বলল, 'ও-কে, থ্যাঙ্ক ইউ।'

ওধারে বোটের কাছ থেকে একটি যুবক চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে হীরককে ডাকতে লাগল, 'হাই হীরক, কাম অন। টাইম ইজ আপ।'

হীরকও চেঁচিয়েই উত্তর দিল, 'কামিং, জাস্ট আ মিনিট।' বলে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমাকে যেতে হচ্ছে। এখনই রোয়িং স্টার্ট হবে। আপনারা থাকবেন, আমি কোম্পানি দিতে পারছি না। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।'

মণিমোহন বললেন, 'ইউ নিড নট বি এপোলোজেটিক। উই আর কোয়াইট কমফোর্টেবল হিয়ার। যাও, বেস্ট অফ লাক—'

সুজয়াও মণিমোহনের প্রতিধ্বনি করে বলল, 'বেস্ট অফ লাক।'

গাঢ় গলায় মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে হীরক বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' বলে আর দাঁড়াল না; বোটগুলোর দিকে চলে গেল।

একটু পরেই দেখা গেল একজন করে কম্পিটিটর একেকটা বোটে উঠে বসেছে। সবাই বসেছে মাঝখানে; দু-হাতে তাদের দুটো লম্বা দাঁড়। হীরককে দেখা গেল ডান দিকের শেষ বোটটায় বসে আছে। তবে চোখ সুজয়াদের দিকে।

আশ্বিনের এই দুপুরে লেকের মাথায় অফুরন্ত মায়াবী রোদের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে সুন্দর স্বাস্থ্যবান হীরককে খুব ভালো লাগছিল সুজয়ার। পলকহীন সে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

এদিকে লাউড স্পিকারে ঘোষণা শোনা গেল। ঘোষক জানিয়ে দিলেন, প্রথমে প্রতিযোগীদের একক কম্পিটিশন হবে। ছ'জন প্রতিযোগীর নাম জানিয়ে তাদের তৈরি থাকতে বলা হল। প্রতিযোগীরা স্নায়ু টান-টান করে অপেক্ষা করতে লাগল। 'লনে' গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বসে দর্শকরাও মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। তাদের মধ্যেও এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘোষক একটু পর আবার জানিয়ে দিলেন, প্রতিযোগীরা লেকের শেষ মাথায় একটা জায়গা ছুঁয়ে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যে প্রথম হবে সে পাবে পাঁচ হাজার টাকা নগদ এবং একটি ট্রফি, সেকেন্ড প্রাইজ আড়াই হাজার টাকা এবং একটি মেডেল, থার্ড প্রাইজ এক হাজার টাকা এবং একটি কাপ। অন্য প্রতিযোগীরাও কিছু-কিছু উপহার পাবে। প্রাইজ বিতরণের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার রোটারি ক্লাবের গভর্নর।

ঘোষণা শেষ করে প্রতিযোগীদের উদ্দেশে ঘোষক বলে উঠলেন, 'স্টার্ট—'

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বর্শার ফলার মতো জল কেটে-কেটে ছ'টা ছুঁচলো লম্বা নৌকো অনেক দূরে ধু-ধু কালির ফোঁটা হয়ে মিলিয়ে গেল।

বেয়ারা পাইনঅ্যাপেল জুস দিয়ে গিয়েছিল। জুসের লম্বা সুদৃশ্য গেলাস সামনের নীচু টেবলে সাজানোই রয়েছে; তুলে 'সিপ' করার কথা ভুলে গেছে সুজয়া। আসলে গার্ডেন আমব্রেলার তলায় যেসব 'মড' ছেলেমেয়ে কিংবা বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলারা বসে ছিলেন তাঁদের উত্তেজনা সুজয়ার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। যুবক-যুবতীরা চিৎকার করছিল। একেক জন প্রতিযোগীর নাম করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছিল, 'বাক আপ সুদেশ সোনি—' কিংবা 'বি স্টেডি ড্যানিয়েল—'

ওই সব ছেলেমেয়ের মতো সুজয়া চিৎকার বা হল্লা করতে পারে না, সেটা তার রুচিতে বাধে। তা ছাড়া হীরককে আজ নিয়ে তিনবার মাত্র সে দেখেছে। এত অল্প পরিচয়ে কারও জন্য অতটা উচ্ছ্বসিত হওয়া যায় না। তবু বোটগুলো যেদিকে গেছে সেদিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে সুজয়া। নিজের অজান্তেই ভাবছিল, হীরক কি ফার্স্ট হতে পারবে?

কলিও হয়তো একই কথা ভাবছিল। সে বলল, 'ফার্স্ট প্রাইজটা কে পাবে বল তো দিদিভাই?'

সুজয়া বলল, 'কেমন করে বলব? আমি কি অ্যাসট্রোলজার?'

'আমার মনে হয়ে হীরকদাই পাবে।'

'কী করে বুঝলি?'

'মনে হল হীরকদার বোটটা অন্য সবার থেকে আগে-আগে ছিল।'

মণিমোহন ওধার থেকে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'কে আগে ছিল, কে পরে—এত দূর থেকে বোঝা যায় নাকি?'

'লেট আস হোপ হীরক গেটস ফার্স্ট প্রাইজ। হাজার হোক আমরা তার গেস্ট।'

সুজয়া হাসল, কিছু বলল না।

দশ মিনিটও কাটল না, অনেক দূরে ছ'টা বোট আবার কালো বিন্দুর মতো ফুটে উঠল। তার মানে লেকের শেষ মাথায় নির্দিষ্ট একটি জায়গা ছুঁয়ে আবার তারা স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে আসছে।

রোয়িং ক্লাবের 'লনে' গার্ডেন আমব্রেলার তলায় উত্তেজনা এখন চরমে। যুবক-যুবতীরা গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাচ্ছিল। সুজয়া অনুভব করছিল, তার মেরুদণ্ড এখন আরও টান-টান হয়ে গেছে, চোখের তারা আরও স্থির। বুকের ভেতর ঝড়ের শব্দ তুলে কীসের কনসার্ট যেন বেজে যাচ্ছিল। এ-সবই পরিবেশের প্রভাব।

কিছুক্ষণের মধ্যে বোটগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। হীরকদের এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হীরক এবং একটি ব্রিটিশ ছেলে, তার নাম ড্যানিয়েল, রয়েছে আগে-আগে, অন্যরা বেশ খানিকটা পেছনে।

লেকের শান্ত স্থির জলের ওপর দিয়ে হীরক আর ড্যানিয়েল তাদের বোট দুটোকে যেন উড়িয়ে নিয়ে আসছে। কে আগে, কে পরে কিংবা কতটা আগে-পরে, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। দুজনেই শরীরকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে এবং পরক্ষণে পেছনে হেলে সমানে দাঁড় টেনে যাচ্ছে।

সুজয়ার চোখ বেশি করে ছিল হীরকের দিকে। আশ্বিনের উজ্জ্বল সোনালি রোদে তাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। উলটোপালটা হাওয়ায় হীরকের চুল উড়ছিল, তার শরীর ক্রমাগত সামনে ঝুঁকেই পেছনে হেলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল গ্রিক মাইথোলজির পাতা থেকে কোনও রূপবান যুবক দেবতা ঢাকুরিয়ার এই লেকে নেমে এসেছে। সুজয়ার চোখ ক্রমশ মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগল।

আরও কাছে আসতে বোঝা গেল ড্যানিয়েলের বোট কম করে দশ-বারো গজ এগিয়ে আছে। সুজয়ার বুকের সেই কনসার্ট আরও জোরে বাজতে লাগল।

স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে বোট দুটো আর বেশি দূরে নেই, সবাই তখন ধরে নিয়েছে গ্রেট ব্রিটেনের ছেলেটিই ফার্স্ট প্রাইজ জিতে নিয়ে যাবে। আচমকা হীরক করল কি, শরীরটাকে দ্রুত তিন-চারবার স্প্রিংয়ের মতো ঝুঁকিয়ে এবং হেলিয়ে দাঁড়ের লম্বা-লম্বা ক'টা স্ট্রোকে ড্যানিয়েলকে প্রায় পনেরো গজ পেছনে ফেলে এগিয়ে এল। মাঝখানের এই দূরত্বটা প্রাণপণ দাঁড় টেনেও ঘোচাতে পারল না ড্যানিয়েল। পনেরো গজ আগে থেকেই স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেল হীরক। অন্য প্রতিযোগীরা একে-একে এরপর এসে পড়ল।

পাড়ে রোয়িং ক্লাবের লনে চিৎকার চেঁচামেচি তখন দশ গুণ বেড়ে গেছে। তার মধ্যেই হীরক এবং অন্য কম্পিটিটররা পাড়ে নেমে এল। সবাই হীরকের হাত ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, 'কনগ্র্যাচুলেশনস—'

হীরক অন্যমনস্কের মতো বলছিল, 'থ্যাঙ্কস—' কিন্তু তার চোখ ভিড়ের ভেতর সুজয়াদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সুজয়ারা আগেই চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিল কিন্তু ভিড়ের জন্য হীরকের কাছে এগুতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত হীরক সুজয়াদের দেখতে পেল। দু-হাতে সবাইকে ঠেলেঠুলে ভিড়ের ভেতর রাস্তা করে সামনে এগিয়ে এল সে। সঙ্গে-সঙ্গে তার একটা হাত ধরে জোরে নাড়াতে-নাড়াতে মণিমোহন বললেন, 'রোয়িং-এ তোমার যে এমন হাত তা তো জানতাম না।'

লাজুক মুখে হাসল হীরক। তারপর সুজয়ার দিকে তাকাল।

সুজয়া আস্তে করে খুব আন্তরিক ভাবে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশনস—'

গভীর গলায় হীরক বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ—' একটু থেমে বলল, 'চলুন, ওখানে গিয়ে বসি।'

সবাই গার্ডেন আমব্রেলার তলায় গিয়ে আবার বসল।

কলি বলল, 'জানেন হীরকদা, যখন আপনি রোয়িং করছিলেন, আপনাকে লাভলি দেখাচ্ছিল।'

দ্রুত একবার তার দিকে তাকিয়ে হীরক হেসে ফেলল। তারপর কি ভেবে সুজয়ার দিকে ফিরল। দেখল মুগ্ধ চোখে সুজয়া তাকে লক্ষ করছে। সুজয়ার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা শোভন

নয় ভেবে মণিমোহনের দিকে ঘাড় ফেরাল সে। বলল, 'ড্যানিয়েল খুব টাফ ফাইটার। কী করে যে ওকে হারালাম ভেবে পাচ্ছি না।'

মণিমোহন বললেন, 'স্টার্টিং পয়েন্টের কাছে আসার খানিকটা আগে যখন দেখলাম তুমি ট্রেল করছ, ভাবলাম ব্রিটিশ ছেলেটা ট্রফি জিতে নিয়ে যাবে। শেষ দিকে তুমি দারুণ ফিটস দেখিয়েছ। উই আর ভেরি ভেরি হ্যাপি।'

বেয়ারাকে ডেকে কফি দিতে বলল হীরক। কফি এলে খেতে-খেতে বলল, 'আপনাদের আরেকটু কিন্তু বসতে হবে। আমার একটা গ্রুপ ইভেন্ট আছে। সেটা শেষ হলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান হতে আধ ঘণ্টার মতো লাগবে। চারটে সাড়ে-চারটের ভেতর আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব।'

'আমাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। উই আর রিয়ালি ফিলিং ফাইন হিয়ার, কোয়াইট কমফোর্টেবল।' বলে একটু থামলেন মণিমোহন। তারপর কিছু মনে পড়তে জিগ্যেস করলেন, 'গ্রুপ ইভেন্টটা কি?'

'টিমের রোয়িং আর কি। একেকটা টিমে পাঁচ জন করে থাকবে।'

একটু পরে লাউডস্পিকারে ঘোষকের গলা শোনা গেল। প্রতিটি টিমকে বোটে যেতে বলা হচ্ছে। হীরক সুজয়াদের কাছ থেকে আপাতত বিদায় নিয়ে লম্বা বোটে গিয়ে উঠল।

প্রত্যেক দলের পাঁচ জন করে প্রতিযোগী এইভাবে বসেছে। একজন নৌকোর সরু ছুঁচলো মাথায়, বাকি চারজন পেটের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষক স্টার্ট দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দুটো নৌকো আবার বর্শার ফলা হয়ে লেক চিরে এগিয়ে গেল। এবং মিনিট কয়েকের ভেতর ফিরে এল।

এবার হীরকদের টিম সেকেন্ড হয়েছে। ব্রিটিশ টিমটা হয়েছে ফার্স্ট।

কম্পিটিশন শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে রোটারি ক্লাবের গর্ভনর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর প্রতিযোগীদের প্রাইজ দিতে লাগলেন।

প্রতিযোগী এবং তাদের আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্য একধারে অনেকগুলো চেয়ার পেতে বসবার জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। হীরক সুজয়াদের ডেকে এনে তার কাছে বসিয়েছিল। তার একধারে মণিমোহন, আরেক ধারে সুজয়া আর কলি।

প্রাইজ নেওয়ার জন্য লাউডস্পিকারে প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। পুরস্কৃতরা প্রচুর হাততালি এবং চিৎকারের মধ্যে প্রাইজ নিতে যাচ্ছে। রোটারি গভর্নরের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার সময় ফ্ল্যাশ বাল্বে তাদের ফোটো তোলা হচ্ছে।

একসময় হীরকেরও ডাক এল। কারুকার্য-করা কাশ্মিরি কাঠের বাক্সে নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর বিরাট ট্রফি নিয়ে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল হীরক। ট্রফিটা কলির হাতে দিয়ে বলল, 'দেখো—' তারপর সুজয়ার দিকে অল্প ঝুঁকে বলল, 'একটা কথা বলব—'

সুজয়া একটু কাত হয়ে বসে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'আমি যে ট্রফি পেলাম এতে আমার ক্রেডিট নেই।'

অবাক হয়ে সুজয়া জিগ্যেস করল, 'তা হলে কার ক্রেডিট?'

তক্ষুনি উত্তর দিল না হীরক। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার।'

'আমার? তার মানে?'

'আপনি এসেছেন। সেই জন্যে আমি ইনস্পায়ার্ড হয়েছিলাম। তা না হলে ড্যানিয়েলের এগেনস্টে আমার পক্ষে জেতা একেবারেই সম্ভব ছিল না।'

রক্তের মধ্যে ঢেউয়ের মতো কিছু একটা খেলে গেল সুজয়ার। ছোট কাকিমা বলেছিলেন, সুযোগ পেলে হীরক সাহসী হয়ে উঠবে। দেখা যাচ্ছে ছোট কাকিমা ছেলেদের চরিত্র তার চাইতে

অনেক ভালো বোঝেন। সুজয়া খুব আস্তে করে বলল, 'আমি যে কাউকে ইনস্পায়ার করতে পারি, জানতাম না।' বলে হাসল।

ঘড়ির কাঁটায় যখন সাড়ে চারটে, সেই সময় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শেষ হল। তারপর পাঁচ মিনিটের ভেতর ড্রেসিং রুম থেকে পোশাক বদলে ঝকঝকে ফিটফাট হয়ে হীরক সুজয়াদের নিয়ে তার নতুন মডেলের ইমপোর্টেড ফিয়েটে উঠল। সামনের সিটে কলি আর সে বসেছে; পেছনের সিটে সুজয়া এবং মণিমোহন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে তারা সল্টলেকে পৌঁছে গেল।

পাঁচ

এখনও সন্ধে নামেনি। পশ্চিম দিকে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে গাছপালা, বাড়িঘরের অস্পষ্ট বর্ডারের কাছে নেমে গেছে ঠিক সেইখানে শেষ আশ্বিনের সূর্য একটা ফ্রিজ শটের মতো আটকে আছে। রোদের রং অনেক আগেই মরে এসেছিল; এখন বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে।

জানলার বাইরে তাকিয়ে সুজয়া আর মণিমোহন সল্টলেকের চওড়া-চওড়া পরিচ্ছন্ন রাস্তা, নতুন নতুন আর্কিটেকচারের বাড়িটাড়ি দেখছিলেন। মণিমোহন বললেন, 'বাঃ, জায়গাটা তো ভারি সুন্দর; খুব প্ল্যানড মনে হচ্ছে। কলকাতা বলে মনেই হয় না।'

হীরক মাঝামাঝি স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল। উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, এটা একটা প্ল্যানড টাউনশিপ। হ্যাপ-হ্যাজার্ড গ্রোথ নয় বলেই এত ভালো লাগছে।'

'ডাঃ রায় বোধ হয় এখানেই নিউ ক্যালকাটা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন!'

'হ্যাঁ। এর সবটাই তাঁর ড্রিম প্রোজেক্ট।'

কথায়-কথায় একটা চমৎকার দোতলা বাড়ির সামেন এসে হর্ন দিল হীরক। বাড়িটার আর্কিটেকচার থেকে শুরু করে বাউন্ডারি-ওয়াল পর্যন্ত সব কিছুই মডার্ন ইউরোপিয়ান আর্কিটেকচারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

গাড়ির শব্দে একটা ধবধবে উর্দিপরা নেপালি দরোয়ান নানা রংয়ের এবং নকশার গ্রিল-লাগানো গেট খুলে দিল। গাড়িটা ভেতরে নিয়ে একটা সুন্দর ফুলবাগানের পাশে পার্ক করল হীরক। তারপর তাড়াতাড়ি নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

মণিমোহনরা নেমে এসে সবাইকে নিয়ে প্রকাণ্ড কাচের দরজা পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

বাড়িতে ঢুকলেই প্যারাবোলার আকারে বিশাল ড্রইংরুম। ডিসটেমপার-করা দেওয়ালে মডার্ন ইমপ্রেসনিস্ট আর্টিস্টদের আঁকা নানা ধরনের ছবি। এক কোণে টিভি সেট, আরেক কোণে প্রকাণ্ড অ্যাকোয়েরিয়ামে লাল-নীল মাছেদের খেলা। আরেক ধারে ছ'ইঞ্চি পুরু কাশ্মিরি কার্পেটের ওপর নাম করা ক্যাবিনেট মেকারের তৈরি সোফা, সেন্টার টেবল, ডিভান ইত্যাদি-ইত্যাদি। ড্রইংরুমের মাঝখান দিয়ে মোজেক করা ট্রাঙ্গুলার পিলার উঠে গেছে ওপরে। একধারে দোতলায় যাওয়ার ফ্যাশনেবল সিঁড়ি। চারিদিকে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে নানা চেহারার দুষ্প্রাপ্য সব অর্কিড।

হীরক নীচে থেকেই চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'মা মা, কারা এসেছেন—'

একটু পরেই দোতলায় সিঁড়ির মুখে যিনি এসে দাঁড়ালেন হঠাৎ দেখলে তাঁকে তরুণী মনে হয়। তবে একটু লক্ষ করলে টের পাওয়া যাবে তিনি মধ্যবয়সিনী। গায়ের রং ফরসা নয়, শ্যামবর্ণ। মহিলাটির মুখ লম্বাটে, পাতলা নাক, ভরাট গলা, সরু চিবুক, প্রতিমার মতো বড়-বড় এবং টানা

চোখ। কোঁচকানো-কোঁচকানো চুলের ঢল নেমে গেছে পিঠময়। সিঁথির দু-ধারে দু-চারটে রুপোর তার ছাড়া বাদবাকি সব চুলই তাঁর কালো কুচকুচে। শরীরে চর্বি জমেনি, মেদহীন নির্ভার চেহারা। পরনে সাদা জমির নকশা-পাড় টাঙ্গাইল শাড়ি, সাদা গরদের ব্লাউজ, হাতে ক'গাছি সোনার চুড়ি, নাকে হিরের নাকফুল, কানে মুক্তোর দুল। সব মিলিয়ে তাঁকে প্রায় অলৌকিক মনে হচ্ছে।

মহিলাটি এসে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই তাঁর পাশে একজন সুদর্শন প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন। নাক মুখ কাটা-কাটা, ধারালো, চিবুক, চুল পাতলা হয়ে এসেছে। মহিলার মতোই ভদ্রলোকের শরীরে বয়সের তেমন ভার পড়েনি। তাঁর পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি।

হীরক বলল, 'এঁদের কথাই তোমাদের বলেছিলাম।'

'ও আচ্ছা, কী সৌভাগ্য আমাদের।' বলতে-বলতে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দোতলা থেকে মধ্যবয়সি পুরুষ এবং মহিলাটি নেমে আসতে লাগলেন।

হীরক ততক্ষণে মণিমোহনদের দিকে ফিরে জানিয়ে দিয়েছে, 'আমার মা আর বাবা—'

নীচে এসে হীরকের বাবা দু-হাত জোড় করে বললেন, 'নমস্কার। আমি শিবনাথ মুখার্জি, ইনি আমার স্ত্রী প্রতিমা। আপনারা আসাতে খুব খুশি হয়েছি।'

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মণিমোহন নিজেদের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে শিবনাথ বললেন, 'আপনাদের না দেখলেও হীরকের মুখে এত শুনেছি যে পরিচয় জানা হয়ে গেছে। আসুন কর্নেল বোস, এসো সুজয়া, ওখানে বসা যাক।' যেতে-যেতে কলির কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রেখে বললেন, 'একে কিন্তু চিনতে পারলাম না।'

মণিমোহন বললেন, 'এ আমার ভাইঝি—কলি।'

ড্রইংরুমে এসে সবাই বসল। হীরকের মা প্রতিমা সুজয়াকে নিজের পাশে বসালেন। এবার শিবনাথ বললেন, 'জানেন কর্নেল বোস, অন্যদিন এসময় আমি বাড়ি থাকি না। সকালে বেরিয়ে যাই, ফিরতে-ফিরতে রাত হয়ে যায়। আপনারা আসবেন বলে আজ দুপুরেই ফিরে এসেছি। অ্যান্ড উই ওয়ার ওয়েটিং ভেরি ইগারলি টু মিট ইউ—'

'ধন্যবাদ।'

প্রতিমা বললেন, 'হীরক বম্বে থেকে ফেরার পর সবসময় আপনাদেব কথা বলছে।'

সস্নেহে মণিমোহন একবার হীরকের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'মা-বাবাকে তোমার প্রাইজ দেখালে না?' বলেই শিবনাথের দিকে ফিরলেন, 'জানেন মিস্টার মুখার্জি, হীরক আজ রোয়িং-এ ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে।'

শিবনাথ বললেন, 'দিনরাত স্পোর্টস আর শিকার, এই নিয়েই আছে। স্পোর্টসের যে-ইভেন্টে নাম দেয় একটা না একটা ট্রফি নিয়েই আসে।'

প্রতিমা বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে কত কাপ, মেডেল আর শিল্ড যে পেয়েছে তার হিসেব নেই।'

সুজয়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। তার মনে হল হীরকের ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়াটা এ-বাড়িতে কোনও উত্তেজক বা চমকপ্রদ ঘটনাই নয়। স্পোর্টসে নাম দিলে ট্রফি পাবে, এটাই যেন নিয়ম।

ট্রফি এবং প্রাইজের টাকা ভুলে গাড়িতে ফেলে এসেছিল হীরক। দৌড়ে গিয়ে সেগুলো নিয়ে এল। শিবনাথ আর প্রতিমা সেসব হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে একটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

এরপর নানারকম এলোমেলো গল্প শুরু হল। পলিটিকস, সিনেমা, থিয়েটার, লিটারেচার, ক্যালকাটার ভেভলাপমেন্ট, পশ্চিম বাংলার নতুন জেনারেশন, ইত্যাদি পপুলার সব বিষয়ের পর পারিবারিক প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

মণিমোহনের কথা মোটামুটি সবই প্রায় হীরকের কাছে শুনেছেন শিবনাথ। নিজেদের সম্বন্ধেও বললেন।

শিবনাথ নিজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। গরিব মিডল-ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে ছিলেন, অনেক কষ্টে লেখাপড়া করেছেন। ভেবেছিলেন কোনওদিন চাকরি-বাকরি করবেন না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার সময় থেকেই তাঁর ইচ্ছা নিজের হাতে কারখানা করবেন। নতুন-নতুন প্রোডাক্ট বেরুবে তাঁর ফ্যাক্টরি থেকে। কিন্তু প্রথম দিকে সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। প্রথমত কারখানা খোলার ক্যাপিটাল ছিল না। তার ওপর গরিব সংসারের দায়দায়িত্ব। চাকরি তাঁকে নিতেই হয়েছিল।

বছর পনেরো-কুড়ি চাকরির পর দায়দায়িত্ব আর ছিল না। এদিকে প্রভিডেন্ট ফান্ডে কিছু টাকাও জমে গেছে। তাঁর মধ্যে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ছিল। একদিন দুম করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে হাওড়ায় ছোটখাটো একটা শেড ভাড়া করে ইলেকট্রিক্যাল গুডসের কারখানা খুললেন। তখন তিনি বিবাহিত। দুটি ছেলেও হয়ে গেছে।

সেই যে কারখানা খোলা হল, তারপর আর পেছন ফিরে তাকাননি। দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই—সর্বক্ষণ ওই কারখানা তাঁর ঘাড়ে চেপে রইল। একনাগাড়ে কয়েক বছর 'অনেস্ট লেবারের' ফলও তিনি পেয়েছেন। তাঁর প্রোডাক্টের ডিমান্ড বেড়েছে। ফলে কারখানাও বড় হয়েছে। হাওড়ায়, সালকিয়ার ওধারে প্রচুর জমি কিনে ফ্যাক্টরি বসিয়েছেন তিনি। প্রতি বছর কারখানার এক্সটেনশান হচ্ছে। ডাইভার্সিফিকেশনের প্রোগ্রামও নিয়েছেন। ফলে তারাতলার কাছে আরও ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লট কিনেছেন। ওখানে আরেকটা ফ্যাক্টরি খুলবেন। এখন সেখানে কারখানার শেড এবং অফিস বিল্ডিং বানানো হচ্ছে।

তিনি বছর হল, ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সল্টলেকে নতুন বাড়ি করে উঠে এসেছেন। দুই ছেলে শিবনাথের। হীরক আর সুদীপ। সুদীপ বড়, হীরক ছোট। দুজনকেই তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার করেছেন। বড় ছেলেকে বিদেশি একটা ডিগ্রির জন্য কানাডায় পাঠিয়েছেন। তিন বছরের একটা কোর্স শেষ করে আসছে মাসে সে দেশে ফিরবে। সুদীপের বিয়ের সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন শিবনাথ। তাঁরই এক বন্ধুর মেয়ে; পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম.এ পাস করে এখন একটা কলেজে লেকচারার।

শিবনাথ আর ক'বছরই বা বাঁচবেন! অশেষ পরিশ্রমে তিনি যে কারখানা করেছেন, তাঁর ইচ্ছা দুই ছেলেকে সেখানে বসিয়ে যাবেন। সুদীপ সম্পর্কে তাঁর দুর্ভাবনা নেই। খুব প্র্যাকটিক্যাল সে; তাছাড়া নিজের হাতে কিছু একটা করার ঝোঁকও তার আছে, অনেকটা তাঁরই স্বভাব পেয়েছে। কিন্তু হীরক সম্পর্কে শিবনাথ রীতিমতো চিন্তিত। যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে তবু ফ্যাক্টরিতে যেতে চায় না। সারা বছর কোথায় রোয়িং, কোথায় মোটর র‍্যালি, কোথায় কোন জঙ্গলে শিকার—এই করে বেড়াচ্ছে। নিজেদের জিনিস নিজেরা বুঝে না নিলে চলে!

শিবনাথ বললেন, 'আমি হীরকের সম্বন্ধে হোপলেস হয়ে পড়েছি।'

সুজয়া লক্ষ করল, শিবনাথ তার বাবা মণিমোহনের মতোই খোলামেলা, সহজ মানুষ। নইলে একদিনের আলাপে নিজের ফ্যামিলি বা ছেলেদের সম্পর্কে এভাবে এত অকপটে কেউ বলতে পারে না। ভদ্রলোককে তার বেশ ভালো লাগল।

প্রতিমা মণিমোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিই বলুন কর্নেল বোস, হীরক সম্পর্কে সবসময় ইনি যে ওইরকম বলেন—এটা কি ভালো? ওর আর কত বয়স? সামনে অনেক সময় পড়ে রয়েছে। ফ্যাক্টরিতে না বসে যাবে কোথায়?'

শিবনাথ বললেন, ' ছেলেকে আর কতদিন ছেলেমানুষ করে রাখবে? ওর বয়েসে মা-বাবা-ভাইবোন, গোটা ফ্যামিলির দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে।'

'সবার ভাগ্য তো এক নয়।'

'ঠিক আছে, যতদিন পারো ছেলেকে ছোট করেই রাখো।'

আসলে হীরককে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে খুনসুটি চলছিল সেটা এক ধরনের খেলা। দুজনেই

যে ছেলেকে দারুণ ভালোবাসেন তা টের পাওয়া যাচ্ছিল। মণিমোহন ওঁদের কথা শুনে হাসছিলেন। সুজয়ারও বেশ মজা লাগছিল। তবে সে হাসছিল না; মাঝে-মাঝেই তার চোখে পড়ছিল হীরক তাঁর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসছে।

কথাবার্তার ফাঁকে একসময় উঠে গেলেন প্রতিমা। কিছুক্ষণ বাদে একটা চাকরকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তার হাতে প্রকাণ্ড ট্রেতে খাবারের স্তূপ, কাপ-টিপট-সুগার বোল ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের হাতে প্লেটে-প্লেটে কেক, প্যাস্ট্রি, সন্দেশ, কাজু বাদাম, কাটলেট সাজিয়ে সবাইকে দিলেন প্রতিমা। তারপর কাপে-কাপে চা ঢেলে দিলেন।

চা খাওয়া হয়ে গেলে প্রতিমা সুজয়া আর কলিকে বললেন, 'বুড়ো মানুষদের মধ্যে বসে থাকতে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না। যাও না, আমাদের বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখে এসো।' হীরককে বললেন, 'যা, ওদের দেখিয়ে দে।'

সুজয়া ইতস্তত করছিল। মণিমোহন বললেন, 'যা না, দেখে আয়। আমরা ততক্ষণ গল্পটল্প করি।'

সুজয়া আর কলি উঠে পড়ল। হীরকের সঙ্গে যেতে-যেতে শুনল শিবনাথ মণিমোহনকে বলছেন, 'এত দিন পর কলকাতায় এসে কেমন লাগছে?'

মণিমোহন বললেন, 'ফাইন।'

তাঁদের আর কোনও কথা শোনা গেল না। হীরক সুজয়াদের নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

একতলায় ড্রইংরুম ছাড়া আরও চারখানা ঘর রয়েছে। এ ছাড়া কিচেন, বাথরুম, ডাইনিং স্পেস। সবগুলো ঘরই ওয়েল-ফারনিশড, ফ্যাশনেবল আসবাব আর পরদা দিয়ে সাজানো।

একতলা থেকে দোতলায় উঠে এল ওরা। এখানেও অনেকগুলো ঘর। সামনের দিকে বিশাল ব্যালকনি। হীরক জানাল তিনটে ঘর মা-বাবা এবং তাদের দুই ভাইয়ের জন্য। একটা ঘরে বিশাল লাইব্রেরি। একটা ঘরে এস্রাজ-সরোদ-সেতার থেকে শুরু করে অন্যান্য ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। এছাড়া টেপ-রেকর্ডার, রেডিওগ্রাম, স্টিরিও, রেকর্ড রাখার স্ট্যান্ড। একধারে গান-বাজনার জন্য রেশমি চাদরে মোড়া ফরাস; চাদরের পাশে ঝালর বসানো। দেওয়ালে বড়ে গোলাম আলি থেকে সুচিত্রা মিত্র পর্যন্ত অনেকের ছবি চমৎকার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে এসে সুজয়া জিগ্যেস করল, 'আপনাদের বাড়িতে খুব গানবাজনা হয় বুঝি?'

হীরক বলল, 'একেবারেই না। ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ি; মিউজিকের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

'তা হলে এত মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট?' রীতিমতো অবাকই হল সুজয়া।

হীরক ঠোঁট কামড়ে হাসতে লাগল; উত্তর দিল না।

সুজয়া জিগ্যেস করল, 'হাসছেন যে?'

'ওসব বাবার খেয়াল।'

হীরকের জবাবটা ঠিক পছন্দ হল না সুজয়ার। কিন্তু এ-সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাওয়া শোভন হবে না ভেবে চুপ করে রইল।

হীরক হয়তো সুজয়ার মনোভাব কিছুটা বুঝে থাকবে। এবার হাসতে-হাসতেই সে বলল, 'বাবার ধারণা তাঁর পুত্রবধূরা একেকজন লতা মঙ্গেশকর, কি হীরাবাঈ বরোদেকারের গলা নিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকবে। তাই অ্যাডভান্স সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখেছেন।'

সুজয়া হেসে ফেলল।

গান-বাজনার ঘর থেকে হীরক এবার সুজয়াদের আরেকটা ঘরে নিয়ে এল। গোটা ঘরখানার দেওয়ালে কাচের আলমারি সেট করা; আলমারিগুলো অগুনতি কাপ-মেডেল-শিল্ড এবং আরও নানারকম ট্রফিতে বোঝাই। দেওয়ালে হীরকের নানা বয়েসের এবং ভঙ্গির অসংখ্য ছবি। বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টে তার অ্যাকশানের কিছু-কিছু ফোটোও চোখে পড়ছে। ছেলেবেলা থেকে কত ট্রফি

যে সে জিতেছে তার হিসেব নেই। এ-ঘরের চারটে দেওয়াল জুড়ে স্পোর্টসম্যান হীরক তার উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে সুখী বিজয়ী রাজপুত্রের মতো গর্বিত ভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে।

অবাক বিস্ময়ে কলি বলল, 'এত কাপ মেডেল আপনি পেয়েছেন!'

ঠিক এই কথাগুলোই বলবে ভেবেছিল সুজয়া। কলি বলে তাকে বাঁচিয়েছে। তার স্বভাবে এত উচ্ছ্বাস থাকতে নেই। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললে সে লজ্জা পেত। তবে এটা ঠিক, আজ দুপুরে লেকে আসার পর থেকে সুজয়া হীরককে যত দেখছে ততই এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করছিল।

হীরক কলির কথায় উত্তর না দিয়ে হাসছিল। কলি আবার জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা হীরকদা, আপনি স্পোর্টসে যতবার নাম দিয়েছেন ততবার ফার্স্ট হয়েছেন?'

'বেশির ভাগই ফার্স্ট হয়েছি। নইলে সেকেন্ড বা থার্ড। তবে যাতেই নাম দিয়েছি ট্রফি না নিয়ে ফিরিনি।' বলতে-বলতে চোখের কোণ দিয়ে সুজয়াকে লক্ষ করল হীরক।

কলি বলল, 'আপনি একেবারে হীরো।'

কথা বলতে-বলতে ওরা আরেকটা ঘরে চলে এল। এখানে দেওয়াল আর মেঝে জুড়ে বাঘের চামড়া, হরিণের শিং, বাইসনের মাথা, শজারুর কাঁটা ইত্যাদি ডাঁই হয়ে আছে।

কলি এর মধ্যেই হীরকের ফ্যান হয়ে পড়েছে। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি এত বাঘ-বাইসন হরিণ মেরেছেন!'

হীরক হাসল। তার চোখ কিন্তু কলির দিকে নয়; সুজয়ার দিকে। সে লক্ষ করল, অবাক হয়ে হিংস্র পশুদের মৃতদেহ দেখছে সুজয়া।

কলি আবার বলল, 'আচ্ছা হীরকদা, শিকার করবার জন্যে আপনাকে জঙ্গলে যেতে হয়?'

হীরক বলল, 'তা হলে কি তোমার ধারণা বাঘ-ভালুকেরা 'কিউ' দিয়ে হাতজোড় করে সামনের রাস্তায় এসে বসে; আর দোতলা থেকে আমি পটাপট গুলি করে তাদের মারি!'

বোকা ধরনের একটা প্রশ্ন করার জন্য কলি লজ্জা পেল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'আপনার ভীষণ সাহস।'

কলির দিকে একটু ঝুঁকে হীরক মজা করে বলল, 'তাই নাকি!'

কলি এবার বলল, 'আমাদের শিকার দেখতে নিয়ে যাবেন?'

হীরক বলল, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কিন্তু বাড়ি থেকে তোমাকে তো একলা ছাড়বে না।'

'আমি জেঠামণি আর দিদিভাইকে ম্যানেজ করে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

সুজয়া লক্ষ করল, হীরকের চোখমুখ খুশিতে চকচক করছে। সে বলল, 'তা হলে খুবই ভালো হয়। শিকারটা দারুণ এনজয় করা যাবে।' বলেই সে সুজয়ার চোখের দিকে তাকাল। প্রায় অনুনয়ের গলায় বলল, 'আপনি যাবেন তো?'

সুজয়া বলল, 'দেখি।'

কলি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি ভাববেন না হীরকদা; দিদিভাইকে আমি ঠিক নিয়ে যাব। আপনি প্রোগ্রামটা করে ফেলুন।'

কলি সরলভাবেই কথাটা বলেছে। তবু হীরকের মুখ দেখে মনে হল সে কলির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। আলতো করে সস্নেহে তার কাঁধে একটা হাত রেখে হীরক বলল, 'চল, ছাদে যাই।'

হীরকদের ছাদটা চমৎকার। সেখানে নানা আকারের টব সাজিয়ে এবং কোথাও মাটি ফেলে সুন্দর একখানা রুফ গার্ডেন করা হয়েছে। মাঝখানে কাচের গোল একটা ঘর; একধারে দেওয়াল ঘেঁষে টিভি অ্যানটেনা।

রুফ গার্ডেনে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সুজয়াদের নানারকম দুর্লভ বিদেশি ফুল দেখাল হীরক। তারপর দেওয়ালের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

এখন সন্ধে নামতে শুরু করেছে। লাটাইতে সুতো গুটনোর মতো কেউ যেন খুব দ্রুত দিনের

শেষ আলোটুকু টেনে নিচ্ছিল। কালো জমির জামদানি শাড়ির মতো শেষ আশ্বিনের সন্ধে চারিদিক মুড়ে দিতে শুরু করেছে।

অন্ধকার গাঢ় নয়; তাই অনেকটা দূর পর্যন্ত এখনও দেখা যায়। হীরকদের এই ছাদ থেকে যেদিকে চোখ যায় নিউ ক্যালকাটার মনোরম ল্যান্ডস্কেপ। চওড়া-চওড়া সটান রাস্তাগুলোতে এখন টিউবলাইট জ্বলে উঠেছে! ঝলমলে আলো, সুন্দর-সুন্দর সব বাড়ি, ঝাউগাছের বেষ্টনি, গর্ভনমেন্ট হাইসিং কলোনির সারিবদ্ধ মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং—সব মিলিয়ে সন্ধের সল্টলেক যেন কোনও এক অলৌকিক নগর।

পুব থেকে, পশ্চিম থেকে, উত্তর থেকে এবং দক্ষিণ থেকেও এখন শরতের সুখদায়ক ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। উলটোপালটা বাতাসে সুজয়া আর কলির চুল উড়ছিল।

কলি বলল, 'আপনাদের এই ছাদ থেকে চারপাশের ভিউটা ফাইন।'

হীরক বলল, 'পূর্ণিমার রাতে যদি আসো আরও ভালো লাগবে।'

'আসব কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই।'

কলি এবার সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওদিকে কী আছে?'

হীরক বলল, 'ওটা পুবদিক। ওই যে বড় বাড়িটা দেখছ ওটা ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চের বাড়ি।'

'আর এ দিকটা?'

'এটা উত্তর দিক। আর ওই বড় রাস্তাটা ভি আই পি রোড; ওটা সোজা এয়ার পোর্টে চলে গেছে। তার ওপারে বাঙ্গুর, লেক টাউন।'

আরেক দিকে আঙুল বাড়িয়ে কলি এবার জিগ্যেস করল, 'ওধারটা কোন দিক?'

'ওটা নর্থ ওয়েস্ট। ওখানে ভি আই পি রোড টার্ন নিয়ে মানিকতলায় চলে গেছে। টার্নের ওপাশে উলটোডাঙা—'

হীরকের কথা শেষ হতে-না-হতেই আচমকা মৃণালের মুখ মনে পড়ে গেল সুজয়ার। সে শুনেছে মৃণাল উলটোডাঙাতে থাকে। বুধবার মৃণাল ঢাকুরিয়া গিয়েছিল। তারপর ক'টা দিন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি এত ছোটাছুটি করতে হয়েছে যে সেই ঠাসা প্রোগ্রামের মধ্যে মৃণালের কথা ভাবার সময় একেবারেই পায়নি। দ্রুত হীরকের দিকে ফিরে সুজয়া নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিগ্যেস করল, 'মৃণালবাবু উলটোডাঙাতে থাকেন না?'

হীরক সুজয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'হ্যাঁ, ভি আই পি রোডের টার্নিং-এর কাছে রেল স্টেশন; সেখান থেকে খানিকটা গেলেই ওদের বাড়ি।'

'মৃণালবাবু আমার রিসার্চের ব্যাপারে কিছু করলেন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। সেই বুধবার আমার সঙ্গে আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল। তারপর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে—'

'কী?'

'মৃণাল যখন কথা দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে।'

এক পলক কী ভাবল সুজয়া। তারপর দ্বিধান্বিতের মতো বলল, 'একটা কাজ করলে হয় না—'

হীরক খুব আগ্রহের গলায় বলল, 'কী, বলুন না—'

'আমরা যখন ফিরব তখন একবার মৃণালবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে চাইছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

'নট দি লিস্ট।'

আরও কিছুক্ষণ পর অন্ধকার গভীর হলে সুজয়ারা নীচে নেমে দেখল মণিমোহনরা জমিয়ে

গল্প করছেন। সে বলল, 'রাত হয়ে গেল; বাবা এবার উঠবে তো?'

মণিমোহন এতক্ষণে যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। বললেন,'আরে তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার উঠতে হবে।' শিবনাথদের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনারা পারমিশান দিন, আজ চলি।'

শিবনাথ বললেন, 'এমন কিছু রাত হয়নি। আরেকটু থাকুন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল; অনেক কিছু জানতে পারছিলাম।'

মণিমোহন মেয়ের দিকে তাকালেন। খানিকটা ইতস্তত করে সুজয়া বলল, 'আমরা আরেক জায়গা হয়ে যাব—'

শিবনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কোন জায়গা হয়ে যাবে?'

'মৃণালবাবুর বাড়ি—'

শিবনাথ আবার কিছু জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হীরক বলে উঠল, 'আমার বন্ধু মৃণাল।'

শিবনাথ সুজয়াকে বললেন, 'মৃণালের সঙ্গে তোমাদের তা হলে আলাপ হয়েছে?'

সুজয়া মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'হি ইজ জেম অফ আ বয়। এমন নিষ্পাপ সরল ভালো ছেলে আমি আর দেখিনি। তবে মৃণালটা বড্ড বেশি ভোগে।' বলে হীরকের দিকে তাকালেন শিবনাথ, 'কেমন আছে মৃণাল?'

'আমার সঙ্গে এর ভেতর দেখা হয়নি; বলতে পারছি না।'

'কেমন বন্ধু! দেখা করিস না কেন? অনেকদিন ছেলেটাকে দেখি না; আসতে বলিস।'

হীরক ঘাড় কাত করল, 'আচ্ছা—'

শিবনাথ এবার মণিমোহনকে বললেন, 'আপনারা যখন মৃণালের ওখানে যাবেন তখন আটকাব না। তবে মাঝে-মাঝে আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

'পায়ের ধুলো কি বলছেন? নিশ্চয়ই আসব। অ্যান্ড উইদ প্লেজার। আপনারাও আমাদের বাড়ি আসবেন। কবে আসছেন বলুন—'

'যত তাড়াতাড়ি পারি যাব। যাওয়ার আগে খবর দেব।'

মণিমোহন উঠে পড়েছিলেন। শিবনাথ হীরককে বললেন, 'যাও, এঁদের পৌঁছে দিয়ে এসো।'

কথা বলতে-বলতে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই ফিয়েটটা লনের কাছে পার্ক করা ছিল। শিবনাথ নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। মণিমোহনরা উঠে পড়লেন; হীরক ড্রাইভারের জায়গায় গিয়ে বসল। তার পাশে কলি। তখনকার মতো এবারও মণিমোহন আর সুজয়া ব্যাক সিটে বসেছে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মণিমোহন বললেন, 'ইট'স আ নাইস মিটিং। এই সন্ধেটার কথা আমার মনে থাকবে।'

'আমাদেরও।' শিবনাথ এবং প্রতিমা একইসঙ্গে বলে উঠলেন।

'আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

হীরক স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে এল।

ছয়

সল্টলেকে যে পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে নতুন কলকাতা পাতাবাহারের রঙিন পাতার মতো ফুটে আছে, উলটোডাঙাতে এলে তার বিপরীত ছবিটাই চোখে পড়ে। যদিও রাস্তাঘাট ভেঙেচুরে এখানে চওড়া

করা হচ্ছে, হাউসিং স্কিমের প্রচুর বাড়ি-টাড়ি উঠেছে, তবু চারিদিক অত্যন্ত নোংরা, এখানে-ওখানে স্তূপাকার আবর্জনা, দুর্গন্ধ। খোলা কাঁচা নর্দমাগুলো যেন মশাদের মেটার্নিটি হোম; ঘণ্টায় সেখানে লাখখানেক করে মশা জন্মাচ্ছে। আর আছে দগদগে ঘায়ের মতো বস্তি।

এই পরিবেশে মৃণালদের পুরোনো আমলের ছোট্ট দোতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। নোনা-লাগা দেওয়ালের গা থেকে কবেই প্লাস্টার খসে গেছে; ছাদের কার্নিসের কাছে অশ্বত্থের চারারা শেকড় চালিয়ে-চালিয়ে বাড়িটার আয়ু কয়েক বছর কমিয়ে এনেছে। সামনের দিকে রাস্তায় গা ঘেঁষা বাউন্ডারি ওয়াল; সদর দরজাটা হাট করে খোলা।

গাড়ি থেকে প্রথমে নামল হীরক। বলল, 'আপনারা এখানে বসুন। মৃণালকে ডেকে আনছি।'

সুজয়া হীরকের মনোভাব বুঝতে পারছিল। এই নোংরা ভাঙাচোরা বাড়িতে তাদের অস্বস্তি হতে পারে, খুব সম্ভব এটাই হীরক ভেবে থাকবে। সুজয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল; তার আগেই মণিমোহন বললেন, 'না-না, এখানে বসব কি, ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে ভেতরে ঢুকব না, তাই কখনও হয়? চলো, আমরাও যাচ্ছি।' দরজা খুলে মণিমোহন, সুজয়া আর কলি নেমে পড়ল।

হীরকের সঙ্গে ভেতরে আসতেই সুজয়ারা দেখতে পেল, একতলায় আলো জ্বলছে। আট থেকে চোদ্দো-পনেরো বছরের একগাদা ছেলে হইচই আর ছোটাছুটি করে কিছু একটা খেলছিল। হীরককে দেখে তারা দারুণ খুশি। খেলা নামিয়ে সবাই প্রায় কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'হীরককাকু এসেছে, হীরককাকু এসেছে।' পরক্ষণেই হীরকের পেছনে ক'জন অচেনা নতুন মানুষ দেখে চুপ করে গেল।

হীরক জিগ্যেস করল, 'মৃণাল আছে রে?'

সবাই একই সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ। ওপরে—'

বোঝা যাচ্ছিল হীরককে ওরা চেনে এবং পছন্দ করে। দুটো ছেলে এর মধ্যে দুদ্দাড় করে দোতলায় সিঁড়ির দিকে দৌড় লাগিয়েছিল, খুব সম্ভব মৃণালকে খবর দিতে। তাদের থামিয়ে হীরক বলল, 'তোদের যেতে হবে না; আমরাই যাচ্ছি। আর শোন, এঁরা এসেছেন। এখন একদম বদমাইশি করবি না, চেঁচাবি না। ওকে?'

সবাই ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'আচ্ছা।'

দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে হীরক বলল, 'এরাই হচ্ছে মৃণালের ফ্যামিলি মেম্বার।' একটু থেমে বলল, 'চারপাশের বস্তির ছেলে সব; এখানেই থাকে।'

মণিমোহন বললেন, 'সেদিন তুমি এদের কথা বলছিলে—'

হীরকদের পেছন-পেছন তিন-চারটি ছেলেও পা টিপে-টিপে আসছিল। আচমকা তাদের দিকে চোখ পড়তে হীরক একটু থেমে বলল, 'কী রে, কিছু বলবি?'

'একটা ছেলে মাথা নাড়ল, 'হুঁ—'

'কী?'

ইশারায় ছেলেটা হীরককে কাছে ডাকল; সে তার কানে-কানে ফিসফিসিয়ে কিছু বলল। হীরকের চাপা গলা আবছাভাবে শোনা গেল, 'না, আজ আনতে ভুলে গেছি। কাল যখন আসব তখন নিয়ে আসব।' ছেলে দুটো হতাশ চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে চলে গেল।

দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে মণিমোহন জিগ্যেস করলেন, 'ওরা তোমাকে কী বলছিল?'

হীরক যা জানাল, সংক্ষেপে এইরকম। যখনই সে এ-বাড়ি আসে, ছেলেদের জন্য কিছু না কিছু আনে। বিস্কুট, টফি, লজেন্স, চকোলেট, চানাচুর—এই সব আর কি। আজ আনার কথা মনে ছিল না। ছেলেগুলোর সঙ্গে একটু আগে এই ব্যাপারেই তার কথা হচ্ছিল।

মণিমোহন হাসতে-হাসতে বললেন, 'তোমার পপুলারিটির কারণটা বোঝা গেল।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা দোতলায় একটা বড় ঘরের সামনে চলে এল। ভেতরে আলো জ্বলছিল।

দেখা গেল, একধারে পুরোনো আমলের একটা খাটে ঝুঁকে কী যেন কাটাকুটি করছে মৃণাল । তার পরনে আধময়লা লুঙ্গি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি। অনেকগুলো পায়ের শব্দে চমকে দরজার দিকে মুখ তুলেই অবাক হয়ে গেল মৃণাল। তারপর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল। বলল, 'আসুন, আসুন।'

সুজয়ারা ততক্ষণে হীরকের সঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

মৃণাল বলল, 'আপনারা আসবেন, এ আমি ভাবতেও পারিনি।'

মণিমোহন বললেন, 'তুমি যখন আর আমাদের ওখানে গেলেই না, ফোনও করলে না, তখন চলেই এলাম।'

'খুব খুশি হয়েছি। বসুন, বসুন—' বলতে-বলতে বিব্রতভাবে ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল মৃণাল।

গোটা ঘরখানা একেবারে অগোছালো, এলোমেলো। একধারে বার্নিশ-চটা ছত্রিভাঙা প্রকাণ্ড খাট, দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সারি-সারি বইয়ের আলমারি, আলমারিগুলোর একটা পাল্লাও আস্ত নেই। খাটের কাছাকাছি গোটাকতক সোফা, সেগুলোতেও ঢাকনা নেই, সব ছিঁড়েখুঁড়ে ভেতরের ছোবড়া আর জং-ধরা স্প্রিং বেরিয়ে পড়েছে। আর আছে খানকয়েক বেতের মোড়া, তাদের অবস্থা ভয়াবহ রকমের খারাপ। দেওয়ালগুলোতে পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে কলি পড়েছে বলে মনে হয় না; সেখানে লাল নীল পেনসিলে কী সব লেখা আছে! একধারে দড়িতে ক'টা ধুতি-পাঞ্জাবি-পাজামা ঝুলছে। খাটের পাশে স্তূপাকার বই, জার্নাল, খবরের কাগজের কাটিং। আরেক পাশে খাতার পাহাড়, খুব সম্ভব ইউনিভার্সিটির কোনও পরীক্ষার খাতা। সেসবের ফাঁকে-ফাঁকে নোংরা চিটচিটে গেঞ্জি, মোজা, এক পাটি স্ট্র্যাপ-ছেঁড়া চপ্পল, চশমার খাপ, ডজনখানেক ডট পেন, এমনি অগুনতি জিনিস। বইয়ের আলমারিগুলোর মাথায় দেখা যাচ্ছে মশারি, বেড-কভার, কম্বল ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে রেকর্ড প্লেয়ার এবং অসংখ্য রেকর্ড। এক কোণে বড় একটা টেবল দেখে মনে হয় ওটা একই সঙ্গে ডাইনিং টেবল এবং স্টোর। ওটার ওপর এঁটো ভাতের থালা থেকে আয়না-চিরুনি, সেভিং বক্স, সোপ কেস, নারকেল তেলের টিন থেকে যাবতীয় জিনিস পাওয়া যাবে।

সুজয়াদের কোথায় কীভাবে বসাবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না মৃণাল। হীরক তাড়াতাড়ি আলমারির মাথা থেকে দুটো কম্বল নামিয়ে সোফাগুলোর ওপর পেতে দিয়ে মণিমোহনদের বলল, 'আপনারা বসুন।' কম্বলের ঢাকনি পড়ায় সোফার স্প্রিংগুলো এবার অন্তত গায়ে ফুটবে না।

সবাই বসে পড়েছিল। মণিমোহন মৃণালকে বললেন, 'তোমাকে প্রথমেই বলে রাখছি আমাদের জন্য একেবারে ব্যস্ত হতে হবে না। বিকেলে আমরা হীরকদের বাড়ি এসেছি। প্রচুর খাওয়াদাওয়া হয়েছে ওখানে। এ-ব্যাপারটা মাথার ভেতর থেকে বার করে দিয়ে বসো, গল্প করা যাক।'

মৃণাল খুঁত-খুঁত করতে লাগল, 'প্রথম দিন আমাদের বাড়ি এলেন—'

তাকে থামিয়ে মণিমোহন বললেন, 'নো ফর্মালিটি—'

মৃণাল অগত্যা চুপচাপ খাটের একধারে বসল।

সুজয়া খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গোটা ঘরটা দেখছিল। ঘর জুড়ে আলমারি, দেওয়ালের তাক, বিছানা—সব জায়গায় বই আর বই। বেশির ভাগই মডার্ন আর অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রির। দামি-দামি দুর্লভ সব গ্রন্থ। লন্ডন আর নিউইয়র্কে যে-বই মাসখানেক আগে বেরিয়েছে, সেগুলোও এ-ঘরে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মিউজিক, লিটারেচার, পুরাতত্ত্ব, আর্ট, ক্রিকেট, ড্রামা, অ্যানথ্রোপোলজি, চেজ—এমনি নানা বিষয়ের জার্নাল বা বইও চোখে পড়ছে। বোঝা যায় বিভিন্ন ব্যাপারে মৃণালের অগাধ কৌতূহল। ঘর সাজাবার জন্য নিশ্চয়ই সে এ-সব কিনে রাখেনি।

ওদিকে হীরক বলছিল, 'তোর সেই লোকটা, মানে নটবর কোথায় রে? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মৃণাল হাসল।

হীরক বলল, 'কী হল, হাসছিস যে!'

মৃণাল এবার বলল, 'সে পরশু চলে গেছে।'

'যাবে তো নিশ্চয়ই। কী-কী হাতিয়ে নিয়ে গেছে?'

'না, মানে—'

হীরক প্রায় ধমকেই উঠল, 'বল, কী-কী নিয়েছে—'

'ট্রানজিস্টর, একটা ঘড়ি আর কিছু টাকাপয়সা—এই তো মনে হচ্ছে।'

'এসব এক্সপেরিমেন্টের কোনও মানে হয়! এই নিয়ে কত লোক তোকে ঠকাল?'

মৃণাল মুখ কাঁচুমাচু করে বসে রইল।

সুজয়া বই দেখতে-দেখতে হীরকদের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। ওদের কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। মণিমোহনও খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার?'

হীরক বলল, 'আর বলবেন না!' তারপর সংক্ষেপে যা জানাল এইরকম। মৃণাল যে-কোনও মানুষকেই বিশ্বাস করে। বাড়িতে যখন রান্নার লোকজন থাকে না তখন রাস্তায় গিয়ে যাকে পায় তাকে ধরে আনে। আর সেই লোকটি তাক বুঝে যা পায় তাই নিয়ে সরে পড়ে। এভাবে কতবার যে মৃণাল ঠকেছে তার হিসেব নেই। ঠকেও তার শিক্ষা হয় না; মানুষকে সে বিশ্বাস করবেই। এই এক্সপেরিমেন্টের কোনও মানে হয়! দিনসাতেক আগে উলটোডাঙা বাজারের কাছ থেকে নটবর নামে একটা মধ্যবয়সি লোককে মৃণাল ধরে এনেছিল। সে-ও আর সবার মতোই তার সব কিছু হাতিয়ে নিয়েই পালিয়েছে।

হীরক বলতে লাগল, 'আচ্ছা বলুন তো, অচেনা লোককে কেউ এভাবে বাড়িতে এনে ঢোকায়!'

মণিমোহন বললেন, 'থানায় ডায়েরি-টায়েরি করেছ?'

মৃণাল কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হীরক বলে উঠল, 'ডায়েরি করবে কার নামে! যাকে বাড়িতে ঢুকিয়েছিল তার দেশ কোথায়, কে-কে আছে তার, আসল নাম নটবরই কিনা—সেসব ও জানে, না জিগ্যেস করেছে? থানায় গেলে লোকটা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে চাইবে না? ও তো হাঁ করে থাকবে।' একটু চুপ করে আবার বলল, 'আগে একবার চুরির পর ওকে থানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ওসি যখন চোর সম্বন্ধে জিগ্যেস করতে লাগল ও একটা কথাও উত্তর দিতে পারল না।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। এসব কেস কেউ এন্টারটেন করে? ওসি দিল ভাগিয়ে।'

মৃণাল কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'ওসব কথা থাক।'

'ঠিক আছে, এসব তোমার ভালো লাগছে না, বুঝতে পারছি। লোক তো ভেগেছে, এখন খাওয়াদাওয়া কী হচ্ছে?'

মৃণাল বলল, 'ওই নীচের ছেলেরা যা রান্না করছে তাই খাচ্ছি।'

হীরক বলল, 'শরীরের তো বারোটা বাজিয়ে এনেছ। দয়া করে যেটুকু এখনও আছে সেটা ফিনিশ করার কি দরকার? যদ্দিন না একটা ভালো লোকজন পাওয়া যাচ্ছে আমাদের বাড়ি চলে আয়। বাবা-মা তোর কথা বলছিলেন। আমি এঁদের ঢাকুরিয়া পৌঁছে দিয়ে তোকে নিয়ে যাব।'

মৃণাল বলল, 'আজ থাক, কাল সকালে একটা লোক আসার কথা আছে। যদি লোক না পাই তোদের বাড়ি যাব। মাসিমা-মেসোমশাইকে বলিস।'

সুজয়া অবাক এবং মুগ্ধ হয়ে মৃণালকে দেখছিল। পৃথিবীতে এমন নিষ্পাপ সরল মানুষ থাকতে পারে, এ যেন ভাবাই যায় না। আরেকটা ব্যাপারও তার ভালো লাগছিল, হীরক সত্যি-সত্যিই মৃণালকে ভালোবাসে। বন্ধুর প্রতি তার টানটা আন্তরিক।

আরও কিছুক্ষণ দুই বন্ধুতে কথাবার্তা চলল। তারপর মণিমোহন মৃণালকে বললেন, 'তোমার কাছে আজ কিন্তু আমরা নিজেদের একটা স্বার্থ নিয়ে এসেছি।'

মৃণাল বলল, 'সুজয়া দেবীর রিসার্চের ব্যাপারে তো?'

'হ্যাঁ।'

'একে স্বার্থ বলছেন কেন? আমার পক্ষে এটা প্লেজার।'

'ধন্যবাদ। কাজ কিছু এগিয়েছে?'

মৃণাল বলল, 'এগিয়েছে। প্রফেসার দত্তর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি, উনি রাজি হয়েছেন।'

মণিমোহন জিগ্যেস করলেন, 'কবে প্রফেসার দত্তর সঙ্গে কথা হল?'

'পরশু।'

'পরশু সব ঠিক করেছ! আমাদের জানাওনি তো?'

'ভেবেছিলাম ফোন করব। তারপর চুরিটুরি হয়ে গেল। তাই—' বলে একটু থামল মৃণাল। কী ভেবে পরক্ষণেই আবার বলল, 'তবে—'

'তবে কী?' মণিমোহন সোজা মৃণালের চোখের দিকে তাকালেন।

'আমার সঙ্গে সুজয়া দেবীকে একবার প্রফেসর দত্তর কাছে যেতে হবে।'

'সে তো যেতেই হবে। কবে যাবে বলো? তোমার কবে সুবিধা হবে?'

'কাল আমার অফ-ডে। কাল যেতে পারেন। মানে একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া ভালো। বেশির ভাগ রিসার্চ স্কলার ওঁকে গাইড হিসেবে পেতে চায়।'

'বেশ তো, কালই যাবে। কীভাবে যাওয়া হবে, বলো—'

'প্রফেসার দত্ত নর্থে থাকেন। সুজয়া দেবীকে কেউ যদি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে পৌঁছে দেন, আমি ওয়েট করব। সকালে ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে। ওখান থেকে প্রফেসার দত্তর বাড়ি হেঁটে গেলে দু-মিনিটের রাস্তা।'

'ঠিক আছে, আমাদের গাড়ি তো আছেই। একটা গাড়িতে করে টুকুকে পাঠিয়ে দেব। আমাকে কাল সকালে নৈহাটিতে যেতে হবে। আগের থেকে বলা আছে। নইলে আমিই নিয়ে আসতাম।'

হীরক হঠাৎ বলে উঠল, 'সুজয়া দেবী এখানে নতুন। ড্রাইভার কোথায় নিতে কোথায় নেবে। আপনি যতি পারমিশান দেন, আমি ওঁকে পৌঁছে দিতে পারি।'

একপলক হীরকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মণিমোহন। তারপর বললেন, 'গ্ল্যাডলি। তুমি নিয়ে এলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আই থিঙ্ক টুকু উড নট ডিসঅ্যাপ্রুভ অফ ইট।' সুজয়ার দিকে ফিরে বললেন, 'কি রে, তোর কোনও আপত্তি নেই তো?'

সুজয়া স্মার্ট আধুনিক মেয়ে। বলল, 'না, আপত্তি কীসের। তবে হীরকবাবুর অসুবিধা হবে কিনা—'

হীরক দ্রুত বলে উঠল, 'নট দা লিস্ট—'

মণিমোহন মৃণালকে বললেন, 'তা হলে কাল সকালে হীরক আমাদের বাড়ি আসছে, আর তুমি শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে থাকছ। বিটুইন নাইন অ্যান্ড নাইট থার্টি।'

মৃণাল বলল, 'হ্যাঁ।'

'আজ তা হলে আমরা উঠি। তোমাকে খুব ডিসটার্ব করলাম।'

'না-না, ডিসটার্ব্যান্সের কী আছে?'

মণিমোহনরা উঠে পড়েছিলেন। দরজার দিকে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'দ্যাখো, তোমাকে আজ নিয়ে তিনবার দেখলাম। অল দা টাইম ইউ লুক ভেরি সিকলি। তোমার কিন্তু ভালো করে চেপ-আপ করিয়ে নেওয়া দরকার। আফটার অল আই অ্যাম আ ডক; তোমাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে।'

মণিমোহন যা বললেন সুজয়াও প্রথম থেকে তাই দেখে আসছে। মৃণাল বড় বেশি রুগ্ণ। সে লক্ষ করল বাবার কথায় হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল মৃণাল। বিষাদের দীর্ঘ একটি ছায়া এক পলকের জন্য তার মুখে অনড় হয়ে থাকল। তারপর আশ্চর্য মিষ্টি হেসে সে বলল, 'আমি তো ভালোই আছি।'

'না। ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। তুমি যদি বলো, আমি তোমাকে দেখব।'

'আমি একজন স্পেশালিস্টকে কিছুদিন আগে দেখিয়েছি। হীরকই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।'

মণিমোহন বললেন, 'ব্লাড, স্পুটাম টেস্ট করিয়েছ? প্রেসার দেখেছে?'

মৃণাল বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাতে কী পাওয়া গেছে?'

'তেমন কিছু না।'

'তবে তোমাকে এত অসুস্থ দেখায় কেন?'

মৃণাল বিব্রত হচ্ছিল। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য, অসুখ-বিসুখের প্রসঙ্গ খুব সম্ভব সে এড়িয়েই থাকতে চায়। মৃণাল ভাসা-ভাসা ভাবে বলল, 'ডাক্তার সেন বলেছেন এটা জেনারেল উইকনেস। ক'দিন রেস্ট নিয়ে কিছু টনিক আর ভিটামিন ট্যাবলেট খেলে ঠিক হয়ে যাবে। ভাবছি নেক্সট উইক থেকে কলেজে পনেরো দিন ছুটি নেব।'

মণিমোহন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'ডাক্তারের রিপোর্টগুলো দাও তো, একটু দেখি।'

মণিমোহনের দৃষ্টির সামনে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল মৃণাল। অসহায়ের মতো বলল, 'এইখানে কোথায় যেন রেখেছিলাম, এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

'প্রেসক্রিপশানটা কোথায়?'

'ওষুধের দোকানে দিয়ে এসেছি। কাল গিয়ে টনিক-ফনিকগুলো নিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে, ওগুলো খেয়ে দ্যাখো। যদি হেলথ ইমপ্রুভ না করে, আমি তোমাকে একবার চেক-আপ করব।'

'আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন?'

'কিছু কষ্ট নয়। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে শুধু জেনারেল উইকনেসই না, অন্য কোনও মেজর ব্যাপার বাধিয়ে বসেছ।'

মৃণাল চুপ করে থাকল।

মণিমোহন বললেন, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

রাস্তায় এসে গাড়ি পর্যন্ত সবাইকে পৌঁছে দিয়ে গেল মৃণাল। সুজয়া জানলা দিয়ে দেখল যতক্ষণ না তাদের গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয় ততক্ষণ মৃণাল দাঁড়িয়ে থাকল।

সাত

পরের দিন সকালে ঘড়ির কাঁটায় যখন সাড়ে আটটা, সেই সময় রাজহাঁসের মতো সাদা ধবধবে একটা জাপানি টোয়োটা নিয়ে হীরক এসে হাজির।

সুজয়ার তিন কাকা অবনীমোহন, বিজয়মোহন আর রামমোহন কিছুক্ষণ আগে যে-যাঁর অফিসে বেরিয়ে গেছেন। মণিমোহন যাবেন নৈহাটিতে এক আত্মীয়ের বাড়ি, তার তোড়জোড় চলছে।

হীরক আসবে বলে আগে থেকেই স্নান-টান করে রেডি হয়ে অপেক্ষা করছিল সুজয়া। পঁচিশ-

ছাব্বিশটা বছর বাংলাদেশ থেকে বারো-তেরোশো মাইল দূরে কসমোপলিটান আবহাওয়ায় কাটিয়ে এলেও তার পোশাকে বা সাজসজ্জায় উগ্রতা নেই। বেলবটম বা প্যারালাল সে পছন্দ করে না, শাড়িই তার প্রিয়।

সুজয়া আজ ক্রিম রংয়ের একটা ফুল ভয়েলের শাড়ি পরেছে, শাড়িটার পুরো জমি ফাঁকা। তবে পাড়ে নীল সুতো দিয়ে অসংখ্য ময়ূর বসানো। শাড়ির মতো ব্লাউজটার রং-ও ক্রিম, সেটার হাতাতেও নীল ময়ূর। পায়ে বিনুনির মতো দুই ফিতের স্লিপার, চোখে অল্প কাজলের টান। ঠোঁটে হালকা একটু রং; তবে হাতের নখ ম্যানিকিওর করা। দুই ভুরুর মধ্যবর্তী জায়গায় নীল বিন্দিয়া। বাঁ-হাতে সোনার ব্যান্ডে ঘড়ি, ডান হাতে একটিমাত্র রুলি, কানে মুক্তোর টাব। এ ছাড়া গয়না বলতে আর কিছু নেই। হাতে সুদৃশ্য এবং দামি একটা লেডিজ ব্যাগ। সব মিলিয়ে তাকে অপার্থিব দেখাচ্ছিল।

তেতলায় তার ঘরের সামনের ব্যালকনিতে বসে ছিল সুজয়া। কলি কাছে নেই। প্রাইভেট টিউটর এসেছে, সে পড়তে গেছে দোতলায়।

হীরককে বাড়িতে ঢুকতে দেখে সুজয়া তাড়াতাড়ি উঠে সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে নীচে নামতে লাগল। একতলার ল্যান্ডিংয়ের মুখে ছোটকাকিমা মণিকার সঙ্গে দেখা। মণিকা বললেন, 'হীরক এসে গেছে।'

হীরক যে আসবে সে-খবরটা কাল রাত্তিরেই মণিমোহন কাকা-কাকিমাদের জানিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, উচ্ছ্বসিতভাবে হীরকদের বাড়িঘর এবং তার মা-বাবা সম্পর্কেও বলেছিলেন। মণিমোহনের এই উচ্ছ্বাসময় বিবরণ থেকে তাঁর ভাইরা এবং ভাইদের স্ত্রীরা বুঝে নিয়েছিলেন, হীরককে তাঁর খুবই ভালো লেগেছে।

সুজয়া বলল, 'আমি ওপর থেকে দেখেছি।'

মণিকা বললেন, ও, সেই জন্যে এরকম স্পিডে নেমে আসছিলে!'

সুজয়া হাসল।

মণিকা এবার চোখ কুঁচকে মজা করে বললেন, 'তুমি দারুণ লাকি।'

ছোট কাকিমা কী বলতে চান ঠিক বুঝতে না পেরে সুজয়া জিগ্যেস করল, 'কীরকম?'

'কলকাতায় পা দিতে-না-দিতেই একটা বয়-ফ্রেন্ড জুটে গেল।'

সুজয়া বলল, 'জেলাসি!'

'দশ বছর আগে হলে হত। বয়েসটা ঝামেলা করে দিচ্ছে যে।'

'তা না হলে?'

'ওপেন কমপিটিশনে নেমে যেতাম।'

সুজয়া হাসতে-হাসতে বলল, 'আচ্ছা চলি। আমরা না-যাওয়া পর্যন্ত মৃণালবাবু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

মৃণালের দাঁড়িয়ে থাকার কথাও মণিমোহনের কাছে সবাই শুনেছে। মণিকা বললেন, 'একজনকে বাড়ি পর্যন্ত ছুটিয়ে এনেছ, আরেকজনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছ। বেস্ট অফ লাক—' মণিকা হাত নাড়তে লাগলেন।

সুজয়াও হাত নেড়ে আবার সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

পেছন থেকে মণিকার গলা শোনা গেল, 'বাড়ি ফিরে আজকের সব রিপোর্ট দেবে।'

একতলায় নামতেই দেখা গেল, বাবা আর বড় কাকিমা লনের মাঝখানে নুড়ির রাস্তায় হীরকের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হীরকও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। খুব সম্ভব সুজয়া যখন নেমে আসছে সেই সময় বাবা আর বড় কাকিমা হীরকের গাড়ি দেখে লনে গিয়েছিলেন। সুজয়া তাঁদের কাছে চলে এল।

বড় কাকিমা দীপ্তি হীরককে বলছিলেন, 'বাড়ি পর্যন্ত এলে। একটু বসে এক কাপ চা খেয়ে

যাও।' মণিমোহনও সেই একই কথা বলছিলেন।

হীরক বলল, 'এখন চা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। মৃণালটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এমনিতেই ওর ব্যাড হেলথ—' বলতে-বলতে তার চোখ বারবার সুজয়ার দিকে চলে যাচ্ছিল।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সুজয়া বুঝতে পারছিল, হীরকের চোখ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দীপ্তি বললেন, 'তা হলে আর আটকাব না। কিন্তু টুকুর ফেরার কী হবে?'

মণিমোহন বললেন, 'হীরক নিয়ে যাচ্ছে, হীরকই দিয়ে যাবে।'

সুজয়ার দিকে মুগ্ধ চোখ রেখেই হীরক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তা তো নিশ্চয়ই। উনি কলকাতার কিছুই চেনেন না; আমি একা ছেড়ে দিতে পারি?'

দীপ্তি এবার জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা কখন ফিরবে?'

'খুব দেরি হবে না। প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে কতক্ষণ আর লাগবে! বারোটার ভেতর ফিরে আসব।'

'তা হলে এক কাজ করো না—'

'বলুন।'

'দুপুরে আমাদের এখানে দুটি ডাল-ভাত খাবে।'

'আজ হবে না; অন্য জায়গায় আমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে। কিছু মনে করবেন না, আরেকদিন খাব।'

কাছাকাছি কোনও একটা থানা থেকে ন'টার সাইরেন বেজে উঠল। অত্যন্ত সহজভাবে হীরক বলল, 'উঠে পড়ুন সুজয়াদেবী—' বলেই গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দিল। তার ভাবভঙ্গি বা কথাবার্তার মধ্যে কোনওরকম আড়ষ্টতা নেই। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সুজয়ারা তার অনেকদিনের চেনা; ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যথেষ্টই অন্তরঙ্গ।

সুজয়া উঠবার পর ফ্রন্ট সিটে স্টিয়ারিং ধরে বসল হীরক। একটু পর তাদের গাড়ি ঢাকুরিয়া থেকে বেরিয়ে গড়িয়াহাটা ওভারব্রিজ পার হয়ে সাদার্ন অ্যাভেনিউতে চলে এল।

পেছনে বসে খুব খারাপ লাগছিল সুজয়ার। মনে হচ্ছিল এ-গাড়িটা যেন তারই, আর হীরক তার মাইনে-করা ড্রাইভার। এই ভাবনাটা তাকে ভীষণ অস্বস্তি দিচ্ছিল। অথচ তার কিছু করার ছিল না; হীরক নিজেই পেছনের দরজা খুলে দিয়েছে। যদিও সে খুবই স্মার্ট আর মডার্ন তবু কাকিমা আর বাবার সামনে একটি অল্প-চেনা যুবকের পাশে গিয়ে বসতে পারেনি। পুণা হলে সে হয়তো বসতে পারত কিন্তু এই কলকাতায় কে কী ভাববে এই নিয়ে তার কিছুটা দুশ্চিন্তা আছে।

বাড়ি থেকে বেরুবার পর এলোমেলো দু-একটা কথা হচ্ছিল হীরকের সঙ্গে। হঠাৎ সুজয়া বলল, 'গাড়িটা একটু থামান তো—'

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হীরক একটু উদ্বিগ্নভাবেই বলল,'কী ব্যাপার?'

সুজয়া দ্রুত দরজা খুলে ফ্রন্ট সিটে হীরকের পাশে এসে বসল। হীরক অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'পেছনে কিছু অসুবিধা হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'লোকে ভাববে—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা চুপ করে গেল সুজয়া।

তার মনোভাব পলকে বুঝে নিয়ে প্রথমে গাড়িতে স্টার্ট দিল হীরক। তারপর দারুণ খুশির গলায় বলল, 'আমি আপনার শোফার, এই তো?'

সুজয়া বলল, 'আপনি একজন স্পোর্টসম্যানই নন, দুর্দান্ত সাইকোলজিস্টও।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা কমপ্লিমেন্টস।'

গাড়িটা ঘুরে ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে সোজা এগিয়ে চলল। খানিকটা যাওয়ার পর হীরকই

আবার বলল, 'একটা ব্যাপার আমার খুব খারাপ লাগছে।'

সুজয়া হকচকিয়ে গেল, 'কী ব্যাপার?' আবছাভাবে তার মনে হল, তবে কি ফ্রন্ট সিটে উঠে আসাটা হীরক পছন্দ করেনি?'

হীরক বলল, 'ডু ইউ টেক মি ফর আ ফ্রেন্ড?'

'অফ কোর্স।'

'তা হলে আমি কিন্তু তোমাকে 'আপনি' 'টাপনি' করে বলতে পারব না।'

সুজয়ার খুব ভালো লাগল। পুণা কিংবা বম্বেতে বহু যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। তাদের বেশির ভাগই মড, স্মার্ট এবং ঝকঝকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এত সহজ এবং সাবলীলভাবে কেউ তাকে 'তুমি' বলেনি। 'আপনি'র স্টেজ পার করতে দু-এক বছর কাটিয়ে দিয়েছে। সুজয়া আন্তরিক গলায় বলল, 'তুমি করেই বলো।'

এরপর আশ্বিনের বাতাসে ঝড় তুলে গাড়িটাকে নিয়ে হীরক যখন শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে পৌঁছল তখন ন'টা বেজে সাতাশ।

ট্রাম ডিপোর উলটোদিকে ফুটপাথে মৃণাল দাঁড়িয়ে ছিল। হীরক তার গা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বলল, 'উঠে পড়—'

সুজয়া একটু সরে গিয়ে মৃণালকে জায়গা করে দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই মৃণাল পেছনের দরজা খুলে ব্যাক সিটে উঠে বসল।

হীরক বলল, 'কখন এসেছিস?'

'ঠিক ন'টায়।'

'তা হলে তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।'

মৃণাল অল্প হাসল; উত্তর দিল না।

হীরক বলল, 'এবার কোথায় যেতে হবে বল—'

মৃণাল বলল, 'সামনে গিয়ে ডান দিকের সেকেন্ড রাস্তায় চল। তারপর আমি বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ডান দিকের দ্বিতীয় রাস্তায় ঢুকে একটু গেলেই প্রফেসর দত্তর হলুদ রংয়ের কম্পাউন্ডওয়ালা দোতলা বাড়ি। মৃণালের কথামতো বাড়িটার কাছে এসে গাড়ি পার্ক করল হীরক। বলল, 'তোরা নেমে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করে আয়।'

মৃণাল বলল, 'তুই যাবি না?'

'আমি গিয়ে কী করব? কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি; এক ঘণ্টার মধ্যে এসে যাব। তার মধ্যে তোদের হয়ে যাবে না?'

'যাবে।'

মৃণালরা নেমে পড়ল; হীরক গাড়ি নিয়ে শ্যামবাজারের দিকে চলে গেল।

প্রফেসর সোমনাথ দত্ত তাঁর প্রকাণ্ড স্টাডিতে মৃণালদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মাঝারি মাপের অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা, চওড়া কপাল, চুল ধবধবে সাদা, গায়ের রং টকটকে, ধারালো নাকমুখ, বড়-বড় চোখে পুরু লেন্সের বাইফোকাল চশমা। পরনে খদ্দরের পরিষ্কার পাজামা আর পাঞ্জাবি। তাঁর দিকে তাকালেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

মৃণাল আর সুজয়া প্রফেসর দত্তকে প্রণাম করে উঠতেই সুজয়াকে তিনি বললেন, 'তুমিই তা হলে সুজয়া।'

সুজয়া মাথা নাড়ল।

সোমনাথ তাদের বসতে বললেন। তাঁর মুখোমুখি একটা বড় সোফায় সুজয়া আর মৃণাল বসে পড়ল। সোমনাথ এবার বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে মৃণাল আমাকে সবই বলেছে। আমার শরীরও ভালো না, ইউনিভার্সিটির নানারকম কাজ, বাইরের কয়েকটা ইউনিভার্সিটির পেপার সেট করতে হয়, নিজেরও একট-আধটু পড়াশোনা আছে, নইলে একেবারে মুখ্যু হয়ে যাব—এত সবের মধ্যে রিসার্চ গাইড হওয়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু মাই ডিয়ারেস্ট অ্যান্ড বেস্ট ছাত্র মৃণালের রিকোয়েস্ট আমাকে রাখতেই হল। ও বললে আমি রিফিউজ করতে পারি না।'

সুজয়া কৃতজ্ঞ চোখে একবার মৃণালের দিকে তাকাল।

সোমনাথ এবার বললেন, 'তবে আমার একটা কথা আছে।'

সুজয়া উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকাল, 'কী?'

'আমি নামেই রিসার্চ গাইড থাকব। তোমার আসল গাইড কিন্তু হবে মৃণাল। ও-ই তোমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।'

মৃণাল হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'এ স্যার আপনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। তুমি সুজয়াকে আমার চাইতে অনেক ভালো গাইড করতে পারবে। আমি তোমাকে তোমার চাইতে অনেক বেশি জানি। নেহাত আমাকে না ছুঁয়ে থাকলে সুজয়া ডক্টরেটটা পাবে না, তাই বুড়ি ছুঁয়ে থাকা।'

মৃণাল আপত্তি করতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে সোমনাথ বললেন, 'কোনও কথা নয়, তোমার গাইডেন্স নিয়ে সুজয়া যে-পেপার তৈরি করবে, আমি চোখ বুজে তা রেকমেন্ড করতে পারি। মাই ডিয়ার সান, ছেলে পড়িয়ে-পড়িয়ে চুল সাদা হয়ে গেল। কাকে দিয়ে কী হয় এটুকু অন্তত আমার জানা আছে।' সুজয়ার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি ওর গাইডেন্সে থাকলে যথেষ্ট লাভবান হবে। মনে কোরো না, আমি অ্যাভয়েড করতে চাইছি।'

সুজয়ার একটু যে সংশয় ছিল না তা নয়। মৃণাল ছাত্র হিসেবে হয়তো অসাধারণ, কলেজের অধ্যাপক হিসেবেও। কিন্তু একজন রিসার্চ স্কলারকে গাইড করা আলাদা কথা। সোমনাথ যখন এত জোর দিয়ে বলছেন তখন তাঁর মুখের ওপর কিছু বলা যায় না। দ্বিধান্বিতভাবে সে বলল, 'আপনি যখন বলছেন তখন আমি ওঁর গাইডেন্সেই থাকব।'

এর পর সুজয়ার সঙ্গে পুণা ইউনিভার্সিটি এবং সুজয়াদের পারিবারিক বিষয়ে এলোমেলো দু-একটা কথা জিগ্যেস করলেন সোমনাথ। তারপর বললেন, 'আমাকে এবার বেরুতে হবে। সুজয়া মা, তুমি এক কাজ করো। ইউনিভার্সিটিতে ফি দিয়ে থিসিসের জন্য তোমার নাম এনরোল করে নিও।' বলতে-বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল তাঁর, 'কী সাবজেক্ট নিয়ে রিসার্চ করবে ঠিক করেছ?'

সুজয়া মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী?'

'ইকনমি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া?'

সোমনাথ প্রায় অবাকই হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ সুজয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কি তোমার এই সাবজেক্টটা মৃণালের সঙ্গে ডিসকাস করে ঠিক করেছ?'

মৃণালও কম অবাক হয়নি। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না স্যার, আমার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত কো-ইনসিডেন্স।' বলে হাসল।

. সুজয়া একবার সোমনাথ, একবার মৃণালকে লক্ষ করছিল। কিছুটা বিমূঢ়ের মতো সে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে?'

সোমনাথ বললেন, 'তুমি যে সাবজেক্টটা ভেবেছ, তার ওপর দু-বছর আগে রিসার্চ শুরু করেছিল মৃণাল। থিসিস প্রায় কমপ্লিট করে ফেলেছিল। তারপর হঠাৎ কী হল, পেপারটা আর সাবমিট করল না। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছি, ও শুনল না। আমার কাছেই ও কাজ করেছে। আমি

বলছি এমন পেপার আমিও তৈরি করতে পারতাম না। এসব হুইমসের কোনও মানে হয়!' একটু থেমে আবার বললেন, 'ব্রিটেন আর আমেরিকার কোনও-কোনও পত্রিকায় এই সাবজেক্টে মৃণালের ক'টা পেপার বেরিয়েছিল; সেগুলো প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে সুজয়া বলল, 'এম চ্যাটার্জি নামে কি সেগুলো বেরুত?'

মৃণাল লাজুক মুখে সামান্য হাসল।

হাতের মুঠোয় আচমকা অভাবনীয় দুর্লভ কিছু পেয়ে গেলে যেমন হয় সুজয়ার মনের অবস্থা এখন অনেকটা সেইরকম। সে মৃণালের দিকে ফিরে বলল, 'ওগুলো আপনার লেখা!' তার চোখে-মুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটে উঠছিল।

মৃণাল বিব্রতভাবে এক পলক তাকিয়েই অন্য দিকে চোখ ফেরাল।

সোমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরই লেখা। হি ইজ ভেরি শাই।'

সুজয়া বলল, 'ওই লেখাগুলো পড়েই আমি এই সাবজেক্টটা সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম। কী স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার, ওই আর্টিকেলগুলোর লেখকের সঙ্গে যে ক'দিন আগেই আলাপ হয়ে গেছে সেটা আজ জানতে পারলাম।'

সোমনাথ বললেন, 'তা হলে দেখছ ঠিক লোককেই তোমার ডিফ্যাক্টো গাইড করে দিয়েছি।'

অত্যন্ত আন্তরিক গলায় সুজয়া বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—'

'আশা করি তোমার আর কোনও দ্বিধার কারণ নেই।'

'না স্যার।'

'তা হলে আজ তোমরা এসো। ইউনিভার্সিটিতে নাম এনরোল করে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। আর রিসার্চ যেমন-যেমন এগুচ্ছে মাঝে-মাঝে এসে আমাকে জানিও।' বলতে-বলতে উঠে পড়লেন সোমনাথ।

সুজয়া আর মৃণাল প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এল।

এক ঘণ্টা পর হীরক আসবে বলেছিল। অথচ আধ ঘণ্টার মধ্যেই এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখে সুজয়া বলল, 'আধ ঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে; এখন কী করবেন?'

মৃণাল বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে হীরকের জন্যে ওয়েট করতে হবে। চলুন, ট্রাম রাস্তার মুখে গিয়ে দাঁড়াই। ও ওদিক থেকেই আসবে।'

ট্রাম রাস্তায় এসে সুজয়া বলল, 'আপনার মতো মানুষ আমি আগে দেখিনি।'

মৃণাল বিমূঢ়ের মতো সুজয়ার দিকে তাকাল, 'মানে?'

'আপনি এমন ব্রিলিয়ান্ট একজন হিস্টোরিয়ান, ব্রিটিশ আর আমেরিকান জার্নালে ওইরকম চমৎকার অ্যানালিসিস করেছেন, এ-কথা তো আগে বলেননি।'

'এর আর বলবার কী আছে!'

'সত্যি আপনি অদ্ভুত।'

মৃণাল উত্তর দিল না।

সুজয়া আবার বলল, 'একটা কথার উত্তর দেবেন?'

'কী?' মৃণাল জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'রিসার্চটা কমপ্লিট করলেন না কেন?'

উদাসীন মুখে মৃণাল বলল, 'এমনি। বিশেষ কোনও কারণ নেই।' একটু থেমে বলল, 'নামের সঙ্গে একটা ডক্টরেট জোড়া লাগলে কী আর এমন ওয়েট বাড়বে! আমি যা ছিলাম তাই থাকব।'

'তবে রিসার্চ শুরু করেছিলেন কেন?'

'তখন ভেবেছিলাম একটা ডক্টরেট জোগাড় করতে পারলে চারটে হাত-পা গজিয়ে যাবে। ওটার জোরে কোনও ইউনিভার্সিটিতে লেকচারশিপ কি রিডারশিপ জুটিয়ে নিতে পারব। পরে ভেবে

দেখলাম কী দরকার। যেমন আছি বেশ আছি। জীবনটা এভাবে কেটে গেলেই আমি খুশি।'

'আপনি বড় হতে চান না?'

'না।'

'জীবন সম্পর্কে আপনার অ্যাটিচুড এত পেসিমিস্ট কেন?'

আবছাভাবে মৃণাল বলল, 'পেসিমিস্ট! কী জানি—' সামনে এখন পিক আওয়ারের শিরাছেঁড়া উত্তেজনা চলছে। ট্রাম-বাস-মিনিবাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট কার—সব শ্বাসরুদ্ধের মতো ছুটে চলেছে ডালহৌসির দিকে। দূরমনস্কর মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকল মৃণাল।

একটুক্ষণ চুপ। তারপর সুজয়া বলল, 'জানেন আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। ফিলিং ভেরি মাচ আনকমফোর্টেবল।'

চমকে মৃণাল তার দিকে তাকাল, 'কেন বলুন তো?'

'আপনি যে সাবজেক্টে রিসার্চ করছিলেন আমার সেটা করা বোধহয় ঠিক হবে না। আমি অন্য একটা সাবজেক্ট বরং চুজ করি।'

'আপনার সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। ওই সাবজেক্টে আপনি কাজ করুন। আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'পরে যদি কখনও মনে হয় সাবজেক্টটা ছেড়ে দিয়ে ভালো করিনি।'

'আই ডোন্ট লুক ব্যাক। কোনও কিছুর জন্যেই আপশোশ করা আমার স্বভাবে নেই। আপনি কাজ আরম্ভ করে দিন। আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য পাবেন।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কী ভেবে সুজয়া বলল, 'আপনার সঙ্গে তা হলে তো রেগুলার যোগাযোগ রাখতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'উইকে আমাদের ক'দিন বসা দরকার?'

'আপনার যে ক'দিন ইচ্ছে।'

'বিরক্ত হবেন না?'

'আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়? আমার শরীরটা খুব ভালো নয়; ঢাকুরিয়া পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারব না। যদি দয়া করে আমার ওখানে আসেন—'

'আসতেই হবে। আপনি কেন কষ্ট করে যাবেন।' বলে একটু থামল সুজয়া। পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়তে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, ওষুধের দোকান থেকে ওষুধগুলো নিয়েছিলেন?'

'না।' মৃণাল কিছুটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'আজ নিয়ে যাব।'

'মনে থাকে যেন।'

আধ ঘণ্টা আর কতটুকু সময়। ওদের কথাবার্তার মধ্যে হীরক এসে পড়ল। গাড়িটা ঘুরিয়ে সে সোমনাথদের গলিতে ঢুকতে যাচ্ছিল, মৃণাল তাকে ডেকে থামাল।

হীরক বলল, 'তোরা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস!'

কেন দাঁড়িয়ে আছে, মৃণাল জানাল।

হীরক বলল, 'গাড়িতে উঠে পড়। আমি তোকে উলটোডাঙায় নামিয়ে দিয়ে সুজয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'আমি বাসে চলে যাচ্ছি। এখন ওদিকের বাসে ভিড় নেই। তুই সুজয়া দেবীকে নিয়ে চলে যা।'

কী ভেবে হীরক বলল, 'আচ্ছা—' সুজয়ার দিকে ফিরে বলল, 'এসো সুজয়া—'

দরজা খুলে সামনের সিটে উঠতে-উঠতে সুজয়া মৃণালকে বলল, 'মনে করে ওষুধগুলো নিয়ে যাবেন কিন্তু।'

মৃণাল হাসল, 'ঠিক আছে।'

'পরশু আমি আপনার বাড়ি আসছি। কখন আসব?'

'যখন ইচ্ছে। কলেজে ছুটি নিয়েছি। সারাদিনই আমি বাড়িতে থাকব। চলি—' রাস্তা পার হয়ে মৃণাল শ্যামবাজার ফাইভ-পয়েন্ট ক্রসিং-এর দিকে চলে গেল। আর হীরক গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সোজা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে এগিয়ে চলল।

ঢলের মতো অগুনতি গাড়ি এখন চলেছে ডালহৌসি এসপ্ল্যানেডের দিকে। উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে চোখ রেখে হীরক জিগ্যেস করল, 'প্রফেসরের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে?'

যা কথা হয়েছে, সব জানাল সুজয়া। হীরক বলল, 'তা হলে তো এখন থেকে তোমাকে রেগুলার উলটোডাঙায় আসতে হবে।'

'হ্যাঁ। উইকে কম করে দু-দিন না এলে চলবে না। তবে ভাবছি—'

'কী?'

'মৃণালবাবু পনেরো দিন ছুটি নিয়েছেন। এই পনেরো দিন রোজ আসব।'

একটু চুপ করে থেকে হীরক বলল, 'যদি দরকার হয় বলো, আমি তোমাকে ঢাকুরিয়া থেকে রোজ নিয়ে আসব।'

সুজয়া তক্ষুনি উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলব।'

দশ-বারো মিনিটের মধ্যে ওরা এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে গেল। একটা প্রকাণ্ড ফাইভ-স্টার হোটেলের কাছে এসে আচমকা গাড়িটা পার্ক করল হীরক।

সুজয়া জিগ্যেস করল, 'এখানে গাড়ি থামালে?'

হীরক বলল, 'আমার কয়েকজন গলফার ফ্রেন্ড দিল্লি থেকে এসেছে। উইক-এন্ডে টালিগঞ্জে গল্‌ফ কম্পিটিশন আছে। ওরা তাতে পার্টিসিপেট করবে। আজ দুপুরে ওদের সঙ্গে লাঞ্চ করার কথা। সকালেই আড্ডা দেওয়ার জন্য আসতে বলেছিল। চলো, ওদের বলে আসি আমার আসতে একটু দেরি হবে।'

সুজয়া বলল, 'আমি গিয়ে কী করব?'

'এখানে একা-একা বসে থেকে কী হবে! এসো-এসো। ওদের সঙ্গে আলাপ হলে ভালো লাগবে।'

একরকম জোর করেই সুজয়াকে নিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়ল হীরক। কার্পেটে-মোড়া বিশাল করিডর পেরিয়ে যেতে-যেতে সুজয়া জিগ্যেস করল, 'তুমিও গল্‌ফ কম্পিটিশনে নাম দিয়েছ নাকি?'

হীরক বলল, 'হ্যাঁ।'

সুজয়া অবাক হয়ে বলল, 'তুমি গল্‌ফ খেলাও জানো!'

'একটু-একটু।'

'আর কী-কী জানো?'

'কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো সব খেলাই। তবে আমার ফ্যাসিনেশন রোয়িং, হ্যান্টিং, গল্‌ফ, মোটর রেসিং আর টেনিসে।' বলে হীরক একটু থামল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার বলে উঠল, 'যে-গেমগুলোর কথা বললাম কোথাও তার কম্পিটিশন হলেই নাম দিই। আর নাম দিয়ে ট্রফি না পেলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

'এটা কিন্তু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নয়।'

হীরক বলল, 'কী করব বলো। ফ্রাঙ্কলি অ্যাডমিট করছি ট্রফি জেতার জন্যেই আমি

কম্পিটিশনে নাম দিই।'

সুজয়া বলল, 'তোমার ধারণা সব কম্পিটিশনেই তুমি ট্রফি জিততে পারবে?'

'আই উইল ট্রাই। আমি পেসিমিস্ট নই, হাইলি অ্যামবিশাস। কম্পিটিশনে নামলে না-জেতা পর্যন্ত ফাইট দিয়ে যাই।'

সুজয়া অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিদ্যুৎচমকের মতো মৃণালের মুখ মনে পড়ল তার। পৃথিবীর কোনও কিছু সম্পর্কেই তার কৌতূহল নেই, উদ্যোগ নেই। হাতের সব দান সে ছেড়ে দিয়েছে। ইচ্ছা করলেই বিরাট একজন হিস্টোরিয়ান হতে পারত মৃণাল, সারা পৃথিবীর প্রশংসা এবং খ্যাতি কুড়িয়ে আনতে পারত। কিন্তু কিছুই সে করল না। জীবন সম্পর্কে এমন উদাসীন, আগ্রহশূন্য, মানুষ আগে আর দেখেনি সুজয়া। তুলনায় হীরক কত জীবন্ত, কত উজ্জ্বল! যে আজ স্পোর্টসের ট্রফি জিতছে কাল সে নিশ্চয়ই জীবনের অন্য সব ট্রফিও জিতে নেবে। তার এই ফাইটিং স্পিরিট মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো।

হীরক জিগ্যেস করল, 'কী ভাবছ?'

আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে সুজয়া বলল, 'কিছু না।'

হীরকের বন্ধুদের পাওয়া গেল হোটেলের মাঝামাঝি জায়গায়, সুইমিং পুলের কাছে—বড়-বড় পাম গাছের ছায়ায়।

ওরা মোট চারজন। সুরেশ জেঠমালানি, হরিচাঁদ ঘেলট, চার্লি সিং আর কৃষ্ণ আয়েঙ্গার। একজন সিন্ধি, দুজন পাঞ্জাবি, একজন সাউথ ইন্ডিয়ান। সবাই স্মার্ট, ঝকঝকে যুবক। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বড় ফ্যামিলির ছেলে।

সুরেশদের সঙ্গে সুজয়ার আলাপ করিয়ে দিয়ে হীরক জানাল, দিল্লি-বম্বে-ব্যাঙ্গালোর কি লক্ষ্ণৌতে গল্‌ফ খেলতে গিয়ে এদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।

হীরকের এই গল্‌ফার বন্ধুরা খুবই আমুদে আর খোলমেলা টাইপের। সুজয়াকে পেয়ে দারুণ হইচই বাধিয়ে দিল। সুরেশ হীরককে বলল, 'তিন মাস আগে তোমার সঙ্গে উটির গল্‌ফ কম্পিটিশনে দেখা হয়েছিল, তখন এর কথা বল কী তো?'

হীরক বলল, 'তখন পর্যন্ত একে আমি দেখিইনি। বলব কী করে?'

কৃষ্ণ সুজয়ার দিকে ফিরে বলল, 'তারপর সুজয়া দুজনে কত দূর এগিয়েছ? আমরা নেমন্তন্নটা কবে পাচ্ছি?' প্রথম থেকেই তারা সুজয়াকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে।

সুজয়া ভেতরে-ভেতরে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে তো গেঁয়ো কনজারভেটিভ ফ্যামিলির মেয়ে নয়, কসমোপলিটান আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। মনোভাব গোপন রাখার কৌশল তার হাতের মুঠোয়। আস্তে করে সুজয়া বলল, 'ওয়েট অ্যান্ড সি—'

'আগে থেকে তোমাদের কনগ্র্যাচুলেশনস জানিয়ে রাখছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সুজয়া লক্ষ করছিল, হীরক তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সুরেশদের কথায় সে অস্বস্তি বোধ করছে। এরপর আড্ডা জমে উঠল। প্রথম দিকে সবাই সুজয়াকে নিয়ে মেতে ছিল। পরে আড্ডাটা টপিক বদলাতে-বদলাতে অন্য দিকে সরে যেতে লাগল।

হরিচাঁদ ঘেলট দিল্লির এক বিরাট ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্টের ছেলে। তাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং নানারকম প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন প্রায়ই সারা ইন্ডিয়ার খবরের কাগজে বেরোয়। খবরের কাগজ যারা পড়ে তাদের কাছে হরিচাঁদদের ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল হাউসের নাম অজানা নয়, সুজয়াও জানে। হরিচাঁদ বলল, 'আমার ভাই এটাই লাস্ট কম্পিটিশন।'

হীরক বেশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'নেক্সট মান্থে পুণায় যে ওপেন গল্‌ফ হচ্ছে, তাতে

তুমি পার্টিসিপেট করছ না?'

'না।'

'রিয়েলি।'

'রিয়েলি।'

'তোমার মতো একজন গল্‌ফার আর কম্পিটিশনে নাম দেবে না, এ তো আমি ভাবতেই পারছি না।'

হরিচাঁদ তার মুখে দারুণ হতাশ একটা ভাব ফুটিয়ে বলল,'কী করব, মাই ইলাস্ট্রিয়াস অ্যান্ড গ্রেট ডিক্টেটর ড্যাডি আলটিমেটাম দিয়েছেন ক্যালকাটা থেকে ফিরেই তাঁর ফরিদাবাদের ইলেকট্রনিকসের ফ্যাক্টরিতে জয়েন করতে হবে। নইলে বাড়ি থেকে বাবা 'গেট আউট' করে দেবেন। গল্‌ফার হিসেবে আমার কেরিয়ার টোটালি ফিনিশড।'

সুরেশ, কৃষ্ণ এবং চার্লি—এদের বাবারাও কেউ ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট, কেউ বিগ বিজনেসম্যান, কেউ নিউজপেপার ম্যাগনেট। ওরা করুণ মুখ করে জানাল আজাদ চিড়িয়া হয়ে আজ পুণা, কাল উটকামন্ড, পরশু হায়দ্রাবাদ ঘুরে গল্‌ফ খেলে বেড়ানোর দিন তাদেরও শেষ। তাদের বাবারাও চরমপত্র সার্ভ করেছেন; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্যামিলি বিজনেস জয়েন করতেই হবে।

হীরক বলল, 'আমারও তো একই প্রবলেম। বাবা তাঁর ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার জন্যে রোজ প্রেসার দিচ্ছেন।'

হরিচাঁদ বলল, 'অল ফাদারস আর হিটলারস অর ফ্র্যাঙ্কোস।' একটু থেমে বলল, 'ওয়েল হীরক, তুমি যদি রিয়েলি তোমার বাবার ফ্যাক্টরিতে বসো, আব তোমার কোনও হেল্প দরকার হয় বোলো। আমরা গল্‌ফাররা একে অন্যের পাশে থাকব। ও.কে?'

'ওকে—'

ইন্ডাস্ট্রি বা বিজনেসর কিছুই জানে না সুজয়া। তবু তার মনে হল, হরিচাঁদের মতো বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সাহায্য পেলে হীরক জীবনে দু-দিনেই অনেকদূর পৌঁছে যাবে। তার ভবিষ্যৎ সোনা দিয়ে মোড়া।

হীরক এবার বলল, 'আজ হোক, কাল হোক, বাবা তাঁর ফ্যাক্টরিতে আমাকে টানবেনই। তখন তোমার হেল্প ভীষণ দরকার। ইউ নো মাই নেচার; সবসময় ফার্স্ট প্রাইজ জিতবার চেষ্টা করি। আমি ভাই ছোটখাটোতে খুশি না। বাবার ফ্যাক্টরিতে হাত লাগালে ওটাকে কান্ট্রির নাম্বার ওয়ান না করতে পারলে আমার ভালো লাগবে না।'

আড্ডায়-আড্ডায় অনেকটা সময় কেটে গেছে। সুজয়া হঠাৎ লক্ষ করল, ঘড়িতে বারোটা বেজে দশ। হীরককে বলল, 'এবার বাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু।'

হবিচাঁদরা একসঙ্গে হইচই জুড়ে দিল, 'বাড়ি ফিরবে কি, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে তবে যাবে।' সুজয়ার কোনও কথাই তারা শুনল না। জোর করে খাইয়ে সেই বিকেলবেলায় তাকে এবং হীরককে ছাড়ল। অবশ্য এর মধ্যে বাড়িতে ফোন করে দুপুরে খাওয়ার ব্যাপারটা কাকিমাদের জানিযে দিয়েছে সুজয়া।

আসার সময় হরিচাঁদরা বলল, 'নেক্সট শনিবার টালিগঞ্জে গল্‌ফ কম্পিটিশনে আসছ তো?'

এই তাজা টগবগে প্রাণবন্ত যুবকগুলিকে বড় ভালো লেগেছে সুজয়ার। সে বলল, 'আসব।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে সুজয়াকে নিয়ে ঢাকুরিয়ার দিকে যেতে-যেতে হীরক বলল, 'একটা ব্যাপারে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—'

সুজয়া বলল, 'কী ব্যাপারে?'

'ওরা ভেবেছে তোমার সঙ্গে আমার, আই মিন—'

হীরকের কথা বুঝতে পারছিল সুজয়া। সে বলল, 'না-না, ও-নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ওটাকে সিরিয়াসলি নিইনি। ফান ইজ ফান—'

গাড়ি একসময় ঢাকুরিয়া পৌঁছে গেল।

আট

পরের দিনই দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হীরকের সঙ্গে মৃণালের উলটোডাঙার বাড়িতে এল সুজয়া। তার ইচ্ছা যে-ক'দিন মৃণালের ছুটি আছে তার সঙ্গে আলোচনা করে রিসার্চের কাজ একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসবে।

হীরকের সঙ্গে মৃণালের বাড়ি আসার ব্যাপারে সুজয়াকে কিছুই করতে হয়নি। যদিও সে হীরককে বলেছিল এ-বিষয়ে মণিমোহনের মতামত জেনে নেবে। কিন্তু হীরক সেজন্য অপেক্ষা করেনি, তার ধৈর্য কম। কাল রাত্তিরে মণিমোহন নৈহাটি থেকে ফেরার পর হীরক ফোন করে জানিয়েছিল, তাঁর আপত্তি না থাকলে এবং সুজয়া যতদিন কলকাতার রাস্তাটাস্তা না চিনছে তাকে মৃণালের কাছে নিয়ে আসবে এবং ঢাকুরিয়ায় পৌঁছে দেবে।

মণিমোহন আপত্তি করেননি। নিজের মেয়েকে তিনি চেনেন। সুজয়ার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস; অকারণ ভাবালুতা বা আবেগে ভেসে যাওয়ার মেয়ে সে নয়। তা ছাড়া নিজের ভালোমন্দ বোঝার মতো যথেষ্ট বড় হয়েছে সুজয়া।

কাল রাত্তিরে হীরকের সঙ্গে কথাবার্তার পর কাকা-কাকিমাদের ডেকে হীরক সম্পর্কে একটা পারিবারিক সভা বসিয়েছিলেন, মণিমোহন। সেই সভায় সুজয়াকে ডাকা হয়নি, তবে সেখানে যা-যা কথা হয়েছে ছোট কাকিমার কাছ থেকে কাল রাত্তিরেই পুরো রিপোর্ট পেয়ে গেছে সে।

ছোট কাকিমা মণিকা মজা করে-করে যা বলেছেন তা মোটামুটি এইরকম। হীরককে মণিমোহন পছন্দ করেছেন। কাকা-কাকিমাদেরও তাকে ভালো লেগেছে। যদিও তারা ব্রাহ্মণ, আর সুজয়ারা কায়স্থ, এটা কোনও বাধাই নয়। আজকাল ইন্টার-কাস্ট বিয়ে আখছার হচ্ছে। মণিমোহন বা কাকা-কাকিমাদের ধারণা সুজয়া হীরককে অপছন্দ করে না। আর হীরক তো হাত ধুয়েই বসে আছে। যদি তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয় মণিমোহন এবং কাকা-কাকিমারা খুশিই হবেন।

বাড়ির লোকেরা আগেভাগেই এতটা ভেবে রেখেছে, সুজয়া বুঝতে পারেনি। এটা ঠিকই, হীরককে তার ভালোই লেগেছে। তার সুন্দর চেহারা, স্পোর্টসম্যান স্পিরিট, উচ্চাকাঙক্ষা—সব মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো। তাই বলে বিয়ের কথা সে চিন্তা করেনি। এত কম পরিচয়ে কাউকে বিয়ে করার কথা সুজয়া অন্তত ভাবতে পারে না।

মৃণালদের বাড়ির কাছে সুজয়াকে পৌঁছে দিয়ে হীরক আজ আর নামল না। কোথায় তার একটা কাজ আছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আমি সন্ধের সময় আসব।'

সুজয়া বলল, 'আচ্ছা—'

হীরক সোজা ভি-আই-পি রোডের দিকে চলে গেল আর সুজয়া মৃণালদের বাড়ির ভেতর ঢুকল।

সেদিনের মতো আজও নীচের তলায় সেই ছেলেগুলো হই-হল্লোড় করছিল। সুজয়াকে দেখে

থেমে গেল। তাকে ওরা চিনতে পেরেছিল। একটা ছেলে বলল, 'কাকু ওপরে আছে। আপনি চলে যান।'

একটু হেসে দোতলায় সেই আগোছালো নোংরা ঘরটায় এসে সুজয়া দেখল মৃণাল খাটে শুয়ে-শুয়ে লন্ডনের একটা হিস্টোরিক্যাল জার্নাল পড়ছে।

সুজয়া ডাকতে যাচ্ছিল, 'তার আগেই মৃণাল তাকে দেখতে পেয়েছে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

সুজয়া বলল, 'এইমাত্র।'

'বসুন বসুন—'

সুজয়া খাটের একধারে বসে পড়ল।

মৃণাল বলল, 'আপনার জন্যে বইয়ের একটা লিস্ট করে রেখেছি। এই বইগুলো আপনাকে পড়তে হবে। এ ছাড়া ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ব্রিটিশ পিরিয়ডের অ্যানুয়েল গেজেট দেখবেন। আমি নিজেও কিছু বই দিতে পারব। আর দেব আমার ইনকমপ্লিট থিসিসের ম্যানাসক্রিপ্ট। সেই সঙ্গে যেসব আর্টিকল আমি লিখেছি তার কাটিং। আমার মনে হয় এতে আপনার কিছু সুবিধে হবে।' খাটের একধারে খবরের কাগজে মোড়া অনেকগুলো বড়-বড় প্যাকেট রয়েছে। সেগুলো দেখিয়ে মৃণাল বলল, 'আমার ম্যানাসক্রিপ্ট, আর বই-টই ঠিক করে রেখেছি। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন।'

সুজয়া ভাবতেই পারেনি তার জন্য খেটেখুটে এভাবে সব কিছু সাজিয়ে রাখবে মৃণাল। কৃতজ্ঞ সুরে সে বলল, 'আচ্ছা—'

'কার সঙ্গে এলেন?'

'হীরকের।'

'ও কোথায়?'

'একটা কাজ আছে বলে চলে গেল।'

একটু চুপ করে থেকে সঙ্কোচের গলায় সুজয়া বলল, 'আপনি সবই জানেন তবু আমি যেভাবে ব্রিটিশ পিরিয়ডের ইকনমি সম্বন্ধে ভেবেছিলাম, বললে আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে।'

অত্যন্ত আগ্রহের গলায় সুজয়া বলল, 'নিশ্চয়ই লাগবে। আমি তো অন্ধকারে পড়ে আছি। আপনি রাস্তা না দেখিয়ে দিলে কোথা থেকে শুরু করব, বুঝতে পারছি না।'

এরপর দুটো ঘণ্টা যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশে আসার পর থেকে ভারতীর অর্থনীতি কীভাবে ব্রিটিশের হাতে নতুন চেহারা নিল, কীভাবে এদেশকে শোষণ করে কোটি-কোটি টাকা তারা দেশে পাচার করল, সাল তারিখ দিয়ে তার নিখুঁত একটি ছবি চোখের সামনে তুলে ধরল মৃণাল। ইতিহাস সম্পর্কে জলের মতো পরিষ্কার ধারণা ছাড়া এভাবে ছবি আঁকা যায় না।

এই রোগা দুর্বল অসুস্থ যুবকটির দিকে তাকিয়ে যতটা মুগ্ধ ঠিক ততটাই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সুজয়া। পুনার যে ইউনিভার্সিটিতে সে পড়েছে ইতিহাসচর্চায় ভারতে এবং ভারতের বাইরে তার যথেষ্ট সুনাম। ওখানকার হিস্ট্রির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ন্যাশনাল হিস্ট্রি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। এ ছাড়া অধ্যাপকদের অনেকেরই দেশজোড়া নাম। কিন্তু তাঁদের কেউ এই দুর্বল যুবকটির মতো ইতিহাসকে শুধু কথা দিয়ে এমন জীবন্ত করে তুলতে পারেননি।

অলৌকিক জাদুকরের মতো মৃণাল সুজয়াকে দুশো বছর আগের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল। আচমকা তেরো-চোদ্দো বছরের ঢ্যাঙামতো একটা ছেলে ঘরে ঢুকল। বলল, 'কাকু, তুমি খেয়েছ?' বলেই দেওয়ালের ধার ঘেঁষে বড় টেবিলটার দিকে তাকাল, 'এ কি, কখন তোমার ভাত দিয়ে গেছি, সব পড়ে আছে!'

টেবিলের ওপর ঢাকা-দেওয়া একটা ভাতের থালা, ডাল কি তরকারির বাটি আর জলের গেলাস রয়েছে। সুজয়া অবাক হয়ে বলল, 'আপনি এখনও খাননি! উঠুন-উঠুন—'

বিব্রতভাবে একটু হাসল মৃণাল। তারপর বলল, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরেকটু বাকি আছে। ওটা শেষ করে খেয়ে নেব।'

'আমি আপনার কোনও কথাই শুনব না। আগে উঠুন—' একরকম জোর করেই মৃণালকে খেতে পাঠিয়ে দিল সুজয়া।

সেই ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে সুজয়াকে বলল, 'আপনি জোর করে তুলে দিলেন বলে কাকু খেতে গেল। আমাদের কথা শোনে না। বেশিরভাগ দিনই ভাত পড়ে থাকে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি রোজ আসবেন।'

সুজয়ার কানে শেষ কথাটা মুহূর্তের জন্য বেসুরে বাজল। পরক্ষণে সে বুঝল, ছেলেটা সত্যিই মৃণালকে ভালোবাসে। সে রোজ এলে মৃণালের খাওয়া হবে সেই জন্যই আসার কথা বলেছে, অন্য কিছু ভেবে নয়।

একটু হেসে সুজয়া জিগ্যেস করল, ' তোমার নাম কী?'

'ছেলেটা বলল, 'পল্টা—'

'আচ্ছা, তুমি এখন যাও।'

ছেলেটা চলে গেল। ওধারে টেবিলের সামনে বসে ঘাড় গুঁজে খেয়ে যাচ্ছে মৃণাল। সুজয়া অন্যমনস্কর মতো ঘরের চারিদিকে তাকাতে লাগল। সেদিন রাত্তিরে পরিষ্কার বোঝা যায়নি, আজ দেখা গেল দেওয়ালে পেনসিলের লেখাগুলো আর কিছুই না, নানা লোকের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার। তা ছাড়া কবে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে, কে কখন তার কাছে আসবে তাও লেখা রয়েছে। সুজয়া মনে-মনে হাসল। ডায়েরিটা ভালোই পেয়েছে মৃণাল।

দেওয়াল থেকে সুজয়ার চোখ অন্যদিকে সরে গেল। দু-দিন আগে সে এসেছিল। এর মধ্যে ঘরটা আরও অগোছালো হয়েছে; মেঝেতে আরও এক সেন্টিমিটার ধুলোর স্তর জমেছে। নোংরা ময়লা একেবারেই দেখতে পারে না সুজয়া। তার ইচ্ছা হচ্ছিল নিজের হাতে এখনই ঘরটা ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দেয়। পরক্ষণেই সে ভাবল, মৃণালের সঙ্গে এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা তার হয়নি যাতে এটা করা যেতে পারে। তবে আজ না হোক, দু-একদিন যাতায়াতের পর এই ঘরে সে হাত লাগাবেই।

অন্যমনস্কর মতো চারিদিক দেখতে-দেখতে সুজয়ার চোখ মৃণালের দিকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠল সে। নিজের অজান্তেই আস্তে-আস্তে উঠে মৃণালের কাছে এসে দাঁড়াল।

মৃণাল ডেলা পাকানো আধপোড়া ভাত কালো কুটকুটে ডাল দিয়ে মাখছিল। একপাশে খানিকটা আধ-কাঁচা আধ-পোড়া আলু ভাজা রয়েছে। এগুলো যে মানুষের খাদ্য হতে পারে, সুজয়ার ধারণা ছিল না। মৃণালের জন্য অদ্ভুত এক কষ্ট অনুভব করতে লাগল সে। বিষাদের গলায় বলল, 'এসব কী খাচ্ছেন?'

সুজয়া যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মৃণাল টের পায়নি। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল মৃণাল। তারপর বিব্রতভাবে একটু হাসল, 'এই মানে—'

'এ-সব কে রেঁধেছে?'

'নীচের ছেলেরা। কেন?'

'এগুলো মানুষ খেতে পারে?'

'ছেলেমানুষ তো; যা পেরেছে তাই করেছে—'

'আপনি এখনও রান্নার লোক পাননি?'

'না। পেলাম আর কই?'

একটু চুপ করে থেকে সুজয়া বলল, 'ঠিক আছে, দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়—'

মৃণাল জিগ্যেস করল, 'কী করবেন?'

'এখন বলছি না।'

সন্ধের পর হীরকের সঙ্গে ঢাকুরিয়ায় ফিরতে-ফিরতে সুজয়া বলল, 'কাল একটু তাড়াতাড়ি এসো।'

হীরক বলল, 'ক'টার সময়?'

'এগারোটার মধ্যে।'

নয়

পরের দিন একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত-মাছ-তরকারি-ভাজা ইত্যাদি বোঝাই করে হীরকের সঙ্গে মৃণালদের বাড়ি এল সুজয়া। কাকিমাদের সঙ্গে কথা বলে মৃণালের জন্য এই ব্যবস্থা করেছে সে। যতদিন না মৃণাল রান্নার লোক পাচ্ছে ততদিন বাড়ি থেকেই তার খাবার নিয়ে যাবে, হীরককে বলতে সে-ও এই ব্যবস্থায় খুশি হয়েছে। বলেছে, 'মৃণালটা নিজের সম্বন্ধে এত আনমাইন্ডফুল, কি বলব! আমার মা-বাবা আর আমি কতবার বলেছি, তোর কেউ নেই, শরীরও ভালো না, বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে আমাদের বাড়ি এসে থাক। আসবে না। কী খাচ্ছে, কী করছে, কেউ দেখবার নেই। তুমি যখন খাওয়ার দিকটা দেখছ তখন ভালোই হল।'

কালকের মতো আজও মৃণালদের বাড়ির দরজার কাছে সুজয়াকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল হীরক। টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে এল সুজয়া।

মৃণাল চুপচাপ বিছানায় শুয়ে ছিল। সুজয়াকে দেখে উঠে বসল। বলল, 'আসুন, আসুন—'

আজ মৃণালকে খুবই ক্লান্ত আর অবসন্ন দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার শরীরে কোথাও একটা তীব্র যন্ত্রণা চলছে। চোখ বসে গেছে, চোখের কোলে কালির ছাপ পড়েছে, চুল উস্কখুস্ক। কাছে আসতে-আসতে সুজয়া বলল, 'কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ নাকি?'

'তেমন কিছু না। কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। তাই—' বলতে-বলতেই সুজয়ার হাতের দিকে মৃণালের চোখ পড়ল। বলল, 'এটা কী?'

টেবিলের ওপর টিফিন ক্যারিয়ারটা নামিয়ে রেখে খাটের একধারে এসে বসল সুজয়া। তারপর বলল, 'আপনার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। যতদিন না রান্নার লোক পাচ্ছেন, আমি বাড়ি থেকে আপনার খাবার নিয়ে আসব।'

মৃণাল বলল, 'প্লিজ না, এটা করবেন না।'

'কেন?'

'তা হয় না।'

সুজয়া বলল, 'আমাকে যদি বন্ধু ভাবেন তা হলে এটুকু কি করতে পারি না?'

মৃণাল বলল, 'আমি ঠিক সেভাবে কথাটা বলিনি। আমার কাছে ক'টা ছেলে থাকে। আমি ভালো খাবার খাব আর ওরা এক বাড়িতে থেকে পোড়া ভাত খাবে, এটা আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।'

সুজয়া এ-দিকটা ভেবে দেখেনি। সে বলল, 'কিন্তু—'

'কোনও কিন্তু নয়। আমার কিছু অসুবিধা হয় না। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর ওইরকম

আধপোড়া ভাত, আধসেদ্ধ ডাল খেয়েই আসছি। আমার সব অভ্যেস হয়ে গেছে।'

সুজয়া বলল, 'ঠিক আছে। আজ খাবেন তো? আমি নিয়ে এলাম—'

'আজই শুধু, কাল থেকে আর নয়।'

'আমার মনে থাকবে। তবে কাল আমি অন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করব।'

বিপন্নভাবে তাকাল মৃণাল, 'কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন?'

'কাল সেটা দেখতে পাবেন।'

'দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে আমার ছেলেরা ভাবতে পারে আমি তাদের থেকে আলাদা।'

'কথাটা আমি ভুলব না।'

আজও সন্ধেয় হীরকের সঙ্গে ঢাকুরিয়ায় ফিরতে-ফিরতে সুজয়া বলল, 'কাল ন'টার মধ্যে তুমি আমাকে মৃণালবাবুর বাড়ি পৌঁছে দিও।'

হীরক বলল, 'আচ্ছা।'

দশ

পরের দিন উলটোডাঙায় এসে প্রথমেই নীচের বাচ্চাদের মৃণালের ঘরে ডেকে আনল সুজয়া। প্রত্যেকের নাম জেনে নিয়ে বলল, 'আজ তোমাদের কী মেনু?'

মেনু শব্দটা এই ছেলেটের অজানা। তারা হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল। সুজয়া এবার জিগ্যেস করল, 'মানে কী-কী রান্না করছ?'

ছেলেরা জানাল ভাত, ডাল আর ঢেঁড়স ভাজা হবে।

সুজয়া মৃণালকে বলল, 'আপনি তো আমার আনা খাবার ছোঁবেন না, আমি পয়সা দিলেও হয়তো সম্মানে লাগবে। দিন, টাকা দিন।'

মৃণাল জিগ্যেস করল, 'কেন?'

'বাজার থেকে মাছ আনতে হবে।'

'মাছ তো ওরা রাঁধতে পারে না।'

'আপনাকে তা নিয়ে ভাবতে হবে না। টাকা দিন।'

মৃণাল আর একটি কথাও না বলে টাকা বার করে দিল। সুজয়ার আচরণ তাঁর কাছে আশ্চর্য রকমের দুর্বোধ্য লাগছে।

টাকা দিয়ে একটা ছেলেকে বাজারে পাঠিয়ে সুজয়া অন্যদের বলল, 'তোমাদের রান্নাঘরটা কোথায়?'

ছেলেরা জানাল, 'নীচে?'

'আমাকে নিয়ে চলো।'

মৃণাল প্রায় চমকে উঠেই বলল, 'আপনি রান্নাঘরে গিয়ে কী করবেন?'

সুজয়া বলল, 'দেখি কী করা যায়—'

'না—না, প্লিজ—'

সুজয়া মৃণালের বাধা গ্রাহ্য করল না। বলল, 'আমি তো আপনার জন্যে খাবার আনিনি। রান্নাঘরটা দেখতে যাব, তাতে আপত্তি কেন?' বলে ছেলেদের নিয়ে নীচে চলে গেল।

সুজয়া আগে কখনও রান্নাটান্না করেনি। পুণায় থাকতে মণিমোহন কলকাতা থেকে রাঁধুনি নিয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও রান্নার লোক আছে। না রাঁধলেও রান্না সম্পর্কে তার মোটামুটি

একটা ধারণা আছে। ছেলেদের নিয়ে হইচই বাধিয়ে সে রান্না চড়িয়ে দিল। ছেলেদেরও দারুণ উৎসাহ। সুজয়ার মুখ থেকে কথা বেরুবার আগেই তারা রান্নার নানারকম জিনিস হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে।

প্রতি সেকেন্ডে ভুল করছে সুজয়া। ছেলেরা তার ভুল শুধরে দিচ্ছে। অবশ্য তারা যে রেসিপির কথা বলছে তাতে রান্না কতদূর কী দাঁড়াবে, সে-সম্পর্কে সুজয়ার নিজেরই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবু একটা নতুন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। মজাও পাচ্ছে সুজয়া, ভালোও লাগছে।

এর মধ্যে মৃণাল, একবার ওপর থেকে নীচে নেমে এসে দুই হাত জোড় করে বলল, 'এভাবে আমাকে অপরাধী করার কোনও মানে হয়?'

সুজয়া বলল, 'নট আ ওয়ার্ড, প্লিজ! আপনি ওপরে যান।' একরকম জোর করেই মৃণালকে দোতলায় পাঠিয়ে দিল সে।

একসময় রান্নাবান্না চুকিয়ে ছেলেদের নিয়ে দোতলায় এল সুজয়া। একবার যখন সঙ্কোচের খোলা ভেঙে সে রান্নাঘরে চলে যেতে পেরেছে তখন অন্য ঘরগুলোও ছাড়বে না। ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মৃণালের ঘরটা ধুয়ে মুছে গুছিয়ে ফিটফাট করে তুলল।

দু-হাত জোড় করে মৃণাল সুজয়ার পেছনে ঘুরতে-ঘুরতে অনবরত বলতে লাগল, 'এর কোনও মানে হয়...এর কোনও মানে হয়...'

সুজয়া বলল, 'আমি নোংরা দু-চক্ষে দেখতে পারি না। যান, স্নান করে আসুন। অনেক বেলা হয়ে গেছে।' ছেলেদেরও তাড়া দিয়ে স্নান করিয়ে নিল সে; নিজেও স্নান করল। তারপর হইহই করে সবাই একসঙ্গে খেতে বসে গেল।

খেতে-খেতে সুজয়া জিগ্যেস করল, 'রান্নাটা কেমন হয়েছে?'

মৃণাল বলল, 'একসেলেন্ট।'

'ফ্ল্যাটারি?'

'একেবারেই না।'

'জানেন, আজকের দিনটা আমার লাইফে রেড লেটার ডে। আজই প্রথম আমি রান্না করলাম।'

মৃণাল বলল, 'প্রথম দিনের পক্ষে আপনার পারাফরমেন্স ব্রিলিয়ান্ট।' একটু চুপ করে থেকে গভীর গলায় আবার বলল, 'আমার মা ছাড়া এমন যত্ন করে আমাকে আর কেউ খাওয়ায়নি। তবে আপনার ভীষণ কষ্ট হল, এটাই আমার খারাপ লাগছে।'

'সেই সঙ্গে আনন্দও যে হল সেটা তো দেখলেন না। সবাই মিলে কীরকম একটা গ্র্যান্ড ফিস্ট করা হল।'

খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ জিরিয়ে রিসার্চের কাজ শুরু হল।

এগারো

মাঝখানে টালিগঞ্জে গল্‌ফ কম্পিটিশনের একটা দিন বাদ দিলে রোজ সকালে উলটোডাঙায় চলে আসে সুজয়া। ছেলেদের নিয়ে হুল্লোড় বাধিয়ে রান্না করে, তারপর একসঙ্গে বসে খায়। সব কিছু তার কাছে একটা মজার খেলা যেন।

গল্‌ফ কম্পিটিশনের দিনটা আসা যায়নি। কারণ হীরক আগে থেকেই টালিগঞ্জের টার্ফ ক্লাবের মাঠে যাওয়ার কথা বলে রেখেছিল এবং নিজে এসে সুজয়া এবং মণিমোহনকে নিয়েও যেতে চেয়েছিল। মণিমোহন বলেছিলেন তাকে আর আসতে হবে না; সুজয়াকে নিয়ে তিনিই টালিগঞ্জে চলে যাবেন। গিয়েছিলেনও।

বিকেল পর্যন্ত গল্‌ফ কোর্টের ধারে মণিমোহনের পাশে বসে-বসে কম্পিটিশন দেখেছে সুজয়া।

চারিদিকে ‘মড’ স্বাস্থ্যবান অসংখ্য মহিলা এবং পুরুষ, যুবক এবং যুবতী। দূরে নামি ঝকঝকে ইমপোর্টেড গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গল্‌ফের মাঠ যেন দিগন্তের ফ্রেমে আটকানো একখানা সবুজ কার্পেট। সেখানে সুখী উজ্জ্বল জীবনের ছড়াছড়ি।

কম্পিটিশনের ফাঁকে দুপুরে একবার লাঞ্চের ব্রেক হয়েছে। সুজয়া আর মণিমোহন হীরকের গেস্ট; তাঁরা এখানেই খেয়েছেন। লাঞ্চের পর আবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

দুপুরের একটু পর প্রতিযোগিতায় নামার জন্য হীরকের ডাক পড়েছে। সে মাঠে নামতেই চারিদিক থেকে হাততালি এবং চিৎকার শুরু হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল হীরক খুবই জনপ্রিয়।

গল্‌ফ স্টিকের স্ট্রোকে সাদা বলগুলোকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যখন হীরক পৌঁছে দিচ্ছে সেই সময় মণিমোহন সুজয়ার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, ‘হি ইজ আ ভেরি ব্রাইট বয়। কেমন পপুলার দেখছিস?’

ঝলমলে সুখী স্বাস্থ্যবান এবং ভাগ্যবান মানুষদের মাঝখানে বসে থেকেও অন্যমনস্কর মতো উলটোডাঙার এক ঘিঞ্জি নোংরা পাড়ায় একট রুগ্‌ণ কৃশ অসুস্থ যুবকের মুখ বারবার ভাবছিল সুজয়া। যদিও ছেলেদের সে আগের দিনই বলে এসেছিল, কীভাবে রান্না করবে, কখন মৃণালকে খেতে দেবে ইত্যাদি, তবু মৃণালের খাওয়া হল কিনা কে জানে। যা উদাসীন মানুষ! মণিমোহনের কথায় চমকে ঘাড় ফিরিয়ে সে বলেছিল, ‘ও, হ্যাঁ—’

মণিমোহন এবার বলেছিলেন, ‘ওর বাবা-মা’ও চমৎকার মানুষ। প্রায়ই ফোনে কথা হয় ওঁদের সঙ্গে।’

বাবা যে হীরকের মা-বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন, এটা সুজয়া জানত না। সে অবাকই হল, ‘তাই নাকি!’

‘হ্যাঁ।’

‘ওঁরা একটা কথা বলছিলেন–

‘কী?’

কথাটা আর সেই মুহূর্তে শোনা হয়নি। আচমকা গল্‌ফ কোর্টের ধার থেকে উল্লসিত চিৎকার উঠেছিল, ‘ফাইন, একসেলেন্ট, সুপার্ব—

সুজয়ারা মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল, স্টিকের একটা দুর্দান্ত স্ট্রোকে বলটাকে নির্ভুল লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে হীরক।

এরপর চিৎকার আর হইচই থামতেই চায়নি; স্ট্রোকের পর স্ট্রোকে বলটাকে নির্দিষ্ট টার্গেটে পাঠিয়ে যাচ্ছিল হীরক।

সন্ধের আগে গল্‌ফ কম্পিটিসন শেষ হলে দেখা গিয়েছিল হীরক সেকেন্ড হয়েছে।

রাত্তিরে কম্পিটিশনের অর্গানাইজাররা নামকরা একটা হোটেলে ডিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন। হীরকের গেস্ট হিসেবে সুজয়াদেরও ইনভিটেসন ছিল। তবে ওরা যায়নি; গল্‌ফ কোর্স থেকেই হীরকের কাছে বিদায় নিয়ে ঢাকুরিয়া ফিরে গিয়েছিল।

বাড়ি যেতে-যেতে মণিমোহন আবার হীরকের মা-বাবার কথা তুলেছিলেন। বলেছিলেন, ‘ওঁরা সেদিন বললেন হীরক শিগগিরই ওদের ফ্যাক্টরিতে জয়েন করবে।’

আস্তে করে সুজয়া বলেছিল, ‘ও, আচ্ছা—’

মণিমোহন মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে এবার বলেছিলেন, ‘হীরককে তোর কেমন মনে হয়?’

খুব সহজভাবে সুজয়া বলল, ‘কেন, ভালোই তো।’

‘তোর কাকা-কাকিমাদেরও ওকে খুব পছন্দ। আমিও হীরকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি।

স্পোর্টসের জন্যে হোল ইন্ডিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। বিরাট-বিরাট বিজনেস আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসের ছেলেদের সঙ্গে এই কানেকশানে ওর বন্ধুত্ব। ও ফ্যাক্টরিতে বসলে দু-দিনে শাইন করে যাবে।'

বাবার এই কথাটা ঠিক। সেদিন হোটেলে হরিচাঁদদের সঙ্গে গল্প করার সময় এর আভাস পেয়েছিল সুজয়া। তবে সব মিলিয়ে মণিমোহন যা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন সেটা অন্যরকম। একটু হেসে সুজয়া বলেছে, 'তুমি যা বলছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মণিমোহন জিগ্যেস করেছিলেন, 'তুই এ-ব্যাপারে কিছু বলবি?'

বাবা তার স্বাধীন মতামতে কখনও বাধা দেন না। আপাতত বিয়ের ঝামেলায় না গিয়ে সে যখন রিসার্চ করবে ঠিক করেছিল তখন মণিমোহনই তাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তবু বাবা গল্ফ কম্পিটিশন থেকে ফেরবার পথে সেদিন আভাসে যে প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তার কারণ একটাই। হয়তো হীরক বা তার মা-বাবার দিক থেকে কোনও প্রপোজাল এসে থাকবে। সুজয়া বলেছিল, 'এই সবে রিসার্চ শুরু করলাম; যাক না কিছুদিন।'

'তুই রিসার্চ কর না। এক্ষুনি বিয়ে করতে কে বলছে? তুই রাজি থাকলে ওদের সঙ্গে সে-কথা বলতে পারি। মনে হচ্ছে ওরা খুব ইগার।'

'এখন ওসব থাক বাবা।'

'ঠিক আছে। তোর যখন ইচ্ছা হয় বলিস। আমি তোকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চাইছি না। একটা সত্যি কথা বলছি, হীরক ছেলেটা কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট।'

হীরক সম্পর্কে বাবা তাঁর মনোভাব সেদিন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক গল্ফ কম্পিটিশনের পরের দিন হীরকের সঙ্গেই আবার উলটোডাঙায় এসেছিল সুজয়া। অন্যদিন সুজয়াকে মৃণালদের বাড়ির দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় হীরক। আসলে সে ভয়ানক ছটফটে। এক জায়গায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে তার ভালো লাগে না। তা ছাড়া যেখানে রিসার্চের মতো একটা সিরিয়াস কাজ চলছে সেখানে বসে থেকে সুজয়াদের অসুবিধা করার মানে হয় না।

সেদিন কিন্তু সুজয়ার সঙ্গে হীরক ভেতরে এল। হুল্লোড় বাধিয়ে বলল, 'জানিস মৃণাল, কাল কম্পিটিশনে আমি সেকেন্ড হয়েছি।'

মৃণাল বলেছে, 'এটা কোনও নিউজই না। ট্রফি তো তুই পাবিই। যদি না পেতিস, তা হলে সেটা হত খবর।' বলে হাসল।

'থ্যাঙ্ক ইউ। যা জানাবার তা জানিয়েছি। এবার আমি পালাই। আমি থাকলে তোমাদের কাজে ডিসটারব্যান্স হবে। যাই—' হীরক চলে গিয়েছিল।

মৃণাল এবার সুজয়াকে বলেছিল, 'কাল গল্ফের মাঠে দিনটা কেমন কাটল?'

ওদের কথার মধ্যে নীচের ছেলেরা এসে হাজির। সুজয়া একটু আগে যখন এ-বাড়িতে ঢুকেছিল, একতলায় ওদের দেখতে পায়নি; খুব সম্ভব ওরা বাইরে কোথাও গিয়েছিল। ফিরে এসে জানতে পেরে ওপরে উঠে এসেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটু হেসে সুজয়া মৃণালকে বলেছিল, 'কাল খুব এনজয় করেছি—'

মৃণাল বলেছিল, 'হীরকের সঙ্গে থাকলে লাইফকে বড় কালারফুল আর চার্মিং মনে হয়। মনে হয় বেঁচে থাকাটা বড় সুখের।'

চোখ বড় করে রগড়ের গলায় সুজয়া বলেছিল, 'আপনারা দুই বন্ধু ফ্ল্যাটারি ক্লাব খুলেছেন নাকি?'

মৃণাল থতমত খেয়েছিল, 'মানে—'

'একজন আরেকজনকে প্রশংসা ছাড়া তো আর কিছুই করেন না দেখছি।'

মৃণাল হেসে ফেলেছিল।

সুজয়া এবার জিগ্যেস করেছিল, 'কাল কী-কী করলেন বলুন। খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করেছেন?'

মৃণাল উত্তর দেওয়ার আগেই ছেলেরা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলেছিল, 'না-না, অল্প একটু খেয়েছিল। আর সব ফেলে রেখেছে—'

মৃণাল বিব্রতভাবে ছেলেদের বলেছে, 'এই যা, নীচে যা এখন। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে এসেছে।'

ছেলেরা জানিয়েছিল, মৃণাল তো সুজয়ার মতো তাদের ভয় পায় না। তারা জোর করে খাওয়ায় কি করে?

মৃণাল এবার তাড়া লাগিয়ে ছেলেদের নীচে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর সুজয়ার দিকে ফিরে হেসে-হেসে বলেছে, 'ওদের কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি ঠিকই খেয়েছি। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনি রোজ-রোজ এসে কাছে বসে খাইয়ে হ্যাবিট খারাপ করে দিয়েছেন। কাল আসেননি, ভালো লাগছিল না।'

সুজয়ার মনে হয়েছিল, 'এই দুর্বল, অসুস্থ যুবকটি তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে।

বারো

দেখতে-দেখেতে এক মাস কেটে গেল। শরৎ শেষ হয়ে গেছে। এখন হেমন্তকাল, সময়টা আকাশের গায়ে ধূসর ব্রাশ টানতে শুরু করেছে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে হিমের মিহি গুঁড়ো। এর মধ্যেই একটি-দুটি করে গাছের পাতা ঝরছে। কিছুদিনের মধ্যেই শীত এসে যাবে। তাই কোনও অদৃশ্য চতুর মেক-আপ ম্যান শীতের মেজাজ ফোটাবার জন্য এখন থেকেই চারিদিক নিজের হাতে সাজিয়ে দিচ্ছে।

এই এক মাস ধরে সুজয়া রোজ উলটোডাঙায় যাচ্ছে, আসছে। সেই যে পনেরো দিন ছুটি নিয়েছিল মৃণাল, সেটা আরও এক মাস বাড়িয়ে নিয়েছে। কেননা তার শরীরটা একদিন একটু ভালো থাকে তো চার দিন খারাপ থাকে। অসুস্থ শরীর নিয়ে কলেজে গিয়ে ক্লাসে-ক্লাসে চেঁচাতে কার আর ভালো লাগে!

সুজয়া মণিমোহনকে দিয়ে মৃণালের শরীরের থরো একটা চেক-আপ করিয়ে নেওয়ার কথা প্রথম-প্রথম প্রায়ই বলত। কিন্তু মৃণাল একেবারেই রাজি নয়। এ-ব্যাপাটায় কেন যে তার গোঁয়ার্তুমি সুজয়া বুঝে উঠতে পারে না। অগত্যা একজন লোকাল ডাক্তারকে দেখিয়ে গাদা-গাদা ভিটামিন ট্যাবলেট আর টনিক সে নিজেই কিনে এনেছে। সেসব খাইয়েও তেমন কিছুই হচ্ছে না মৃণালের।

প্রায় রোজই উলটোডাঙায় এসে সুজয়া দেখতে পায় চুপচাপ পেটে হাত চেপে কিংবা চোখ বুজে শুয়ে আছে মৃণাল। তার সারা মুখে ক্লান্তি এবং যন্ত্রণার ছাপ।

সুজয়া এলেই কিন্তু মৃণালের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার দু-চোখ খুশিতে চকচক করতে থাকে। প্রাণপণে শরীরের সব যন্ত্রণা মুছে হাসিমুখে সে বলে, 'আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

সুজয়া জানে সে আসবে বলেই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে মৃণাল।

মৃণালের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে ছেলেদের সঙ্গে একতলায় রান্না করতে চলে যায় সুজয়া। এই রান্নার ব্যাপারটায় একেবারে কুঁকড়ে থাকে মৃণাল। কিন্তু সুজয়াকে বাধা দেওয়ার মতো ক্ষমতা তার নেই। সুজয়া জানে একটা রান্নার লোক খুঁজে দেওয়ার জন্য সে চারিদিকে বহু লোক লাগিয়ে

রেখেছে। কিন্তু এখনও তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে শুরু হয় পড়াশোনার কাজ। সেই সময় মৃণালকে আর চেনাই যায় না। ইতিহাসের জাদুঘর থেকে তুলে এনে একের-পর-এক সিনেমা স্লাইডের মতো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক ছবি সে চোখের সামনে তুলে ধরতে থাকে।

যেভাবে কাজ এগুচ্ছে তাতে আর কয়েক মাসের মধ্যেই থিসিস জমা দেওয়া যাবে। আসলে সবই করে রেখেছে মৃণাল। শুধু তার নামের জায়গায় থিসিসে সুজয়ার নামটা বসবে।

সুজয়া বোঝে এই থিসিস ছাপা হয়ে বেরুলে হিস্টোরিয়ানদের মধ্যে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে। কিন্তু অদ্ভুত এক সংকোচ আর দ্বিধা তাকে সবসময় অস্বস্তিতে রাখে। মনে হয় অন্যের খাটুনির ফসল সে চুরি করে নিচ্ছে। যদিও নিজের ইচ্ছায় মৃণাল তার রিসার্চের সব পেপার তাকে দিয়েছে, তবু দ্বিধান্বিত ভাবটা কিছুতেই কাটতে চায় না সুজয়ার।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে-করতে সুজয়া মাঝে-মাঝেই বলে, 'দেখুন, এ আমার খুব খারাপ লাগছে। নিজের কাছে ভীষণ ছোট হয়ে যাচ্ছি।'

মৃণাল জিগ্যেস করে, 'কেন বলুন তো?'

কারণটা জানিয়ে দেয় সুজয়া। মৃণাল বলে, 'এ-কথা তো আপনি অনেক বার বলেছেন। ব্যাপারটা কি জানেন, আমার পেপারগুলো তো পড়েই থাকত। নষ্ট হয়ে যেত। আপনার কাজে লাগছে। এতেই আমি খুশি।'

'কিন্তু—'

'আপনি কোনও সংকোচ করবে না সুজয়াদেবী। ভাবুন না, একজন বন্ধুর কাছ থেকে আপনি কিছু উপহার পেলেন।'

'তার বদলে আমি তো কিছুই দিতে পারছি না।'

'যেখানে বন্ধুত্ব সেখানে দেয়া-নেয়ার কথা আসে কীসে? তা ছাড়া আপনি দ্যাননি কে বললে! যা দিয়েছেন তার ঋণ কি শোধ করা যায়!'

মৃণাল কী ইঙ্গিত করছিল, সুজয়া বুঝেছে। সে বললে, 'কী আর দিয়েছি!'

মৃণাল বলল, 'আপনার পক্ষে তো অ্যাসেস করা সম্ভব নয়। যে পেয়েছে সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে।'

সুজয়া এরপর কী বলবে ভেবে পায় না। এই রোগা উদাসীন অন্যমনস্ক মানুষটি সম্পর্কে তার আকর্ষণ ক্রমশ আরও বাড়তে থাকে।

তেরো

ওদিকে হীরক সম্পর্কেও সুজয়ার প্রবল আকর্ষণ। যত দিন যায় সেটা এতটুকু কমে না; বরং বেড়েই চলে।

রোজ সকালে হীরক তাকে মৃণালের কাছে যেমন পৌঁছে দিয়ে যায়, বিকেলে তেমনি ঢাকুরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার আসে। গাড়িতে তুলেই সে কিন্তু সুজয়াকে বাড়ি পৌঁছে দেয় না। হীরক তাকে নিয়ে যায় কোনও বন্ধুর বাড়ি কিংবা ময়দানের কোনও খেলার আসরে অথবা ওয়াই-এম-সি-এ'র কোনও ইনডোর গেমের কমপিটিশনে। সুখী স্বাস্থ্যবান তাজা যুবক-যুবতীদের হইচই বা হুল্লোড়ে সময় সেখানে টগবগ করে ফুটছে। কোনও-কোনও দিন হীরক তাকে কোনও মজার বিদেশি ছবি দেখাতে নিয়ে যায় কিংবা গাড়িতে প্রচণ্ড স্পিড তুলে চলে যায় ডায়মন্ডহারবারে বা বি টি রোড

ধরে অনেক—অনেক দূরে। জীবন কোথায় সফেন আনন্দ পানাপাত্রে বোঝাই করে রেখেছে হীরক তার খোঁজ জানে। তার কাছে এলে মনেই হয় না এই পৃথিবীতে কোনও সমস্যা আছে। বেঁচে থাকাটা যে কি সুখের, কি উত্তেজনার, তার কাছে এলে প্রতি সেকেন্ডে টের পাওয়া যায়। জীবনকে বড় কাম্য তার লোভনীয় মনে হতে থাকে। হীরকের সঙ্গে দু-মিনিট থাকলে নেশা ধরে যায়।

সুজয়ার একদিকে মৃণাল, আরেক দিকে হীরক। এক দিকে উদাসীনতা, বিষণ্ণতা, আরেক দিকে প্রচণ্ড প্যাশন, স্পিড, আনন্দ। একজন নিজেকে গুটিয়ে রাখে, জীবন সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ বা আকাঙক্ষা তার নেই। আরেক জন নিজেকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ ছটফট করছে; প্রবল উচ্চাকাঙক্ষী সে।

এই দুই বিপরীত প্যাটার্নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সুজয়া। তার সমস্যা বা আনন্দ, দু-জনকেই সে পছন্দ করে। দু-জনকেই তার ভালো লাগে।

এর মধ্যে একটা ছোট ঘটনা ঘটল। রোজই মৃণালদের বাড়ির কাছে সকালে সুজয়াকে নামিয়ে দিয়ে যায় হীরক; তারপর আবার বিকেলে আসে। কিন্তু একদিন আচমকা দুপুরে চলে এল সে। তখন রান্না শেষ হয়ে গেছে সুজয়াদের। সবাই হুল্লোড় করে খাচ্ছে।

বড়-বড় অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ভাত-ডাল-মাছ সাজানো রয়েছে। সুজয়া মৃণালের কাছাকাছি বসে খাচ্ছিল আর মাঝে-মাঝেই বাঁ হাতে বড় চামচে করে ভাত-মাছ-তরকারি মৃণালের পাতে দেওয়ার জন্য তুলে-তুলে নিচ্ছিল।

মৃণাল দু-হাতে পাত আগলে রেখে জোরে-জোরে মাথা নাড়ছিল আর বলছিল, 'না-না, প্লিজ আর দেবেন না। এত আমি খেতে পারি না। মরে যাব—'

'না খেয়ে-খেয়ে নিজের যা অবস্থা করছেন, হুঁশ আছে! হাত সরান—' জোর করে মৃণালের হাত সরিয়ে সুজয়া মাছ-টাছ তার পাতে দিচ্ছিল।

কতক্ষণ এভাবে খাওয়া-দাওয়া চলছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় ছেলেদের চিৎকারে মৃণাল আর সুজয়া মুখ তুলতেই দেখতে পেল হীরক দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। মৃণাল বলল, 'কি রে, তুই কখন এসেছিস?' বলেই লক্ষ করল হীরকের মুখে ছায়ার মতো কী যেন স্থির হয়ে আছে।

সুজয়াও সেই ছায়াটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু দু-এক সেকেন্ড মাত্র। তারপরেই হীরক বলে উঠল, 'এই তো এলাম। তোরা তো গ্র্যান্ড ফিস্ট লাগিয়ে দিয়েছিস!' বলতে-বলতে ঘরে ঢুকে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসল।

মৃণাল বলল, 'আমরা তো রোজই ফিস্ট করছি। তুইও বসে পড়—

'না রে, এইমাত্র খেয়ে এসেছি। তোরা খা।'

মৃণাল এবার বলল, 'জানিস, সুজয়াদেবীকে ভীষণ খাটিয়ে নিচ্ছি!' বলে একটু হাসল।

হীরক জিগ্যেস করল, 'কীরকম?'

'এই যে ফিস্ট দেখছিস এটা ওঁর জন্যেই। রোজ উনি নিজে রান্নাটান্না করে আমাদের খাওয়াচ্ছেন। দ্যাখ তো, কোনও মানে হয়!'

সুজয়া আর মৃণাল লক্ষ করল হীরকের মুখে সেই ছায়াটা আবার ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সে মৃণালদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'সুজয়া এখানে এসে রান্না করে! কই আমাকে তো কিছু বলেনি!'

সুজয়া বলল, 'কী বলব! এর আবার কি বলবার আছে!'

হীরক চুপ করে রইল।

মৃণাল বলল, 'বারণ করলে একেবারেই শোনেন না। ওঁর বাবা বা বাড়ির লোকেরা জানতে পারলে আমার সম্বন্ধে কী ভাববে বল তো হীরক। সবসময় আমি এত লজ্জায় থাকি!'

হীরক এবারও চুপ।

সুজয়া বলল, 'কেউ কিছু ভাববে না, আপনি খান।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সুজয়া বলল, 'আজ আর পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করছে না। হীরক এসেছে, আড্ডা দিয়ে আজকের দুপুরটা কাটিয়ে দেব।'

মৃণাল হাসল, 'আপনার যা ইচ্ছা।'

এরপর কথায়-কথায় দুপুরের রোদ হলুদ হয়ে আসতে লাগল। হীরকও এলোমেলো নানা বিষয়ে প্রচুর কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কোথায় যেন অর্কেস্ট্রা মসৃণভাবে বাজছে না; বারবার কোথায় একটা তাল যেন কেটে যাচ্ছে। সেটা সুজয়া টের পাচ্ছে। হয়তো মৃণাল এবং হীরকও।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর যেন ক্লান্ত হয়েই সুজয়া বলল, 'আর বক-বক করতে ভালো লাগছে না, অনেকদিন গান শুনিনি। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজান।'

মৃণাল উঠে পড়ল। ঘরের কোণে একটা কাঠের স্ট্যান্ডে রেকর্ড প্লেয়ার ছিল আর ছিল গাদা-গাদা রেকর্ড। মৃণাল সেখানে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'কোন গানটা শুনবেন?'

সুজয়া বলল, 'রবীন্দ্রনাথের গান যা শুনব তাই ভালো লাগবে। আপনি পছন্দ করে একটা বাজান না।'

খানিকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটির পর রেকর্ড প্লেয়ারে একটা রেকর্ড বসিয়ে চালিয়ে দিতেই বেজে উঠল, 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তুমি জান নাই তুমি জান নাই, তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।'

গান শুনতে-শুনতে আচমকা সুজয়া লক্ষ করল, হীরকের মুখে সেই ছায়াটা আরও গাঢ় হয়ে ফিরে এসেছে।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার সময় হীরক বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব।'

উইন্ডস্ক্রিনের বাইরের আলোকিত রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল সুজয়া। আস্তে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'কী কথা?'

তক্ষুনি উত্তর দিল না হীরক। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দ্বিধান্বিতের মতো বলল, 'আজ থাক।'

সুজয়া আর কোনও প্রশ্ন করল না। অশোভন কৌতূহল তার স্বভাবসিদ্ধ নয়, জোর করে সে কিছু জানতে চায় না। হীরকের যখন ইচ্ছা হবে, বলবে।

এরপর রোজই ফেরার সময় হীরক বলতে লাগল, একটা বিশেষ দরকারি কথা সুজয়াকে বলবে। কিন্তু আজ না কাল, কাল না পরশু—এই করে-করে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। কথাটা তারও বলা হয়নি; সুজয়ারও শোনা হয়নি।

চোদ্দো

অক্টোবরের শেষাশেষি মৃণালের কাছে রিসার্চের কাজ শুরু করেছিল সুজয়া। তারপর চারটে মাস পার হয়ে গেছে। এখন ফেব্রুয়ারি চলছে। কলকাতায় শীতের মরশুম এখন জমজমাট। উত্তুরে হাওয়া সাঁই-সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। হিমে-কুয়াশায় চারিদিক আড়ষ্ট।

এই চার মাসে মৃণালের শরীর আরও খারাপ হয়েছে। ছুটি অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল

তার। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থেকে শুরু করে একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বাররা সবাই মৃণালকে খুব পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। তার খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য আরও ছ'মাস তাঁরা স্পেশাল লিভ স্যাংশান করেছেন।

আগে সুজয়া সকাল ন'টার মধ্যে হীরকের সঙ্গে উলটোডাঙায় চলে আসত। আজকাল অত তাড়াতাড়ি আসে না; তবে খাওয়াদাওয়ার পর এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে চলে আসে। কেন না এর মধ্যে একটা রান্নার লোক জোগাড় করে নিয়েছে মৃণাল।

লোক জুটলেও বাচ্চাদের মতো ধমক-ধামক না দিলে, জোরজার না করলে মৃণাল ঠিকমতো খায় না। তাই আগে আগেই সুজয়াকে আসতে হয়। তা ছাড়া সুজয়া বুঝতে পারে সে আসবে বলে সর্বক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে মৃণাল। মুখে কিছু বলে না সে, তার উজ্জ্বল চোখ দেখে তা টের পাওয়া যায়।

এদিকে মৃণালের শরীর দ্রুত আরও খারাপ হচ্ছে বলে প্রায়ই লোকাল ডাক্তারকে ডেকে আনে সুজয়া। মৃণাল এমনিতে খুবই শান্ত, নিরীহ, নম্র, কিন্তু কিছুতেই পাড়ার ডাক্তার ছাড়া কোনও স্পেশালিস্টের কাছে যাবে না; এ-ব্যাপারে তার প্রচণ্ড গোঁয়ার্তুমি। যাই হোক, গাদা-গাদা ট্যাবলেট, মিক্সচার আর টনিক কিনে এনে সুজয়াকেই তাড়া দিয়ে খাওয়াতে হয়। কিন্তু সারাদিনে ক'ঘণ্টা আর সে থাকে! যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ নিয়ম করে ওষুধ না হয় খাওয়াল। কিন্তু দিনের বাকি সময়টা? সুজয়ার সন্দেহ তখন ওষুধ-টষুধ খায় না মৃণাল; ফেলে দেয়।

একেক দিন সুজয়া বলেল, 'আপনাকে ওষুধ আর ভাত খাওয়াবার জন্যে দেখছি সারাজীবন এখানে এসে থাকতে হবে।'

মৃণালের চোখে আলোর মতো কিছু ফুটে ওঠে। পরক্ষণে মৃদু গলায় সে বলে, 'কী যে বলেন!'

এই চার মাসে রিসার্চের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মৃণালই সবকিছু আগে করে রেখেছিল। সেটাই একটু এদিক-সেদিক করে এখন টাইপ করা হচ্ছে।

এই চারমাসে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সুজয়া। আগে হীরক তাকে মৃণালদের বাড়ির দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত, এখনও যায়। কিন্তু সেদিন, মৃণালের সঙ্গে তাকে যেদিন কাছাকাছি বসে খেতে দেখেছিল, পরে রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছিল—সেই থেকে হঠাৎ হঠাৎ ওদের পড়াশোনার ফাঁকে চলে আসে হীরক। কিছুই সে বলে না, খানিকক্ষণ বসে থাকে, হয়তো চলে যায়; নইলে খাটের এক ধারে শুয়ে থাকে। তার মনের কিছুটা স্পষ্ট, অনেকটাই অন্ধকারে ঢাকা।

পনেরো

মার্চের শেষাশেষি সুজয়ার থিসিসটা টাইপ করা হয়ে গেল। এবার প্রফেসর সোমনাথ দত্তকে একবার দেখিয়ে সাবমিট করা হবে।

থিসিস জমা দেওয়ার দিনকয়েক আগে মৃণালদের বাড়ি থেকে ফেরার সময় হীরক সুজয়াকে বলল, 'এত দিন তোমার রিসার্চ চলছিল; ডিসটার্ব করিনি। এবার আমার সেই কথাটা বলার সময় হয়েছে।'

হীরক কী বলবে, সুজয়া জানে। কিছুদিন ধরে বাড়িতে তার ইঙ্গিত পাচ্ছে। কাকারা, কাকিমারা এমনকি বাবাও হীরকের ব্যাপারে একটা ডিসিশন নিতে বলছেন। গবেষণার কাজ শেষ হয়ে গেছে; এখন আর বিয়েতে আপত্তি কীসের! বাবা কাকা আর কাকিমাদের কথা শুনতে-শুনতে একটি পরনির্ভর সরল রুগ্‌ণ নিঃসঙ্গ যুবকের মুখ বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সে কাউকে কোনও উত্তর দেয়নি।

সুজয়া হাসল, 'সময় যদি হয়ে থাকে বলে ফেল—'

হীরক বলল, 'তুমি কি কিছু বুঝতে পারো না?'

'পারলেও তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।'

'তবে আর ক'টা দিন ওয়েট করো।'

'আমি তো ক'মাস ধরেই ওয়েট করে আছি।'

হীরক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আসছে মাসে ব্যাঙ্গালোরে আমার একটা রোয়িং কমপিটিশন আছে। সেখান থেকে মোটর র‍্যালিতে লখনউ, লখনউ থেকে ফিরেই বাবার ফ্যাক্টরিতে জয়েন করছি। ধরো একটা মাস, তারপর বলব।'

ষোলো

থিসিস জমা দেওয়ার পর বাড়ির আবহাওয়া ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। কেউ জোরজার করছে না ঠিকই, তবে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে কাকারা-কাকিমারা হীরককে বিয়ের কথা বলতে লাগলেন। সুজয়া বড় হয়েছে, বিয়ে তো তাকে করতেই হবে। হাতের কাছে যখন এরকম একটা ভালো ছেলে এসেই গেছে তখন আর দেরি করার মানে হয় না। এতগুলো মানুষ তাকে ক্রমশ হীরকের দিকে ঠেলে দিতে লাগল।

এর মধ্যে হীরক একদিন বাঙ্গালোরে চলে গেল। যাওয়ার আগে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে গেল। এক মাস বাদে ফিরে এসে তার সেই কথাটা বলবে।

হীরক চলে যাওয়ার পর বাড়ির গাড়ি নিয়ে একা একাই সুজয়া উলটোডাঙায় আসে। সে ড্রাইভ করতে জানে। হীরকের সঙ্গে যাওয়া-আসা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজকাল কেমন যেন খারাপ লাগে; মনে হয় কোথায় খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গেছে। তবু এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে সে। আজকাল সুজয়ার মনে হয়, তার আর মৃণালের মাঝখানে অদৃশ্য কাচের দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হীরক। তার আচরণে বা কথায় বার্তায়, কোথাও বিন্দুমাত্র অশোভনতা নেই। হীরক অত্যন্ত ভদ্র মার্জিত এবং রুচিশীল। তবু তাকে পেরিয়ে প্রাণ খুলে সে মৃণালের সঙ্গে যেন কথা বলতে পারত না।

হীরক এখন নেই কিন্তু বাড়ির সেই চাপটা রয়েছেই। হীরক বাঙ্গালোর থেকে ফিরলে কেউ আর দেরি করতে চায় না; প্রথম বিয়ের তারিখেই কাজ চুকিয়ে ফেলতে চায়। নানুটা আমেরিকায় বিয়ে করল; আনন্দ করতে না পারার জন্য সবারই মন খারাপ হয়েছিল। বাড়িতে অনেকদিন উৎসব-টুৎসব হয়নি; সুজয়ার বিয়েটাকে ঘিরে সবার ইচ্ছা প্রচুর আনন্দ করে।

বাড়ির চাপ যত বাড়ছে, রুগ্‌ণ অসুস্থ পরনির্ভর মৃণাল তার কাছে ততই যেন এগিয়ে আসছে। সে এমন একটা মানুষ, তাড়া না দিলে খায় না, নিজের কোনও ব্যাপারেই তার খেয়াল নেই। হীরকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেলে কে মৃণালকে দেখবে? হঠাৎ সুজয়া নিজের সঙ্গে পরপর দু-রাত যুদ্ধ করে মৃণালের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

একদিন দুপুরে মৃণালের কাছে এসে তার খাওয়া হলে বলল, 'চলুন, একটু ঘুরে আসি—'

ক'মাস ধরে রোজ নিয়মিত এখানে আসছে সুজয়া, কিন্তু কখনও বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেনি। একটু অবাক হয়েই মৃণাল বলল, 'কোথায়?'

'যেখানে হোক—'

'হঠাৎ এ খেয়াল?'

'আরে উঠুন না।'

মৃণালকে নিয়ে একসময় বেরিয়ে পড়ল সুজয়া। এ ক'মাসে হীরক তাকে কলকাতার রাস্তা-টাস্তা মোটামুটি চিনিয়ে দিয়েছে। এলোমেলো এখানে-ওখানে ঘুরে ময়দানে এসে গাড়ি থামাল। তারপর মৃণালকে নিয়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর দূরে চৌরঙ্গির স্কাইস্ক্রেপারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেকদিন থেকে একটা কথা ভাবছি—'

মৃণাল জিগ্যেস করল, 'কী?'

'তোমাকে 'আপনি' করে বলতে ইচ্ছা করে না।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল মৃণাল। তারপর কোমল হেসে বলল, 'তুমি করেই বোলো। এই কথা বলার জন্যে বাড়ি থেকে নিয়ে এলে?'

'না। আরও কিছু বলার আছে।'

'কী?'

'তুমি কোনও ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিস চেনো?'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'চিনি। এবার বলো কেন?'

'সেখানে একটা নোটিশ দিতে হবে।'

'কীসের নোটিশ?'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে লোকে কীসের নোটিশ দ্যায়?' বলে একটু চুপ করল সুজয়া। পরক্ষণে মুখ নামিয়ে একটা লম্বা ঘাসের ডগা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে খুব আস্তে নরম গলায় বলল, 'আমি তোমার কাছে এসে থাকব।'

মৃণাল চমকে উঠল, না, না, এ হয় না।'

'কেন হবে না?'

'আমি তোমার যোগ্য নই।'

'সেটা আমি বুঝব।'

'তা ছাড়া অন্য কারণও আছে। প্লিজ তুমি আমাকে অস্থির করে দিও না।'

'কোনও কারণ আমি শুনব না। তোমার জন্যেই আমি তোমার কাছে এসে থাকব। আমি না থাকলে তুমি বাঁচবে না।'

'দুর্বলের ওপর মেয়েরা চিরদিনই সদয়। কিন্তু আমার কথা ভেবে তুমি নিজের ক্ষতি কোরো না সুজয়া।'

'কেন তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাইছ? আমার কাছে তোমার কি কোনওরকম প্রত্যাশা থাকতে নেই?'

'দয়া করে সবদিক বুঝতে চেষ্টা করো। ইমোশানের মাথায় কোনও কাজ করা ঠিক নয়।'

'ক'দিন আমি সমানে ভেবেছি। হঠাৎ কোনও ডিসিশন নিইনি।'

'কিন্তু—'

'প্লিজ আর কোনও কথা না। আজই আমরা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিশ দেব। দেরি করলে চারিদিকের প্রেসারে আমি হয়তো দুর্বল হয়ে যাব। আমার শক্তি আর কতটুকু বলো—'

'আজ থাক; তুমি আরও ভালো করে ভেবে দেখো—'

'একটি মেয়ে যখন নিজের থেকে বিয়ের কথা বলে তখন সবদিক ভেবেই বলে।'

মৃণাল বলল, 'এই নিয়ে তোমাদের বাড়িতে গোলমাল হবে।'

সুজয়া বলল, 'প্রথম-প্রথম হবে; পরে নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে।'

একটু চুপ করে থেকে মৃণাল বলল, 'হীরকের কথা তুমি ভেবেছ?'

সুজয়া চমকে উঠল, "কারও কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'আমি তোমার ভাবার কথা বলেছি—'

তবে কি তার সম্পর্কে হীরকের তাকানো, কথাবার্তা বা আচরণে এমন কিছু ছিল যা মৃণালের চোখে পড়েছে। সুজয়া দূরমনস্কর মতো কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'বললাম তো, আমার সবদিক ভাবা আছে—'

একরকম জোর করেই শ্যামবাজারে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে মৃণালকে নিয়ে গিয়ে সুজয়া নোটিশ দিল। তিন সপ্তাহ বাদে তাদের বিয়ে হবে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রোরের কাছ থেকে বেরিয়ে মৃণাল বলল,'তুমি কিন্তু ভুল করলে।'

তার কথার উত্তর না দিয়ে সুজয়া বলল, 'বিয়ের দিন তিনজন উইটনেস সঙ্গে করে নিয়ে এসো।'

সতেরো

বিয়ের দিন পড়েছে রবিবারে। সকালবেলা উঠে স্নান করে চমৎকার করে নিজেকে সাজাল সুজয়া।

তেতলায় তখন কেউ ছিল না। নীচে কাকা-কাকিমারা আর মণিমোহন ছিলেন। সুজয়া সেখানে এসে সবাইকে প্রণাম করল।

সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কোনওদিন বেরুবার সময় এত সাজে না সুজয়া; এমন করে প্রণামও করে না।

বড় কাকা বললেন, 'হঠাৎ প্রণাম কেন রে?'

নতমুখে সুজয়া বলল, 'আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি বড় কাকা। তোমাদের আশীর্বাদ চাই।'

বাজ পড়ার পর যেমন স্তব্ধতা নামে, বাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য তেমনি চুপ করে গেল। তারপর অনেকগুলো গলা চিরে ক'টা শব্দ বেরিয়ে এল, 'বিয়ে! কাকে?'

'মৃণালকে।'

'মৃণালকে বিয়ে করবি! তুই কি পাগল হয়েছিস?'

'না; অনেক ভেবেই আমি এটা ঠিক করেছি।'

'আগে বলিসনি কেন?'

'তা হলে তোমরা বাধা দিতে।' বলতে-বলতে বিমূঢ় মানুষগুলোর সামনে দিয়ে লনে গিয়ে নামল সুজয়া; পামগাছের ভেতরে বাদামি নুড়ির রাস্তা পেরিয়ে একটু পর বাইরে চলে এল।

ততক্ষণে কাকা-কাকিমাদের হুঁশ ফিরে এসেছে। তাঁরা পেছন থেকে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই টুকু, শোন—শোন—'

আজ আর বাড়ির গাড়ি নিয়ে আসেনি সুজয়া। একটা ট্যাক্সি ধরে শ্যামবাজারে চলে এসেছিল।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে এসে সে দেখল মৃণাল তখনও আসেনি। তবে রেজিস্ট্রার, একজন সুদর্শন আলিপুর কোর্টের উকিল, তাঁর চেম্বারে অপেক্ষা করছিলেন। সুজয়াকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। বললেন, 'মৃণালবাবু একটু আগে এসেছিলেন। আপনার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন।'

চিঠিটা রেজিস্ট্রারের হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়তে লাগল সুজয়া।

'সুচরিতাসু,

তোমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এ-বিয়ে হতে পারে না। তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি। তা হল, আমি ক্যান্সারের পেশেন্ট। অনেকদিন আগেই, তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক আগে, রোগটা ধরা পড়েছিল। ক্যান্সার স্পেশালিস্ট জানিয়েছেন আমার আয়ু বড় জোর দু-বছর। অনিবার্য মৃত্যুকে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার পক্ষে তোমার ক্ষতি করা সম্ভব নয়।

হীরক তোমাকে ভালোবাসে। তার চোখমুখ দেখে আমি টের পেয়েছি। তুমি তাকে বিয়ে করলে আমি সুখী হব।

আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হীরকের নামে আমার বাড়িটা উইল করে উইলটা ডাকে ওদের সল্টলেকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ও বাঙ্গালোর আর লখনউ থেকে ফিরে এলে যা ভালো বোঝে করবে। ওদের প্রচুর পয়সা, আমার বাড়িতে যে অসহায় গরিব ছেলেরা থাকে তাদের যদি হীরক দেখে, কৃতজ্ঞ থাকব।

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। না চাইতেই অযাচিতভাবে তোমার যে করুণা পেয়েছি আমার জীবনে এর চাইতে মূল্যবান আর কিছুই নেই।

ইতি—মৃণাল।'

আঠারো

এক বছর কেটে গেছে। সুজয়া এর মধ্যে ডক্টরেট পেয়ে গেছে। হীরকের সঙ্গে তার বিয়েও হয়েছে। হীরক মৃণালের বাড়ি সারিয়ে সুরিয়ে সেই ছেলেগুলোকে সেখানেই থাকতে দিয়েছে; ওদের সব দায়দায়িত্ব এখন তার।

এই একবছরে হীরক প্রচুর খুঁজেছে মৃণালকে, পায়নি।

হঠাৎ একবছর বাদে হীরক আর সুজয়া ত্রিবান্দ্রম থেকে মৃণালের একটা চিঠি পেল। সে যা লিখেছে তা এইরকম ঃ

'আমি এখানকার একটা হাসপাতালে আছি। কাল অপারেশন হবে।

'আজ পুরোনো একটা স্পোর্টসের কাগজে পড়তে-পড়তে হঠাৎ তোমাদের বিয়ের ছবি চোখে পড়ল। বড় ভালো লাগল।

'অপারেশনের আগের দিন তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ তোমরা এসো না। হৃদয় খুঁড়ে কোনও বেদনার কারণ আমি হতে চাই না। আমার শুভেচ্ছা নিও—'

চিঠিটা পড়তে-পড়তে একটি উদাসীন অন্যমনস্ক রুগ্‌ণ পরনির্ভর মানুষের জন্য হীরক আর সুজয়ার চোখে জল এসে যায়।



মাঝখানে একজন

কলকাতা থেকে ট্রেনে প্রথমে শেরমুন্ডায় এসেছিল অতসী। সেখান থেকে ঠাসাঠাসি ভিড়ের বাস ধরতে হয়েছিল তাকে।

এ-বাসটা সোজাসুজি ধাতুরিয়ায় যায় না। শেরমুন্ডা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ন্যাশনাল হাইওয়ের গায়ে নবলপুরার ছোট্ট বাজারটার কাছে অতসীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল সেটা।

নবলপুরা থেকে খাড়া পাঁচ মাইল উত্তরে আদিবাসীদের গাঁ ধাতুরিয়া। এই রাস্তায় গাড়িঘোড়া বলতে কিছু নেই। না বাস, না টাঙ্গা. না একটা সাইকেল রিকশা। কাজেই নবলপুরার বাজার থেকে একটা ওঁরাও কুলি জোগাড় করে তার মাথায় সুটকেস, হোল্ড-অল চাপিয়ে এবং নিজের কাঁধে ওয়াটার বটল, হাতে বেতের বাস্কেট ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল অতসী।

কলকাতা থেকে কয়েক শো কিলোমিটার দূরে এই ছোটনাগপুরে পৃথিবী কোথাও সমতল নয়। যেদিকে যতদূর চোখ যায় মাঠের পর মাঠ। আর সেই মাঠ ঢেউয়ের মতো উঁচু-নীচু হয়ে আছে। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে, ততদূর পর্যন্ত শুধু খাড়া চড়াই আর ঢালু উতরাই। চারিদিকে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ঝোপঝাড়, ট্যারা-বাঁকা চেহারার সিসম গাছ, সমুন্নত শালের বন, মাঝেমধ্যে অর্জুন আর কেঁদের জটলা। আর এসবের ফাঁকে-ফাঁকে টুকরো-টুকরো গমের খেত, মকাইয়ের খেত, আখের খেত। খাড়া পাঁচ কিলোমিটার চড়াই-উতরাই ভেঙে অতসী যখন ধাতুরিয়ায় পৌঁছল তখন আকাশের গড়ানে পাড় বেয়ে-বেয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদ।

ধাতুরিয়া গ্রামটা মাঝারি আকারের একটা পাহাড়ের ঢালে। চারিদিকে কাঠ আর টিনের কিছু বাড়িঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, দূরে আরও কয়েকটা ছোটখাটো পাহাড়ের মাথায় বা ঢালে অনেকগুলো গাঁ চোখে পড়বে। আর যা দেখা যাবে তা হল আমলকী আর জলপাইয়ের বন। এ ছাড়া শ'য়ে-শ'য়ে সিসম গাছ তো আছেই।

অতসী আসবে, এ-খবর আগেই আদিবাসীদের এই গ্রামগুলোতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে আসছে এখানকার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে।

তাকে দেখবার জন্য বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতি, কাচ্চা-বাচ্চা মিলিয়ে কয়েক হাজার মানুষ গ্রামটার মুখে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝারি মাপের মজবুত তামাটে বা কুচকুচে কালো চেহারা, মোটা ঘন চুল, ভারী চোয়াল, নিষ্পাপ সরল চোখ, ধবধবে সাদা দাঁত ইত্যাদি দেখামাত্রই শনাক্ত করা যায় এরা ওরাওঁ বা সাঁওতাল।

এই ভিড়ের ভেতর ত্রিশ-বত্রিশ বছরের পাতলা লম্বাটে চেহারার একটি ফরসা বাঙালি যুবক এবং কুড়ি-বাইশ বছরের একটি লাজুক চেহারার বিহারি ছেলেকেও দেখা যাচ্ছে।

অতসীরা কাছাকাছি আসতেই বাঙালি যুবকটি এগিয়ে এল। তার পেছন-পেছন বিহারি ছেলেটি। আদিবাসীদের ভিড়টা এক ইঞ্চিও এগুলো না, দূরে দাঁড়িয়ে চোখে মুখে বিস্ময় আর কিছুটা ভয় মিশিয়ে অতসীকে দেখতে লাগল।

বাঙালি যুবকটি হাতজোড় করে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'নমস্কার। আমি বিনয়—বিনয় ব্যানার্জি, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারেই আছি। এখন থেকে আপনার আন্ডারে কাজ করব।'

বিনয় ব্যানার্জির নাম কলকাতায় শুনে এসেছিল অতসী। একজন পুরোদস্তুর অফিসার না আসা পর্যন্ত সে-ই এখানকার ওয়েলফেয়ার অফিসে ইন-চার্জের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অফিসিয়াল

স্ট্যাটাসের দিক থেকে বিনয় তার সাব-অর্ডিনেট হবে ঠিকই, তবু 'আন্ডারে' কথাটা খট করে কানে লাগল। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে অতসী বিব্রতভাবে বলল, 'আন্ডারে-টান্ডারে বলবেন না। আমরা সহকর্মী, এখন থেকে একসঙ্গে কাজ করব।'

বিনয় একেবারে গলে গেল যেন। এর আগে এখানে যে ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারটি ছিল তার মেজাজ মোগল পিরিয়ডের নবাব-বাদশাদের মতো। প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু থেকে সাব-অর্ডিনেটদের দেখত সে। বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে চিমটি কাটার মতো কথা বলত, পান থেকে চুন খসলে যা-তা অপমান করত। তার ওপর চিৎকার আর দাঁত-খিচুনি তো ছিলই। কিন্তু এই নতুন অফিসারটি একেবারে অন্যরকম। প্রথম থেকেই তাঁর ব্যবহার, কথাবার্তা চমৎকার। বিনয় কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, 'ধন্যবাদ।'

অতসী একটু হাসল।

এবার বিহারি ছেলেটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বিনয়।

ছেলেটির নাম রাকেশ সিনহা। ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসের টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্ক সে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো হাইট। হাত-পায়ের হাড় মোটা মোটা, চওড়া কাঁধ, কপাটের মতো বুক। কিন্তু মুখটা খুবই কচি, অনেকটা মেয়েলি ধাঁচের। নাকের তলায় কালির হালকা পোঁচের মতো গোঁফের রেখা। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় ছেলেটা লাজুক ধরনের।

সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে ঘাড় নুইয়ে নমস্কার করল রাকেশ।

অতসী তাকে বলল, 'তুমি আমার চাইতে অনেক ছোট। তোমাকে কিন্তু 'তুমি' করেই বলব।'

রাকেশ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'জি—জরুর।'

বিনয় এবার পেছন দিকের হাজার দু-তিনেক আদিবাসীকে দেখিয়ে বলল, 'আর ওরা হল এখানকার আদি বাসিন্দা—সন্স অফ দি সয়েল। এই গ্রাম ছাড়াও চারপাশের আরও কয়েকটা গ্রাম থেকে ওরা আপনাকে দেখতে এসেছে। এদের নিয়েই আমাদের কাজ।'

অতসী একটু হেসে আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে একটু হাত নাড়ল। তারপর বিনয়ের দিকে ফিরল, 'অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছি। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। এখন একটু বসতে না পারলে মরে যাব বিনয়বাবু।'

বিনয় খুব লজ্জা পেয়ে গেল। বিব্রত মুখে বলল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আপনাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হয়নি। আসুন আসুন—'

বিনয় একরকম জোরজার করেই অতসীর হাত থেকে বেতের বাস্কেটটা নিয়ে রাস্তা দেখাতে-দেখাতে এগিয়ে চলল। অতসী তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। তাদের পেছনে রাকেশ এবং ওরাওঁ কুলিটা চলেছে। সবার পেছনে রয়েছে বিশাল আদিবাসী জনতা।

চলতে-চলতে বিনয় জিগ্যেস করল, 'আপনি এখন কি সোজা কলকাতা থেকে এলেন?'

অতসী বলল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো ট্রেন আর বাস জার্নি করতে হয়েছে। তারপর হাঁটা। খুবই ধকল গেছে।'

অতসী সামান্য হাসল। ধকলটা কীরকম গেছে সেটা যথেষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছে। বাসে আর ট্রেনে তবু একরকম কেটে গেছে। কিন্তু পুরো পাঁচ কিলোমিটার চড়াই-উতরাই ভাঙবার পর পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা শরীরের যাবতীয় নার্ভ এখন যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। গায়ের ব্যথা মারতে কম করে দিন তিনেক বিছানায় পড়ে থাকতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর অতসী জিগ্যেস করল, 'এখানে আমার থাকার কী ব্যবস্থা হয়েছে?'

বিনয় বলল, 'কোয়ার্টার্স আছে। সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোয়ার্টার্সের অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালো তো?'

'এই জায়গার পক্ষে খুবই ভালো। তবে একটা অসুবিধা আছে।'

'কী?'

'ইলেকট্রিক আলোটা এখানে পাবেন না।'

অতসী বলল, 'এই পাহাড়ি ট্রাইব্যাল ভিলেজে ইলেকট্রিসিটি কোথায় আর পাওয়া যাবে।'

বিনয় ভরসা দিয়ে বলল,'কলকাতা কি পাটনা থেকে যারা এখানে আসে, প্রথম-প্রথম কিছুদিন কেরোসিনের লণ্ঠনে তাদের অসুবিধা হয়। তারপর অবশ্য অভ্যাস হয়ে যায়।'

'সবই হ্যাবিটের ব্যাপার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'রান্নাবান্নার একটা লোক আপনাকে জোগাড় করে দিতে হবে কিন্তু।'

বিনয় বলল, 'সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাল সকালেই আপনার লোক এসে যাবে। এখানকারই এক ওরাওঁ-এর মেয়ে। জামশেদপুরে বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে কাজ করত। চমৎকার বাংলা বলতে পারে, বাংলা রান্নাও শিখে গেছে। আপনার অসুবিধা হবে না।'

অতসী বলল, 'আমি অত প্যারোকিয়াল নই। বাঙালি-মাদ্রাজি-পাঞ্জাবি-গুজরাটি—যে-কোনও রান্না হলেই চলবে। খেতে পারলেই হল।' একটু থেমে বলল, 'যাক, কাল না হয় লোক আসবে। আজকের ব্যবস্থা কী হবে? আমার ভুল হল, বাস থেকে নেমেই নবলপুরার বাজার থেকে যদি পাঁউরুটি-টাউরুটি কিনে নিতাম। এখানে দোকান-টোকান আছে তো?'

বিনয় হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, 'একটা ব্যাপারে আমি একটু প্রিভিলেজ নিয়েছি। জোর দিয়ে বললে কাজের মেয়েটা আজই চলে আসত। কিন্তু আমি তেমন করে তাকে বলিনি।'

অতসী অবাক হয়ে গেল, 'কেন?'

'আমার খুব ইচ্ছা—' কথাটা পুরো না করেই থেমে গেল বিনয়।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অতসী, 'কী?'

'আজ আপনি আমাদের ওখানে দুটি ডালভাত খাবেন।'

'আপনার ওখানে মানে?'

অতসী কী বলতে চায় সেটা মোটামুটি বুঝল বিনয়। খুব সম্ভব তার ধারণা এই আদিবাসী এরিয়াতে বিনয় একাই থাকে কিংবা সে ব্যাচেলার। বিনয় বলল, 'আমি ফ্যামিলি নিয়ে এখানে থাকি। আপনার কোয়ার্টারের পাশের কোয়ার্টার্সটা আমার।'

'ও, আচ্ছা। কিন্তু আপনাদের অসুবিধা হবে। শুধু-শুধু আমার জন্য কষ্ট করার মানে হয় না। একটা রাত কোনওরকমে কেটে যেতই।'

বিনয় যেন একটু আহত হল, 'অসুবিধা, কষ্ট, এসব কী বলছেন? খুব আনন্দ পাব। দয়া করে না বলবেন না।'

অতসী হেসে ফেলল, 'ঠিক আছে, আপনাদের যখন এত ইচ্ছে—' বিনয়ের আন্তরিকতাটুকু তার খুব ভালো লাগছিল। একটু ভেবে সে আবার বলল, 'আচ্ছা বিনয়বাবু, এখানে টোটাল কত জন স্টাফ?'

বিনয় বলল, 'রাকেশ, আপনি আর আমি—এই তিন জন। একজন ডাক্তারও আছেন। এ ছাড়া আছে জনচারেক ওরাওঁ আর মুন্ডা। ওরা ক্লাস ফোর স্টাফ।'

'মাত্র এই ক'জনে এই বিরাট ট্রাইব্যাল এরিয়ার ওয়েলফেয়ারের কাজ চলে!'

'দরকারের তুলনায় স্টাফ খুবই কম। অনেক কিছুই করা যায় না। কিন্তু কী আর করা যাবে?

আপনার আগে যারা এ-অফিসের চার্জে ছিলেন তাঁরা অনেকেই আরও লোকজন নেবার জন্যে দিল্লিতে লিখেছেন, কিন্তু ফল কিছু হয়নি।'

অতসী বলল, 'এ-নিয়ে আপনার সঙ্গে পরে ডিসকাস করব।'

'নিশ্চয়ই।'

কথা বলতে-বলতে একসময় ওরা একটা টিনের ছোট বাংলো মতো বাড়ির সামনে এসে পড়ল।

বিনয় বলল, 'এই আপনার কোয়ার্টার।' এই বাংলোটার পাশে আরও তিন চারটে ছোট-ছোট টিনের বাংলো আর কাঠের একটা লম্বা ব্যারাক দেখিয়ে জানাল, একটাতে সপরিবারে সে নিজে থাকে, আরেকটাতে থাকে রাকেশ, ব্যারাকটায় থাকে ক্লাস ফোর স্টাফের কর্মচারীরা। এই সব বাড়ির পর উঁচু একটা টিলার মাথায় যে একতলা পাকা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটা এই ধাতুরিয়া অঞ্চলের ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিস।

নিজের কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে স্টাফের বাড়িঘর আর অফিস বিল্ডিংটা দেখে নিল অতসী। বলল, 'অফিসটা তো খুব সুন্দর জায়গায়।'

বিনয় বলল, 'হ্যাঁ। আপনার খুব ভালো লাগবে। জায়গাটা সত্যিই চার্মিং। চলুন, কোয়ার্টারে যাওয়া যাক।'

অতসী ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে বিনয় বলল, 'দয়া করে একটু দাঁড়িয়ে যান।'

অতসী জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার?'

ওদের পেছন-পেছন আদিবাসীরাও চলে এসেছিল। খানিকটা দূরে তারা গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখাতে-দেখাতে বিনয় বলল, 'এরা আপনার কাছে কিছু শুনতে চায়।'

অতসী একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল। এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলার অভ্যাস নেই তার। জিগ্যেস করল, 'কী বলব বলুন তো?'

'যা হয় বলুন।'

'ওরা কি বাংলা বুঝবে?'

সবটা না হলেও অনেকটাই বুঝবে। ইচ্ছে করলে হিন্দিতেও বলতে পারেন।'

'হিন্দিটা জানলেও ভালো বলতে পারি না।' বলে একটুক্ষণ চুপ করে থাকল অতসী। তারপর আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে বাংলায় অল্প-অল্প হিন্দি মিশিয়ে বলতে লাগল, 'আমি তোমাদের কাছে এসেছি। এখন থেকে তোমাদের কাছেই থাকব। তোমাদের মধ্যে কাজ করব। যে-কাজে এসেছি, তাতে সবসময় তোমাদের সাহায্য দরকার।' বলতে-বলতে মনে হল, কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় নেতারা যেভাবে বক্তৃতা দেয়, বলার ভেতর যেন সেই স্টাইলটা এসে যাচ্ছে। আদিবাসীদের মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, এই ভাষা আদিবাসীরা একবর্ণও বুঝতে পারছে না। ওরা চটপট বুঝতে পারে এমন ল্যাঙ্গুয়েজ অতসীর আপাতত জানা নেই। কলকাতা মেট্রোপলিস থেকে অনেক দূরে পাহাড় এবং জঙ্গলের মাঝখানে এই সব আদিবাসীদের কমিউনিকেট করতে হলে যে-ভাষার দরকার সেটা শিখতে সময় লাগবে তার।

অতসী আবার বলল, 'বিনয়বাবুর কাছে শুনেছি, তোমরা সেই দুপুর থেকে আমার জন্যে এসে দাঁড়িয়ে আছ। তোমাদের দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। তোমাদের সবার বাড়ি আমি যাব। আর কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থেকো না। সন্ধে হয়ে আসছে। এবার বাড়ি চলে যাও।'

প্রকৃতির সন্তান ওরাওঁ, মুন্ডা এবং সাঁওতালরা ফিরে যেতে লাগল। আর অতসী আস্তে-আস্তে বিনয়ের সঙ্গে কোয়ার্টারের ভেতর ঢুকল। আর রাকেশ চলে গেল তার কোয়ার্টারের দিকে।

দুই

কোয়ার্টারটা চমৎকার। দুটো বড়-বড় বেডরুম, একটা বসবার ঘর। এ ছাড়া কিচেন, স্টোর, বাথরুম ইত্যাদি তো আছেই। বেডরুম, ডাইনিং স্পেস বা বসবার ঘর—সবই পুরোপুরি ফারনিশড্। পেছন দিকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে সবজি আর ফুলের বাগান রয়েছে। বোঝা যায়, অতসীর আগে যিনি ওয়েলফেয়ার অফিসার ছিলেন তাঁর গার্ডেনিং-এর শখ ছিল। ট্রান্সফার হওয়ায় সাজানো বাগান ফেলে রেখে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথমে অতসীকে বাংলোটা দেখাল বিনয়। তারপর বসবার ঘরে এসে বলল, 'আপনি রেস্ট নিন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।'

অতসী বলল, 'আমি স্নান করব। বাথরুমে কি জল আছে?'

'সন্ধে হয়ে এল। এই অবেলায় স্নান করবেন?'

'হ্যাঁ। ট্রেনে বাসে, তারপর হেঁটে এতটা রাস্তা এসেছি। ধুলো-বালি আর ঘামে গা চটচট করছে। স্নান না করলে রাত্তিরে ঘুমোতেই পারব না।'

'ঠিক আছে। আমি আমার কোয়ার্টারে গিয়ে গরম জল পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস ঠান্ডা জলে স্নান করার অভ্যাস অতসীর। সে বলল, 'গরম জলের দরকার নেই। দু-বালতি ঠান্ডা জল হলেই চলে যাবে।'

বিনয় বলল, 'নতুন জায়গায় এসেছেন। ঠান্ডা জলে স্নান করা ঠিক হবে না। চট করে ঠান্ডা লেগে যাবে।'

কথাটা ঠিক বলেই মনে হল অতসীর। আজন্ম তার কেটেছে কলকাতায়। হঠাৎ সেখান থেকে একেবারে অন্যরকম আবহাওয়ায় চলে এসেছে সে। আপাতত সাবধানে থাকা দরকার। বিনয় যে তার সম্বন্ধে এ-কথা ভেবেছে সেজন্যে খুব ভালো লাগল অতসীর। একটু হেসে সে বলল, 'তা হলে গরম জলই পাঠিয়ে দিন।'

বিনয় চলে গেল।

অতসী এবার বেতের সোফায় খানিকটা কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে তার শরীরের জোড়গুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন।

এখনও খানিকটা বেলা আছে। বিষণ্ণ সোনালি রোদ বাইরের পাহাড় আর ঝোপ-জঙ্গলের মাথায় আবছাভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আকাশ যেখানে ঘাড় নীচু করে দিগন্ত ছুঁয়েছে, সূর্যটা নামতে-নামতে সেখানে গিয়ে একটা সরু সুতোয় ঝুলছে যেন।

এই মুহূর্তে শেষ বেলার রোদ গায়ে মেখে গোটা আকাশ জুড়ে হাজার-হাজার পাখি উড়ছিল। কিছুক্ষণ আগে চড়াই-উতরাই ভেঙে আসার সময় যে-ফিনফিনে কুয়াশা চোখে পড়েছিল, এখন তা আরেকটু ঘন হয়েছে।

শুয়ে-শুয়ে আকাশ পাখি এবং কুয়াশা-টুয়াশা দেখতে-দেখতে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল অতসীর। কোনওদিন কি সে ভেবেছিল কলকাতা থেকে কয়েক শো কিলোমিটার দূরে ছোটনাগপুরের এই নির্জন পাহাড়ি উপত্যকায় তাকে চাকরি নিয়ে আসতে হবে?

অতসীর বয়স সাতাশ-আটাশ। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চি। বাঙালি মেয়েদের এতটা হাইট কচিৎ কখনও চোখে পড়ে। গায়ের রং পাকা গমের মতো। মুখটা লম্বাটে ধাঁচের, অনেকটা ডিমের আকার। ঘন পালকে ঘেরা ভাসা-ভাসা বড় চোখ। ছোট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের। গায়ে এক গ্রামও অপ্রয়োজনীয় চর্বি নেই। চুলের রং ঈষৎ লাল এবং ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। গলাটা সোনার নিটোল ফুলদানি। থুতনিতে সুন্দর একটি খাঁজ। অতসীর চেহারায় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশেছে

আশ্চর্য এক নমনীয়তা। তার সবটুকু আকর্ষণ এখানেই।

তার সাজ-টাজের মধ্যেও অনাবশ্যক বাহুল্য নেই। এখন তার পরনে ছোট-ছোট ময়ূর ছাপ দেওয়া ক্রিম রং-এর একটা ফুল ভয়েল শাড়ি এবং ওই রং-এরই ব্লাউজ। ডান হাতের মাঝের আঙুলে একটা লাল পাথর বসানো আংটি, কানে ছোট পাতার মতো কানফুল, গলায় দার্জিলিং পাথরের সুদৃশ্য হার, বাঁ-হাতে সোনার ব্যান্ডে ঘড়ি। এতে তাকে অলৌকিক মনে হয়।

ছাত্রীও ছিল সে অসাধারণ। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে বছর পাঁচেক আগে অ্যানথ্রোপলজিতে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল। সোশাল ওয়েলফেয়ারে বছর দেড়েকের কোর্স কমপ্লিট করে একটা ডিগ্রি পেয়েছে।

ওদের ফ্যামিলিটাও এক কথায় চমৎকার। বাবা ছিলেন গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। বছর তিনেক আগে রিটায়ার করে যোধপুর পার্কে বাড়ি করেছেন। অতসীরা দুই ভাই, দুই বোন। ভাই বোনেরা সবাই তার বড়। এক দাদা আছে ফরেন সার্ভিসে; এখন ওয়েস্ট জার্মানির ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে ফার্স্ট সেক্রেটারি। আরেক দাদা কলকাতায় অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের রিডার, বড় বউদি জার্মানিতে বাংলা শেখানোর ক্লাস খুলেছে। ছোট বউদি রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গানের নামকরা আর্টিস্ট; দু-চার মাস পর পরই বাজারে তার রেকর্ড বেরোয়, আর প্রায় প্রতি মাসেই হয় রেডিও নইলে টিভি-তে প্রোগ্রাম থাকে। একমাত্র দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দিদি-জামাইবাবু থাকেন আমেরিকায়। দুজনেই ডাক্তার। মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় তাদের প্রেম। এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি নেবার পর বিয়ে। তারপর দুজনেই এম-এস করে আমেরিকায় গেছে সার্জারিতে আরও বড় ডিগ্রি নিতে। দাদাদের এবং দিদির একটা করে ছেলে। বড়দার ছেলের বয়স সাত, ছোড়দার ছেলের তিন, দিদির ছেলের দেড়। ওরা প্ল্যান করেছে প্রথম বাচ্চাটা দশ বছরের না হলে দ্বিতীয় বাচ্চা আনবে না। দু-নম্বর ইসুর পর ও-ব্যাপারটায় ফুল স্টপ।

বাড়ির আবহাওয়া এবং পরিবেশ খুবই খোলামেলা। বাবা-মা-ভাই-বোন সবার মধ্যেই সম্পর্কটা একেবারে বন্ধুর মতো। জামাইবাবু ছেলেপুলের ব্যাপারে মজা করে একবার বলেছিল, 'আমরা বাপু লয়াল সিটিজেন। দো আউর তিন বচ্চের ভেতর দো হলেই ওই ব্যাপারটায় যবনিকা পতন করিয়ে দেব।'

অতসীরও এতদিনে বিয়ে হয়ে যাবার কথা ছিল। বছর দুয়েক আগে সোশাল ওয়েলফেয়ারে ডিগ্রি নেবার পরই বিয়েটা হয়ে যেত। বিয়ের পর তাদের চলে যাবার কথা ছিল লন্ডনে। পাশপোর্ট-টাশপোর্ট সব রেডি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের একদিন আগে রাজীব খুন হল। আর তার ফলেই সারা জীবনটা একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল অতসীর। কলকাতা ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না। আচমকা ক্যাঁচ করে দরজায় শব্দ শোনা গেল। চমকে অতসী দেখল, সতেরো-আঠারো বছরের গাঁট্টাগোট্টা একটা আদিবাসী মেয়ে—খাটো শাড়ি আর কাঁচুলি টাইপের নীল ব্লাউজ গায়ে, মাথায় লাল ফুল গোঁজা—বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা বলল, 'মেমসাব গরম পানিয়া—'

অতসী বুঝতে পারল বিনয় মেয়েটাকে পাঠিয়েছে। বলল, 'তুমি বিনয়বাবুর বাড়িতে কাজ করো?'

মেয়েটা ঘাড় কাত করল, 'হুঁ।'

'কী নাম?

'ডরথি।'

ডরথি কি ডরোথি? হঠাৎ অতসীর মনে পড়ল, এখানে এই আদিবাসী ওরাওঁ এবং মুন্ডাদের ভেতর প্রচুর খ্রিস্টান রয়েছে। সে বলল, 'আচ্ছা তুমি এখন যাও—'

মেয়েটা চলে গেল। তারপরও খানিকক্ষণ সারা শরীরে অগাধ ক্লান্তি এবং আলস্য নিয়ে শুয়ে থাকল অতসী। ছোটনাগপুর রেঞ্জ থেকে অদৃশ্য লাটাইতে দিনের শেষ রোদটুকু কেউ যখন দ্রুত গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, সেই সময় আস্তে-আস্তে উঠে পড়ল সে। সেই ওরাওঁ কুলিটা এ ঘরেরই একধারে তার সুটকেস-টুটকেস রেখে গিয়েছিল। সুটকেসটা খুলে তার ভেতর থেকে তোয়ালে শাড়ি সাবান টুথপেস্ট ব্রাশ ইত্যাদি বার করল অতসী। তারপর সেগুলো হাতে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল।

স্নান-টান সেরে আধ ঘণ্টা পরে বাইরে বেরিয়ে অতসী দেখল, সবগুলো ঘরে কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে আর বাইরের ঘরে বিনয় এবং একটি মহিলা বসে আছে। অতসী বুঝতে পারল বিনয় ঘরে-ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে এখন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বড়-বড় পা ফেলে সোজা তাদের কাছে চলে এল সে। ভেতর আসতে দেখা গেল, টেবলের ওপর সস্তাদামের কাঠের ট্রে-তে চায়ের সাজ সরঞ্জাম এবং কিছু খাবার-টাবার সাজানো রয়েছে।

অতসী ঘরে ঢোকামাত্র বিনয়রা উঠে দাঁড়াল! বিব্রতভাবে সে বলল, 'এ কী, দাঁড়ালেন কেন? বসুন-বসুন—' বিনয় যে তার সাব-অর্ডিনেট এ-কথাটা যেন সে ভুলতে পারছে না। কিন্তু এ-জাতীয় তটস্থ বা বশংবদ ভাব একেবারেই ভালো লাগে না অতসীর। যে-কোনও মানুষের সঙ্গে সহজ অসংকোচ সম্পর্ক সে পছন্দ করে।

বিনয়ের দেখাদেখি যে-মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখিয়ে অতসী এবার জিগ্যেস করল, 'ইনি নিশ্চয়ই আপনার মিসেস?'

বিনয় আস্তে মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ও সন্ধ্যা।'

ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট বোঝা যায়নি। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল বিনয়ের স্ত্রী সন্ধ্যার বয়স বেশি না, বড় জোর তেইশ চব্বিশ। মহিলা না বলে তাকে মেয়ে বলাই ভালো। তার মানে অতসীর চাইতে চার-পাঁচ বছরের ছোট। গোলগাল আদুরে চেহারা, মাথা ভর্তি কোঁচকানো-কোঁচকানো ঘন চুল বিরাট একটা খোঁপায় আটকানো। গায়ের রং ফরসাও না কালোও না, দুয়ের মাঝামাঝি। মসৃণ টানটান ত্বক। চোখ দুটিতে সরল নিষ্পাপ একটি হাসি সর্বক্ষণ যেন টলটল করতে থাকে। দেখেই টের পাওয়া যায়, এই মেয়েটি নিতান্ত অকারণেই সবসময় খুশি থাকতে পারে।

হাত ভরতি তার গোছা গোছা কাচের চুড়ি, শাঁখা আর লাল কড়ের বালা। মাঠের মাঝখানে সূর্যোদয়ের মতো তার কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড টিপ। দেখামাত্র তাকে ভালো লেগে যায়।

অতসী সন্ধ্যার একটা হাত ধরে নিজের পাশে নিয়ে বসাল। বলল, 'আমি কিন্তু 'আপনি-আপনি' করে বলতে পারব না। বয়সে তুমি আমার চাইতে অনেক ছোট।'

অতসীরা বসার পর বিনয় মুখোমুখি একটা সোফায় বসে পড়েছিল। দারুণ ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই ওকে 'তুমি' করে বলবেন।'

সন্ধ্যা বলল, 'আপনাকে দিদি বললে রাগ করবেন না?'

অতসী আদরের ভঙ্গিতে সন্ধ্যার পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'বোকা মেয়ে, রাগ করব কেন? আমি তোমার দিদিই তো।'

কথাবার্তার ফাঁকে-ফাঁকে সন্ধ্যা চা করে ফেলেছিল। খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপ অতসীর সামনের টেবলটায় সাজিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'খান দিদি।' তারপর বিনয়কে চা দিয়ে নিজেও এক কাপ নিল।

এবার খাবারের প্লেটটার দিকে তাকিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল অতসী।—'কত লুচি কত মিষ্টি! এত সব খাওয়া যায়?'

সন্ধ্যা বলল, 'এত কোথায়? রাতের খাওয়া খেতে-খেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। নিন দিদি।'

'আমি তো খাব, তোমাদেরটা কোথায়?'

'আপনি আসার আগেই আমরা খেয়েছি।

'না, তা হবে না।' নিজের প্লেট থেকে লুচি-টুচি তুলে জোর জার করে সন্ধ্যাদের দিল অতসী।

আচমকা কী মনে পড়ে যেতে বিনয় ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'মজুমদার তো এখনও এল না। বলেছিল বিকেলেই চলে আসবে।'

সন্ধ্যা বলল, 'বলেছে যখন নিশ্চয়ই আসবে। কথা দিলে মজুমদারদা কথা রাখে। হয়ত কোনও কাজে আটকে-টাটকে গেছে।'

মজুমদার কে? কী জন্য এখানে তার আসার কথা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করল না অতসী। করাটা অশোভনও।

চা খেতে-খেতে এলোমেলো গল্প চলল। দশ মিনিটের মধ্যেই সন্ধ্যা বুঝিয়ে দিল, প্রচুর কথা বলতে পারে সে, আর তার পেটে কোনওরকম গোপন ব্যাপার থাকে না। জানা গেল, সন্ধ্যার বাবা পোস্ট-মাস্টার। সে বাবার একমাত্র মেয়ে; হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে ছ'বছর আগে, বি.এ. পার্ট ওয়ান ফেল করেছে বার তিনকে, লেখাপড়া তার মাথায় ঢোকে না। কতকাল আর ফেল করা মেয়ের মুখ দেখতে ভালো লাগে! বাবা তাই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বিয়েতে খরচ হয়েছে পঁচিশ হাজার সাতশো টাকা। এই টাকাটা খরচ করতে বাবার ধার হয়েছে সাত হাজার। সে-টাকা এখনও পুরোপুরি শোধ হয়নি। তবে বাবার রিটায়ারমেন্টের মধ্যেই হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার শ্বশুর-শাশুড়ি অর্থাৎ বিনয়ের মা-বাবা দুজনেই এখনও বেঁচে আছেন। শ্বশুর ইস্টার্ন রেলে ইনস্পেক্টর ছিলেন, বছর খানেক হল রিটায়ার করেছেন। এক ভাশুর আছে, আর আছে এক ননদ। ভাশুর ভারত ইলেকট্রিক্যালসে কাজ করে, থাকে ভূপালে। বড় অফিসার সে, পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায়। তার তিন ছেলেমেয়ে, সবাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ভাশুর চমৎকার মানুষ, কিন্তু বউয়ের কাছে জুজু হয়ে থাকে। স্বামী বড় চাকরি করে বলে জায়ের নাক ভীষণ উঁচু। ননদের বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে; থাকে বোম্বাইতে। তার স্বামী ওখানকার একটা বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে বিরাট অফিসার। ওরা অনেকবার সন্ধ্যাদের বোম্বাই যেতে বলেছে। জানিয়েছে, বোম্বাই গেলে অমিতাভ বচ্চন, হেমা মালিনী আর ধর্মেন্দ্রর শুটিং দেখিয়ে দেবে। সন্ধ্যা এই তিন ফিল্মস্টারের দুর্দান্ত ফ্যান। কিন্তু যাবার ইচ্ছা থাকলেও বোম্বাই যাওয়া হয়নি। চার বছর বিয়ে হয়েছে তার। ছেলেপুলে নেই। বিয়ের পরই এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে চলে এসেছে। এখানে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, জঙ্গল আর জঙ্গল। চোখ মেললেই ওরাওঁ মুন্ডা আর সাঁওতাল। সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, ইলেকট্রিক আলো নেই। সন্ধে হল তো ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করল।

সন্ধ্যা বলেই যেতে লাগল। ওরাওঁ মুন্ডা বা সাঁওতালরা মানুষ ভালো, ভীষণ সরল। কিন্তু কাঁহাতক তাদের সঙ্গ ভালো লাগে! সারাদিন তাদের সঙ্গে কী গল্পই বা করা যায়!

সন্ধ্যা আরও জানাল, তার স্বামীটি লোক খুব খারাপ না। তবে মারাত্মক কুঁড়ের বাদশা। দিনরাত শুয়ে থাকতে পারলে আর কিছুই চায় না। জীবনে অ্যাম্বিশান নেই; মাইনে আটশো বারো টাকা। এতেই সে খুশি।

এই চার বছরে কেঁদে-কেটে বা রাগারাগি করে মাত্র চার বার কলকাতায় যেতে পেরেছে সন্ধ্যা। চার বার মোট পনেরো দিনে হিন্দি বাংলা মিলিয়ে পঁচিশটা ছবি দেখেছে। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

ঝড়ের বেগে একসঙ্গে এতগুলো খবর দিয়ে হঠাৎ কী যেন মনে পড়তে আচমকা উঠে পড়ল সন্ধ্যা। বলল, 'ওই দেখুন গল্পে-গল্পে কতক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছি। আমি এখন যাই। সন্ধে হয়ে গেল। রান্না চাপাতে হবে। মাছ মাংস আনাজ সব ছড়িয়ে রেখে এসেছি।'

অতসী বলল, 'আমরাই বা এখানে বসে থেকে কী করব? চলো, তোমাদের কোয়ার্টারে যাই।

রান্না করতে-করতে তুমি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে পারবে।'

সন্ধ্যার চোখমুখ দেখে মনে হল, সে দারুণ খুশি হয়েছে। বলল, 'চলুন দিদি, এক্ষুনি চলুন। আপনি গেলে ভীষণ ভালো লাগবে।'

অতসী আর বিনয় উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরুতে যাবে, অতসী হঠাৎ বলল, 'তালা-টালা কিছুই আনিনি। কোয়ার্টারটা বন্ধ করব কী করে?'

বিনয় বলল, 'এখানে তালার দরকার হয় না।'

অতসী অবাক হয়ে বলল, 'দরকার হয় না! কেন?'

'এখানে চোর-ছ্যাঁচড় নেই। এই সব আদিবাসীরা এত অনেস্ট যে চুরিটুরি কী ব্যাপার তারা জানেই না। আমরা তো ঘরদোর খোলা ফেলেই বেড়াতে চলে যাই। আসুন—'

তিন

বিনয়দের কোয়ার্টারটা অতসীর কোয়ার্টার্সের চাইতে অনেক ছোট। দুটো বেডরুম, একটা বসবার ঘর, কিচেন, বাথরুম আর স্টোর। পেছনে বা সামনে ফাঁকা জায়গা খুব বেশি নেই।

নিজেদের কোয়ার্টার্সে ফিরে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে গেল সন্ধ্যা। সেই ওরাওঁ মেয়েটা অর্থাৎ ডরোথি বাটনা বাটছিল। চারিদিকে মাছ, মাংস, আনাজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সন্ধ্যা ডরোথির পাশ দিয়ে উনুনের ধারে গিয়ে বসল।

রান্নাঘরের বাইরে খানিকটা ফাঁকা জায়গার খাওয়ার জন্য খান চারেক চেয়ার আর একটা টেবল পাতা রয়েছে। এটা বিনয়দের ডাইনিং রুম বা খাওয়ার জায়গা। ওখানে বসলে রান্নাঘরের ভেতরটা দেখা যায়।

ডাইনিং টেবলটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে অতসী বলল, 'এখানেই বসি। এখান থেকে সন্ধ্যার রান্নাবান্নাও দেখা যাবে, গল্পও করা যাবে।'

সন্ধ্যা বলল, 'সেটাই ভালো হবে। ডরোথি যা তো, একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে আয়।'

বাটনা ছেড়ে উঠে এল ডরোথি। একটা আলো জ্বালিয়ে টেবলের ওপর রেখে আবার রান্নাঘরে মশলায় হাত লাগাল।

রান্না আর গল্পের ফাঁকে-ফাঁকে বেশ কয়েকবার চা করে বিনয় আর অতসীকে দিয়ে গেল সন্ধ্যা। নিজেও নিল। ডরোথি অবশ্য একবারের বেশি নেয়নি। চা খুব একটা পছন্দ করে না সে।

এদিকে রাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সময়টা বোধহয় পূর্ণিমাপক্ষ। ছোটনাগপুর রেঞ্জের মাথায় রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে চারিদিকে। গলানো চাঁদির মতো আলো শাল বন, সিসম বন, অর্জুন গাছের জঙ্গল আর পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। খুব কাছাকাছি কোনও ঝোপঝাড় থেকে অনবরত ঝিল্লিস্বর উঠে আসছে। আর আছে গাছের পাতার ভেতর দিয়ে সরসর করে উলটো-পালটা হাওয়া বয়ে যাবার শব্দ।

গল্প করতে-করতে হঠাৎ বিনয় স্ত্রীকে বলল, 'এই সন্ধ্যা, ব্যাপারটা কী হল বলো তো?'

মুখ ফিরিয়ে সন্ধ্যা জিগ্যেস করল, 'কী?'

'তোমার আরেক জন গেস্ট তো এখনও এল না। বিকেলে আসার কথা। এখন ন'টা বাজতে চলল।' বিনয়কে বেশ চিন্তিত দেখাল, 'মজুমদার কথা দিলে কথা রাখে। এ-ব্যাপারে সে ভীষণ পার্টিকুলার।'

সন্ধ্যার মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। সে বলল, 'কোনও ঝামেলা টামেলায় পড়ল নাকি

মজুমদারদা?'

'কী জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মজুমদারদার ওখানে কাউকে একবার পাঠাও না। ধরে নিয়ে আসুক।'

'তোমার কি মাথা খারাপ! এই রাত্তিরবেলা পাঁচ মাইল ভেঙে কে যাবে? তা ছাড়া বছরের এ-সময়টা রাত্তিরে ভাল্লুক বেরোয়। আমি কাউকে পাঠিয়ে রিস্ক নিতে পারব না।'

'মজুমদারদা না আসায় এমন বিচ্ছিরি লাগছে যে কী বলব!'

অতসী কিছুক্ষণ আগে তার নিজের কোয়ার্টারে বসে মজুমদারের কথা শুনেছিল। তখন কোনও প্রশ্ন করেনি। এবার বেশ কৌতূহল হতে লাগল তার। জিগ্যেস করল, 'মজুমদার কে?'

বিনয় জানাল, 'এখানে স্কটিশ এভাঙ্গেলিস্টদের অনেক কালের পুরনো একটা মিশন আছে। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির শেষ দিকে ওরা এটা বসায়। সেই থেকে এখানকার ট্রাইব্যাল পিপলদের মধ্যে মিশনটা নানা রকম সারভিস দিয়ে আসছে। মজুমদার ওই মিশনে কাজ করে।'

মজুমদার সম্পর্কে বলতে-বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল বিনয়ের। একটু চুপ করে থেকে সে বেশ ব্যস্তভাবেই বলল, 'আরে, একটা কথা একদম ভুলে গেছি।'

'কী?'

'আমাদের এখানে নতুন অফিসার-ইন-চার্জ আসছেন শুনে মজুমদার নিজের থেকেই বলল, এসে আলাপ করে যাবে। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য দারুণ আগ্রহ দেখাল।'

ও, তাই নাকি—'

'হ্যাঁ।' বিনয় মাথা নাড়ল, 'আমরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, প্রথম দিনটা কিছুতেই আপনাকে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে দেব না, আমাদের এখানেই দুটি ডাল-ভাত খেতে বলব। সেইসঙ্গে মজুমদারকেও নেমন্তন্ন করেছিলাম। ভেবেছিলাম, খেতে বসে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

অতসী অল্প একটু হাসল, 'ভালোই ভেবেছিলেন। দেখুন, যদি শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক আসতে পারেন।'

'দেখা যাক।'

রান্নাঘর থেকে সন্ধ্যা বলল, 'মজুমদারদা চমৎকার মানুষ। আলাপ হলে আপনার খুব ভালো লাগবে দিদি।'

মজুমদার সম্পর্কে কৌতূহলটা বাড়ছিল অতসীর। যে অচেনা লোকটি তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে তার সম্বন্ধে আগ্রহ হবার কথাই। অতসী জিগ্যেস করল, 'মিস্টার মজুমদারের স্কটিশ মিশনটা এখান থেকে কত দূরে?'

বিনয় বলল, 'মাইল পাঁচেক হবে।

একটু আগে বিনয় বলছিল, মজুমদারের খোঁজ করতে পাঠালে পাঁচ মাইল পাহাড়ি রাস্তা ভাঙতে হবে, কারণটা এবার বোঝা গেল। অতসী জিগ্যেস করল, 'এখানে স্কটিশ মিশনটা কী ধরনের কাজ করে?'

বিনয় যা বলল তা এইরকম। অনেক আগেই সেই ব্রিটিশ আমলে মিশনটা এখানকার ট্রাইব্যাল এরিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রিচ করত। টাট্টুর পিঠে চড়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে আদিবাসীদের ব্যাপটাইজ করাই ছিল সেই আমলের মিশনারিদের আসল কাজ। দেশ স্বাধীন হবার পর ব্যাপটাইজেশনের ব্যাপারটা অনেক কমে গেছে। ঢাকঢোল বাজিয়ে এখন আর ওরা কাউকে খ্রিস্টান করে না। তবে কেউ খ্রিস্টান হতে চাইলে সাহায্য করে। এখন ওদের প্রধান অ্যাক্টিভিটি হল পুরোপুরি সেবামূলক। এখানে ওরা স্কুল খুলেছে, হাসপাতাল খুলেছে, হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট শেখানোর জন্য একটা সেন্টার বসিয়েছে। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

অতসী বলল, 'এতকাল ধরে ব্যাপটাইজেশন চলছে। নিশ্চয়ই ওরা অনেক ক্রিশ্চান করতে পেরেছে, তাই না?'

বিনয় বলল, 'এখানকার পপুলেশনের সিক্সটি পারসেন্টই ক্রিশ্চান।'

একটু ভেবে অতসী জিগ্যেস করল, 'রিলিজিয়নের ব্যাপারটুকু বাদ দিলে মিশনের কাজ আর গভর্নমেন্টের ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের কাজের মধ্যে তফাত কতটা?'

'খুব বেশি না।'

একটু চুপচাপ। তারপর অতসী বলল, 'একদিন ওদের মিশনে গিয়ে সব দেখে আসতে হবে।'

বিনয় বলল, 'যেদিন বলবেন সেদিনই নিয়ে যাব। মজুমদার আছে, কোনও অসুবিধা হবে না। সে-ই ঘুরিয়ে টুরিয়ে সব দেখিয়ে দেবে।'

কথায়-কথায় রাত বাড়ছিল। কুয়াশার ফিনফিনে পরদার ওপারে পূর্ণিমার চাঁদ অঢেল গলানো রুপো ঢেলে যাচ্ছে। ছোটনাগপুরের নির্জন বনভূমি আর উপত্যকা এখন ঝিম ঝিম করছে। এই মুহূর্তে জ্যোৎস্নার ঢলনামা চারিদিকের ল্যান্ডস্কেপটাকে কেমন যেন অলৌকিক মনে হয়।

এদিকে রান্নাবান্না হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার। খাবার-দাবার ঠিকঠাক করে গুছিয়ে স্নান করে পাটভাঙা একটা শাড়ি পরে এল সে। রান্নার পর স্নান করে পরিষ্কার ইস্তিরি-করা শাড়ি পরে খেতে দেওয়া তার অনেক দিনের অভ্যাস। রান্নার সময় উনুনের তাতে শরীর ঘেমে যায়। ঘামে-ভেজা জামা-কাপড়ে তার গা চটচট করে। মোট কথা, এ-সময় স্নানটি তার না করলেই নয়।

সন্ধ্যা অতসীদের নিয়ে ডাইনিং স্পেসে চলে এল। খোলা জানলা দিয়ে ছোটনাগপুরের উলটো-পালটা হাওয়া ভেসে আসছে। এর মধ্যে বাতাসে হিমের ভাব মিশতে শুরু করেছে। অতসী শাড়িটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসল।

সন্ধ্যা বলল, দিদি শীত করছে? একটা চাদর দেব?'

অতসী বলল, 'চাদর লাগবে না। এক কাজ করো ভাই, ওই জানলাটা বন্ধ করে দাও।'

সন্ধ্যা উঠতে-উঠতে বলল, 'আপনি নতুন এসেছেন কিনা, তাই শীত লাগছে। কলকাতার চাইতে ঠান্ডাটা অবশ্য এখানে বেশিই। তবে থাকতে-থাকতে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। এই ঠান্ডাটুকু ভালোই লাগে।'

জানলা বন্ধ করে ফিরে এসে ফের অতসীর পাশে বসল সন্ধ্যা। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'ক'টা বাজে বলো তো?'

কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে বিনয় বলল, 'ন'টা চল্লিশ।'

'তা হলে বোধহয় মজুমদারদা আর এল না।'

'আরেকটু দেখি। রাত দশটা এগারোটাতেও কোনও-কোনও দিন মজুমদার হুট করে এসে হাজির হয়।'

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা অতসীর দিকে ফিরল, 'দিদি, আপনি রাত্তিরে কখন খান?'

অতসী বলল, 'ফিক্সড কোনও টাইম নেই। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'আপনি ভীষণ টায়ার্ড হয়ে আছেন। আপনাকে খেতে দিই। আমরা মজুমদারদার জন্যে খানিকক্ষণ ওয়েট করব।'

এভাবে খেতে বসাটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার। অতসী যদিও ভীষণ ক্লান্ত, চোখের পাতায় আঠার মতো ঘুম জড়িয়ে যাচ্ছে, এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার চাইতে বেশি কাম্য আর কিছুই নেই, তবু সে বলল, 'আমার কোনওরকম অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোক আসুন, তারপর সবাই একসঙ্গে খাব।'

সন্ধ্যা বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, মজুমদারদার জন্যে আর খানিকক্ষণ দেখি—'

বিনয় ওধার থেকে বলল, 'দশটার বেশি এক সেকেন্ডও ওয়েট করব না।' একটু থেমে বলল, 'কোনও মানে হয়। আসতে না পারলে মজুমদারের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল। সে জানে এতগুলো লোক তার জন্যে বসে থাকবে।' গলার স্বরে বোঝা যায় বিনয় বেশ বিরক্ত হয়েছে।

মজুমদার সম্পর্কে স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারছিল সন্ধ্যা। বলল, 'হয়তো কোনও অসুবিধা আছে, তাই খবর দিতে পারেনি। কী হয়েছে না হয়েছে, মজুমদারদার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না। কিছু না জেনে কারও ওপর রাগ করা ঠিক না।'

বিনয় কিছু বলল না।

সন্ধ্যা এবার অতসীর দিকে ফিরল, 'ডরোথিকে আরেকটু চা দিতে বলব দিদি?'

অতসী চা-টা একটু বেশিই খায়। বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

চা খেয়ে আর এলোমেলো কথা বলে-বলে আরও খানিকটা সময় কাটিয়ে দিল ওরা। তারপর দশটা যখন প্রায় বেজে এসেছে সেই সময় বিনয় স্ত্রীকে বলল, 'আর দেরি করার দরকার নেই। খাবার দিয়ে দাও। কাল একবার মিশনে গিয়ে মজুমদারের খবর নিয়ে আসব।'

বিনয়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই বাইরে জিপ থামার শব্দ হল। তারপরেই একটা গলা ভেসে এল, 'ব্যানার্জি, সন্ধ্যাবউদি, আমি এসে গেছি!'

অতসী হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল। গলাটা তার খুবই চেনা। মুহূর্তে ক্লান্ত শরীর, শিথিল স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল যেন। কত বছর বাদে এই গলা শুনল সে?

ততক্ষণে দরজার ফ্রেমের ঠিক মাঝখানে দীর্ঘ চেহারার একটি পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে। ধোঁয়ানো লণ্ঠনের অল্প-অল্প আবছা আলোয় তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল অতসী। কণ্ঠস্বর যার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল এ কিন্তু সে নয়। হাইট এই রকমই ছিল সঞ্জয়ের—রাজীবের হত্যাকারী যোশেফ সঞ্জয় বিশ্বাসের। চেহারার ধাঁচও একই, কিন্তু মুখটা একেবারে আলাদা। দুজন মানুষের গলার স্বর কি একইরকম হতে পারে? অতসী জানে না। সে পলকহীন তাকিয়েই রইল।

ক'বছর ধরে রাজীবের হত্যাকারী সঞ্জয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে অতসী। কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চিতার ভেতর যখন রাজীবের পোস্ট মর্টেম করা কাটাছেঁড়া শরীরটা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি, দু-চোখের তারায় গনগনে আগুনের মতো কিছু একটা ঝলকাচ্ছিল। রাজীবের মৃতদেহ শেষ বারের মতো দেখতে-দেখতে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, হত্যাকারীকে ছাড়বে না, তাকে খুঁজে বার করার জন্য দরকার হলে শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে-শুঁকে গোটা পৃথিবী তোলপাড় করে ফেলবে। যেভাবেই হোক প্রতিহিংসা সে নেবেই।

রাজীবের হত্যাকারীকে ফাঁসির দড়িতে না ঝোলানো পর্যন্ত তার কাছে বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই।

একটু আগে বাইরে থেকে মজুমদারের গলার স্বর শুনে অতসী ধরেই নিয়েছিল, এতদিনে সঞ্জয়কে সে হাতের ভেতর পেয়ে গেছে। কিন্তু তাকে দেখার পর ক্রমশ তার উত্তেজিত স্নায়ুগুলো আলগা হয়ে আসতে লাগল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। সঞ্জয়ের সারনেম ছিল বিশ্বাস আর এই ভদ্রলোক মজুমদার। এরা সম্পূর্ণ আলাদা। তবু দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর কী করে যে এক রকম হয়? হতাশ হলেও একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন মজুমদারকে দেখতে লাগল অতসী।

এদিকে বিনয় বলছিল, 'কী ব্যাপার, এত দেরি হল? আমরা তো জানতাম আপনার পাংচুয়ালিটি ব্রিটিশদের মতো।'

মজুমদার বলল, 'আর বলবেন না, দশ মাইল দূরে গারুদিয়াতে গিয়েছিলাম। ওরাওঁদের একটা পরব ছিল; কিছুতেই তাড়াতাড়ি ওরা ছাড়ল না।'

'আমরা ভেবেছিলাম, আজ আর আপনি এলেন না।'

'পাগল হয়েছেন, সন্ধ্যাবউদির হাতের চিকেন কারি আর মাছের কালিয়ার জন্যে রাত তিনটে বাজলেও চলে আসতাম। আমাদের মিশনে স্টিফেনের হাতের রান্না খেয়ে-খেয়ে লিভারে কড়া পড়ে গেছে।'

সন্ধ্যা বলল, 'দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি মজুমদারদা? ভেতরে আসুন।'

সামনের দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে দারুণ ব্যস্তভাবে মজুমদার বলে উঠল, 'আরে, আসল কথা জিগ্যেস করতেই তো ভুলে গেছি। যাঁর অনারে আমার এই নেমন্তন্ন আপনাদের সেই ওয়েলফেয়ার অফিসার এসে গেছেন?'

'এই তো। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি আসছেন না বলে খেতে বসেননি।'

অতসীকে প্রথমটা লক্ষ করেনি মজুমদার। তা ছাড়া ঝাপসা লণ্ঠনটার পেছন দিকে বসে থাকার জন্য তাকে পরিষ্কার দেখাও যাচ্ছিল না। ঘরের ভেতর আসতে-আসতে মজুমদার বলল, 'এক্সট্রিমলি সরি। আপনাদের বসিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা চাইছি।' বলতে-বলতে বিনয়ের পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

বিনয় অতসীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি মাইকেল প্রবাল মজুমদার। এঁর কথা আপনাকে আগেই বলেছি।' প্রবালকে বলল, 'ইনি শ্রীমতী অতসী চ্যাটার্জি। আমাদের এই নতুন ওয়েলফেয়ার অফিসারের কথাও আপনি আমার কাছে শুনেছেন।'

'নমস্কার।' বলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রবাল। এতক্ষণে অতসীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছে সে। কিন্তু আড়ষ্টতাটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই দারুণ স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল, 'জানেন, আপনি আসছেন শুনে আমার ভীষণ কিউরিওসিটি হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে ব্যানার্জিকে ধরেছিলাম।'

স্নায়ুগুলোকে সজাগ রেখে প্রবালের কণ্ঠস্বর শুনে যাচ্ছিল অতসী। নাঃ, কোথাও এতটুকু পার্থক্য নেই। দু-বছর আগে পর্যন্ত শোনা অবিকল সঞ্জয়ের সেই গলা।

আলাদা দুটি মানুষের একই রকম কণ্ঠস্বর অতসীকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়েছে। এমন অভিজ্ঞতা আগে আর কখনও হয়নি তার।

কাছাকাছি এসে বসার জন্য প্রবালকে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। না-ফরসা না-কালো এই যুবকটির টান-টান, সমুন্নত চেহারা। ছ'ফুটের কাছাকাছি হাইট, মাথাভরতি অগোছালো ঝাঁকড়া চুল, লম্বাটে মুখ। চমৎকার স্বাস্থ্য তার। দেখে মনে হয় দারুণ ভালোমানুষ—সরল, নিষ্পাপ, পবিত্র।

সঞ্জয়ের চোখমুখও তো নিষ্পাপ এবং পবিত্র ছিল। কিন্তু সে যে মানুষ খুন করতে পারে, তাকে দেখে পৃথিবীর সব চাইতে অভিজ্ঞ ক্রিমিনোলজিস্টও তা সন্দেহ করতে পারত না। অমন ডিসেপটিভ চেহারা ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। কিন্তু মাইকেল প্রবাল মজুমদার নামে সম্পূর্ণ আলাদা একটি যুবকের সামনে বসে সঞ্জয় সম্পর্কে সে এসব কী ভাবছে! সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে অতসী আস্তে করে বলল, 'আমার সম্বন্ধে কিউরিওসিটি হল কেন?'

প্রবাল বলল, 'এখানে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্যে আগে আর কোনও মহিলা আসেননি। অন্তত আমি যদ্দিন এখানে আছি, তদ্দিন কোনও মহিলাকে দেখিনি। আপনিই প্রথম লেডি ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

বিনয়ও সায় দিল, 'আমি অনেকদিন এখানে আছি। অ্যাবাউট টেন ইয়ার্স। মজুমদার ঠিকই বলেছে, আপনার আগে আর কোনও মহিলা অফিসার আসেননি।'

অতসী খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। নিস্পৃহ গলায় প্রবালকে বলল, 'তা হলে কৌতূহল হবার কথাই।' একটু থেমে জিগ্যেস করল, 'আপনি কতদিন এখানে আছেন?'

প্রবাল বলল, 'বেশ কিছুদিন।'

বিনয় বলল, 'মজুমদারকে এখানকার লোকেরা দারুণ ভালোবাসে। আদিবাসীদের ব্যাপারে মজুমদার খুবই ডেডিকেটেড।'

অতসী বলল, 'ভালোই হল। আমাদের ওয়েফেয়ারের কাজে দরকার হলে ওঁর সাহায্য নেওয়া যাবে।'

মজুমদার বলল, 'মোস্ট গ্ল্যাডলি। যখন বলবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।'

কথায়-কথায় রাত বাড়ছিল। সন্ধ্যা একসময় বলল, 'এগারোটা বেজে গেছে। এবার খাবার দিই?'

এতক্ষণ খাওয়ার কথা খেয়াল ছিল না কারও। সবার হয়ে প্রবাল বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দারুণ খিদে পেয়ে গেছে।'

'খিদে পাওয়ার কোনও লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না। আমি বলতে বুঝি পেল!'

প্রবাহ হাসল, 'যা বলেছেন।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর ডাইনিং টেবলে প্লেটে-প্লেটে খাবার সাজিয়ে ফেলল সন্ধ্যা। ডরোথি তাকে সাহায্য করতে লাগল।

খাবার সাজানো হলে আরেকটা ঝকঝকে কাচের লণ্ঠন জ্বালিয়ে টেবলের মাঝখানে রেখে সন্ধ্যা ডাকল, 'আপনারা আসুন, আমি রেডি।'

বাইরের ঘর থেকে অতসীরা তিনজন উঠে এল। টেবলটা চারিদিকে সমান নয়, লম্বাটে গোছের। লম্বা দু-দিকের দুই মাথায় মুখোমুখি দুটো চেয়ার পাতা, চওড়ার দিকেও দুটো চেয়ার রয়েছে। চওড়ার দিকের একটা চেয়ারে প্রবাল বসতেই তার সামনাসামনি বসে পড়ল অতসী। এভাবে বসবে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল সে। প্রবালকে আরেকটু খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছা তার।

অগত্যা লম্বা দিকের এক মাথায় বিনয়কে বসতে হল। আরেক মাথায় সন্ধ্যা। সন্ধ্যার সামনে অবশ্য খাবারের প্লেট নেই। ডরোথি একধারে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যা বলল, 'আরম্ভ করে দিন।'

অতসী বললে, 'এ কী, তুমি খাবে না?'

সন্ধ্যা বলল, 'আপনাদের হয়ে যাক; তারপর ডরোথি আর আমি খাব।' আসলে এ-সংসারের কর্ত্রী হিসেবে অতিথিদের নিজের হাতে খাওয়াতে চাইছে সে। পাছে যত্ন এবং আপ্যায়নে কোনও রকম ত্রুটি হয়ে যায়, সেজন্য সে এখন বসে-বসে লক্ষ রাখবে, দরকারমতো সবার পাতে-পাতে খাবার তুলে দেবে।

অতসী বলল, 'তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা খাবো, খুব খারাপ লাগছে কিন্তু।'

প্রবালও তার কথায় সায় দিল।

হেসে-হেসে সন্ধ্যা বলল, 'আজকের দিনটা থাক। ডরোথিটা ছেলেমানুষ। ওকে ফেলে কোনওদিন খাই না।'

ডরোথি বলল, 'আপনি বসে পড়ুন না বউদি। সবাইকে দিয়ে আমি পরে খাবো'খন।'

সন্ধ্যা ডরোথির দিকে ফিরে সস্নেহে বলল, 'তুই থাম। তোকে আর বুড়োমি করতে হবে না।'

সন্ধ্যাকে যখন একসঙ্গে খেতে বসানো গেল না, তখন কী আর করা, অতসীরা খাওয়া

শুরু করল।

খেতে-খেতে নানারকম গল্প চলতে লাগল। ক'জন বাঙালি কলকাতার বাইরে একসঙ্গে হলেই অনিবার্যভাবে যে-যে টপিক আসে সবই এসে গেল। অর্থাৎ কলকাতার পপুলেশন, ট্রান্সপোর্টের ভয়াবহ প্রবলেম, বাঙালি যুবকদের আন-এমপ্লয়মেন্ট, হিন্দি ফিল্ম, সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার ইত্যাদি-ইত্যাদি। এ-সবের ফাঁকে এই ধাতুরিয়া অঞ্চলের আদিবাসী নেচারের সন্তান সাঁওতাল ওরাওঁ আর মুন্ডাদের সারল্য, তাদের অগুনতি মজাদার সামাজিক নিয়ম-কানুন এবং আরও নানা প্রসঙ্গ হুড়মুড় করে আসতে লাগল।

অতসী সবার সঙ্গে গল্প করছিল ঠিকই, কিন্তু তার চোখ প্রায় সারাক্ষণই টেবলের উলটো দিকে প্রবালের মুখের ওপর আটকে আছে। মাঝে-মাঝে চোখাচোখি হলে সে কিন্তু চোখ সরিয়ে নিচ্ছে না। তবে প্রবালের যে খুবই অস্বস্তি হচ্ছে, সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। অতসীর পলকহীন তীক্ষ্ণ চোখের দিকে চোখ পড়ামাত্র সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

অতসী যেমন তাকিয়ে আছে তেমনি স্নায়ুগুলো সজাগ রেখে প্রবালের কথা শুনে যাচ্ছে। বার-বার শুনে তার কণ্ঠস্বরটা স্মৃতির ভেতর আটকে রাখতে চাইছে অতসী। পরে কোনও একসময় যখন ধারেকাছে কেউ থাকবে না, চুপচাপ নিরিবিলিতে সঞ্জয়ের গলার সঙ্গে এই কণ্ঠস্বরটা মিলিয়ে দেখবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আর বসল না প্রবাল। বলল, 'আমাকে পাহাড় টপকে অনেকটা দূর যেতে হবে। দয়া করে যদি পারমিশান দ্যান—'কথাটা অতসীর দিকে তাকিয়ে বলেছে সে।

অতসী বলল, 'নিশ্চয়ই, আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে।'

অতসীর গলায় এমন কিছু ছিল যাতে খানিকটা চমক লাগল যেন প্রবালের। একটু চুপ করে গলায় বেশ জোর দিয়েই বলল, 'সার্টেনলি। আচ্ছা তা হলে চলি অতসীদেবী। গুড নাইট—'

অতসী আস্তে করে বলল, 'গুড নাইট।'

এবার প্রবাল সন্ধ্যাদের দিকে ফিরল। হাত নেড়ে বলল, 'চলি ব্যানার্জি, চললাম সন্ধ্যাবউদি। আপনাদের খুব জ্বালিয়ে গেলাম।'

সন্ধ্যা বলল, 'মাঝে-মাঝে দয়া করে এরকম জ্বালাতে এলে তো হয়। আমাদের খানিকটা সময় ভালোই কাটে।'

'বেশি লোভ দেখাবেন না ম্যাডাম। চিকেন আর কালিয়া যা খেলাম, এরকম ঘন-ঘন খাওয়ালে দেখবেন বাক্স-বিছানা ঘাড়ে করে এনে এখানেই পার্মানেন্টলি তাঁবু ফেলে বসেছি।'

'মুখেই। ক'দিন পর আপনার দর্শন মিলল, হুঁশ আছে? পাক্কা তিন মাস বাদে। নেহাত অতসীদি এসেছেন; তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আপনি উদয় হলেন। নইলে আরও কতদিন আপনার টিকি দেখা যেত না তা আমাদের জানা আছে।'

দু-হাত জোড় করে মজাদার ভঙ্গি করল প্রবাল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ক্ষমা, এবার থেকে দু-দিন পরপর এসে 'প্রেজেন্ট ম্যাডাম' করে যাব।'

সন্ধ্যা বলল, 'দেখা যাক। একমাস দেখার পর ক্ষমার ব্যাপারটা কনসিডার করা যাবে।'

'ও-কে।' হাসতে-হাসতে বেরিয়ে পড়ল প্রবাল। তার সঙ্গে-সঙ্গে অতসীরাও উঠল।

বিনয়ের কোয়ার্টারের গায়ে ঢালু জায়গায় প্রবালের জিপটা দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িতে উঠে চাবি ঘুরিয়ে সে স্টার্ট দিল। জিপটা আস্তে-আস্তে সামনের উতরাই বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। একটু পর সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে জিপটার চলে যাওয়া দেখছিল অতসী। এবার সে বলল, 'আমিও যাই। সন্ধ্যা, খুব স্বার্থপরের মতো বলছি কিন্তু ভাই, এখন গিয়ে শুতে না পারলে স্রেফ মরে যাব। যা খাইয়েছ, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।' একটু থেমে পরক্ষণে আবার বলল, 'এত

যত্ন কর খাওয়ালে। অথচ তোমার খাওয়ার সময় কাছে বসতে পারছি না। কিছু মনে কোরো না ভাই।'

সন্ধ্যা এবং বিনয় একই সঙ্গে বলে উঠল, 'আরে না-না, আপনি টায়ার্ড। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

অতসীর কোয়ার্টারে এসে হোল্ড-অল খুলে বালিশ, মশারি ইত্যাদি বার করে নিজের হাতে বেডরুমের খাটের ওপর বিছানা পেতে দিল সন্ধ্যা। তারপর মাথার কাছে একটা ছোট টেবলে প্লেট চাপা দিয়ে জলের গ্লাস রেখে বলল, 'আমরা যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন।'

চার

বিনয়রা চলে যাবার পর দরজা টরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল অতসী। তার মাথার কাছেই জানলাটা খোলা রয়েছে। সেখান দিয়ে ছোটনাগপুরের উলটো-পালটা বাতাস স্রোতের মতো হুড়-হুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ছে। স্বচ্ছ নীলাভ নাইলনের মশারিটা হাওয়ায় নৌকোর পালের মতো ফুলে-ফুলে উঠছে।

সারা শরীরে অগাধ ক্লান্তি মাখানো। চারিদিকে সীমাহীন নির্জনতা আর আরামদায়ক শীতল বাতাস। বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু ঘুম আসছে না।

সবাইকে ছেড়ে কলকাতার বাইরে এসে একা-একা কখনও থাকেনি অতসী। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় গরম বা পুজোর ছুটিতে মা-বাবা কি দাদা-বউদিদের সঙ্গে মুসৌরি কি উটি, দার্জিলিং কিংবা পণ্ডিচেরিতে বেড়াতে গেছে। চিরকাল বড় ফ্যামিলিতে অনেক মানুষের মধ্যে থাকার অভ্যাস অতসীর। আচমকা দূরে এসে একা থাকতে হলে অস্বস্তি হবার কথাই। কিন্তু তার অস্বস্তিটা চারপাশের নির্জনতা বা একা থাকার জন্য নয়। প্রবালের গলার স্বর শোনার পর থেকেই তার মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে। ওই কণ্ঠস্বরটা অতসীর মাথায় ফিক্সেশনের মতো আটকে যাচ্ছে যেন।

খানিকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল অতসী। তারপর বালিশে চিবুক ডুবিয়ে মশারির ভেতর থেকে জানলার বাইরে তাকাল। ঝকঝকে নীলাকাশে রুপোর থালার মতো চাঁদটা স্থির হয়ে আছে। নীচে যতদূর চোখ যায় উঁচু-নীচু পাহাড়ের রেঞ্জ; সেগুলোর গায়ে দেওদার, অর্জুন এবং কেঁদের বন। আর আছে এলোমেলো ঝোপঝাড়। পাহাড় এবং জঙ্গলকে ঘিরে আছে সিল্কের মতো পাতলা ফিনফিনে কুয়াশা। গলানো রুপোর মতো চাঁদের আলো এখন ছোটনাগপুরের সব কিছুকে অপার্থিব মায়ায় ঘিরে রেখেছে। কাছাকাছি কোনও ঝোপঝাড় কিংবা খাদ থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক উঠে আসছে। কোয়ার্টারের পেছন দিকের গাছ-গাছালির মাথায় রাতজাগা পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়।

জ্যোৎস্না-ধোয়া মায়াবী উপত্যকা কিংবা পাহাড়চূড়া, ঝিল্লিস্বর বা পাখিদের ডানার আওয়াজ, কিছুই যেন স্পষ্ট করে দেখতে অথবা শুনতে পাচ্ছে না অতসী। বারবার প্রবালের কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসছে। প্রবালের ঠিক না, তার ভেতর থেকে সঞ্জয় যেন কথা বলছিল।

সেই ব্যাপারটা আরেক বার মনে পড়ে গেল অতসীর। আশ্চর্য! দুজন মানুষের গলা কী করে যে একরকম হয়, কে জানে!

নাঃ, ঘুম আসছে না। আজ খুব সম্ভব আর আসবেও না। মাথার ভেতর ফিক্সেশনের মতো প্রবাল আর সঞ্জয় যেন আটকে গেছে।

কখন যেন একসময় ধীরে-ধীরে ছোটনাগপুরের কোমল নীলাকাশ, চাঁদির থালার মত চাঁদ, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া পাহাড়, ভ্যালি, সমুন্নত শালের বন চোখের সামনে থেকে মুছে যেতে লাগল। আর অন্ধকার অডিটোরিয়ামে স্লাইডের ছবির মতো একটি মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সঞ্জয়ের মুখ।

সঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ ইউনিভার্সিটিতে প্রথম দিন ক্লাস করতে এসে।

বি. এ-র রেজাল্ট বেরুবার পরই অসুখে পড়েছিল অতসী। একটানা মাসখানেক টাইফয়েডে শুয়ে থাকার পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে আরও দুটো মাস লেগে গিয়েছিল। ততদিনে ফিফথ্ ইয়ারের সেশন শুরু হয়ে গেছে।

প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এসে অতসী দেখল, আগেই সব পেপারের অনেকগুলো করে ক্লাস হয়ে গেছে। প্রায় মিড-সেশানে এসে খুবই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল সে। একের-পর-এক ক্লাস হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না।

প্রথম দিন চারটে ক্লাস ছিল। লাস্ট ক্লাসটা যখন শেষ হয়ে এসেছে, অতসী প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিল, একটা বছর ড্রপ করে দেবে। বি.এ.-র রেজাল্টটা মোটামুটি ভালোই হয়েছিল তার, অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড। এম.এ.-তে আরও ভালো করার ইচ্ছা ছিল। ভেবেছিল, দিনরাত খেটেখুটে অন্তত একটা ফার্স্ট ক্লাস তাকে পেতেই হবে। রেজাল্টটা ভালো হলে স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে যাওয়া অনেক সহজ। তা ছাড়া বড়দা আছে ওয়েস্ট জার্মানিতে, দিদি-জামাইবাবু আমেরিকায়। ওই দুটো দেশের যে-কোনও একটার স্কলারশিপ পেলে তো কথাই নেই। ওদের কাছেই থাকা যাবে। মোট কথা, বাইরের কোনও ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে রিসার্চ-টিসার্চ করতে চায় অতসী। কিন্তু তার আগে যা দরকার তা হল, এম. এ-তে একটা ভালো রেজাল্ট। একটা বছর ড্রপ না করলে তার আর আশা নেই।

অতসী খেয়াল করেনি, প্রথম থেকে শেষ ক্লাস পর্যন্ত ক্লাসরুমের আরেক কোণ থেকে একজন তাকে অনবরত লক্ষ করে যাচ্ছিল।

লাস্ট পিরিয়ডটা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে গোটা ক্লাসটা হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল। একদিনে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ সম্ভব নয়। অল্প-স্বল্প একটু-আধটু কথা হয়েছে।

ছুটির পর একা একাই সিঁড়ি দিয়ে নামছিল অতসী আর ভাবছিল, বাড়ি গিয়েই মা-বাবাকে জানিয়ে দেবে কাল থেকে আর ইউনিভার্সিটিতে আসছে না।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'প্লিজ একটু শুনবেন—'

অন্যমনস্ক অতসী চমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঘাড় ফেরাতেই তার চোখে পড়েছিল, পেছন দিকের লম্বা করিডরের ওপর দিয়ে বড়-বড় পা ফেলে একটা ছেলে এগিয়ে আসছে।

একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল অতসী, সেই সঙ্গে খানিকটা বিরক্তও। কিছু-কিছু ছোকরা আছে, নতুন মেয়ে দেখলেই গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে চায়। এদের কী করে টিট করতে হয় অতসী জানে। তার মধ্যে এমন এক ধরনের ব্যক্তিত্ব আছে, যাতে কারও পক্ষেই খুব বেশিদূর এগুনো সম্ভব নয়। নিজের চারপাশে একটা অদৃশ্য বাউন্ডারি-ওয়াল তুলে রেখেছে অতসী। সেটা ডিঙোতে গেলে ধাক্কা খেতে হয়।

ছেলেটা ততক্ষণে কাছাকাছি এসে গেছে। বেশ ব্রাইট টান-টান চেহারা, ছ-ফুটের কাছাকাছি হাইট, লম্বাটে মুখ, এলোমেলো ঘন চুল অবহেলায় পেছন দিকে উলটে দেওয়া। গালে দু-তিন দিনের না-কামানো অল্প-অল্প পাতলা দাড়ি। বয়েস অতসীর চাইতে কিছু বেশিই হবে। কম করে চার পাঁচ বছরের বড়।

তার পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট। শার্টের দুটো বোতাম নেই; ফলে বুকের অনেকটা জায়গা খোলা; পায়ে পুরু সোলের চপ্পল; কবজিতে চওড়া স্টিল ব্যান্ডের রেক্টেঙ্গুলার ঘড়ি।

তবে ছেলেটার সবটুকু আকর্ষণ রয়েছে তার চোখে-মুখে। এমন সরল নিষ্পাপ পবিত্র মুখ এবং চোখ আগে আর কখনও চোখে পড়েনি অতসীর। আবছাভাবে তার মনে হল ছেলেটি একেবারে অচেনা নয়। ক্লাসের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা ছেলেমেয়ের ভেতর থেকে তাকেও যেন দেখেছে সে।

অতসী ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে জিগ্যেস করেছিল, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

ছেলেটি দারুণ সুন্দর করে হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। চলুন, নামতে-নামতে কথা বলি—'

'চলুন—'

ইউনিভার্সিটির চওড়া-চওড়া সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে ছেলেটি বলল, 'আমার নাম সঞ্জয়। আপনি—'

'অতসী।'

'আপনার আর আমার একই সাবজেক্ট। সেশান শুরু হয়ে গেছে তিন মাস আগে! কিন্তু আজই আপনাকে প্রথম ক্লাসে দেখলাম। এতদিন আসেননি কেন?'

না আসার কারণটা জানিয়েছিল অতসী।

সঞ্জয় বলেছিল, 'অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গেছে। প্রফেসররা প্রচুর নোট দিয়েছেন। এত পরে এলেন, কী করে মেক আপ করবেন?'

একটা বছর ড্রপ করার কথা যে ভেবে ফেলেছে তা আর জানালো না অতসী। খুব নিস্পৃহভাবে শুধু বলল, 'দেখি—'

কথা বলতে-বলতে ওরা নীচে নেমে এসেছিল। সঞ্জয় বলেছিল, 'আপনি কি এক্ষুনি বাড়ি ফিরবেন?'

কুড়ি বছর বয়েস তখন অতসীর। এর মধ্যে কয়েক হাজার যুবক দেখেছে সে। তাদের স্বরের উত্থান-পতন শুনে আর মুখ-চোখের চেহারা দেখে অনেক কিছুই টের পেয়ে যেত। সঞ্জয় কতদূর যেতে পারে, তার দৌড় কতটা, সেটাই দেখার ইচ্ছে হয়েছিল অতসীর। খুব শান্ত গলায় সে বলেছিল, 'কেন বলুন তো?'

'যদি ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ি ফিরলে চলে, কোথাও গিয়ে বসতাম—'

সোজাসুজি সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'কোথায় বসতে চান?'

একটুও না ভেবে সঞ্জয় উত্তর দিয়েছিল, 'কফি হাউসে। আপত্তি আছে?'

'না, চলুন। কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি এক সেকেন্ডও থাকতে পারব না।' বলেই পা বাড়িয়ে দিয়েছিল অতসী।

সঞ্জয় কিন্তু দাঁড়িয়েই ছিল। সে বলেছে, কফি হাউসে যাবার আগে একটা কথা বলবার আছে।'

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অতসী, 'কী কথা?'

'আপনাকে এই যে যেতে বলছি, তাতে আমার কোনওরকম ইনটেনশান নেই। হয়তো মনে করতে পারেন ফিউচারে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বলার জন্যে আজ তার ফাউন্ডেশন তৈরি করতে যাচ্ছি। নট দি লিস্ট।' বলে একটু থেমেছে সঞ্জয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুরু করেছে, 'প্রেমের মতো লাক্সারি গুডস নাড়াচাড়া করার মতো টাইম এবং পয়সার জোর আমার নেই। তা ছাড়া লাইফে আমার অন্য অ্যাম্বিশান আছে। 'লাভ'-টাভের মতো কোনও ক্যাঁচাকলে পা ঢুকিয়ে নিজের বারোটা আমি বাজাতে চাই না। আপনি একজন প্রেটি ইয়াং গার্ল না হয়ে যদি খ্যাঙাখেঁচা

চেহারার ছোকরা হতেন, তবুও আপনাকে কফি হাউসে যেতে বলতাম।'

এ-সব সঞ্জয়ের চাল কি না কে জানে! হয়তো এভাবে বেপরোয়া ধরনের উলটো-পালটা কথা বলে সে ইমপ্রেস করতে চায়। ভেতরে-ভেতরে সে যা-ই ভেবে থাকুক, তার কথাগুলোর মধ্যে দারুণ চমক রয়েছে। দুর্দান্ত স্মার্ট আর ঝকঝকে মেয়ে অতসী। কনভেন্টে আর ইংলিশ মিডিয়াম কলেজে কসমোপলিটান অ্যাটমসস্ফিয়ারে সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই টাইপের কথা আগে আর কখনও শোনেনি। সঞ্জয়কে তার বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। অতসী বলেছিল, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে, আপনিও মনে রাখতে চেষ্টা করবেন।'

'অফ কোর্স।'

'আর কিছু বলবেন?'

'না। চলুন—'

কফি হাউসে এসে কফি আর পাকোড়ার অর্ডার দিয়ে সঞ্জয় বলেছিল, 'আমার পক্ষে এর বেশি আর কিছু দিয়ে আপনাকে এন্টারটেন করা সম্ভব নয়। এর পর যদি আপনার সঙ্গে কফি হাউসে আসার অপারচুটিনি হয়, আপনাকেই কিন্তু বিলের পয়সা দিতে হবে।'

সঞ্জয়ের বলার স্টাইলটাই এমন যে অতসী হেসে ফেলেছে। বলেছে, 'পরে কেন, আজকের বিলটাও আমিই দিয়ে দিচ্ছি।'

'তা হয় না। আজ প্রথম দিন; আপনাকে আমি ইনভাইট করে এনেছি। আজকের বিলটা আমিই দেব,।' বলতে-বলতে অতসীর হাসি লক্ষ করে একটু থমকে গেছে সঞ্জয়। তারপর বলেছে, 'আপনি হয়তো ভাবছেন আমি 'জোক' করছি কিন্তু বিশ্বাস করুন বিল পে করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার ট্রাউজার্স, শার্ট, রিস্টওয়াচ—সব এক বন্ধুর দেওয়া। পুরোপুরি গিফ্‌ট। তারই জন্যে আমি এই এম.এ.-টা পড়তে পারছি। কিন্তু এসব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুলে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু দিস ইজ হানড্রেড পারসেন্ট ট্রু।'

অতসী হেসেই যাচ্ছিল।

সঞ্জয় আবার বলেছিল, 'আপনিও বিশ্বাস করলেন না তো। জানতাম, করবেন না। ব্যাপারটা কি জানেন?

অতসী জিগ্যেস করেছে, 'কী?'

'আমার চেহারা এবং পোশাক-টোশাক, সবই ডিসেপটিভ। দেখলে মনে হবে আমি কোনও মাল্টিমিলিওনেয়ার ফ্যামিলির ছেলে। চেহারার ওপর আমার হাত নেই; ওটা মা-বাবার ব্যাপার। আর আগেই বলেছি বডিতে যা দেখছেন—ট্রাউজার্স, শার্ট, রিস্টওয়াচ—সবই বন্ধুর দেওয়া।' বলতে-বলতে একটু থেমেছিল সঞ্জয়। তারপর গভীর গলায় ফের বলেছিল, 'রাজীবের মতো বন্ধু হয় না। ও না থাকলে কলকাতায় এসে আমার পড়াটড়া কিছুই হত না। হয়তো চায়ের দোকানের বয় কি অ্যান্টিসোশাল এলিমেন্ট হয়ে উঠতাম। ওয়াগন-টোয়াগন ভাঙতাম, ছুরি দেখিয়ে ছিনতাই করতাম।'

সঞ্জয়ের কথাগুলো কতটা মিথ্যে, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। মুখচোখ এবং গলার স্বর পালটে যদি মিথ্যেই বলে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে সঞ্জয়ের মতো অ্যাক্টর গোটা পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায়নি। ওর সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল অতসীর, কিন্তু একেবারে প্রথম দিন প্রায় অচেনা একটি যুবককে তার মা-বাবা, তাদের ফ্যামিলি এবং তার প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করতে যাওয়া অশোভন। তা ছাড়া ভেতরে-ভেতরে নিজের স্নায়ুগুলোকে টান-টান করে রেখেছিল অতসী। কোনওরকম আজে-বাজে আগ্রহ দেখিয়ে সে অদৃশ্য কোনও ফাঁদে পা দিতে চায়নি। সব কিছুই চুপচাপ শুনে বা দেখে যেতে চেয়েছিল শুধু।

সঞ্জয় বলেছিল, 'আমার বা আমার বন্ধুর কথা থাক। যে-জন্যে আপনাকে এই কফি হাউসে

ধরে এনেছি সেটাই বলা যাক।'

অতসী এবারও কিছু বলেনি। কফিতে আস্তে একটু চুমুক দিয়ে মুখ তুলে সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়েছিল।

সঞ্জয় বলেছিল, 'সেশান শুরু হবার পর তিন মাস আপনি ক্লাস করেননি। এর ভেতর প্রফেসররা অনেকগুলি ভেরি ইমপর্টান্ট ক্লাস-নোট দিয়েছেন। আমার কাছে নোটগুলো রয়েছে। যদি চান তো দিতে পারি। ভালো রেজাল্ট করতে হলে ওগুলো কাজে লাগবে।'

ক্লাস-নোটগুলোর জন্যেই সঞ্জয় যে তাকে কফি হাউসে নিয়ে এসেছে, এটা আগে ভাবতে পারেনি অতসী। হঠাৎ এই অদ্ভুত ধরনের যুবকটি সম্পর্কে খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল সে। তবে সেই সংশয়টাও ভেতরে-ভেতরে কাজ করে যাচ্ছিল। যারা ভালো রেজাল্ট করতে চায় তারা নিজেদের নোট-টোট অন্যকে দিতে চায় না। কিন্তু একটি অচেনা মেয়ের জন্য সঞ্জয়ের এত দুশ্চিন্তা কেন? মেয়ে বলেই কি এই পরোপকারের ইচ্ছা?

অতসীর ভাবনার মধ্যেই সঞ্জয় আবার বলে উঠল, 'হয়তো ভাবতে পারেন, আপনাকে নোট-টোট কেন দিতে চাইছি? এতে আমার কী ইন্টারেস্ট?' বলে হেসে-হেসে মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলেছিল, 'কিচ্ছু না। একজন ক্লাসফ্রেন্ড হিসেবে এটা আমার ডিউটি বলে মনে করি।'

সঞ্জয় কি থট রিডিং জানে? মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা পড়তে পারে? অতসী কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে কিছু বলার আগে সঞ্জয় ফের শুরু করেছিল, 'হর্স রেস দেখেছেন কখনও?'

অতসী এরকম একটা উদ্ভট প্রশ্ন আশা করেনি। একটু অবাক হয়ে বলেছিল, 'না। কেন বলুন তো?'

'তা হলে একটু এলাবোরেটলিই বলতে হয়। রেসে যে ঘোড়াগুলো ছোটে, দৌড় স্টার্ট করার আগে তাদের একটা লাইনে দাঁড় করানো হয়। কেউ আগে থাকে না, পরেও না। স্টার্টের পর যারা পারল তারা আগে-আগে টার্গেটে পৌঁছল; যারা পারল না তারা ফ্ল্যাট হয়ে পেছনে পড়ে থাকল। কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপের চান্স নিয়ে একজন আগে একজন পরে স্টার্ট করলে চলবে না। দ্যাটস অ্যানস্পোর্টিং। কেউ পিছিয়ে থাকলে তাকে এক লাইনে দাঁড় করাতে হবে।' বলে সঞ্জয় হেসে ফেলেছে, 'নেতাদের মতো টেরিফিক একখানা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম, তাই না?'

অতসী এবার প্রায় মুগ্ধই হয়ে গিয়েছিল। আস্তে-আস্তে বলেছিল, 'আপনি ক্লাস ফ্রেন্ডদের কথা খুব ভাবেন, না?'

'ভাবব না?'

'জানেন, ঘণ্টাখানেক আগে আমি ডিসাইডই করে ফেলেছিলাম, এই ইয়ারটা ড্রপ করে দেব।'

টেবলের ওপর দিয়ে অতসীর দিকে খানিকটা ঝুঁকে সঞ্জয় জিগ্যেস করেছে, 'কেন বলুন তো?'

কারণটা জানিয়ে অতসী বলেছিল, 'আপনি নোটগুলি দিতে চেয়েছেন। মনে হচ্ছে বছরটা সেভড হয়ে গেল। অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ-টন্যবাদ বলে ফর্মালিটি করলে আমি কিন্তু নোট দেব না। এটা আমার ডিউটি।'

অতসী বলেছিল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, ফর্মালিটি করব না। নোটগুলো কবে পাব?'

সঞ্জয় বলেছিল, 'আজই দিতে পারতাম, কিন্তু দেব না। কাল নেবেন।'

আগে থেকে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল অতসী, কোনও ব্যাপারেই আগ্রহ দেখাবে না বা কোনও প্রশ্ন করবে না। কিন্তু নিজের অজান্তে সে বলে ফেলেছিল, 'আজ দেওয়া যাবে না কেন?'

'কারণ, তা হলে আমি যেখানে থাকি, সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে হয়। একবার জোর করে কফি হাউস পর্যন্ত টেনে এনেছি। এরপর আবার আরেক জায়গায় যেতে বললে ডেফিনিটলি

ভাববেন আমার কোনও পারপাস আছে। আপনাকে এটা ভাববার চান্স দেব না।' বলেই কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল, 'এক ঘণ্টার জন্যে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। নাউ ফিফটি সেভেন মিনিটস হ্যাভ পাসড, উই শুড গেট আপ নাউ।'

একটা বেয়ারাকে ডেকে বিল-টিল মিটিয়ে অতসীকে নিয়ে কফি হাউসের দোতলা থেকে নেমে প্রেসিডেন্সি কলেজের উলটো দিকের স্টপেজে চলে এসেছিল সঞ্জয়।

একটু পরেই দু-নম্বর ডাবল ডেকার এসে গিয়েছিল। অতসীকে বাসে তুলে দিতে-দিতে বলেছিল, 'আশা করি কাল আবার দেখা হচ্ছে।'

অতসী বলেছিল, 'আশা করি।'

'কাল থেকে কিন্তু আর 'আপনি-টাপনি' চলবে না, স্ট্রেট ''তুমি''।

অতসী কিছু বলার আগেই বাস ছেড়ে দিয়েছিল।

সেই শুরু। তারপর সঞ্জয়কে যত দেখেছে, ততই মুগ্ধ হয়েছে অতসী। সঞ্জয়ের কথাবার্তা আর স্বভাবের মধ্যে কোথায় যেন অত্যন্ত জোরালো অলৌকিক একটা চুম্বক ছিল। সেটা ক্রমাগত অতসীকে তার দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

ক্লাসে সবশুদ্ধু ছেলেমেয়ে ছিল ছেচল্লিশ জন। দিনকয়েক ক্লাস করার পর সবার সঙ্গেই আলাপ-টালাপ হয়ে গিয়েছিল অতসীর। বিশেষ করে মঞ্জুষা আর শ্রাবণীর সঙ্গে রীতিমতো বন্ধুত্বই হয়েছিল। দারুণ দেখতে ছিল মঞ্জুষাকে। ভালো হাইট, গায়ের রং আশ্বিনের রৌদ্র ঝলকের মতো, সরু কোমর, লম্বাটে মুখ, কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল। দুর্দান্ত আমুদে টাইপের মেয়ে। ভালো 'পপ সং' গাইতে পারত। হই-চই করে সারাক্ষণ ক্লাস মাতিয়ে রাখত।'

শ্রাবণী ফরসাও না, আবার কালোও না। নাক-মুখ কাটা-কাটা, ম্যানিকিওর করা নখ, প্লাক করা ভুরুর নীচে বাদামি চোখ। হাইটও বেশ ভালো, পাঁচ ফুট সাত আট ইঞ্চি হবে।

দুর্দান্ত 'মড' ছিল শ্রাবণী। কোনওদিন জাপানি কিমোনো ধরনের ড্রেস দিয়ে আসত; কোনওদিন পরে আসত ফ্যাশনেবল মিডি ফ্রকের মতো জামা; কোনওদিন বা তার পরনে থাকত বেলবটম আর শার্ট। সেও মঞ্জুষার মতো হই-হুল্লোড় করতে পারত। মেয়ে-বন্ধুরা একসঙ্গে থাকলে অ্যাক্টিং করে দারুণ সেক্সের গল্প করত।

পড়াশোনাতে ব্রিলিয়ান্ট ছিল শ্রাবণী আর মঞ্জুষা। দুজনেই অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

ছেলেদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভালো। প্রত্যেকটা মানুষ তো এক মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরি হয় না। যেমন গণেশ। মফস্‌সলের একটা কলেজ থেকে পাস করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়তে এসেছিল সে। তার মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, চুলে জবজবে করে নারকেল তেল। গোল মুখে বড়-বড় চোখ, স্যার আশুতোষের মতো গোঁফ। পরনে ডবল কফ দেওয়া ফুল শার্ট, যার গলার বোতাম পর্যন্ত আটকানো থাকত, ধুতির কোঁচা সামনের দিকে ঝুলত, পায়ে থাকত ফিতে-বাঁধা বুট জুতো। সারা গায়ে মফস্‌সল পার্মানেন্ট স্ট্যাম্প মেরে রেখেছিল। মেয়েদের দিকে তাকাতে পারত না গণেশ। আচমকা কোনও মেয়ে সামনে পড়ে গেলে নার্ভাস হয়ে গলগল করে ঘামতে থাকত। ওর পেছনে সব চাইতে বেশি লাগত শ্রাবণী। একেকদিন দুম করে কাছে গিয়ে বলত, 'ফিল্ম সোসাইটি একটা দারুণ ''হট'' চেক ছবি দেখাবে। একটা এক্সট্রা টিকিট আছে। আমার সঙ্গে যাবেন?' গণেশের মুখ-চোখের চেহারা দেখে তখন মনে হত স্ট্রোক হয়ে যাবে। সবাই ওকে বলত, কাউডাং গণেশ, অর্থাৎ গোবর গণেশ।

আরেকটা ছেলের কথা মনে পড়ে। অবনীশ। মাঝারি ধরনের স্টুডেন্ট। কথা বলত কম। দুর্দান্ত মন দিয়ে প্রফেসারদের লেকচারের কমা সেমিকোলন ড্যাশ পর্যন্ত টুকে নিত আর চোখের কোণ দিয়ে মেয়েদের দেখত। কোনও মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে চট করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। শ্রাবণী বলত, 'ব্লাডি বাগারটা একটা স্লাই ফক্স।'

তার ক্লাশের আরেকটি ছেলে তুষারকে ভীষণ ভালো লাগত অতসীর। টান টান ধারালো চেহারা ছিল তুষারের। চুলগুলো সর্বক্ষণ অগোছালো, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে পাজামা, পাঞ্জাবি। পায়ে পুরু সোলের চপ্পল; কাঁধ থেকে কাপড়ের নকশা করা সাইড ব্যাগ ঝুলত।

তুষার ছিল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সবার সঙ্গেই সমানভাবে মিশত সে, জমিয়ে আড্ডা দিতে পারত। মুখে সর্বক্ষণ হাসি লেগেই থাকত তার। ইংরেজি, বাংলা, হিস্ট্রি, ফিলোজফি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকনমিকস—সব সাবজেক্টের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তো বটেই, ইউনিভার্সিটির কেরানি, বেয়ারা, দপ্তরি, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনও রকম অসুবিধা বা ঝামেলায় পড়লে যে-যুবকটিতে নিশ্চিতভাবেই কাছে পেত, সে হল তুষার। সবার সঙ্গে মিশলেও কোথায় যেন একটা প্রখর মর্যাদাবোধ ছিল তার। কোনওদিন কাউকে খোঁচা দিয়ে বা আঘাত করে কথা বলেনি সে। কোনওদিন তার মুখে কেউ খারাপ কথা শোনেনি; নোংরা ঠাট্টা-টাট্টা করতে দ্যাখেনি। যাকে বলে 'লাভেবল পার্সোন্যালিটি' সে ছিল তাই। সবাই তাকে যতটা ভালোবাসত, ঠিক ততটাই সমীহ করত। অতসীদের সময় তার মতো এত পপুলার ছেলে ইউনিভার্সিটিতে আর একজনও ছিল না।

হৃদয়বান, আড্ডাবাজ, সেনসিটিভ, রাজনীতি-করা তুষার এমনিতে ছিল খুবই সহজ আর স্বচ্ছন্দ। কিন্তু আশুতোষ কি সেন্টেনারি বিল্ডিংয়ের সামনে উঁচু টুলের ওপর দাঁড়িয়ে যখন সে ভিয়েতনাম, কঙ্গো, পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু বা ছাত্রদের স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা দিত তখন তার চেহারাটাই যেত বদলে। বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি, তিনটে ভাষাই জলের মতো বলতে পারত। প্রয়োজনীয় শব্দের জন্যে কেউ কোনওদিন তাকে তোতলাতে বা থমকাতে দ্যাখেনি। বক্তৃতার স্টাইল তার চমৎকার; বলার মধ্যে ছিল ম্যাজিক। গম্ভীর ভরাট গলায় কখনও মজা কখনও উইট কখনও বা দুর্দান্ত সিরিয়াসনেস মিশিয়ে দারুণ একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে পারত সে। অগুনতি মানুষকে চুম্বকের মতো নিজের চারধারে আটকে রাখত।

আরেকটি ছেলেকেও খুব মনে পড়ে অতসীর। অভিজিৎ ছিল দারুণ স্পোর্টসম্যান, ক্রিকেট আর ফুটবলে ইউনিভার্সিটি ব্লু। যেমন স্মার্ট তেমনি হুজুগে! খেলার মাঠ, গোল চামড়ার একটা বল, উইলো কাঠের ব্যাট, ব্র্যাডম্যান, পেলে, ইয়াসিন, সোবার্স, বেকেনবাউয়ার, স্ট্যানলি ম্যাথুজ, উইকস, কানহাই, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল, ওয়েস্ট জার্মানি, নাইনটিন থার্টি থেকে এখন পর্যন্ত নানা উত্তেজক টেস্টের রেকর্ড আর স্ট্যাটিসটিকস—এসব ছাড়া অন্য কিছু অভিজিতের মাথায় বেশি ঢুকত না। অকারণ চালিয়াতি বা স্নবারি নেই তার মধ্যে। সরল সাদাসিধে টাইপের ছেলে সে। কতাবার্তায় কিছুটা ব্লান্ট মনে হতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক, তার মধ্যে কোনওরকম নোংরা ব্যাপার ছিল না। যা বলবার মুখের ওপর সোজাসুজি বলতে পারত, তার অ্যাপ্রোচ ছিল একেবারে স্ট্রেট। তুষারের মতো অতটা না হলেও খেলা-টেলার জন্য ইনিভার্সিটিতে সেও ছিল বেশ পপুলার।

অভিজিৎ পড়ত পল সায়েন্স, কিন্তু অন্য ডিপার্টমেন্টের ছেলে-মেয়েদের কাছে গিয়েও আলাপ করত, আড্ডা-টাড্ডা দিত।

মনে পড়ে, একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে রাস্তার উলটোদিকে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছে অতসী। অনেকক্ষণ বাস-টাস আসছিল না। হঠৎ পাশ থেকে একটা চেনা গলা কানে এসেছিল। কেউ তাকে ডাকছে। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়েছিল—অভিজিৎ।

অভিজিৎকে বেশ পছন্দই করত অতসী। হেসে বলেছিল, 'আরে তুমি! কোথায় যাচ্ছ—ময়দানে?' ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে রোজই মাঠে ছুটত অভিজিৎ; অতসীর তা জানা ছিল।

অভিজিৎ কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল, 'না।'

'তবে কি বাড়ি! গুড বয় দেখছি। পড়াশোনা শেষ, সুবোধ বালক স্ট্রেট মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে।'

'নো।'

'তা হলে?'

'আমি তোমার জন্যে এই বাস স্টপে অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার ওয়েট করছি।'

অতসী অবাক। বাস স্টপে অভিজিৎ যে দাঁড়িয়ে ছিল, আগে লক্ষ করেনি অতসী। বলেছিল, 'আমার জন্যে!'

আস্তে ঘাড় কাত করেছিল অভিজিৎ।

অতসী বলছিল, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

'তোমার সঙ্গে কোথাও বসে দু-একটা কথা বলতে চাই। আপত্তি নেই তো?'

অতসী জানত, তার সঙ্গে অনেক যুবকই কোনও নির্জন জায়গায় বসে কথা বলতে চায়। সে আরও জানত, তার চারধারে অদৃশ্য বাউন্ডারি-ওয়াল তোলা রয়েছে। নিজে থেকে ওই দেওয়ালটা সরিয়ে না দিলে কারও সাধ্য নেই ওটা ডিঙোতে পারে। তা ছাড়া অভিজিৎ স্পোর্টসম্যান, ফুটবল ক্রিকেট পর্যন্তই তার রেঞ্জ। এর বাইরে অন্য কোনও ব্যাপারে কোনওরকম আগ্রহ বা উৎসাহ আছে বলে মনে হয়নি। সব মানুষেরই লাইফের একটা 'গোল' থাকে। কেউ পারফেক্ট কেরানি হতে চায়, কেউ উৎকৃষ্ট দালাল, কেউ আই-এ-এস, কেউ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। অভিজিতের একমাত্র টার্গেট ইন্ডিয়ার ক্রিকেট টিমে টেস্ট ক্যাপ পরা, নইলে ফুটবলের ইলেভেনে চান্স পাওয়া।

অতসী ভেবেছিল, দেখাই যাক, ইউনিভার্সিটির ডাবল ব্লু কী বলে! সে বলেছে, 'নো অবজেকশান। কোথায় যাবে—কফি হাউসে?'

অভিজিৎ তক্ষুনি বলেছিল, 'আরে না না, ওটা একটা মাছের বাজার। সবসময় ওখানে যেন মাছি ভনভন করছে। কোনও কথা শোনা যায় না।'

'তা হলে কোথায় যাবে?'

'এখন তো চৌরঙ্গিতে যাই। ওখানে গিয়ে একটা রেস্তোরাঁ ফেস্তোরাঁয় গিয়ে বসব। লিভ ইট টু মি।'

'ঠিক আছে।'

একটা মিনি বাসে করে ওরা চৌরঙ্গিতে চলে এসেছিল। সেখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে পার্ক স্ট্রিটের এক চিনা রেস্তোরাঁয়।

অর্ডার দিয়ে চিকেন কাটলেট আর ফ্রায়েড পর্ন আনিয়ে খেতে-খেতে অভিজিৎ বলেছিল, 'তুমি আমাকে বেশ কিছুদিন দেখছ। অ্যাবাউট এ ইয়ার, তাই না?'

অতসী বলেছিল, 'খুব সম্ভব।'

'একটা বছর কাউকে দেখলে তার সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যায়—তুমি কি বলো?'

'যেতে পারে।'

একটু চুপ। তারপর অভিজিৎ সোজাসুজি অতসীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?'

কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরেছিল অতসী। বলেছিল, 'একসেলেন্ট। অনেক দিন কেউ আমাকে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়ায়নি। তোমার মতো—'

'ফাজলামো কোরো না। আমি সিরিয়াসলিই জানতে চাইছি। আমাকে তোমার স্ট্রেট ছেলে বলে মনে হয়?'

অতসী আর ঠাট্টা-টাট্টা করেনি। আস্তে করে বলেছিল, 'সিওর।'

অভিজিতের চোখ-মুখ দেখে মনে হয়েছিল, উত্তরটা শুনে সে খুশি হয়েছে। বলেছিল, 'আমি স্পোর্টসম্যান; আমার পেটে স্ক্রুর মতো প্যাঁচ নেই। এখন তোমাকে যা জিগ্যেস করব তার স্ট্রেট জবাব দেবে। তোমরা মেয়েরা খুব খলিফা। প্লিজ, আমাকে খেলাবে না।'

'ঠিক আছে, কী জানতে চাও বলে ফেল।'

'তুমি কি ফ্রি আছ?'

অভিজিৎ ঠিক কী জানতে চায়, বুঝতে না পেরে অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'ফ্রি বলতে?'

অভিজিৎ বলেছিল, 'কারও সঙ্গে ফেঁসে-টেসে নেই তো? আই মিন প্রেম-ট্রেম চালাচ্ছ কিনা সেটাই জানতে চাইছি।'

অতসী তৎক্ষণাৎ বলেছিল, 'না। ওই ব্যাপারটা নিয়ে এখন পর্যন্ত ভাববার সময় পাইনি।'

'ফাইন! তোমার যদি আপত্তি না থাকে এ-ব্যাপারে আমরা প্রসিড করতে পারি।'

অতসী এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। ক্লাস টেনে ওঠার পর থেকে গাদা-গাদা প্রেমপত্র পেয়ে আসছে সে। এ ছাড়া ছোড়দার দু-একজন বন্ধু, বড়দার শালা, ছোট বউদির এক পিসতুতো ভাই, দিদির দেওর এবং ছোট পিসির ভাশুরের ছেলে—এমনি অনেক যুবক প্রায় নিয়ম করেই তাদের বাড়িতে হাজিরা দিত। এদের মধ্যে প্রায় সবাই ব্রাইট এবং ব্রিলিয়ান্ট। তাদের তাকানো, গলার স্বর ইত্যাদির মধ্যে এমন কিছু থাকত, যা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু অভিজিতের মতো এত সোজাসুজি তাকে প্রেম করার কথা বলেনি। কয়েক মিনিট থ হয়ে থাকার পর অতসী বলেছিল, 'সরি, আমি এখন এম-এ-তে একটা ভালো রেজাল্ট করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।'

'রেজাল্ট ভালো করার সঙ্গে এটাও চলতে পারে না?'

না। আমি ডিভাইডেড লয়ালটিতে বিশ্বাস করি না। দুটোই হল ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার। আমার কনস্টিটিউশান উইক। অত বড় দুটো জিনিস একসঙ্গে চালাবার মতো অত এনার্জি আমার নেই।'

'সিওর?'

'সিওর।'

একটু চুপ করে থেকে হেসে উঠেছিল অভিজিৎ, 'ও-কে ফরগেট দ্যাট চ্যাপ্টার।'

অতসীর খুব খারাপ লাগছিল। চোখের কোণ দিয়ে অভিজিৎকে দেখতে-দেখতে সে বলেছে, 'তুমি রাগ করলে।'

'নট অ্যাট অল। আমি স্পোর্টসম্যান! ভিক্টরি বা ডিফিট, আমার কাছে দুটোই সেম। আর কী খাবে বলো?'

ওরকম একটা অবস্থায় খাওয়া যায়? প্রন-ট্রন গলায় আটকে যাচ্ছিল যেন। বিব্রতমুখে অতসী বলেছিল, 'না-না, আর কিছু লাগবে না।'

অভিজিৎ বলেছিল 'দ্যাখো, খেতে বসে একদম লজ্জা করবে না।' বেয়ারাকে ডেকে আইসক্রিম-টাইসক্রিম দিতে বলেছিল সে।

অতসী ঘাড় নীচু করে কীভাবে যে দামি-দামি খাবারগুলো খেয়েছিল সে-ই জানে। মুখ তুলে অভিজিতের দিকে তাকাতে পারছিল না সে। তার মতো ঝকঝকে স্মার্ট মেয়েরও কথা বলতে আটকে যাচ্ছিল।

অভিজিৎ হয়তো তার অস্বস্তির ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল, 'আরে বাবা, আমি কিচ্ছু মনে করিনি! তোমাকে স্ট্রেট জিগ্যেস করেছি। স্ট্রেট জবাব পেয়েছি। চ্যাপ্টার ক্লোজড। আমরা যেমন বন্ধু ছিলাম তেমনি থাকব। খাও—'

খাওয়া-টাওয়া হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে চৌরঙ্গিতে এসে অতসীকে বাসে তুলে দিয়েছিল অভিজিৎ। তারপর ময়দানের দিকে চলে গিয়েছিল।

অভিজিৎ যা বলেছিল, তার প্রত্যেকটা অক্ষর এরপর থেকে মেনে চলত। আগের মতোই মিশত সে, জমিয়ে আড্ডা দিত। তার কথাবার্তা বা আচরণে বোঝাই যেত না, পার্ক স্ট্রিটের চিনা

রেস্তোরাঁয় বসে সে ওইরকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিল। পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত স্পোর্টসম্যান এই যুবকটিকে এখনও মনে-মনে শ্রদ্ধা করে অতসী।

ইউনিভার্সিটিতে লাইফটা মোটামুটি কালারফুলই ছিল। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ ছিল সাহসী, কেউ ভীরু, কেউ মুখচোরা, কেউ বেপরোয়া, কেউ আমুদে, কেউ বা হিংসুটে। সব মিলিয়ে নানা রঙের একটা নকশা যেন। এই ছেলেমেয়েদের অনেককেই ভালো লাগত অতসীর। কিন্তু সব চাইতে যে তাকে বেশি করে আকর্ষণ করত সে সঞ্জয়।

সেই যে প্রথম দিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ হবার পর অদ্ভুতভাবে সে তাকে কফি হাউসে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরের দিন গাদা গাদা ক্লাস-নোট এনে দিয়েছিল; সেখানেই অতসী সম্পর্কে তার আগ্রহ শেষ। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে রোজ-রোজ দেখা হত। সামনাসামনি পড়ে গেলে সঞ্জয় জানতে চাইত, অতসীর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে কিংবা এরিয়ার পড়া মেক-আপ হয়েছে কি না, ইত্যাদি-ইত্যাদি। এর বেশি আর কিছু জিগ্যেস করত না। তার ব্যবহার ছিল আশ্চর্য শোভন। অতসী সম্পর্কে তার অহেতুক কৌতূহল ছিল না।

অতসীর কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে বা গল্প করতে ভীষণ ইচ্ছা করত। এই উপকারী বন্ধুবৎসল যুবকটি সম্পর্কে প্রথম দিনের সেই সন্দেহ বা সংশয় কবেই কেটে গিয়েছিল। সঞ্জয় সম্পর্কে তার এই আকর্ষণের কারণটা স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবে না অতসী। হয়তো সঞ্জয়ের কথাবার্তার ধরন কিংবা ক্লাস-নোট দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা কিংবা তার চমৎকার মার্জিত ব্যবহার। ব্যাপারটা খুব সম্ভব সাইকোলজির আওতায় পড়ে। অতসী কখনও মনোবিজ্ঞান পড়েনি।

ক্লাসে ছেলে এবং মেয়েরা আলাদা-আলাদা বসত। কিন্তু নিজের অজান্তেই অতসীর চোখ ছেলেদের দিকের একটি বিশেষ মুখের ওপর গিয়ে পড়ত। যখনই তাকিয়েছে তখনই লক্ষ্য করেছে দূরমনস্কর মতো বসে আছে সঞ্জয়। এত ছেলেমেয়ে তাদের হই-চই কিংবা প্রফেসাররা থাকলে নিস্তব্ধ ক্লাসরুমে তাঁদের নোট দেওয়ার মধ্যে চুপচাপ কী যেন ভাবত সে।

ক্লাসের পর অতসী মাঝে মধ্যে জিগ্যেস করত, 'ক্লাসে বসে এত কী ভাবো বলো তো?' গোড়ায় গোড়ায় সঞ্জয়কে 'আপনি-টাপনি' করে বলত সে, পরে 'তুমি'-তে নেমে গিয়েছিল।

সঞ্জয় হাসত। বলত, 'কী আবার ভাবব? কিচ্ছু না। তুমি ভুল দেখেছ।'

সঞ্জয়ের এই অন্যমনস্কতার কারণটা অনেক পরে জেনেছিল অতসী।

ফিফথ ইয়ার যখন শেষ হয়ে আসছে সেই সময় প্রায়ই ক্লাস করত না সঞ্জয়। প্রায়ই একসঙ্গে দু-দিন, তিন দিন কি গোটা একটা সপ্তাহের জন্য কোথায় যেন চলে যেত। তারপর ফিরে এসে অতসী বা অন্য কোনও ছেলে-মেয়েকে বলত, 'ভাই এই ক'দিনের ক্লাস-নোটগুলো দাও তো।'

অন্য কারও কাছে নোট চাইলে অতসীর ভীষণ খারাপ লাগত তবে কিছু বলত না। কিন্তু তার কাছে যখন সঞ্জয় চাইত তখন জিগ্যেস করত, 'কোথায় ডুব দিয়েছিলে?'

পবিত্র, সরস, নিষ্পাপ হাসিটি মুখে ফুটিয়ে সঞ্জয় বলত 'কোথাও না, এখানেই ছিলাম।'

'তবে ক্লাস করোনি কেন?'

'ভালো লাগছিল না।'

অতসীর মনে হয়েছে কিছু একটা যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে সঞ্জয়। ক্লাসে তার অন্যমনস্কতার সঙ্গে এই গোপনীয়তার কোথায় যেন একটা সম্পর্ক ছিল। অতসী আর কিছু জিগ্যেস করত না। নিজের থেকে না বললে জোর করে জানতে চাওয়াটা অশোভন।

ক্লাস অফ্ টফ্ থাকলে বা কোনও কারণে ইউনিভার্সিটি তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলে সঞ্জয়কে মাঝেমধ্যে কফি হাউস কি ওয়াই-এম-সি.এ রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেত অতসী।

সঞ্জয় বলত, 'আমাকে যে এখানে টেনে আনলে, বিলের কথাটা মনে আছে? আমার পকেট কিন্তু পার্মানেন্টলি এম্পটি।'

অতসী বলত, 'মনে আছে বাবা। তোমার সঙ্গে তো প্রথম দিনই আমার এগ্রিমেন্ট হয়ে গেছে, বিলের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিন্তু—'

'কী?'

'রোজ-রোজ তোমার ঘাড় ভেঙে খাব। ইট লুকস ভেরি ব্যাড। আফটার অল আমি একজন পুরুষ মানুষ, মেয়েদের ওপর সুযোগ নিতে আমার সিভালরিতে আটকায়।'

'লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিতে হবে না।'

কোনওদিন সঞ্জয় বলত, 'দ্যাখো আমি যেশাস ক্রাইস্ট কি শুকদেব নই।'

অবাক হয়ে অতসী জিগ্যেস করত, 'তাতে কী।'

সঞ্জয় হাসতে-হাসতে বলত, 'দেখবে আমি একদিন হয়তো ফেঁসে গেছি। কিন্তু বিলিভ মি, পকেট আর হার্টের জোর আমার ভীষণ কম। প্রেম-ফ্রেম চালাতে গেলে স্রেফ মরে যাব।'

সঞ্জয় সম্পর্কে প্রেম ভালোবাসার কথা কখনও ভাবেনি অতসী। তবে তাকে খুব ভালো লাগত। অতসী বলত, 'একদম ইয়ার্কি করবে না।'

সঞ্জয় বলত, 'ঠিক আছে, করব না। তবে আগেই বলে রাখছি, আমার সব কথা শুনলে বুঝবে সহানুভূতি আর করুণা ছাড়া আমি আর কিছু পাওয়ার যোগ্য নই। এর বেশি কারও কাছে আমার কোনও এক্সপেক্টেশানও নেই।'

সঞ্জয় কী বলতে চেয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি অতসীর। সে বলেছে, 'ওটা তো তোমার ধারণা।'

'ওটা হানড্রেড পারসেন্ট ট্রু, বিশ্বাস করো।'

'তোমার সব কথা না শুনলে কী করে বুঝব ওটা সত্যি কি না। তোমার সম্বন্ধে আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছা করে।'

একটু চুপ করে থেকে সঞ্জয় বলেছে, 'আমার লাইফে এমন কোনও মেটিরিয়াল নেই যা কাউকে চার্ম করতে পারে। খুবই ডাল, ইনসিগনিফিক্যান্ট লাইফ আমার।'

অতসী বলেছিল, 'কতটা ডাল আর কতটা ইনসিগনিফিক্যান্ট সেটা আমি বুঝব। তুমি বলো না—'

একদিনে না। টুকরো, টুকরো ভাবে বেশ কয়েক মাস ধরে নিজের কথা বলেছে সঞ্জয়।

ওরা বাঙালি ক্রিশ্চান। তিন জেনারেশান ধরে এলাহাবাদে আছে। পঞ্চাশ বছর আগে ওর ঠাকুরদা একটি বিলিতি মার্চেন্ট ফার্মে ছোটখাটো চাকরি নিয়ে ওখানে চলে গিয়েছিল। ঠাকুরদার একমাত্র ছেলে বাবা। বাবার একমাত্র ছেলে সঞ্জয়।

ঠাকুরদা মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি করলেও সঞ্জয়ের বাবা ঢুকেছিলেন গভর্নমেন্ট সারভিসে। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে। প্রথমে ছিলেন ক্লার্কের পোস্টে।

বাবা চাকরিতে ঢোকার কয়েক বছরের ভেতর দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। তারপর ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলেন বাবা। দশ বছরের ভেতর বিগ অফিসার হয়ে গেলেন।

বাবা ছিলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া সৎ। ইনকাম ট্যাক্স এমন একটা ডিপার্টমেন্ট যেখানে ইচ্ছা করলে এক বছরে চারতলা বাড়ি করা যায়, হুইস্কির সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দেওয়া যায়, দু-বছরে বাড়ির কম্পাউন্ডে দামি ইমপোর্টেড গাড়ি এসে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে ফ্ল্যাট কিনে লাইফ এনজয় করার জন্য ওয়ার্ল্ডের সব চাইতে সুন্দরী মেয়েদের একজনকে পার্মানেন্টলি সেখানে রাখা যায়। বিশেষ করে সঞ্জয়ের বাবা যে-কাজ করতেন তাতে হাতের দুই তুড়িতে পৃথিবীর সব কমফোর্ট তাঁর পায়ের কাছে চলে আসতে পারত।

বাবা যা মাইনে-টাইনে পেতেন তাতে মোটামুটি ভালোই চলে যাবার কথা। কিন্তু চলত

না। তার কারণ, তাঁর মাইনের বেশির ভাগ টাকাই চলে যেত এলাহাবাদের গরিব ক্রিশ্চানদের জন্য নানারকম চ্যারিটি করে। কে খেতে পাচ্ছে না, কার ছেলের স্কুল বা কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে, কার ওষুধ জুটছে না, সবদিকে ছিল বাবার নজর। তা ছাড়া রাত্তিরে-রাত্তিরে ক্লাস করে হোমিওপ্যাথিটা পাশ করেছিলেন গরিবদের মধ্যে বিনা ফি-তে সার্ভিস দেবার জন্য। একটা পয়সা তো নিতেনই না, তার ওপর ওষুধ নিজের পয়সায় কিনে দিতেন। অফিসের সময়টুকু বাদ দিলে সকালের দিকটা তা বটেই, সন্ধের পর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত রোগী আর সোশাল সার্ভিস নিয়েই তাঁর কেটে যেত।

চ্যারিটি করতে গিয়ে মাইনের টাকা তো যেতই, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলতে-তুলতে সেটা প্রায় ফাঁকাই করে ফেলেছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল একজন সৎ, আইডিয়াল ক্রিশ্চানের মতো।

মা ছিলেন খুবই ধীরস্থির এবং শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বাবার কোনও কাজে বাধা তা দিতেনই না, উলটে সব ব্যাপারেই হাসিমুখে সায় দিয়ে যেতেন। কিন্তু তিনিও মাঝে-মাঝে বলতেন, 'সবই তো খরচ করে ফেলছ। সঞ্জুটার ভবিষ্যৎ আছে, তার কথা একটু ভেবো।' সঞ্জয়ের ডাক নাম সঞ্জু।

বাবা বলতেন, 'আমার বাবা আমার জন্যে কিছু রেখে যাননি। আমিও আমার ছেলের জন্যে কিছু রেখে যাব না। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দেব। নিজের ফিউচার নিজে তাকে তৈরি করে নিতে হবে।'

এমনিতে খুব সাধারণভাবে চললেও সঞ্জয়ের লেখাপড়ার ব্যাপারে কোনওরকম কার্পণ্য ছিল না বাবার। সঞ্জয়কে এলাহাবাদের সবচাইতে নামকরা ভালো স্কুলে এবং কলেজে পড়িয়েছিলেন। নিজে তার পড়াশোনা দেখার সময় পেতেন না। তাই প্রচুর মাইনে দিয়ে সব চাইতে ভালো টিউটর রেখে দিয়েছিলেন। সঞ্জয়ের খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাকের জন্যে দু-হাতে খরচ করতেন।

সোশাল সার্ভিস এবং সততার জন্য এলাহাবাদের হাজার-হাজার মানুষ বাবাকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। কিন্তু চাকরিতে বেশি অনেস্টির জন্য এলাহাবাদের কয়েকজন বিগ বিজনেসম্যান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে শত্রু করে ফেলেছিলেন। ইনকাম ট্যাক্সের কারচুপির জন্য প্রথম-প্রথম মিডলম্যানদের দিয়ে তারা মোটা ঘুষের অফার পাঠাত। গাড়ি, বাড়ি, টিভি, ফ্রিজ, রেকর্ড প্লেয়ার, স্টিরিও, ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট, মেয়েমানুষ—মুখ ফুটে যা চাইবেন তাই পাওয়া যাবে। বাবা তাদের বাড়ি থেকে বার করে দিতেন। বার করলে কী হবে, আবার তারা আসত। আবার তাদের বার করে দেওয়া হত। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর যখন ওরা বুঝল, টাকাপয়সা বা বাড়ি-গাড়ি ঘুষ দিয়ে বাবাকে গাঁথা যাবে না, তখন অন্য লাইন অফ অ্যাকশান নিল। সকালে দুপুরে বিকেলে, এমনকী মাঝরাতেও টেলিফোন করে অনবরত তারা ভয় দেখাত, শাসাত। তাদের ইচ্ছানুযায়ী না চললে ফলাফল খুবই খারাপ হবে।

বাবা বেশিরভাগ সময় বাড়ি থাকতেন না। ফোনগুলো মা আর সঞ্জয়ই বেশি ধরত। মা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বাবাকে প্রায়ই বলতেন, 'কী হবে বলো তো?'

বাবা বলতেন, 'কী আবার হবে? কিচ্ছু না। যারা ওভাবে ভয় দেখায়, তারা কাওয়ার্ড।'

মাঝরাতে যে ফোনগুলো আসত, বাবা সেগুলো ধরতেন। লাইনের ওধার থেকে অদৃশ্য লোকগুলো কী বলত শোনা যেত না। তবে আন্দাজ করা যেত। বাবা বলতেন, 'তোমরা যা পারো করো। ঘুষ দিয়ে বা আতঙ্ক দেখিয়ে আমার শিরদাঁড়া বাঁকানো যাবে না।'

এইভাবে দারুণ একটা ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে সঞ্জয় এবং তার মায়ের সময় কেটে যাচ্ছিল। মা প্রায় রোজই বাবাকে বলতেন, 'একটু সাবধানে রাস্তায় চলাফেরা করবে। বাইরে বেশি রাত করবে না।'

বাবা হাসতেন। বলতেন 'কিচ্ছু হবে না। কতকগুলো বাজে লোকের ফোন পেয়ে তুমি ভয়

পেয়েছ। ভাবনার কিছু নেই।' বাবা এতটুকু বিচলিত হননি। আগের মতোই সকালে এবং সন্ধেয় গরিব ক্রিশ্চান পাড়ায় ঘুরে-ঘুরে রোগী দেখেছেন, সোশাল সার্ভিস দিয়েছেন। এবং যথারীতি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর দৈনন্দিন রুটিনে এতটুকু হেরফের হয়নি।

এ-সবের মধ্যেই সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করে কলেজে ঢুকেছিল সঞ্জয়। ফার্স্ট ইয়ার যখন শেষ হয়ে আসছে, সেই সময় একদিন অনেক রাত্তিরে রাজীব তাদের বাড়ি এসে হাজির। দারুণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে। চুল এলোমেলো। শার্টের বোতাম লাগানো ছিল না।

রাজীব তার প্রাণের বন্ধু। এলাহাবাদে-টেলাহাবাদে যাকে বলে 'জিগরি দোস্ত'। ছেলেবেলা থেকে এক স্কুলে তারা পড়েছে। সিনিয়র কেমব্রিজের পর এক কলেজে ভরতি হয়েছে। চলাফেরা, ওঠাবসা, ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাওয়া—সবই তাদের একসঙ্গে। এলাহাবাদের রাস্তায় কোনওদিন একা-একা তাদের দেখা যেত না। মোট কথা, একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে ভাবা যেত না।

এলাহাবাদের বিগ বিজনেসম্যানদের একজন কামতাপ্রসাদ ভার্গব রাজীবের বাবা। তাঁকে বলা হত ইউ.পি.-র অয়েল অ্যান্ড সুগার কিং। গোটা উত্তরপ্রদেশে চিনি এবং সরষের তেলের যত আউটপুট হত, তার মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটা প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট তিনি কনট্রোল করতেন। বিশাল চর্বির পাহাড় কামতাপ্রসাদকে মালটিমিলিওনেয়ার বললে ঠিক বোঝানো যায় না। হোয়াইট এবং ব্ল্যাক মিলিয়ে তাঁর যে কত টাকা, স্বনামে এবং বেনামে কত যে প্রপার্টি, তা নিজেই জানতেন না। 'ব্ল্যাক টাকা' আর 'বেনামা প্রপার্টি' বললে ভীষণ রেগে যেতেন কামতাপ্রসাদ। বলতেন, 'আরে উল্লুকা পাঠ্‌ঠা, রুপাইয়া আউর প্রপার্টি কখনও গান্ধা হয়, না কালা হয়? রুপাইয়া হল খুদ লছমিজি। ব্ল্যাক মানি, বেনামদার প্রপার্টি নেহি, বোল্ আন-অ্যাকাউন্টেড মানি, আন-অ্যাকাউন্টেড প্রপার্টি। দু-একর জায়গা জুড়ে এলাহাবাদের সিভিল লাইনস-এ মধ্যযুগের ব্যারনদের মতো তাঁর ছিল সুবিশাল ক্যাসল, দশ বারোটা দেশি এবং ইমপোর্টেড গাড়ি। সেই সঙ্গে পুরোনো চাল বজায় রেখে তেজি আরবি ঘোড়ায় টানা ফিটন।

বিরাট বিজনেসম্যানের ছেলে হয়েও রাজীবের কোনওরকম বড়লোকি চাল ছিল না। অতগুলো গাড়ি আছে বাড়িতে, তবু বেশিরভাগ দিনই সাইকেল রিকশা করে কলেজ বা স্কুলে চলে আসত।

দারুণ তাজা আর টগবগে ছেলে রাজীব। পুরোপুরি গ্রিকদের মতো চেহারা। কলেজে পড়ার সময়ই তার হাইট ছিল ছ-ফুটের কাছাকাছি। গায়ে এক ফোঁটা বাজে চর্বি নেই। নাকটা সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে, সরু কোমর, কোঁকড়ানো চুল।

দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান রাজীব। তবে ফুটবল বা ক্রিকেট সম্পর্কে তার ইন্টারেস্ট ছিল না। সে খেলত গলফ, হর্স-পোলো আর বিলিয়ার্ড। সবগুলোই অবশ্য বড়লোকের খেলা। তারা যে মালটিমিলিওনেয়ার, সেটা টের পাওয়াবার জন্য এই খেলাগুলো বেছে নেয়নি রাজীব। তার মধ্যে কোনও রকম 'শো' ছিল না। সঞ্জয় জানে, খুব কম বয়স থেকেই এসব খেলায় তার দারুণ ঝোঁক। কলেজে ঢুকেই হর্স-পোলো আর বিলিয়ার্ডে সে হোল ইউ.পি.-কে রিপ্রেজেন্ট করেছিল।

রাজীবের স্বভাবটা ঝড়ের মতো। যখন যেখানে সে যেত, হইহই করে চারপাশের সব কিছু নিজের সঙ্গে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেত। এমন প্রাণবন্ত ছেলে আর কখনও দ্যাখেনি সঞ্জয়।

কতবার সে রাজীবদের সিভিল লাইনসের ক্যাসেলের মতো বাড়িটায় গেছে আর রাজীব তাদের হিউয়েট রোডের ভাড়া করা মাঝারি ফ্ল্যাটে এসেছে তার মনে পড়ে না।

রাজীব যখন তাদের বাড়ি আসত, রাস্তা থেকেই টের পাইয়ে দিত। ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলত, 'চাচিজি, ভীষণ খিদে পেয়েছে, একেবারে মরে গেলাম। শিগগির কিছু খেতে দিন।' তারপরেই তিন লাফে সঞ্জয়ের ঘরে গিয়ে বলত, 'গেট আপ সঞ্জু, কায়রো থেকে পোলোর

জন্যে দারুণ একটা ঘোড়া আনিয়েছি। চাচিজিকে খেতে দিতে বললাম। খেয়েই ঘোড়াটাকে ট্রায়াল দিতে পোলো ক্লাবে চলে যাব।'

কিন্তু সেদিন রাত্তিরে রাজীবকে ভীষণ বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। এই বিষাদ আর দুশ্চিন্তা তার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। তা ছাড়া এত রাত্তিরে আগে আর কখনও সে তাদের বাড়ি আসেনি।

সঞ্জয়ের ঘরে ঢুকে তার বিছানায় চুপচাপ বসে পড়েছিল রাজীব। তারপর বলেছিল, 'মা একটা কথা তোকে জানাতে বলেছে।'

'কী?'

'চাচাজির কাছে আমাদের কোম্পানির ফাইল রয়েছে। উনি যেন রাত পর্যন্ত বাইরে না থাকেন, অফিস ছুটি হলেই বাড়ি চলে আসেন। আর সকালে যখন অফিসে যাবেন তখন সঙ্গে যেন কাউকে নিয়ে যান, ফেরার সময়ও তাই।'

সঞ্জয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দরজার কাছ থেকে দারুণ উদ্বেগের গলায় মা বলে উঠেছিলেন, 'কী হয়েছে রাজু? তোমার চাচাজির কি কোনও বিপদ হতে পারে?'

সঞ্জয় চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। কখন মা ওখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সে টের পায়নি। লক্ষ করেছিল, রাজীবও দরজার দিকে তাকিয়েছে। মুখ নীচু করে সে বলেছে, 'না-না, বিপদ কীসের! তবে—'

'তবে কী?'

'চাচাজির একটু সাবধানে থাকা ভালো। আর মা অন্য একটা কথা আপনাদের বলতে বলেছে—'

'কী কথা বলো তো?'

'চাচাজি যদি পারেন দু-এক বছরের জন্যে এলাহাবাদ সার্কেল থেকে অন্য কোনও সার্কেলে যেন ট্রান্সফার নিয়ে চলে যান।'

মা ঘরের ভেতরে এসে সঞ্জয়ের পাশে বসেছিলেন। তারপর ত্রস্ত গলায় বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমার চাচাজির ভীষণ বিপদ আসছে। আমাকে সব খুলে বলো।'

রাজীব বলেছিল, 'মা আমাকে যা জানাতে বলেছে, সবই বলেছি। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।'

সেদিন রাজীব চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে বাবা ফিরে এলে মা বলেছিলেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি কিন্তু আমার কথা তুমি একেবারেই কানে তোলো না। আমার সর্বনাশ না ঘটিয়ে তুমি ছাড়বে না।'

বাবা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'কী হয়েছে বলো তো?'

মা রাজীবের কাছে যা শুনেছে বলে গিয়েছিল।

সব শুনে বাবা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বলেছিলেন, 'এরপর রাজু যখন আসবে, বোলো আমি তার মাকে সাবধান করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আর এটাও বলে দিও, কোনওদিন কোনও অন্যায় করিনি। দেশের আইন-টাইন আমার পক্ষে। কারও ভয়ে আমি পাহারাদার নিয়ে ঘুরতে পারব না। যেভাবে এতকাল চলে এসেছি ঠিক সেইভাবেই চলব।' একটু থেমে ফের বলেছিলেন, 'রাজুর মা কেন রাজুকে পাঠিয়েছিলেন, আন্দাজ করতে পারো?'

মা বলেছিলেন, 'না, কেন বলো তো?'

'রাজুর বাবা কামতাপ্রসাদজির ফার্মের ফাইলগুলো আমার হাতে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রচুর গোলমাল। রাজুর মা হয়তো এমন কিছু জানতে পেরেছেন যাতে আমার কোনও বিপদ হতে

পারে, তাই ছেলেকে পাঠিয়েছেন। এমনও হতে পারে এটা কামতাপ্রসাদের একটা দুর্দান্ত চাল। ছেলে এবং স্ত্রীকে আমাকে তাড়াবার ব্যাপারে কাজে লাগাতে চাইছেন। আমি এখান থেকে চলে গেল কামতাপ্রসাদের সুবিধা হয় কিন্তু আমি যাব না।'

মা এবার যেন অনেকটাই বুঝতে পেরেছিলেন। ভয়ার্ত গলায় বলেছিলেন, 'তুমি জানো রাজুর বাবার কত টাকা, ইচ্ছা করলে রাতকে দিন করে দিতে পারেন।'

'জানি, কিন্তু ভয় পেয়ে চলে গেলে দেশের লক্ষ-লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। এমন একটা অ্যান্টিসোশাল ক্রিমিনালকে কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

'তোমার মতো একজন অফিসার ওঁর কী করতে পারে? উলটে আমাদেরই সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কিছু হবে না। আমি ছোট অফিসার হতে পারি। তবে মনে রেখ এই বিরাট দেশের গভর্নমেন্ট আমার পেছনে রয়েছে।'

শুধু সেই একদিনই না, আরও বারকয়েক এসে রাজীব সতর্ক করে দিয়ে গেছে। সঞ্জয় যখন ওদের বাড়ি গেছে রাজীবের মা তাকেও তার বাবার ট্রান্সফার সম্বন্ধে বলেছেন। তার দু-হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করেছেন, 'বাবাকে বোলো ট্রান্সফার যদি না-ও নেন, লম্বা ছুটি নিয়ে উনি যেন বাইরে কোথাও চলে যান।'

সঞ্জয় বাড়ি ফিরে বাবাকে সব জানিয়েছে কিন্তু তাঁকে টলানো যায়নি। ছুটি নিয়ে এলাহাবাদের বাইরে তো যানইনি, সঙ্গে কোনও পাহারাদার নিয়েও চলাফেরা করতেন না। লুকিয়ে-লুকিয়ে সঞ্জয় দিনকয়েক তাঁর কিছু পিছু অফিস পর্যন্ত গেছে; ছুটির পরও দূর থেকে নজর রেখেছে। কিন্তু বেশিদিন এটা চালানো যায়নি। বাবা একদিন ধরে ফেলেছিলেন এবং খুবই রাগারাগি করেছেন।

তারপর একদিন যা ভয় করা গিয়েছিল তা-ই ঘটে গেল।

অন্য দিনের মতো সেদিনও বাবা সকালে অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিকেলে ছুটির পর গরিব ক্রিশ্চানদের বস্তি ঘুরে বাড়ি ফিরতে তাঁর বেশ রাত হয়ে যেত। সেদিন কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না। অনেক রাতে থানা থেকে ফোন এসেছিল, বাবাকে ছুরি মারা হয়েছে। তিনি হাসপাতালে আছেন, অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সঞ্জয় মাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ দেখা আর হয়নি। সেই রাতটা কীভাবে ভোর হয়েছিল, সঞ্জয়ই শুধু জানে।

পরের দিন সকাল হতে-না-হতেই রাজীব আর তার মা দৌড়ে এসেছিলেন। দু-হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে রাজীবের মা ভাঙা-ভাঙা করুণ বিষণ্ণ গলায় বলেছিলেন, 'বহেনজি, এ-মুখ আপনাকে দেখাবার নয়। তবু এ-সময় না এসে পারলাম না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'হে ভগবান, এর আগে আমার মাথায় আকাশের বাজ কেন ভেঙে পড়ল না!'

মা কোনও উত্তর দেননি; শুধু আচ্ছন্নের মতো বসে ছিলেন।

একধারে দু-হাতে মুখ ঢেকে বালকের মতো কেঁদে যাচ্ছিল সঞ্জয়। তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ঝাপসা গলায় সমানে বলে যাচ্ছিল রাজীব, 'কাঁদিস না সঞ্জু, কাঁদিস না—'

ওদিকে রাজীবের মা আবার শুরু করেছিলেন, 'আমি কারও জন্যেই আপনার কাছে ক্ষমা চাইব না বহেনজি। এ-পাপ যার হাত দিয়ে হয়েছে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। শুধু একটা দুঃখ রয়েছে, রাজুকে দিয়ে এতবার বলালাম, কিন্তু সঞ্জুর বাবাকে আপনারা এলাহাবাদের বাইরে পাঠালেন না।'

মা এবারও উত্তর দেননি; একটা মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন। এই পৃথিবীর কোনও শব্দ বা দৃশ্য তিনি যেন শুনতে বা দেখতে পাচ্ছিলেন না।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মৃত্যুর খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাহাবাদ শহরের অগুনতি

মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। তারা দৌড়ে এসেছিল। বাবার অফিসের কলিগরাও চলে এসেছিলেন। আর এসেছিল গরিব ক্রিশ্চানপাড়ার লোকজনেরা। পিতৃশোকে মানুষ যেভাবে কাঁদে সেইভাবে তারা কেঁদে যাচ্ছিল।

তারপর এক সময় প্রচুর ফুল আর মালা এল। খোলা গাড়িতে বাবাকে সাজিয়ে বেরিয়াল গ্রাউন্ডের দিকে বিশাল শোকযাত্রা শুরু হল।

বিকেলের দিকে কফিনের ভেতর চিরনিদ্রিত বাবাকে শুইয়ে গোরস্থানের মাটির নীচে যখন রেখে দেওয়া হল তখন গির্জার পুরোহিতরা কাঁপা গম্ভীর গলায় তাঁর আত্মার অনন্ত শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন আর কয়েক হাজার শোকাচ্ছন্ন মানুষের চোখ থেকে অবিরাম জল ঝরছে।

সন্ধের একটু পর গোরস্থান থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সঞ্জয়রা। সেই সকাল থেকেই রাজীব এবং তার মা তাদের সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন। অনেক রাত্রে সঞ্জয়কে কিছু খাইয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন রাজীবের মা। সঞ্জয়ের মাকেও কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। রাজীব তার মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফেরেনি; সঞ্জয়দের বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর পর জীবনের স্ট্রাকচারটা ভেঙেচুরে কীরকম যেন হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়দের। হাসপাতালে বাবার ডেডবডি দেখার পর সেই যে মা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আর বেশি কথা-টথা বলতেন না, খেতেন না, শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকতেন। টের পাওয়া যাচ্ছিল, তাঁর মাথার গোলমালের সিমটম দেখা দিয়েছে। মাকে আগলে রাখার জন্যে সারাদিন বাড়িতে থাকতে হত সঞ্জয়কে। কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার।

এদিকে প্রথম-প্রথম চেনাজানা লোকেরা, বাবার কলিগরা তাদের খোঁজ-খবর নিতে আসত। তারপর একদিন তাদের যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেটাই স্বাভাবিক। সবারই চাকরি-বাকরি আছে, ঘর-সংসার আছে, দায়-দায়িত্ব আছে। ইমোশানের আয়ু আর কতক্ষণ!

সবাই যাতায়াত বন্ধ করলেও রাজীব কিন্তু রোজই আসত। কলেজের সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিনের অনেকখানি সময় তাদের কাছেই কাটিয়ে যেত। রাজীবের মাও প্রায়ই আসতেন। মায়ের দুটো হাত ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকতেন; জোরজার করে খাওয়াতেন। বাবার রক্তের দাগ কার হাতে লেগে আছে সেটা ওঁরা খুব ভালো করেই জানতেন। সেজন্য কষ্ট আর যন্ত্রণার শেষ ছিল না ওঁদের।

এভাবে মাস দেড়-দুই চলার পর হঠাৎ একদিন মা বলেছিলেন, 'আমার এখানে একদম ভালো লাগছে না সঞ্জু। চল, কোথাও চলে যাই।'

সঞ্জয়ের কাছেও এলাহাবাদ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাজার আট দশেক টাকা ছিল আর ব্যাংকে ছিল হাজার চারেক। এই বারো হাজার টাকা তুলে বাড়িওলাকে বছর খানেকের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে মাকে সঙ্গে করে একদিন বেরিয়ে পড়েছিল সঞ্জয়।

ওদের যাবার কথা শুনেই রাজীবের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'আমাদের ওপর রাগ করেই তোরা চলে যাচ্ছিস। আর বোধহয় ফিরবি না!'

সঞ্জয় বলেছিল, 'ফিরব না কেন, নিশ্চয়ই ফিরব।'

যাবার দিন এলাহাবাদ স্টেশনে ওদের তুলে দিতে এসে কেঁদে ফেলেছিল রাজীব, 'ভেবেছিলাম হোল লাইফ তুই আর আমি একসঙ্গে থাকব। আর বোধহয় তোর সঙ্গে দেখা হবে না।'

সঞ্জয়ের গলার ভেতরটা ক্রমাগত ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। ঢোক গিলতে আর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু তার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

তারপর তিনটে-চারটে বছর ইন্ডিয়ার নানা জায়গায় অসুস্থ মাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সঞ্জয়। কখনও সমুদ্রের ধারে, কখনও পাহাড়ে, কখনও বা অন্য কোনও নির্জন জায়গায়। কোথাও গিয়ে দশ পনেরো দিন কাটতে-না-কাটতেই মা বলতেন, 'এখানে ভালো লাগছে না। অন্য কোথাও নিয়ে

চল।' অগত্যা বাক্স-বিছানা গুছিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তে হত। কিন্তু এত গোরাঘুরিতেও মায়ের কোনও রকম ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে যাচ্ছিল। তার চাইতেও যেটা মারাত্মক, মাথার গোলমালটা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার ওপর খাওয়া-দাওয়া তো প্রায়ই বন্ধই করে দিয়েছিলেন।

এসবের নিট ফল যা দাঁড়ায় একদিন তা-ই হয়েছিল। কোচিনের কাছে একটা জায়গায় তখন তারা রয়েছে। মা সেখানেই মারা গেলেন। ওখানকার এক ক্যাথলিক চার্চে গিয়ে পাদরিদের ধরে তাঁর শেষ কাজ করেছিল সঞ্জয়।

বাবা আগেই গেছেন। অসুস্থ হোক, রুগ্‌ণ হোক, মাথার গোলমাল থাক, তবু তো মা। সেই মা চলে যাবার পর একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সঞ্জয়। যে-পাদরিরা তার মায়ের শেষ কাজ করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাই তাকে সঙ্গে করে নিজেদের চার্চে নিয়ে গেছেন। সেখানে দু-চার দিন থাকার পর এলাহাবাদের কথা মনে পড়েছিল সঞ্জয়ের। সে ঠিক করে ফেলেছিল আপাতত ওখানেই ফিরে যাবে। হাতের টাকা সবই প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। ফিরে গিয়ে তার প্রথম কাজ হবে চাকরি খোঁজা। যে-কোনও ধরনের একটা কাজ তার চাই-ই চাই।

এলাহাবাদে এসে সঞ্জয় ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। যে-বাড়িতে তারা ভাড়ায় থাকত সেখানে অন্য ভাড়াটে এসে গেছে। বিমূঢ়ের মতো সে বাড়ির মালিকের কাছে ছুটে গিয়েছিল। দু-মাইল দূরে এলাহাবাদের অন্য এক মহল্লায় থাকত সে। মালিক বলেছিল, যে এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে সঞ্জয়রা চলে গিয়েছিল সেই বছরটা তো বটেই, তারপর আরও ছ'মাস অপেক্ষা করেছে সে, কিন্তু সঞ্জয়ের দিক থেকে কোনও রকম খবর-টবর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়িটা অন্য লোককে ভাড়া দিয়েছে। তবে সঞ্জয়দের জিনিসপত্র কিছুই নষ্ট হয়নি বা খোয়া যায়নি। সব বার করে এনে নিজের এই বাড়িতে রেখেছে। যখন ইচ্ছা সঞ্জয় নিয়ে যেতে পারে।

বাড়িওলা খানতিনেক চিঠিও দিয়েছিল। সঞ্জয়রা যখন বাইরে বাইরে ঘুরছে সেইসময় কলকাতা থেকে তার সেই অচেনা দূরসম্পর্কের পিসি ওগুলো লিখেছিলেন। কীভাবে যেন বাবার খুনের খবরটা তিনি পেয়ে গেছেন। খুবই আন্তরিক চিঠি। মাকে নিয়ে কলকাতায় কিছুদিন থেকে আসতে লিখেছেন পিসি।

বাড়িওলা লোকটা ভালোই। সঞ্জয়ের বাবাকে সে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করত। কী অবস্থায় বাড়িটা অন্যকে ভাড়া দিতে হয়েছে সব জানিয়ে এবার সঞ্জয় আর তার মা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিল সে এবং মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'তোমার জন্যে বড় কষ্ট হয় সঞ্জু, কিন্তু কী করবে বলো। ভাগ্যের ওপর কারও হাত নেই। তোমার বাবা-মা'র মতো মানুষ হয় না। তাঁদের এভাবে মৃত্যু হবে কে ভাবতে পেয়েছিল!' 'একটু থেমে আস্তে-আস্তে আবার শুরু করেছিল, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মনে জোর আন বেটা, ভগবানের অপর ভরসা রাখো। এখন তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। যে ক'দিন ইচ্ছা আমাদের কাছে থাকো।'

সেই মুহূর্তে কোথাও যাবার জায়গা ছিল না সঞ্জয়ের। এলাহাবাদে তাদের কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। কলকাতায় তাই সেই অচেনা না-দেখা পিসির কাছে যাবার কথাও ভাবতে পারছিল না। বাড়িওলার বাড়িতেই তখনকার মতো থেকে গিয়েছিল। যদিও বাড়ির মালিক এবং তার ফ্যামিলির অন্য সকলের আদর-যত্ন এবং সহানুভূতির অভাব ছিল না তবু এভাবে থাকতে সঞ্জয়ের খুবই সংকোচ হচ্ছিল। সে ভেবেছিল, দু-চার দিনের মধ্যে তাদের সব জিনিসপত্র বেচে দিয়ে কোনও একটা মেস-টেসে উঠে যাবে।

এলাহাবাদে এসে প্রথমেই যার কথা মনে হয়েছিল সে রাজীব কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করেনি সঞ্জয়। আসলে ওদের বাড়ি যেতেই ইচ্ছা করেনি। একটা ফোন অবশ্য করতে পারত; তা-ও করেনি। রাজীবের মতো বন্ধু হয় না, তার মায়ের মতো মানুষও পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায় না, তবু ওদের কথা ভাবলেই বাবার ভয়াবহ খুন আর মায়ের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায়। বাবা খুন না হলে

মায়ের এমন মৃত্যু হত না।

সঞ্জয় জানত, খুনের জন্য ওদের কষ্ট আর যন্ত্রণার শেষ ছিল না। ওরা বাবাকে বাঁচাতেই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর রক্ত যার হাতে মাখানো রয়েছে সে তো ওদের সব চাইতে কাছের মানুষ। রাজীবদের বাড়ি গেলেই তো তাকে দেখতে হবে। কিন্তু সেই ঘৃণ্য নোংরা কুৎসিত ঘাতকের মুখ আর দেখতে ইচ্ছা করত না।

বাড়ির মালিকের বাড়িতে কতক্ষণ আর থাকত সঞ্জয়। প্রায় সারাদিনই চাকরির খোঁজে এলাহাবাদের অফিসে-অফিসে আর বাবার পুরোনো কলিগদের বাড়ি ঘুরে বেড়াত। কিন্তু শুধু সিনিয়র কেমব্রিজের সার্টিফিকেটের জোরে চাকরি জোটানো প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছিল। টাকাপয়সা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এরপর কীভাবে সে বেঁচে থাকবে, সেটা ভাবতে তার সাহস হচ্ছিল না।

দিন পনেরো এভাবে কাটতে-না-কাটতেই কীভাবে যেন খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছিল রাজীব। তার সব কথা শুনে দু-হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছে। তারপর বলেছে, 'সেই যে তোরা গেলি, একটা চিঠি পর্যন্ত দিসনি। মা আর আমি ক'টা বছর ধরে রোজ ভাবছি এই বুঝি তোদের চিঠি এল।' একটু থেমে বলেছে, 'চাচিজি মারা গেলেন, অন্তত এই খবরটা তো দিতে পারতিস।'

সঞ্জয় উত্তর দেয়নি।

রাজীব আবার বলেছিল, 'কবে তুই এলাহাবাদে এসেছিস?'

সঞ্জয় বলেছিল, 'দিন পনেরো আগে।'

'আর আজকে আমি জানতে পারলাম। তাও তোদের বাড়িওলার কাছে। এখন কী করবি ভাবছিস?'

'চাকরি-টাকরির চেষ্টা করছি।'

'তা হবে না। তুই আবার কলেজে ভরতি হয়ে যা।'

'আমার আর পড়াশুনো হবে না।'

'কেন হবে না? লেখাপড়াটা এমন একটা ব্যাপার, যখন খুশি সেটা স্টার্ট করা যায়।'

একটু চুপ করে থেকে সঞ্জয় জানিয়েছিল, পড়া চালাবার মতো পয়সা তার নেই; চাকরি না পেলে না খেয়ে থাকতে হবে।'

রাজীব তক্ষুনি আর কিছু বলেনি, পরের দিন তার মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। চাচিজি বলেছিলেন রাজু এবং সঞ্জয় তার কাছে সমান। কোনও ফারাক নেই। তাঁদেরই পাপে সঞ্জয়ের যে ক্ষতি হয়ে গেছে তার ক্ষমাও নেই, পূরণও হয় না। তবু সঞ্জয় যেন চাচিজিকে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়। সঞ্জয়ের লেখাপড়া এবং অন্য সব দায়িত্ব তিনি নিতে চান। রাজীব বি-এ পাস করে ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়ছে আর চাচিজি থাকতে সঞ্জয় লেখাপড়া ছেড়ে নোকরির খোঁজ করে বেড়াবে, তা হয় না।

সঞ্জয় মুখ নীচু করে বলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করুন চাচিজি—'

'কেন আমাকে তুমি তোমার নিজের চাচি বলে ভাবো না?'

'নিশ্চয়ই ভাবি।'

'তা হলে আপত্তি করছ কেন?'

সঞ্জয় সোজাসুজি রাজীবের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার বাবার খুনির টাকায় নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চাই না।'

রাজীব এবং রাজীবের মায়ের মুখ একই সঙ্গে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল যেন। রাজীবের মা বলেছিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ বেটা। কোনও ছেলেরই তা করা উচিত নয়। কিন্তু তোমার লেখাপড়ার জন্যে যে টাকা খরচ হবে তা রাজুর বাবার নয়। আমার বাবা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন।

আমি তার থেকেই তোমাকে দেব।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন, 'আমার বাবা ছিলেন অধ্যাপক। জীবনে কাউকে ঠকাননি, কারও ক্ষতি করেননি, অসৎ পথে পয়সা রোজগার করেননি। সারাজীবন সৎ এই মানুষটির পয়সায় লেখাপড়া শেখার মধ্যে কোনওরকম গ্লানি নেই বেটা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সঞ্জয় কিন্তু তাকে বলতে দেননি রাজীবের মা। পরের দিনই রাজীব তাকে কলেজে ভরতি করে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু এলাহাবাদ ভালো লাগছিল না সঞ্জয়ের। এ-শহরে তার বাবা খুন হয়েছেন এবং হত্যাকারী মাথা উঁচু করে গোটা সোসাইটিকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে-মাড়িয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, এই ভাবনাটা সঞ্জয়কে অসুস্থ করে তুলত। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ত, একটা দামি ইমপোর্টেড গাড়িতে করে হুস করে লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন কপালের দুপাশে রগ দুটো খ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফাতে থাকত। মনে হত মাথার ভেতরকার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে।

বাবার খুন এবং তার হত্যাকারী মাথার ভেতর অবসেশনের মতো যেন আটকে গিয়েছিল। ক্লাস লেকচার তার মাথায় ঢুকত না, টেক্সট বুক খুললে ছাপা অক্ষরগুলো দুর্বোধ্য ঠেকত, রাত্রে ঘুম আসত না, শুধু বাবার ঘাতকের মুখ মনে পড়ত। মনে হত, বাতাসে অক্সিজেন কমে গেছে। এলাহাবাদ তার দমবন্ধ করে দিচ্ছিল।

কলেজে ভরতি হবার পর রাজীব রোজই হোস্টেলে এসে অনেকক্ষণ থেকে যেত। মাঝেমধ্যে এক-আধ দিন খাবার তৈরি করে টিফিন কেরিয়ারে বোঝাই করে তার মাও আসতেন। মাস দুয়েক বাদে একদিন বিকেলে ওঁরা দুজনে একসঙ্গে আসতেই সঞ্জয় বলেছিল, 'চাচিজি, এলাহাবাদে আমার একদম ভালো লাগছে না'

রাজীবের মা জিগ্যেস করেছিলেন, 'কেন বেটা?'

'আমি ভুলতে পারছি না, এই শহরে আমার বাবাকে খুন করা হয়েছিল।'

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন রাজীবের মা। তারপর বলেছিলেন, 'বুঝেছি বেটা, তুমি কোথায় যেতে চাও?'

সঞ্জয় বলেছিল, 'কলকাতায়। আমার এক দূর সম্পর্কের পিসিমা ওখানে থাকেন। ভাবছি তাঁর কাছেই চলে যাব। তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। চলে যেতে লিখেছেন।'

রাজীব বলেছিল, 'বেশ তাই হোক। তবে কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া তোকে চালিয়ে যেতে হবে। মা যা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছে সেটাই চলবে। তোর নামে কলকাতার অ্যাড্রেসে টাকা যাবে।'

রাজীবের মাও তাতে সায় দিয়েছিলেন।

একটু চিন্তা করে সঞ্জয় বলেছিল, 'ঠিক আছে।'

এর দিনকয়েক বাদে কলকাতায় চলে এসেছিল সে। এন্টালিতে পিসির কাছে উঠে এখানকার কলেজে ভরতি হয়েছিল। তারপর বি.এ. পাস করে এম.এ. পড়তে ইউনিভার্সিটিতে এসেছে।

নিজের কথা শেষ করে সঞ্জয় হেসেছে, 'এই হচ্ছে আমার লাইফ।'

শুনতে-শুনতে এই দুঃখী যুবকটির জন্যে সহানুভূতিতে মন ভরে গিয়েছিল অতসীর।

সঞ্জয় এবার বলেছে, 'নিশ্চয়ই তোমার খুব ভালো লাগল না। লাগবার কথাও নয়। অন্যের ওপর ডিপেন্ডেন্ট, প্যারাসাইটের মতো যে বেঁচে আছে, এমন একজনকে আর কার ভালো লাগে।'

অতসী তার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না। আস্তে করে বলেছিল, 'তোমার বন্ধু আর তার মায়ের তুলনা হয় না।'

'হ্যাঁ। ওদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। রাজীবের মতো বন্ধু না থাকলে আমি কবেই শেষ হয়ে যেতাম—'

'তোমার বন্ধু এখন কী করছে?'

'বাবার সঙ্গে সম্পর্ক কাট-অফ করে দিল্লি চলে গেছে। একটা বিরাট মাল্টি-ন্যাশনাল ফার্মে টপ একজিকিউটিভ।'

অতসী অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'ওর বাবা অত বড় বিজনেসম্যান, মাল্টি-মিলিওনেয়ার। সব ছেড়ে চলে গেল।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'ওর বাবা নিজের বিজনেস মানে হোর্ডিং, ট্যাক্স ইভেশান, ব্ল্যাক মার্কেটিং—এমনি নানা ঝামেলায় রাজীবকে ঢোকাতে চেয়েছিল কিন্তু ও খুব আপরাইট ছেলে। তা ছাড়া আমার বাবা খুন হবার পর থেকেই নিজের বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এম.এ. পাস করার পর সব ছেড়েছুড়ে দিল্লি চলে গেল। শুধু দুঃখ হয় চাচিজির জন্যে।'

'কেন?'

'ক্রিমিন্যাল স্বামীকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা করেন, কিন্তু তাকে ছেড়েও যেতে পারেন না। ভদ্রমহিলার লাইফটা নষ্ট হয়ে গেল।'

একটু চুপ। তারপর অতসী গভীর গলায় বলেছিল, 'তোমার বন্ধুর কথা শুনে শ্রদ্ধা হল। তাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।'

অন্যমনস্কর মতো সঞ্জয় বলেছিল, 'শ্রদ্ধা করার মতোই ছেলে রাজীব। তবে ওর ক্যারেক্টারে দুটো উইকনেস রয়েছে—' বলতে-বলতে থমকে গিয়েছিল সে।

সামনের দিকে ঝুঁকে অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'কী উইকনেস?'

বিব্রতভাবে সঞ্জয় বলেছিল, 'না-না, ও কিচ্ছু না। আমি যার কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব তার কোনওরকম খুঁত দেখতে নেই।'

অতসী আরও বার কয়েক জিগ্যেস করেছিল, কিন্তু বন্ধুর দুর্বলতা সম্বন্ধে একটি শব্দও সঞ্জয়ের মুখ থেকে বার করতে পারেনি। অবশ্য বেশি জোরজারও করেনি সে; সেটা অশোভন হত।

সঞ্জয়ের সঙ্গে তার মেশামেশি ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সবারই চোখে পড়ত। কারণ লুকিয়ে-চুরিয়ে অতসী কিছু করত না। এই নিয়ে শ্রাবণী আর মঞ্জুষা তার পেছনে খুব লাগত। এই লাগার পেছনে কোনওরকম নোংরামি ছিল না; ওটা স্রেফ মজা করার জন্যই।

শ্রাবণী মেয়েদের কমন-রুমে এক পাক নেচে নিয়ে একদিন বলেছিল, 'চালিয়ে যা অতসী, চালিয়ে যা। গেট গোয়িং—'

শ্রাবণী বলেছিল, 'তুই ভাই টেরিফিক। আমাদের চাইতে তিন মাস পর ইউনিভার্সিটিতে এসে আমাদের আগেই নাকে হুক আটকে ফেললি। তোদের ক'বছরের প্ল্যান—ওয়ান-ইয়ার, টু-ইয়ার না থ্রি-ইয়ার?'

অতসী হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'তার মানে?'

'ভেরি সিম্পল। এখন থেকে এক বছর, দু-বছর না তিন বছর বাদে আমরা সানাইয়ের বাজনা শুনব।'

'কী ইয়ার্কি হচ্ছে? সঞ্জয় আর আমার মধ্যে ওরকম কোনও রিলেশানই নেই। তোরা যেমন আমার ফ্রেন্ড, সঞ্জয়ও একজ্যাক্টলি তা-ই।'

মঞ্জুষা অতসীর নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে পায়ের আঙুলের ডগায় শরীরের ভার রেখে আরেক পাক নেচে নিয়েছিল। তারপর চোখ কুঁচকে মজাদার একটা ভঙ্গি করে রসালো অশ্লীল আমেরিকান খিস্তি দিয়ে বলেছিল, 'একটা সত্যি কথা বলবি?'

মঞ্জুষার মুখে কিছু আটকাত না। মেয়েদের সঙ্গে তো বটেই, ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গেও সেক্স-টেক্স নিয়ে ফ্রিলি গল্প করতে পারত। ভেতরে-ভেতরে নার্ভাস হয়ে গেলেও বাইরে সেটা বুঝতে দেয়নি অতসী। সেটা টের পেলে আর দেখতে হবে না; মঞ্জুষা একেবারে ফিনিশ করে দেবে। অতসী

বলেছিল, 'নিশ্চয় বলব। আমার কাছে কোনও হাইড অ্যান্ড সিক গেম নেই। আই ডিসলাইক ইট।'

'সিওর?'

'সিওর—আই স্যোইয়ার।'

এবার মঞ্জুষা এক কাণ্ডই করেছিল। মুখটা কানের কাছে এনে গলার স্বর ঝপ করে নামিয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'ফিজিক্যালি তোরা কতটা প্রসিড করলি!'

অতসীর মতো স্মার্ট মেয়েরও কানের ডগা ঝাঁঝাঁ করে উঠেছিল আর মুখ টকটকে লাল। সে বলেছিল, 'কী আজেবাজে বকছিস!'

'আজেবাজে!' গলার স্বর আরও নামিয়ে দিয়েছিল মঞ্জুষা, 'বডি বাদ দিয়ে তা হলে প্রেম চালাচ্ছ?—প্লেটোনিক। দেখিস বাবা, বোকাদের মতো শেষে ডুবিস না। প্রোটেকশান নেবার অনেক রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। নিশ্চয়ই সেগুলো তুই জানিস।'

হাত তুলে অতসী বলেছিল, 'মারব এক থাপ্পড়।'

সঞ্জয়ের ব্যাপার নিয়ে তাদের বাড়িতেও কম মজা হয়নি। বাড়ির আবহাওয়া ছিল খুবই খোলামেলা। বাবা, মা, দাদারা, বউদিরা, দিদি, জামাইবাবু এবং অতসী—একজনের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। যে-কোনও কারণেই তা শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত না।

অতসীদের বাড়িতে একটা নিয়ম চালু ছিল। দিনের বেলা অতসী ইউনিভার্সিটিতে যেত কোনওদিন বারোটায়, কোনওদিন দশটায়। ছোড়দারও বেরুবার কোনও ফিক্সড্ সময় ছিল না। মারও সংসারের সব দিক ম্যানেজ করে পুজো সারতে-সারতে দেড়টা দুটো বেজে যেত। বাবা অবশ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়তে যেতেন রোজ একই সময়ে—ঠিক একটায়। কাজেই দুপুরের খাওয়াটা যে যার সুবিধামতো খেত কিন্তু রাত্তিরে সবার একসঙ্গে বসে খাওয়া চাই। খাওয়াটা চলত খাঁটি রাশিয়ার ধাঁচে, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে। সেই সঙ্গে প্রচুর গল্পটল্প। রোজেই কোনও-না-কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে খানিকক্ষণ হইচই আর হাসাহাসি চলত। সে-সবের আসল উদ্দেশ্য হল বিশুদ্ধ খানিকটা আনন্দলাভ। উইট, ফান আর মজার-মজার কথায় খাবার টেবল সরগরম হয়ে উঠত।

অতসী যখন এম-এ পড়ছে তখন বড়দা আর বড় বউদি রোমে। ফরেন সার্ভিসে ঢোকার পর থেকে বড়দাকে এবং সেই সঙ্গে বড় বউদিকে কলকাতায় ক্বচিৎ কখনও পাওয়া যেত। তবে ছোড়দা ছোড়দি বাবা মা আর অতসী ছিলই। দিদির বিয়ে হয়ে গেলেও তখনও ওরা আমেরিকায় যায়নি, এখানেই হাসপাতালে অ্যাটাচ্ড ছিল। দিদির শ্বশুরবাড়ি তাদের বাড়ির খুব কাছেই, বলতে গেলে এক পাড়াতেই। সারাদিন হাসপাতালে ডিউটি দেবার পর প্রায় রোজই সন্ধের পর দিদি-জামাইবাবু তাদের বাড়ি আসত। রাত্তিরে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরত।

খেতে বসে একেক দিন একেক জনকে ধরা হত। কোনও দিন বাবাকে, কোনওদিন মাকে, কোনও দিন বা দাদা, দিদি জামাইবাবুকে। তাদের চলাফেরা; গলার স্বর মুদ্রাদোষ দুর্বলতা ক্যারিকেচার করে অন্যেরা দেখাত। খাবারদাবার বা অন্য কিছু সম্পর্কে দুর্বলতা থাকলে তাই নিয়ে লাগত। এসব ছিল খুবই নির্দোষ আক্রমণ। যে আক্রান্ত হত সে মনে কিছু করত না, এবং প্রচুর হেসে-হেসে এনজয় করত আর বলত, 'ঠিক আছে। অ্যাট মাই কস্ট হেসে নাও। কিন্তু মনে রেখো এক মাঘে শীত যায় না। তোমাদেরও টার্ন আসবে।'

অতসী সঞ্জয় সম্পর্কে রোজই বাড়িতে এসে কিছু না কিছু বলত। সঞ্জয় কত দুঃখী, সঞ্জয় কত ভালো, কত হৃদয়বান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে আছে একদিন খাবার টেবিলে বসে বাবা জিগ্যেস করেছিলেন, 'আজ তোমাদের টপিক কী?'

বাবা আর ছোড়দা লম্বা টেবিলের দু-ধারে মুখোমুখি বসত। অন্যরা বসত মাঝখানে। ছোড়দা বলেছিল, 'সোনা।'

অতসীর ডাকনাম সোনা। সে চমকে উঠেছিল।

বাবা হাসিমুখে বলেছিলেন, 'গুড। তোমরা যে যার বন্দুকে বুলেট পুরে নাও।' অতসীর দিকে ফিরে বলেছিলেন 'সোনা, গেট রেডি ফর দ্য অ্যাটাক।'

অতসী হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'আমি কেন, আমি কী করেছি?'

ছোড়দা ছিল দারুণ ফাজিল। বলেছিল, 'আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে যা। কী করেছিস বুঝতে পারবি।' বলে সেই প্রথম দিন থেকে কীভাবে সঞ্জয়ের কথা বলেছে সব নকল করে দেখিয়েছিল।

ছোড়দা দুর্দান্ত ক্যারিকেচার করতে পারত। বাবা-মা থেকে দিদি-জামাইবাবু পর্যন্ত, হেসে-হেসে সবার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল যেন।

জামাইবাবু বলেছিল, 'সোনার কেসটা দেখছি খুবই ক্রিটিক্যাল।'

ছোট বউদি জামাইবাবুর সব কথায় 'ডিটো' দিয়ে যেত। সে বলেছিল, 'এগ্‌জ্যাক্টলি। ছ'মাস ধরে দেখছি, সঞ্জয় ছাড়া তার মুখে আর কোনও নাম নেই।'

দিদি খুব সাদাসিধে ভালোমানুষ টাইপের মেয়ে। সে বলেছিল, 'হ্যাঁ রে সোনা, তুই কি কিছু ঘটিয়ে ফেলেছিস নাকি, অ্যাঁ?'

বাবা টেবিলে ওধার থেকে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ছোড়দা তাঁকে থামিয়ে দিয়েছে, 'সোনার এই কেসটা তোমার পক্ষে কিন্তু খুবই ডেলিকেট। আফটার অল তুমি বাবা তো। জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্যে বসে-বসে তুমি সব ওয়াচ করে যাও।' বলে দিদির দিকে ফিরে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই ঘটিয়েছে।'

মা ওধার থেকে উদ্বিগ্ন মুখে জিগ্যেস করেছিল, 'হ্যাঁ রে সোনা, ছেলেটা আমাদের জাতের তো? দেখিস বাপু, অন্য জাতটাত ধরে আনিস না।'

অতসী চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'তোমরা সবাই মিলে আমার মাথাটা খারাপ না করে কি ছাড়বে না? সঞ্জয় আমার বন্ধু। চমৎকার ছেলে। বন্ধুত্ব ছাড়া তার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।'

ব্যাপারটা বিশুদ্ধ 'ফান' থেকে অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে বাবা বলেছিলেন, 'যদিও জাজমেন্ট সিটে বসিয়ে আমার মুখ আটকে দেওয়া হয়েছে, তবু একটা কথা আমাকে বলতে দিতে হবে।'

ছোড়দা বলেছিল, 'ঠিক আছে, বলো। তবে কারও দিকে পারশিয়ালিটি করবে না।'

'একেবারেই না।' বাবা বলেছিলেন, 'সোনার ফ্রেন্ড সঞ্জয়কে একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে বল। তার সঙ্গে কথাটথা বলে বুঝতে চেষ্টা করো হাউ ফার দে হ্যাভ প্রসিডেড। তার আগে সোনাকে বিলো দ্য বেল্ট হিট করা ঠিক হবে না।' অতসীর দিকে ফিরে জিগ্যেস করেছিলেন, 'সোনা, তোর আপত্তি নেই?'

অতসী গলায় জোর দিয়ে বলেছিল, 'নট অ্যাট অল। সঞ্জয়কে কবে আসতে বলব?'

একটু ভেবে বাবা বলেছিলেন, 'আসছে রবিবার দুপুরে।'

অতসী বলেছিল, 'আমিও তাই চাই। রবিবার সঞ্জয়কে নিয়ে আসছি। ছোড়দা, জামাইবাবু, ছোট বউদি যে-জন্যে আমার পেছনে লেগেছে তা যদি প্রুভ করতে না পারে খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

ছোড়দা মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলেছিল, 'প্রুভ করতে না পারলে তোকে এক মাস রোজ চাইনিজ খাওয়াব, আর পাঁচটা শাড়ি কিনে দেব।'

ছোট বউদি বলেছিল, 'আমি দশটা সিনেমা দেখাব।'

জামাইবাবু বলেছিল, 'আর আমি ভালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে ফার্স্ট ক্লাস একটা সার্টিফিকেট দেব। তাতে লেখা থাকবে ঃ আমার শ্যালিকা শ্রীমতী অতসী প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি জাগতিক সর্বপ্রকার তুচ্ছ আসক্তির উর্ধ্বে এক ব্রহ্মচারিণী।'

ছোড়দা বলেছিল, 'আর যদি আমরা যা বলছি, তা প্রুভড হয়ে যায়?'

বাবা জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্য থেকে বলে উঠেছিলেন, 'তাহলে তোরা তোদের

সানাইওলা, প্যান্ডেলওলা, পুরুত, ক্যাটারার—এসব লোকের কাছে দৌড়ুতে হবে।'

সবাই হইহই করে হেসে উঠেছিল। আর অতসী বলে উঠেছিল, 'ভালো হবে না বলছি বাবা। দেখছ মা—'

মা ঠোঁট টিপে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, 'তুমি বাপু জাজমেন্ট সিটের মান রাখলে না। পারশিয়ালিটি করে ওদের দিকে যাচ্ছ।'

বাবা বলেছিলেন, 'জাজমেন্ট সিটে বসেছি বলে কি একটু-আধটু মজাও করতে পারব না? তা হলে বাপু তুমিই কাল থেকে এই সিটে বসে চিফ জাস্টিসের মতো মুখ গম্ভীর করে থেকো। দিস ইজ ফান—পিওর ফান।'

পরের দিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে অতসী সঞ্জয়কে বলেছিল, 'নেক্সট সানডে দুপুরে তুমি আমাদের বাড়ি খাবে। সেদিন অন্য কোনওরকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেখো না।'

একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়—'হঠাৎ নেমন্তন্ন?'

প্রথমে বাবার কথা জানায়নি অতসী। শুধু বলেছিল, 'এমনি ইচ্ছে হল।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'তোমাদের বাড়ি যেতে বলছ? আমার পক্ষে খুবই আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'এই নিয়ে হয়তো তোমাদের ফ্যামিলিতে একটা কমপ্লিকেশন হবে।'

'আরে বাবা, আমি পার্সোনালি তোমাকে যেতে বলছি না। আমার বাবা এবং হোল ফ্যামিলি তোমাকে ইনভাইট করেছে।'

'তাঁরা তো আমাকে চেনেন না, কখনও দ্যাখেনওনি।'

'না দেখুন, আমার কাছে শুনেছেন তো।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'রবিবারটা আমার নানারকম কাজ থাকে।'

'তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না। রবিবার যাওয়া চাই। ন'টার ভেতর আমাদের বাড়ি পৌঁছে যেও।' বলে বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিল অতসী।

পরের রবিবার নটায় আসেনি সঞ্জয়। সে যখন এল এগারোটা বেজে গেছে। তার সঙ্গে আলাপটালাপ করে বাবা-মা, দাদা-দিদি, বউদি এবং জামাইবাবু, সবাই খুব খুশি। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন সঞ্জয় এবং অতসীর মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু নেই।

সরল, হৃদয়বান এই যুবকটি সবাইকে শুধু মুগ্ধই করেনি, তার জন্য বাবা-মা, দাদা-বউদিরা গভীর সহানুভূতিও বোধ করেছিল। এর কারণ তার দুঃখের জীবন। সঞ্জয়ের মা-বাবার মৃত্যুর কথা আগেই বাড়ির লোকেদের অল্পস্বল্প জানিয়েছিল অতসী। সেদিন আবার সেই প্রসঙ্গটা উঠেছিল। সঞ্জয়ের মুখ থেকে ডিটেলে শুনতে-শুনতে সবার বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে গিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, 'অতসী আমাদের বলেছে। তবে এতটা সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝতে পারিনি। উই ফিল ফর ইউ মাই বয়।'

সঞ্জয় উত্তর দেয়নি।

বাবা আবার বলেছিলেন, 'তোমার সেই বন্ধু আর তার মায়ের জন্যে খুব শ্রদ্ধা হচ্ছে। ওঁরা যদি কখনও কলকাতায় আসেন আমাদের এখানে নিয়ে এসো। পৃথিবীতে হৃদয়বান মানুষের সংখ্যা তো কমে যাচ্ছে। যা দু-চারজন আছে, তাদের দেখলেও মন ভালো হয়।'

অন্যমনস্কর মতো সঞ্জয় বলেছিল, 'ওঁরা এলে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।'

বিকেলের দিকে সঞ্জয় যখন চলে যাবে সেই সময় অতসী দুম করে সঞ্জয়কে বলেছিল, 'আচ্ছা

বলো তো, আজ তুমি কী জন্যে আমাদের বাড়ি এসেছিলে?'

সঞ্জয় অবাক হয়ে বলেছে, 'কেন, নেমন্তন্ন খেতে।'

'উঁহু, ওটা একটা ক্যামোফ্লেজ। আসলে তুমি এসেছিলে পরীক্ষা দিতে।' দাদা-বউদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে-দেখাতে অতসী বলেছিল, 'এই যে এদের দেখছ, ওরা একেক জন দুর্ধর্ষ একজামিনার। তোমার জন্যে একজামিনেশন বোর্ড সাজিয়ে ক'দিন ধরে বসে আছে।'

বিমূঢ়ের মতো সঞ্জয় বলেছিল, 'একজামিনেশন বোর্ড মানে?'

'ওঁদের ধারণা তোমার আর আমার মধ্যে শুধু বন্ধুত্বই নেই। আরও গভীর কিছু আছে।'

সবাইকে দ্রুত একবার দেখে নিয়ে হেসে ফেলেছিল সঞ্জয়। মজার গলায় বলেছিল, 'পরীক্ষায় পাস মার্কস পেয়েছি?'

ছোড়দা বলেছিল, 'ফুল মার্কস পেয়েছ।'

'তা হলে আজ যাওয়া যাক।'

বাবা বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগল। যখন ইচ্ছা আমাদের এখানে চলে আসবে। আর ছুটির দিনে সকাল সাতটার ভেতর তোমাকে আমাদের বাড়ি দেখতে চাই।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'ছুটির দিনে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কিছু কাজকর্ম থাকে। অতসী বার বার বলেছিল, তাই আজ এসেছি।'

'কী কাজ?'

'বলবার মতো কিছু নয়।'

'অসুবিধা থাকলে অন্য দিন এসো।'

'আচ্ছা।'

কিছু পরে সঞ্জয়কে বাসে তুলে দেবার জন্য তার সঙ্গে বড় রাস্তায় এসেছিল অতসী।

সঞ্জয় বলেছিল, 'তোমাদের ফ্যামিলিটা একসেলেন্ট। খুব ভালো লাগল।'

অতসী বলেছিল, 'তুমি তো আসতে চাইছিলে না।'

'না এলে ঠকতাম।'

এর পর মাঝে-মাঝে চলে আসত সঞ্জয়। কোনও-কোনও দিন ইউনিভার্সিটি থেকে অতসী তাকে সোজা ধরে নিয়ে আসত। বাড়ির সবাই তাকে দারুণ পছন্দ করত। দিনকয়েক না এলে বাবা তাড়া দিতেন, 'কী হল রে, সঞ্জয় তো আসছে না।'

মানে, সিক্সথ ইয়ারে ওঠার পর অনেক দিন, প্রায় দু-সপ্তাহ একটানা তাদের বাড়ি আসেনি সঞ্জয়। ইউনিভার্সিটিতেও তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

বাবা-মা, দাদা-দিদিরা বলেছিল, 'কী হল বল তো ছেলেটার? কত দিন আসছে না! তুই ওদের বাড়ির ঠিকানা জানিস?'

এন্টালিতে পিসির কাছে থাকত সঞ্জয়। ওখানকার ঠিকানাটা একদিন কথায়-কথায় বলেছিল সে। বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল অতসী, তবে রাস্তার নাম মনে ছিল। সে বলেছে, 'চেষ্টা করলে খুঁজে বার করতে পারব।'

বাবা বলেছিলেন, 'একবার গিয়ে দ্যাখ না। ছেলেটার অসুখ-বিসুখ করল কি না কে জানে।'

সেদিন আর ইউনিভার্সিটিতে যায়নি অতসী। এন্টালিতে গিয়ে খুব বেশি খোঁজাখুজি করতে হয়নি। সঞ্জয় ওই লোকালিটির খুবই পপুলার ছেলে। দু-একজনকে জিগ্যেস করতেই একটা পুরোনো একতলা বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল।

কড়া নাড়তেই পঞ্চান্ন ছাপান্ন বছরের একজন মহিলা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়ন, কোঁচকানো এক ঢাল চুল, ছোট্ট কপাল, পাতলা ঠোঁট, নাকটা এমন কিছু ধারালো

নয়, তবু সব মিলিয়ে তার মধ্যে কোথায় যেন অলৌকিকের ছোঁয়া আছে। মহিলার সমস্ত আকর্ষণ তাঁর চোখে। এমন মায়াবী, স্নেহপ্রবণ চোখ ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়। পরনে সাদা ধবধবে ব্লাউজ আর সাদা থান। দু-হাতে দু-গাছি করে সোনার চুড়ি। গলায় লম্বা চেন হার, ঠিক বুকের কাছে ক্রসের আকারে লকেট ঝুলছিল। দেখেই বোঝা যায় খুব নিষ্ঠাবতী ক্রিশ্চান।

ভারি কোমল গলায় মহিলা জিগ্যেস করেছিলেন, 'কাকে চাই মা?'

সঞ্জয় আগেই জানিয়েছিল তার পিসিমা বিধবা। একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস। একটিমাত্র মেয়ে তাঁর। অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাই মাদ্রাজে থাকে। দেখামাত্রই অতসী বুঝতে পেরেছিল, ইনিই সঞ্জয়ের পিসিমা। বলেছিল, 'সঞ্জয় আমার সঙ্গে পড়ে। অনেক দিন ক্লাসে যাচ্ছে না। তাই—'।

কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে পিসিমা বলেছেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অতসী?'

অতসী অবাক। বলেছিল, 'আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

'সঞ্জুর কাছে দিনরাত একটি মেয়ের নামই তো শুনি। সে ছাড়া আর কে আসতে পারে বলো? ভেতরে এসো।'

'আপনি নিশ্চয়ই পিসিমা?'

'তুমিও তা হলে আমাকে চিনতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। একই সোর্স থেকে।'

পিসিমা হেসেছিলেন।

ওদের বাড়িটা ছোট। সব মিলিয়ে খান চারেক ঘর। পিসিমা যে ঘরটায় অতসীকে নিয়ে বসিয়েছিলেন সেখানে এক দেওয়ালে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো যিশুখ্রিস্টের বিরাট ছবির তলায় ধূপ জ্বলছিল। আরেক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ এবং রামকৃষ্ণদেবের ছবিতেও ফুলের মালা।

অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'সঞ্জয় কোথায়? বাড়ি নেই?'

পিসিমা বলেছিলেন, 'কাছেই আছে। এখনই চলে আসবে। তুমি একটু বোসো; আমি চা করে আনি।'

'চা লাগবে না পিসিমা—'

'তাই কখনও হয়! প্রথম দিন এলে—'

শুধু চা-ই না, সঙ্গে একগাদা মিষ্টি আর কেক-টেক নিয়ে একটু পর পিসিমা এ-ঘরে এসেছিলেন এবং কোনও রকম আপত্তি না শুনে পাশে বসে নানা ধরনের গল্প করতে-করতে অতসীকে সবগুলো খাবার খাইয়েছিলেন।

ঘণ্টা দুয়েক পরও যখন সঞ্জয় ফিরল না তখন অতসী বলেছিল, 'কই এখনও তো সঞ্জয় এল না!'

'ওর কথা আর বোলো না। সঞ্জুটা ওর বাবার স্বভাব পুরোটা পেয়েছে। রোজ এই কান্ড করছে। খাওয়া নেই দাওয়া নেই, দিনরাত বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরছে।'

অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'বস্তিতে কী করে সঞ্জয়?'

পিসিমা যা জানিয়েছিলেন তা এই রকম। এন্টালির চারপাশে গরিব ক্রিশ্চান আর মুসলমাদের অনেকগুলো বস্তি-টস্তি রয়েছে। ডাচ আর ফ্রেঞ্চ এভাঙ্গেলিস্টরা ওখানে নানারকম সোশাল সার্ভিস দিয়ে থাকে। ওরা স্কুল বসিয়েছে, হেলথ-সেন্টার খুলেছে, বাচ্চাদের নিয়মিত দুধ আর পাঁউরুটি দেয়, ইত্যাদি-ইত্যাদি। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে এভাঙ্গেলিস্টদের কাজ বেড়ে যায়। ওদের সঙ্গে কীভাবে যেন জুটে গেছে সঞ্জয়। পারলে সারাদিনই বস্তিতে কাটিয়ে দিত সে। কিছুদিন ধরে পানীয় জলের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল বস্তিগুলোতে। কর্পোরেশনে ছোটাছুটি করে লোকাল কাউন্সিলার আর মেয়রকে ধরে ডিপ টিউবওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করেছে সঞ্জয়। ওটা যতক্ষণ না বসানো যাচ্ছে ততক্ষণ

সে ইউনিভার্সিটিতে যাবে না।

কেন যে সঞ্জয় ছুটির দিনে তাদের বাড়ি যেতে চায় না, এবার বুঝতে পেরেছিল অতসী। এই আশ্চর্য ধরনের ছেলেটা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধায় তার মন ভরে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ বাদে পিসির কাছ থেকে রাস্তা জেনে নিয়ে কাছাকাছি একটা বস্তিতে চলে এসেছিল অতসী। ওখানে সত্যি সত্যিই একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কাজ চলছিল। বস্তির গাদা-গাদা কাচ্চাবাচ্চা বুড়ো-বুড়ি এবং নানা বয়সের প্রচুর লোক এখানে ভিড় করে ছিল। তাদের ভেতর সঞ্জয়কে দেখা গিয়েছিল। তার চুল উশকোখুশকো। না কামানো গালে খাপচা-খাপচা দাড়ি, পরনের ট্রাউজার্স আর শার্টটা ময়লা।

সঞ্জয়ও তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেছিল। রীতিমতো অবাকই হয়েছে সে। বলেছিল, 'তুমি।'

অতসী, বলেছিল, হ্যাঁ। একজন গ্রেট হিউম্যানিটারিয়ানকে দেখতে এলাম।'

সঞ্জয় লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'ধুস, কী যা তা বলছ!' একটু থেমে জিগ্যেস করেছে, 'এখানে আমি আছি, তোমাকে কে খবর দিল?'

'কে দিতে পারে?'

'একটু ভেবে সঞ্জয় বলেছে, 'বুঝেছি, আমাদের বাড়ি হয়ে এসেছ। পিসিমা বলে দিয়েছে।'

অতসী বলেছিল, 'হুঁ। তুমি আমাকে কোনওদিন তোমাদের বাড়ি আসতে বলো নি। তবু চলে এলাম।'

বিব্রতভাবে সঞ্জয় বলেছে, 'মাঝে মধ্যে ভেবেছি তোমাকে আসতে বলব। কিন্তু বলাটা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। যাক গে, হঠাৎ এলে; কিছু দরকার আছে?'

'দারুণ কিছু একটা না। অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাচ্ছ না, ইউনিভার্সিটি থেকেও ডুব দিয়েছ। বাবা তোমার খোঁজ নিতে বলেছিলেন। তাই চলে এলাম।' বলে একটু চুপ করে থেকে সঞ্জয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়েছে। তারপর আবার শুরু করেছে, 'এসেছিলাম বলে একজন গ্রেট সোশাল ওয়ার্কারকে দেখতে পেলাম। তুমিও যে এভাবে পুওর পিপলদের মধ্যে সার্ভিস দাও, কই আগে তো বলোনি।'

'দূর, এ আবার বলবার কী আছে! স্রেফ খানিকটা সময় কাটানো। তারপর তোমাদের বাড়ির সবাই কেমন আছেন?'

'ফাইন। বাবা তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'এখন কয়েক দিন যেতে পারব না; মেসোমশাইকে বলো নেক্সট উইক থেকে ইউনিভার্সিটিতে যাব; তখন তোমাদের বাড়ি গিয়ে সবার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব।'

সেই যে অতসী সঞ্জয়দের বাড়ি এসেছিল, তারপর থেকে প্রায়ই আসতে লাগল। সে এলে সঞ্জয়ের পিসিমা খুব খুশি হতেন। এদিকে সঞ্জয়ও তাদের বাড়ি আগের মতোই যেত। অতসী দু-একবার পিসিমাকেও ধরে নিয়ে গেছে।

দেখতে-দেখতে সেবারের বড়দিন এসে গেল। পিসিমা দিন সাতেক আগেই অতসীকে এক্সমাসের নেমন্তন্ন করেছিলেন। ঠিক হয়েছিল সকালে গিয়ে সারাদিন সঞ্জয়দের বাড়ি থাকবে অতসী। একেবারে রাতের খাওয়া সেরে আসবে। কিন্তু পঁচিশে ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন কী কারণে যেন সারাদিন বাড়িতে আটক থাকতে হয়েছিল। খুব সম্ভব দিল্লি-টিল্লি থেকে ছোড়দার শ্বশুরবাড়ির দিকের কারা যেন এসেছিল। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন ফেলে হুট করে বেরুনো যায় না। যাই হোক সারাদিন পর সঞ্জয়দের বাড়ি অতসী যখন গিয়েছিল তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

বড়দিন বলে বাড়িটা আলো এবং ফুলটুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। চারিদিক ভারি স্নিগ্ধ আর পবিত্র মনে হচ্ছিল।

পিসিমা অতসীকে দেখামাত্র তার হাত ধরে সেই ঘরটায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে যিশুখ্রিস্টের বিরাট ছবিটা টাঙানো রয়েছে। যেতে-যেতে বলেছিলেন, 'কী রে মেয়ে, সেই সকাল থেকে তোর জন্যে বসে আছি তা মেয়ের আসার নামই নেই। আমার এত খারাপ লাগছিল যে কী বলব! আরেকটু দেখে সঞ্জুকে তোদের বাড়ি পাঠাতাম।' নিয়মিত যাতায়াতের ফলে শেষের দিকে অতসীকে 'তুই' করেই বলতেন পিসিমা।

কেন আগে আসতে পারেনি, অতসী জানিয়েছিল।

পিসিমার সঙ্গে ঘরের ভেতর আসতেই অতসী দেখতে পেয়েছিল সঞ্জয় এবং তার সমবয়সী আরেকটি অচেনা যুবক দুটো সোফায় বসে আছে। খুব সম্ভব যুবকটি সঞ্জয়ের কোনও আত্মীয় বা নিমন্ত্রিত কেউ হবে।

তখন সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়সের মধ্যেই অনেক ঝকঝকে স্মার্ট ছেলে দেখেছে অতসী কিন্তু ওই যুবকটির মতো সুপুরুষ আগে কখনও তার চোখে পড়েনি।

গায়ের রং পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো, টান টান মসৃণ ত্বক। পুরো ছ'ফুটের কাছাকাছি হাইট, পিওর গ্রিকদের মতো চেহারা। নাকটা সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুক, বিস্তৃত কপাল, কাঁধ পর্যন্ত চুল। তার মজবুত ঘাড়, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাত। ঘাড়ের মাংসল ফ্রেম, হাত-পায়ের মোটা হাড় বুঝিয়ে দেয় সে শুধু সুপুরুষই নয়, প্রবল শক্তিমানও।

সঞ্জয় তাকে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'আরে বোসো বোসো। আমরা তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

দেরি করে আসায় কৈফিয়ৎ হিসাবে পিসিমাকে যা বলেছিল, সঞ্জয়কেও তাই বলেছে অতসী।

সঞ্জয় বলেছিল, 'সকালের দিকে এলে তোমার খুব ভালো লাগত। পিসিমার জানাশোনা এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। একসেলেন্ট গলা। ঘণ্টা খানেক ধরে অনেকগুলো ভক্তিমূলক গান শোনালেন।'

অতসী বলেছিল, 'খুব মিস করলাম।' সে কথা বলছিল ঠিকই কিন্তু তার চোখ নিজের অজান্তে ঘুরে-ঘুরে সেই যুবকটির দিকে চলে যাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে দু-একবার চোখাচোখিও হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অতসী।

সঞ্জয় অতসী আর পিসিমা, তিনজনে কথা বলছিলেন। সেই যুবকটি চুপচাপ বসে ছিল। হঠাৎ একসময় ওদের কথার মধ্যে সে বলে উঠেছিল, 'দিস ইজ ব্যাড সঞ্জু—'

সবাই হকচকিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। সঞ্জয় জিগ্যেস করেছে, 'কী হল রে?'

আঙুল দিয়ে অতসীকে দেখাতে-দেখাতে যুবকটি বলেছিল, 'আমি মুখে তালা দিয়ে বসে আছি। ইনি এলেন, আমার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দেওয়া তোর উচিত।'

সঞ্জয় ব্যস্তভাবে বলেছিল, 'আই অ্যাম সরি। এ হল অতসী, ইউনিভার্সিটিতে আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড।' যুবকটিকে দেখিয়ে অতসীকে বলেছিল, 'আর এ আমার ছেলেবেলার বন্ধু রাজু, মানে রাজীব। এর কথা আগেই তোমাকে বলেছি।'

এই তা হলে রাজীব! হাতজোড় করে নমস্কার করতে-করতে অতসী বলেছিল, 'জানেন আপনার কথা সঞ্জয়ের মুখে এত শুনেছি যে আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করত। যাক, দেখাটা হয়ে গেল।'

রাজীব বলেছিল, 'খুব বাড়িয়ে বলেছে তো! সঞ্জুটা হাইপারবোলে ভীষণ ওস্তাদ।'

'একেবারেই না। আপনি যা তা-ই বলেছে। জানেন, আমার বাবাও আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। বলেছেন, বড় মাপের মানুষদের দেখলে মন ভালো থাকে। আমাদের বাড়ি আপনাকে একদিন কিন্তু যেতে হবে।' বলেই ভেতরে-ভেতরে সংকোচ বোধ করেছে অতসী। একজন অচেনা যুবককে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এতটা আগ্রহ না দেখালেই বুঝি শোভন হত। কিন্তু

মুখ থেকে যা বেরিয়ে গেছে তা তো আর ফেরানো যায় না।

রাজীব বলেছিল, 'নিশ্চয়ই যাব। আপনার বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন।' একটু ভেবে ফের বলেছিল, 'একটা ব্যাপার আপনি জানেন কি?'

'কী?'

'সঞ্জু আমার কথা আপনাকে বলেছে, কিন্তু আপনার কথা আমাকে বলেনি।'

সঞ্জয় বলে উঠেছিল, 'বা রে, কী করে বলব! তুই দিল্লি থাকতিস আর আমি এখানে। তোকে পেলে তো বলব!'

রাজীব অতসীকে বলেছিল, 'একেবারে লেম এক্সকিউজ। সঞ্জুটা উইকে দুটো করে চিঠি লিখত, কোনও একটা চিঠিতে আপনার সম্বন্ধে দুটো লাইনের স্পেস কি করা যেত না?'

অতসী কী বলবে, সে শুধু হেসেছে।

সঞ্জয় বলেছিল, 'এ ব্যাপারটা আমার খেয়াল হয়নি।'

'ভালো ব্যাপারে খেয়াল হবে কেন? তা ছাড়া কলকাতায় তিন দিন হল এসেছি। এর ভেতর একবারও তো বলতে পারতিস!'

'সরি, এক্সট্রিমলি সরি। ক্ষমা চাইছি ভাই।'

অতসী এবার বলেছিল, 'তিন দিন আগে এসেছেন, আপনার ফ্রেন্ড আমাকেও কিন্তু তা বলেনি।'

সঞ্জয় বলছিল, 'এর মধ্যে কি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে!'

'তা ঠিক; তবে আমাদের বাড়িতে তো টেলিফোন ছিল!'

'ওটা আমার মাথায় আসেনি।'

অতসী এবার রাজীবকে জিগ্যেস করেছে, 'কলকাতায় ক-দিন থাকছেন?'

রাজীব বলেছিল, 'ক'দিন কি! আমাদের কোম্পানি ক্যালকাটা ডিভিসনাল অফিসের হিউজ এক্সপ্যানশানের স্কিম নিয়েছে। সেজন্যে আমাকে পার্মানেন্টলি এখানে পাঠিয়েছে।'

অতসী খুব খুশি হয়েছিল, 'ফাইন। এবার থেকে তা হলে আপনার সঙ্গে রেগুলার দেখা হবে, কি বলেন?'

'ডেফিনিটলি।'

রাজীবের কথাটা শেষ হতে-না-হতেই হঠাৎ অতসী লক্ষ করেছিল, সঞ্জয়ের মুখে ছায়ার মতো কিছু একটা পড়েছে। তবে কি তার সঙ্গে রাজীবের দেখা হোক, সঞ্জয় এটা চাইছে না? ঠিক বুঝতে পারল না অতসী।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর রাজীব ঘড়ি দেখে বলেছিল, 'দশটা বাজেনি, এখন আপনার কী প্রোগ্রাম মিস ব্যানার্জি?'

অতসী বলেছিল, 'কি আর, বাড়ি ফিরে যাব।'

'পার্ক স্ট্রিটের একটা বড় রেস্তোরাঁয় আমার টেবল বুক করা আছে। এক্সমাস ফেস্টিভ্যাল বলে হোল নাইট ওখানে এক্সাইটিং ড্যান্স আর মিউজিকের অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। খানিকক্ষণ বসে নাচ-টাচ দেখে যান না—'

ডিসেম্বরের রাত দশটা খুব একটা কম রাত না। অতসী নাচ দেখতে নিশ্চয়ই যেত না কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সঞ্জয় দ্রুত বলে উঠেছিল, 'না রে রাজু, এত রাতে ওকে রেস্তোরাঁ-ফেস্তোরাঁয় যেতে বলিস না। বাড়িতে বলে আসেনি; দেরি করে ফিরলে সবাই চিন্তা করবেন।'

রাজীব বলেছিল, 'আরে বাবা, ম্যাটার অফ ফর্টি ফাইভ মিনিটস অর অ্যান আওয়ার। এক ঘণ্টা, কত আর দেরি হয়ে যাবে!'

'তুই জানিস না, অতসীর বাবা-মা একটু কনজারভেটিভ ধরনের। পিসিমা নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন

করেছিলেন বলে আসতে দিয়েছেন। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে বেচারা বকুনি খাবে।'

অতসী থ হয়ে গিয়েছিল। আগে দু-একদিন সঞ্জয়দের বাড়ি খেয়ে-টেয়ে ফিরতে রাত হয়েছে। মা-বাবা কিছু মনে করেননি। তবে অবিবাহিত মেয়ে রোজই যদি রাত করে ফেরে কোন মা-বাবা তা সহ্য করে? তার বাবা-মা কোনওমতেই কনজারভেটিভ নন, তবে শোভনতার সীমা ছাড়লে নিশ্চয়ই তাঁরা অসন্তুষ্ট হন।

অত্যন্ত লিবারেল অত্যন্ত উদার মা-বাবা সম্পর্কে সঞ্জয় যা বলেছিল তাতে ভেতরে-ভেতরে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে অতসী। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গেলে আবহাওয়াটা অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। তাই সে চুপ করেই থেকেছে।

একটা কথা ভেবে খুবই অবাক হয়েছে অতসী। রাজীবের মতো মহৎ উপকারী হৃদয়বান এবং প্রিয়তম বন্ধুর কাছ থেকে সঞ্জয় যেন তাকে দূরে রাখতে চাইছিল। ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। সঞ্জয় এবার অতসীকে বলেছে, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

অতসীর বিস্ময় যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। বেশি রাত হয়ে গেলে সঞ্জয় তাকে সঙ্গে করে বাড়িতে দিয়ে আসত। কিন্তু আগে কোনও দিন বাড়ি ফেরার জন্যে তাড়া লাগায়নি। অতসী বলেছিল, 'ঠিক আছে, চলো।'

রাজীব ওধার থেকে বলেছিল, 'বাঃ, তুই মিস ব্যানার্জির সঙ্গে যাচ্ছিস, আর আমি বুঝি একা-একা রেস্তোরাঁয় গিয়ে নাচ দেখব?'

'নাচ-ফাচ আমার ভালো লাগে না। বাট আই উইল গিভ ইউ কম্প্যানি। অতসীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই আমি রেস্তোরাঁয় চলে আসছি।'

সঞ্জয় হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছিল, অতসীকে পৌঁছে দেবার সময়ও রাজীবকে সে সঙ্গে নিতে চায় না। রাজীব ধরতে পারেনি। খুব সম্ভব সে ভেবে থাকবে, বাড়ির লোকজন কনজারভেটিভ বলে বেশি রাত করল না অতসী এবং বাড়ি যাবার সময় সঞ্জয় তাকে সঙ্গে যেতে বলল না।

অতসী উঠে পড়েছিল। রাজীবও উঠতে-উঠতে বলেছে, 'আমার সঙ্গে নাচ দেখতে গেলে খুশি হতাম। এনিওয়ে এটা রাখুন—' পকেট থেকে নিজের নাম-টাম লেখা একটা কার্ড বার করে অতসীকে দিতে দিতে বলেছে, 'আমার ফোন নাম্বার রয়েছে। যদি কখনও ডায়াল করেন দারুণ আনন্দ হবে।'

চমৎকার কথা বলতে পারত রাজীব। কণ্ঠস্বর ভরাট এবং সুরেলা। হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিতে-নিতে অতসী বলেছিল, 'নিশ্চয়ই করব। আমাদের বাড়ি কবে আসছেন?'

'যেদিন যেতে বলবেন।'

'কামিং সানডে আসুন না। সেদিন বাড়িতে সবাই থাকবে।'

'নিশ্চয়ই যাব। যদি আপত্তি না থাকে আপনাদের ফোন নাম্বারটা দিন না।'

'কোনও আপত্তি নেই।' সঞ্জয়ের পিসিমার কাছ থেকে কাগজ আর পেন চেয়ে নিয়ে ফোন নাম্বার টাম্বার লিখতে-লিখতে অতসী চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করেছে, সঞ্জয়ের মুখের ওপর সেই ছায়াটা আরেকটু ঘন হয়েছে।

আরও কিছুক্ষণ বাদে ট্যাক্সি করে সঞ্জয়ের সঙ্গে বাড়ি যেতে-যেতে অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'তোমার বন্ধুর সঙ্গে ড্যান্স-ট্যান্স দেখতে দিলে না কেন? এক ঘণ্টা পর বাড়ি গেলে কেউ কিছু মনে করত না। তুমি তো এর আগেও রাত এগোরোটা টেগারোটায় আমাকে পৌঁছে দিয়েছ।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'এক্সমাস নাইটে পার্ক স্ট্রিটের বার-কাম-রেস্তোরাঁগুলোতে হুইস্কির স্রোত খেলে যাচ্ছে। যত সব মাতালদের খোঁয়াড়। আর যা ড্যান্সট্যান্স আজ চলছে তা যেমন ডার্টি তেমনি নসিয়েটিং। তোমার মতো মেয়ের ওইরকম ন্যাস্টি অ্যাটমসফিয়ারে যাওয়া উচিত না।'

পার্ক স্ট্রিটের বার-কাম-রেস্তোরাঁগুলোত আগে কখনও ঢোকেনি অতসী। ক্রিসমাস নাইটে

সেখানকার আবহাওয়া কীরকম হয়ে ওঠে সে-সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না। তখনকার মতো অতসীর মনে হয়েছিল, সঞ্জয় যে রাজীবের সঙ্গে ওখানে যেতে দেয়নি সেটা ভালোই হয়েছে। সে বুঝতে পারেনি এর পেছনে সঞ্জয়ের একটা বিপজ্জনক মোটিভই কাজ করেছে। ঠান্ডা মাথায় ছক কেটে রাজীবের কাছ থেকে প্রথম থেকেই সে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

অতসী বলেছে, 'তুমি তো সিগারেট খাও না, পান খাও না, ড্রিংক করো না। তা হলে তুমি যাবে কেন?'

'বন্ধুকে সঙ্গ দিতে। আফটার অল ওর কাছে কৃতজ্ঞতা আর অবলিগেশনের তো শেষ নেই আমার।'

পরের রবিবার সকালের দিকে রাজীব অতসীদের বাড়ি চলে এসেছিল। একাই এসেছে। বলেছে, 'কথা দিয়েছিলাম, দেখুন চলে এলাম।'

অতসী বলেছিল, 'সো নাইস অফ ইউ।' সত্যি সত্যিই সে খুশি হয়েছিল।

রাজীব বলেছিল, 'ভেবেছিলাম সঞ্জুটাকে ধরে আনব। পরে ভেবে দেখলাম, 'রবিবার আড্ডা-টাড্ডা দেওয়ার চাইতে বস্তির লোকেদের সারভিস দেওয়া আমার ফ্রেন্ডটির কাছে অনেক বেশি ইমপর্টান্ট। গ্রেট ফিল্যানথ্রপিস্ট তো। তাই আর ওকে বলিনি।'

রাজীব এসেছিল কাঁটায়-কাঁটায় ন'টায়। এক ঘণ্টা বাদে ঠিক দশটার সময় দেখা গেছে অতসীদের হোল ফ্যামিলি তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' বলে একটা কথা আছে। অতসীদের বাড়িতে পা দিয়েই সেই কাজটি করে ফেলেছিল সে।

দিদি আর ছোট বউদি নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় বলাবলি করছিল, 'কী দারুণ চেহারা দেখেছ! একেবার গ্রিক স্কালপচার যেন।'

'হুঁ। কথাও বলে একসেলেন্ট।'

রাজীবের কথাবার্তা, ব্যবহার এবং চেহারার মধ্যে দারুণ একটা ম্যাজিক ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সবাই তার ফ্যান হয়ে গেছে।

দুপুরবেলা সে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা-মা-দাদারা-বউদিরা তাকে আটকে রেখেছেন।

জমিয়ে গল্প করতে-করতে দুপুরের খাওয়া শেষ হয়েছিল। তারপর রাজীব বলেছিল, 'এবার কিন্তু আমাকে ছাড়তে হবে।'

ছোড়দা আর জামাইবাবু বলেছিল, 'ছুটির দিনে কী এমন কাজ! আর কিছুক্ষণ থেকে গেলে আমাদের ভালো লাগবে।'

একটু ভেবে রাজীব বলেছে, 'ঘরে বসে আড্ডা দিয়ে কী হবে। আপনারা সবাই আমার সঙ্গে চলুন। তিনটের সময় আমাকে একটা ব্যাপারে পার্টিসিপেট করতে হবে। দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে।'

ছোড়দা জিগ্যেস করেছিল, 'ব্যাপারটা কী?'

'আগে বলব না। গেলে বুঝতে পারবেন। সবাই চলুন, প্লিজ না বলবেন না।' একরকম জোরজার করেই অতসীদের বাড়ির সবাইকে রেস কোর্সের ভেতরে পোলো গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়েছিল।

একধারে বিরাট শামিয়ানা খাটানো ছিল। তার তলায় কলকাতার এলিট সোসাইটির প্রচুর মহিলা এবং পুরুষ বসে ছিলেন। আর ছিলেন আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সের টপ অফিসারেরা। সামনেই হর্স পোলোর কোর্ট। দূরে অনেকগুলো স্বাস্থ্যবান তেজি ঘোড়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ছুড়ছিল। তাদের গা থেকে থেকে তেল যেন গড়িয়ে পড়ছিল।

শামিয়ানার তলায় আরামদায়ক বেতের সোফায় অতসীদের বসিয়ে বেয়ারাদের ডেকে কফি-টফি দিতে বলেছিল রাজীব। তারপর অতসীদের দিকে ফিরে বলেছে, 'আপনারা এখানে বসুন। আমাকে পোলোর মাঠে নামতে হবে।' বলেই হাত নাড়তে-নাড়তে চলে গিয়েছিল।

খানিকক্ষণ পর দেখা গিয়েছিল ড্রেস-ট্রেস বদলে পেলোর জন্য বানানো বাদামি রঙের ব্রিচেস পরে হাতে স্টিক নিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে মাঠে নেমে গিয়েছিল রাজীব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুটো অপোনেন্ট টিমের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আগে আর কখনও পোলো দেখেনি অতসী। শুধু অতসী কেন, তাদের ফ্যামিলির কেউই না! এই কলকাতা শহরে এমন একটা রাজকীয় খেলার ব্যবস্থা আছে, আগে তারা জানত না।

দুই দলের ঘোড়াগুলো দারুণ জোরে একবার মাঠের এধারে যাচ্ছিল, আরেক বার ওধারে। খেলোয়াড়রা ঘোড়ার পিঠে বসে এক হাতে লাগাম ধরে আরেক হাতে স্টিক দিয়ে সাদা বল মারতে-মারতে বা বিরুদ্ধে পক্ষের কাছ থেকে বল কাড়তে-কাড়তে এগিয়ে গেছে বা পিছিয়ে এসেছে।

এখানে সবাই দুর্দান্ত খেলোয়াড়। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সব চাইতে বেশি করে চোখ টেনে নিয়েছিল সে রাজীব।

সবুজ কার্পেটের মতো মাঠটার ওপর দিয়ে রাজীবের ধবধবে সাদা ঘোড়া রাজকীয় মহিমায় বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছিল। তার পিঠে সমুন্নত চেহারার সুপুরুষ রাজীবকে ইতিহাসে-পড়া মধ্যযুগের কোনও নাইট বা রাজপুতানার কোনও রূপবান তরুণ রাজার মতো মনে হচ্ছিল। অতসী তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। রাজীবকে দেখতে-দেখতে তার বাইশ-তেইশ বছরের হৃৎপিণ্ড কখনও থমকে যাচ্ছিল, কখনও বা প্রচণ্ড ঝড়ে সেটা তোলপাড় হচ্ছিল।

ওধারে বাবা মাকে বলছিলেন, 'ছেলেটা অসাধারণ।'

জামাইবাবু ছোড়দাকে বলছিল, 'ম্যাজেস্টিক।'

ছোট বউদি দিদিকে বলছিল, 'সাদা ঘোড়ার ওপর ভদ্রলোককে কী দারুণ লাগছে!'

পোলো গ্রাউন্ডেই না, রাজীব তার সেই সাদা ঘোড়াটা যেন অতসীর হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়েই ছুটিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছিল।

সেই রবিবারের পর প্রায় রোজই অতসীর বাড়ি আসতে লাগল রাজীব। দুই-তিন বার আসার পর কবে যেন অতসীকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল, এখন আর মনে পড়ে না। কোনওদিন তাকে নিয়ে রাজীব যেত পোলো গ্রাউন্ডে, কোনওদিন রাইফেল শুটিংয়ে, কোনওদিন বা 'পশ' কোনও রেস্তোরাঁয়। তার পৌরুষ এত তীব্র, তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার শক্তি এক প্রচণ্ড যে ঝড়ের মুখে পলকা একটা পাতার মতো অতসী উড়ে গিয়েছিল।

বেশিরভাগ দিন একাই আসত রাজীব। মাঝে-মাঝে অবশ্য সঞ্জয়কেও সঙ্গে আনত।

রাজীবের মতো এমন প্রবল পুরুষ আগে আর কখনও দেখেনি অতসী। সে যেন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ছুটির বা অন্য দিনে কখন রাজীব আসবে, সেই জন্য রুদ্ধশ্বাসে সে অপেক্ষা করত। কোনও-কোনও দিন রাজীব সোজা ইউনিভার্সিটিতে চলে যেত, সেখান থেকে তাকে ঝকঝকে একটা গাড়িতে তুলে কোনও একদিকে চলে যেত। শুধু তাকে একাই না, কোনও-কোনও দিন সঞ্জয়কেও সঙ্গে তুলে নিত। তুলে নিত বললে ঠিক হয় না। সঞ্জয় নিজের থেকেই ওদের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ত। যদি কোনওভাবে সে টের পেত, রাজীব তাদের বাড়ি আসবে, তার আগে এসে বসে থাকত। ওরা বেরুতে গেলে সঙ্গ নিত। মোট কথা, অতসীকে রাজীবের সঙ্গে একা কিছুতেই ছাড়তে চাইত না।

একটা ব্যাপার অতসী লক্ষ করছিল। রাজীবের সঙ্গে তাব আলাপের পর থেকে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল সঞ্জয়। সর্বক্ষণই তাকে অন্যমনস্ক আর চিন্তিত দেখাত। আগে বারবার বলেও যাকে বাড়িতে আনানো যেত না, সে হুটহাট চলে আসত। ব্যাপারটা ভালো লাগেনি অতসীর। তার মনে হয়েছে সঞ্জয় অদ্ভুত ধরনের ঈর্ষায় ভুগছে। তা হলে এতদিনের ভালোমানুষি, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে মেশা—সবই তার একটা চতুর চাল। বন্ধুর সঙ্গে দু-দিন ঘুরতেই ফিলানথ্রপিস্ট ডিসপ্যাসানেট সন্ন্যাসীর বাইরের বার্নিশ সরিয়ে আসল মানুষটা তা হলে বেরিয়ে পড়েছে।

অতসী মাঝে-মাঝে ঠাট্টার সঙ্গে ধারালো একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলত, 'যাক, বন্ধুর জন্যে এখন তা হলে আমাদের বাড়ি তোমাকে দেখা যাচ্ছে।'

সঞ্জয় হাসত, 'তা বলতে পারো।' একটু ভেবে বলত, 'কাল নাকি রাজুর সঙ্গে ব্যারাকপুর গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলে?' কিংবা 'পরশুদিন আইস স্কেটিং দেখতে গিয়েছিলে?'

'তুমি তা হলে সব খবর রাখছ!' অতসী সোজাসুজি সঞ্জয়ের চোখের দিকে তাকাত।

সঞ্জয় হকচকিয়ে যেত। বলত, 'না, মানে শুনলাম কিনা। তাই—'

কোনও দিন এসে সে হয়ত বলত, 'রাজীবকে কেমন লাগছে?'

'তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। কেমন লাগা উচিত, তুমিই তো আমার চাইতে অনেক বেশি ভালো জানো।'

সঞ্জয় উত্তর দিত না। তবে রাজীব সম্পর্কে সে কিছু একটা বলতে চাইত, সেটা বোঝা যেত। ক্রমশ সে যেন বিমর্ষ এবং হতাশ হয়ে পড়ছিল।

এদিকে রাজীবকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিল না অতসী। একটা দিন সে না এলে তার ভীষণ খারাপ লাগত।

রাজীবের চরিত্রে এমন কিছু অতসী দেখতে পায়নি যা আপত্তিকর। কখনও রাজীব তার ক্ষতি বা অমর্যাদা করেনি। তবে এটা জানা গিয়েছিল, সে একটু আধটু ড্রিংক করে। এ-ব্যাপারে তার বক্তব্য পরিষ্কার। বিরাট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির টপ একজিকিউটিভ সে। কোম্পানির স্বার্থে নানা ধরনের মানুষকে তার এন্টারটেন করতে হয়। এদের সঙ্গ দেবার জন্য বড়-বড় পশ হোটেল, ক্লাব বা পার্টিতে না গেলেই নয়। সঙ্গ দিতে হলে একটু-আধটু ড্রিংক করতেই হয়। সবাই হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে ঘুরবে আর সে এদের মধ্যে পবিত্র শরবতের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেটা খুবই ব্যাড ম্যানার্স। কাজেই ড্রিংক করাটা তার চাকরির একটা ভাইটাল পার্ট।

অতসী খুব পিউরিটান নয়। ড্রিংকের নাম শুনে সে চমকে ওঠেনি। কারণ সে জানত ফরেন সারভিসে ঢোকার পর বড়দাকে পার্টিতে গিয়ে ড্রিংক করতে হত এবং এখনও হয়। ছোড়দা এবং জামাইবাবু তখন একটু-আধটু হুইস্কি বা রাম-টাম যে না খেত, এমন নয়। হুইস্কি বাদ দিয়ে বড় চাকরি-বাকরির কথা ভাবা যায় না। কাজেই রাজীবের ড্রিংকের ব্যাপারটা খারাপ লাগেনি অতসীর।

এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন তাকে নিয়ে ইমপোর্টেড কারে টপ স্পিড তুলে ডায়মন্ডহারবার চলে গিয়েছিল রাজীব।

তখন পূর্ণিমা চলছে। আকাশে রুপোর থালার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় সামনের বিশাল নদীটাকে অলৌকিক দেখাচ্ছিল।

নদীর পাড় দিয়ে রাস্তা গেছে। তার তলা থেকে জল পর্যন্ত ঢালু জায়গাটা পাথর দিয়ে বাঁধানো। গাড়িটা রাস্তার একধারে রেখে অতসীকে নিয়ে রাজীব জলের কাছাকাছি গিয়ে বসেছিল। দু-একটা এলোমেলো কথার পর সে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে একটা খুব জরুরি কথা আছে।'

অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'কী?'

কোনওরকম প্যানপ্যানানি না করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রাজীব বলেছিল, 'ডিসেম্বরের এন্ডে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এখন জানুয়ারির এন্ড। কাউকে বোঝার পক্ষে এক মাস সাফিসিয়েন্ট। এবার আমাদের বিয়েটা করে ফেলা দরকার। ঠিক করেছি, পনেরো দিনের ভেতরেই এ-ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলব। আমার ধারণা তোমার আপত্তি নেই।'

অতসী প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। আলাপের মাত্র এক মাসের মাথায় কেউ যে বিয়ের কথা বলতে পারে, এটা সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু রাজীবের মধ্যে কোথায় যেন হিপনোটিজমের একটা ব্যাপার আছে। সম্মোহিতের মতো অতসী শুধু মুখ নামিয়ে জানাতে পেরেছিল, তার আপত্তি নেই।

সেদিনই কলকাতায় ফিরে মা-বাবা দাদা-বউদিদের রাজীব বলেছিল, 'অতসী আর আমি ঠিক করে ফেলেছি বিয়ে করব। আপনারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন। কোনও কিছু বেশিদিন ঝুলিয়ে রাখতে আমার ভালো লাগে না। তা হলে অন্য কাজে কনসেনট্রেট করতে ভীষণ অসুবিধে হয়। এখন থেকে এক ফোর্টনাইটের ভেতর এ-ব্যাপারটা যাতে চুকে যায়, দেখবেন।' একটু থেমে সে জানিয়েছে, এ-বিয়েতে তার বাবা আসবেন না। ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, হোর্ডার, খুনি, অ্যান্টিন্যাশান্যাল, অ্যান্টিসোশ্যাল বাবার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে মাকে আনতে লোক পাঠাবে। কিন্তু বাবা তাঁকে আসতে দেবেন কি না, সন্দেহ আছে।

রাজীব আর অতসী যে পরস্পরকে পছন্দ করে, তাদের মধ্যে কিছু যে একটা চলছে, এটা বাড়ির সবাই বুঝতে পেরে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবটা এমনই আকস্মিক যে তারা প্রায় বিমূঢ়ই হয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, 'তোমার কথা শুনলাম। আমাদের একটা দিন ভাবতে দাও। কাল এ-নিয়ে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

'আপনাদের কিছুটা হেজিটেশন রয়েছে দেখছি। ঠিক আছে নেক্সট চব্বিশ ঘণ্টা সাসপেন্সেই থেকে যাই।'

রাজীব চলে যাবার পর সেদিন রাত্রেই পারিবারিক সভা বসে গিয়েছিল অতসীদের বাড়িতে। রাজীব অবাঙালি বলে মা একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন। বাবা বা দাদা-জামাইবাবুর এ-ব্যাপারে আপত্তি ছিল না। বাবার যে সামান্য দ্বিধা ছিল তা অন্য কারণে। রাজীবের বিয়েতে তার বাবা না আসুক, অন্তত মা না থাকলে খারাপ দেখায়। দিদি বলেছিল, 'পনেরোটা দিন খুব কম সময়। বড়দা রয়েছে ওয়েস্ট জার্মানিতে। এর মধ্যে ছুটি-টুটি নিয়ে ওর আসা অসম্ভব। সোনার বিয়েতে ও থাকতে পারবে না এটা কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।'

জামাইবাবু বলেছিল, 'তোমাদের পাত্র তো পনেরো দিনের ভেতরেই বিয়ে করার জন্যে খেপে উঠেছে। যে-ধরনের একবগ্‌গা টাইপ, সে বোধহয় আর দেরি করতে রাজি হবে না। সোনাটা যে কী মেসমেরাইজ করেছে তা ও-ই জানে!'

পারিবারিক কনফারেন্স শেষ হয়েছিল মাঝ রাতে। প্রচুর আলাপ-আলোচনার পর যা দাঁড়িয়েছিল তা এইরকম। রাজীবের মতো ছেলে সহজে পাওয়া যায় না। হয়ত একটু খামখেয়ালি এবং বেপরোয়া, তা হোক, পনেরো দিনের মধ্যেই বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে। ওয়েস্ট জার্মানি থেকে বড়দা যখন আসবে, তখন আবার একটা ফাংশান-টাংশান করা যাবে। আরও একটা ব্যাপার ঠিক হয়, পরের দিন শুধু রাজীবকেই না, সঞ্জয়কে ডেকেও আগের রাতের ডিশিসানের কথাটা জানিয়ে দেওয়া হবে। কেন না সে রাজীবের প্রিয়তম বন্ধু এবং শুভাকাঙক্ষী। সে-ই তার সঙ্গে অতসীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

পরের দিন রাজীব এবং সঞ্জয়কে ডেকে বাবা জানিয়ে দিয়েছিলেন। পনেরো দিনের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা ফাইনাল করে ফেলবেন। তবে এ ব্যাপারে রাজীবের মা-বাবাকে তিনি চিঠি লিখবেন। এটা তাঁর কর্তব্য। বাবা যত ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষই হোক না, তার ছেলের বিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে সেরে ফেলাটা কোনও কাজের কথা নয়।

বিয়ের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবার পর খুব খুশি হয়েছিল রাজীব। বলেছিল, 'যাক, সাসপেন্সটা কাটল। আই অ্যাম ভেরি ভেরি হ্যাপি।' একটু থেমে বলেছিল, 'আপনারা রেডি হোন। আমাকে অফিসের কাজে তিন-চারদিনের জন্যে একবার দিল্লি যেতে হবে। কালকের মর্নিং ফ্লাইটে চলে যাব ফিরে এসেই দেখা করব।'

বাবা এবার সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, 'তোমার জন্যে রাজীবের মতো ছেলেকে পেয়েছি। উই আর গ্রেটফুল টু ইউ।'

সঞ্জয় হাসতে চেষ্টা করেছিল। আবছাভাবে কিছু একটা বলেও ছিল। কিন্তু বোঝা যায়নি।

খানিকটা দূরে বসে অতসী লক্ষ করেছিল সঞ্জয় যেন আরও বিমর্ষ হয়ে গেছে। এমনিতে তার মুখেচোখ ভারি উজ্জ্বল আর পবিত্র। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল কেউ যেন ব্রাশ দিয়ে তার মুখে কালির পোঁচ টেনে দিয়েছে। সঞ্জয়কে তখন অত্যন্ত নোংরা আর জঘন্য ঈর্ষাপরায়ণ মনে হয়েছিল।

মনে আছে, পরের দিন সকালেই দিল্লি চলে গিয়েছিল রাজীব। দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে এসে অতসী দেখে, সঞ্জয় গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখামাত্র কাছে এগিয়ে এসে সে বলেছিল, 'তোমার জন্যে আধঘণ্টা ওয়েট করছি। একটা কথা ছিল।'

মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল অতসীর। আস্তে করে বলেছিল, 'কী?'

'এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না। আজকের দিনটা ক্লাস না করলে ভালো হত। কোথাও গিয়ে বসে কথাটা বলতাম।'

সঞ্জয় কী বলবে, মোটামুটি বুঝতে পেরেছিল অতসী। তবু তার দৌড়টা শেষ পর্যন্ত দেখতে চেয়েছে সে। বলেছে, 'আমার আপত্তি নেই। আমাকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারো—'

সঞ্জয় তাকে সঙ্গে করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ মুখোমুখি বসে থেকেও যখন সে মুখ খুলছিল না তখন অতসী বলেছে, 'কী হল, বোবা হয়ে বসে থাকবে নাকি? যা বলবার বলো—'

চমকে উঠে সঞ্জয় বলেছে, 'হ্যাঁ, বলছি।' বলেও আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকেছে সে। তারপর ফের শুরু করেছে, 'তুমি কি সত্যি-সত্যিই রাজীবকে বিয়ে করছ?'

কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ঘৃণায় সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠেছিল অতসীর। বিয়ের ব্যাপারেই সঞ্জয় কিছু বলবে, এটা সে আন্দাজ করেছিল। কিন্তু সরাসরি এরকম একটা নোংরা কুৎসিত প্রশ্ন করবে, এতটা ভাবতে পারেনি। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলেছিল, 'তুমি আর কিছু বলবে?'

তার কণ্ঠস্বর শুনে এবং মুখচোখের চেহারা দেখে চমকে উঠেছিল সঞ্জয়! থতিয়ে-থতিয়ে কোনও রকমে বলেছিল, 'না, মানে—'

'তোমার কথা বলা হয়েছে। আশা করি আমার উত্তরটাও তুমি পেয়ে গেছ। আমাকে আর কখনও এ-জাতীয় প্রশ্ন কোরো না। আমি চলি—'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আরও কথা ছিল।'

'তুমি কী বলবে আমি জানি। যে তার উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে আড়ালে কথা বলে সেই আনগ্রেটফুল ডার্টি জেলাস টাইপের বজ্জাতের কথা শোনার মতো রুচি আমার নেই।'

মুহূর্তে সঞ্জয়ের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। করুণভাবে সে কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই অতসী উঠে চলে গেছে।

দিনকয়েক বাদে রাজীব দিল্লি থেকে ফিরে এসেছিল। তারপর দু-তিনটে দিন কেমন যেন অস্থির আর অন্যমনস্ক দেখিয়েছে তাকে।

অতসী উদ্বিগ্নভাবেই জিগ্যেস করেছে, 'কী হয়েছে তোমার?'

রাজীব চমকে উঠে বলেছে, 'না, ও কিছু না।' একটু চুপ করে থেকে বলেছে, 'বিয়ে করতে যাচ্ছি! হিউজ রেসপনসিবিলিটি তো। তাই বোধহয় মেন্টাল এক্সাইটমেন্ট চলছে। তা ছাড়া নিজের বিয়ের ব্যাপারটা নিজেকেই তো সব করতে হচ্ছে। তারও একটা স্ট্রেন পড়েছে। অবশ্য সঞ্জুটা আছে, কিন্তু এসব ব্যাপারে ওটা একেবারে আনাড়ি।' বলে হেসে ফেলেছে।

অতসী আর কিছু জিগ্যেস করেনি, রাজীবের কথাটা মোটামুটি মেনে নিয়েছিল।

এদিকে বাড়িতে পুরোদমে বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছিল। নেমন্তন্নের কার্ড প্রেসে চলে গেছে। প্যান্ডেলওলা, সানাইওলা, ফার্নিচারওলা এবং কেটারাররা অনবরত বাড়িতে ছোটাছুটি করছে। আত্মীয়স্বজনরাও দু-একজন করে আসতে শুরু করেছিল।

বিয়ের সাতদিন আগে থেকে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল অতসী। তাই বলে বাড়িতে থাকত না সে। দিদি-বউদিদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে শাড়ি গয়না-টয়না কিনে বেড়াত।

তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল অতসী। রোজই একবার-না-একবার সঞ্জয় তাদের বাড়ি এসে চুপচাপ বসে থাকত। তার চোখ লালচে, মুখ না-কামানো, চুল উশকো-খুশকো, ট্রাউজার্স আর শার্টটা দারুণ ময়লা—সব মিলিয়ে কেমন যেন শোকাচ্ছন্ন চেহারা।

বাবা জিগ্যেস করতেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

সঞ্জয় বলত, 'কই, কিছু না তো।'

তার কী যে হয়েছে সেটা শুধু জানত অতসী। সে বুঝতে পারত, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যই রোজ আসছে সঞ্জয় এবং সে কী বলবে সেটাও অতসীর খুব ভালো করেই জানা। তার ইচ্ছা হত সঞ্জয়কে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। রাজীবকে সঞ্জয়ের ব্যাপারটা সে বলতে পারত, কিন্তু দুই প্রিয় বন্ধুর মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিতে তার ইচ্ছা হত না।

যাই হোক, রাজীব থাকত সার্কুলার রোডের একটা বিরাট মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের প্রকাণ্ড প্যালেশিয়াল ফ্ল্যাটে। ওখানেই তার দিক থেকে বিয়ের আয়োজন করেছিল সে। বিয়ের ব্যাপারে পুরোপুরি বাঙালি আচার-টাচার মানার জন্য ও-বাড়িরই অন্য ফ্ল্যাটের বাঙালি মহিলাদের ডেকে নিয়েছিল, বাঙালি কলিগদের স্ত্রীরা তো ছিলই।

মনে পড়ে, বিয়ের ঠিক আগের দিন সন্ধেবেলা সাতটা-টাতটায় হঠাৎ এসে সঞ্জয় হাজির। তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল।

ড্রইং রুমে তখন বাড়ির সবাই তো ছিলই, বাইরে থেকে যে-সব আত্মীয়-স্বজন বিয়ে উপলক্ষে এসেছে তারাও ছিল। হইচই হাসাহাসি এবং ঠাট্টায় আসর একেবারে সরগরম। ঘরে ঢুকেই সঞ্জয় চেঁচিয়ে বলেছিল, 'প্লিজ, এই বিয়ে আপনারা স্টপ করুন।'

গোটা ড্রইংরুমটা কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেই ভাবটা কাটলে ছোড়দা বলেছিল, 'কী পাগলের মতো কথা বলছ সঞ্জয়! প্যান্ডেল খাটানো হয়ে গেছে, সানাইওলারা এসে পড়েছে, এক হাজার লোককে নেমতন্ন করা হয়েছে, আত্মীয়স্বজনদের ফিফটি পারসেন্ট থাকে বাইরে—তারা এসে গেছে। এখন বিয়ে বন্ধ করা যায়! লোকে হাসবে না?'

বাবা জিগ্যেস করেছিলেন, 'বিয়ে বন্ধ করতে বলছ কেন?'

সঞ্জয় বলেছিল, 'আমাকে এ-ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করবেন না। ফর গডস সেক, এ বিয়ে আপনাদের বন্ধ করতেই হবে'।

এই সময় অতসী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। চিৎকার করে বলেছিল, এই বাজে নোংরা লোকটাকে এক্ষুনি বাড়ি থেকে বার করে দাও বাবা। তোমাদের আগে আমি বলিনি, এই লোকটা ক-দিন ধরে সমানে আমাকে বোঝাতে চাইছে আমি যেন রাজীবকে বিয়ে না করি। এমন এনভায়াস আনগ্রেটফুল লোক লাইফে দেখিনি। যে বন্ধু সব দিক থেকে বাঁচিয়েছে, তার পিঠে ও ছুরি মারতে চাইছে। ফিলানথ্রপিস্ট, সোশ্যাল ওয়ার্কার—সব ওর বুজরুকি।' উত্তেজনায় ঘৃণায় রাগে তার গলার শির যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

দু-হাত নেড়ে আর্তনাদের মতো সঞ্জয় বলেছিল, 'না, না, আমি অকৃতজ্ঞ নই। কারও ওপর আমার ঈর্ষা নেই। বিশ্বাস করো অতসী, দয়া করে বিশ্বাস করো—'

মা এক ধারে বসে সঞ্জয়কে লক্ষ করছিলেন। এবার তিনি বলেছেন, 'রাজীব সম্পর্কে তুমি কি কিছু বলতে চাও বাবা? সে কি ছেলে হিসেবে ভালো নয়?'

জিভ কেটে, দু-হাত এবং মাথা জোরে-জোরে নাড়তে-নাড়তে সঞ্জয় বলেছিল, 'রাজুর কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ। তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার থাকতে পারে না, তবু কাকিমা, আমার অনুরোধ এ-বিয়ে বন্ধ করে দিন। এতে সবার ভালো হবে।'

শুনতে-শুনতে অতসী এত ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে ঘরে বাবা, দাদারা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যে রয়েছে, সেসব খেয়াল ছিল না। সব কথা যেসব জায়গায় বলতে নেই, তাও সেই মুহূর্তে সে ভুলে গিয়েছিল। গলার স্বর আরও চড়িয়ে সে বলেছে, 'ভালোমানুষি দেখাতে চেষ্টা কোরো না। তুমি যদি মনে করে থাকো রাজীবের সঙ্গে বিয়ে না হলে তোমার সুবিধা হবে তা হলে ভুল করবে।'

'ছি ছি, এ তুমি কী বলছ অতসী! ক্রাইস্টের নাম নিয়ে বলছি এ-বিয়ে বন্ধ করতে আমার কোনও স্বার্থ নেই।'

জামাইবাবু খুবই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'দেন স্টপ ইট। এখন আর এ-বিয়ে আটকানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া এতদিন ধরে বিয়ের ব্যাপারটা চলছে। তুমি সবই জানো; প্রত্যেকটা স্টেজে তুমি প্রেজেন্ট ছিলে। বন্ধ করার হলে আগে বলোনি কেন? লাস্ট মোমেন্টে এসব ঝামেলার কোনও মানে হয়?'

জামাইবাবুর যুক্তিতে কোথাও ফাঁক ছিল না। বাবা সায় দিয়ে বলেছিলেন, 'ঠিকই বলেছ সমীর। এখন বিয়ে স্টপ করা যাবে না।'

সঞ্জয় পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিল যেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবছা গলায় বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমার আর কিছু বলার নেই।' বলেই ভাঙাচোরা মানুষের মতো আস্তে-আস্তে পা টেনে-টেনে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সঞ্জয় এসেছিল সাতটায়। তার পাঁচ ঘণ্টা বাদে, ঠিক বারোটায় টেলিফোনে এসেছিল একটা ভয়াবহ খবর। ফোনটা করেছিলেন রাজীবের পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক, রণধীর চ্যাটার্জি। তিনি জানিয়েছিলেন, রাজীবকে কে যেন খুন করে গেছে।

তারপর কীভাবে দু-তিনটে দিন কেটে গেছে, অতসীই জানে। একে-একে ডেকরেটররা প্যান্ডেল খুলে নিয়ে চলে গেছে, সানাইওলারা তাদের বাজনার সরঞ্জাম, কেটারাররা হাঁড়ি-কড়া নিয়ে গেছে, আত্মীয়রা সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় নিয়েছে। আর এরই মধ্যে রাজীবের খুনের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে পুলিশ এসেছিল। অতসী তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের জন্য সঞ্জয়ই দায়ী।

এর পর শিকারি কুকুরের মতো পুলিশ সঞ্জয়কে খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু রাজীবের খুনের রাত থেকেই সে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তাকে ধরা যায়নি।

রাজীবের এই ভয়ংকর আকস্মিক মৃত্যু অতসীদের ফ্যামিলিকে দারুণ ধাক্কা দিয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে অতসীকে। সে এত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে মাস-দুয়েক বাড়ি থেকে বেরুত না। তারপর আস্তে-আস্তে সব স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। আবার সে ইউনিভার্সিটিতে যেতে শুরু করেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প-টল্পও করত কিন্তু আগেকার হাসিখুশি হুল্লোড়প্রিয় সরল আমুদে মেয়েটা তার মধ্য থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। বাইরের দিকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও ভেতরে-ভেতরে গনগনে আগুন জ্বলছিল তার। যেভাবেই হোক রাজীবের খুনের প্রতিহিংসা তাকে নিতেই হবে। ফেরারি হত্যাকারী পৃথিবীর যে-প্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে থাক তাকে খুঁজে বার করে ফাঁসির দড়িতে না ঝোলানো পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।

রাজীবের কেসটা নিয়ে যে-সিনিয়র পুলিশ অফিসার ইনভেস্টিগেট করছিলেন তিনি অতসীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। প্রতি সপ্তাহেই একবার দুবার করে তাঁর সঙ্গে দেখা করত অতসী। বলত, 'মেসোমশাই যেমন করে পারেন সঞ্জয়কে খুঁজে বার করুন।'

তিনি বলতেন, 'তোমার মানসকি অবস্থাটা বুঝতে পারছি মা। মার্ডারারকে ধরার জন্যে আমাদের যা করতে হয়, করব। ফাঁসিতে তাকে চড়তেই হবে।'

কিন্তু দেখতে-দেখতে এম.এ. পাস করে গেছে অতসী, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারে একটা ডিপ্লোমা কোর্সও কমপ্লিট করে ফেলেছে। তারপর চাকরি নিয়ে আজ এই ধাতুরিয়ায় চলে এসেছে।

আসার আগে পুলিশ অফিসার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে অতসী বলেছিল, 'আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু সঞ্জয়ের ব্যাপারটা ছেড়ে দেবেন না।'

মেসোমশাই বলেছিলেন, 'তিরিশ বছর আমি পুলিশে আছি। রিটায়ারমেন্টের আর বছরখানেক বাকি। আজ পর্যন্ত কোনও কেস হাতে নিয়ে ফেল করিনি; এই একটা ছাড়া! তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারও ওরকম একটা হিইনাস ক্রিমিনালকে আমি ধরবই। ডিসক্রেডিট নিয়ে আমি কিছুতেই রিটায়ার করব না।' একটু চুপ করে চিন্তিততভাবে আবার তিনি বলেছেন, 'কিন্তু মা, এই মার্ডার কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে একটা খারাপ ইনফরমেশন পেয়েছি।'

'কী ইনফরমেশন?'

'এই রাজীব সম্পর্কে।'

উদ্বিগ্ন মুখে অতসী জিগ্যেস করেছিল, 'রাজীব সম্পর্কে কী খারাপ খবর পেয়েছেন?'

মেসোমশাই বলেছিলেন, 'কনফার্মড কিছু পাইনি; তাই বলা ঠিক হবে না। কারেক্ট খবর পেলে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

'জানাবেন কিন্তু—' মেসোমশাইকে ধাতুরিয়ার ঠিকানা দিয়ে মনের ভেতর রাজীব সম্পর্কে দারুণ একটা খিঁচ নিয়ে কলকাতা থেকে চলে এসেছিল।

তারপর খানিকক্ষণ আগে প্রবালের গলা শুনে চমকে উঠেছিল সে। সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এই গলার আশ্চর্য মিল। কিন্তু দুজনের মুখের চেহারা একেবারে আলাদা।

ভাবতে-ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, অতসীর মনে নেই।

ছয়

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল কার যেন ডাকাডাকিতে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে অতসী দেখল, জানলার বাইরের পাহাড় আর উপত্যকা নরম সোনালি রোদে ভেসে যাচ্ছে। পাহাড়ের ঢালে দেওদার আর অর্জুন গাছের পাতাগুলো ঝলমল করছে। গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে এখানকার প্রকৃতির সন্তান কালচে-বাদামি চেহারার দু-চারটে ওরাওঁ কি মুণ্ডাকে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গাঢ় নীল আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে-বেয়ে সূর্যটা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। সব মিলিয়ে অলৌকিক ছবি যেন।

প্রথমটা অতসী খেয়াল করতে পারল না কোথায় আছে। আর তখনই আবার একটা গলা শোনা গেল, 'দিদি, দিদি—'

সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর। এবার মনে পড়ে গেল, কাল সে ছোটনাগপুরে এসেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতেই দেখা গেল, সন্ধ্যা, বিনয়, একটি উনিশ-কুড়ি বছরের অচেনা ওরাওঁ কিংবা মুন্ডা মেয়ে এবং গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একটি মধ্যবয়সি আদিবাসী দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা হাসল, 'আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম তো।'

এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না অতসী। রোদ উঠবার আগেই সে উঠে পড়ে। একটু লজ্জা পেয়ে গেল সে। বলল, 'কাল ভীষণ টায়ার্ড ছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠতে পারিনি। তোমরা ডেকে

ভালো করেছ। ভেতরে এসো—'

সন্ধ্যা বলল, 'এখন আর যাব না দিদি। আপনার লোক নিয়ে এসেছি।' সঙ্গের আদিবাসিনী মেয়েটাকে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম লিমি। খুব ভালো আর কাজের মেয়ে।' আদিবাসী পুরুষটাকে দেখিয়ে বলল, 'এ হল লাকড়া, লিমির বাপ। আপনাদের অফিসের ড্রাইভার।' পরিচয়-টরিচয় দেবার পর মেয়েটাকে বলল, এই দিদিমণির কাছে থাকবি, মন দিয়ে কাজ করবি—বুঝলি?'

লিমির মুখটা গোলগাল, পুরু ঠোঁট, ঠান্ডা চোখ, একমাথা কোঁকড়া চুল উঁচু করে বেঁধে এই সকালবেলাতেই ফুল গুঁজে দিয়েছে। মাঝারি ধরনের চেহারায় প্রচুর স্বাস্থ্য তার। সরল মুখে আলগা একটি হাসি লেগে আছে।

মেয়েটার পরনে হলুদ জমির ওপর লাল ফুল আঁকা মিলের ছাপা শাড়ি আর নীল ব্লাউজ। চোখে মোটা করে কাজলের টান। হাতে গোটা গোটা রঙিন কাচের চুড়ি, কানে রুপোর কানফুল, নাকে ঝুটো পাথর-বসানো রুপোর নাকছাবি, গলায় চৌকো-চৌকো খেলো পাথরের হার; পায়ে সস্তা দামের রবারের চটি। হাতে আছে মোটা কাপড়ের একটা ব্যাগ। বোঝা যায় ব্যাগটার ভেতর তার শাড়ি জামা এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র পোরা রয়েছে। মাথা হেলিয়ে লিমি বলল, 'বুঝেছি।'

সন্ধ্যা বলল, 'সব দিকে নজর রাখবি। দিদিমণির যেন কোনও অসুবিধা না হয়।'

লিমি বলল, 'অসুবিধা হলে আমি এলাম কেন? তুমি কিছু ভেবো না বউদি।'

ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে লাকড়া জানালো, সোচতে হবে না; তার লেড়কি দশটা আঁখ দিয়ে চারিদিকে নজর রাখে আর বিশ হাতে কাজ করে। মেমসাহেব আরামেই থাকবেন।

কাজকর্ম সম্পর্কে লিমিকে আরও কিছু দরকারি কথা বলে সন্ধ্যা অতসীর দিকে তাকাল, 'আমরা এখন যাই দিদি। লিমি তো সবে এল; ও একটু গুছিয়ে টুছিয়ে নিক। আমি ডরোথিকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

সন্ধ্যারা চলে গেল। লিমি ভেতরে ঢুকে বলল, 'আগে আমাকে তোমার কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দাও দিদিমণি।'

বাংলাটা জলের মতো বলছে লিমি। অবাক হতে-হতে অতসীর মনে পড়ল, কাল সন্ধ্যারা বলছিল, জামশেদপুরে বাঙালিদের বাড়ি থেকে-থেকে বাংলা ভাষাটা চমৎকার শিখে গেছে লিমি। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তাকে কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিল অতসী।

লিমি জিগ্যেস করল, 'আমি কোন ঘরটায় থাকব?'

অতসী বলল, 'বসবার ঘরের পাশের ঘরটা আমি নিয়েছি। ওটা ছাড়া আরও তিনটে ঘর আছে। তোর যেটা ইচ্ছা নিতে পারিস।'

কিচেনের পাশের ঘরটা দেখিয়ে লিমি বলল, 'তা হলে আমি ওটাই নিলাম। তুমি বসবার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।'

অতসী সোজা বসবার ঘরে গেল না। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

বিনয় কালই বলেছিল অফিসেরই একটা লোক ভোরবেলা পেছনের কুয়ো থেকে জল তুলে বাথরুমের চৌবাচ্চা আর বালতিগুলো ভরতি করে যাবে। তার কাজ হল এখানকার স্টাফেদের কোয়ার্টারে-কোয়ার্টারে সকালে কুয়ো থেকে জল তুলে দেওয়া আর বিকেলে সিকি কিলোমিটার দূরের একটা টিউবওয়েল থেকে সবার জন্য খাবার জল নিয়ে আসা।

অতসী দেখল, চৌবাচ্চা টৌবাচ্চা কানায়-কানায় ভরতি। বোঝা গেল, সে যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন লোকটা জল দিয়ে গেছে।

মুখটুখ ধুয়ে অতসী বসবার ঘরে আসতে না আসতেই ডরোথি দুজনের মতো চা আর পরোটা

দিয়ে গেল। বোঝা গেল, সন্ধ্যা লিমির জন্যও পাঠিয়েছে।

লিমিও ততক্ষণে শাড়ি-টাড়ি বদলে এসে পড়েছে। খেতে-খেতে দুজনের কথা হতে লাগল।

লিমি বলল, 'তোমার ঘরটর ভালো করে আরেকবার দেখলাম। চাল-ডাল লকড়ি উনুন কিছুই তো নেই গো দিদিমণি।'

অতসী বলল, 'থাকবে কী করে। আমি তো সবে কাল সন্ধেবেলায় এখানে এলাম! রাত্তিরে বিনয়বাবুরা খাওয়ালেন।' একটু থেমে বলল, 'এখানকার বাজার-টাজার কিছুই চিনি না; কোথায় কী পাওয়া যায় তাও জানি না।'

'জানার দরকার নেই। তুমি আমাকে টাকা-পয়সা দাও; সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।'

'কত দেব?'

'পঞ্চাশ-ষাট টাকা দাও।'

অতসী তার শোবার ঘরে গিয়ে সুটকেস থেকে টাকা বার করে এনে লিমিকে দিল।

লিমি জিগ্যেস করল, 'তোমার অফিস ক'টা থেকে?'

'মনে হয় সাড়ে দশটা থেকে।'

'তুমি কি খেয়ে অফিসে যাবে, না দুপুরে একসময় এসে খেয়ে যাবে?'

খুব বেলা করে খাওয়ার অভ্যাস নেই অতসীর। ইউনিভার্সিটি বা কলেজে পড়ার সময় রোজ নির্দিষ্ট একটা সময়ে তার ক্লাস থাকত না। কোনওদিন এগারোটায়, কোনওদিন বারোটা, কোনওদিন বা একটা থেকে শুরু হত। কিন্তু দশটার ভেতর খেয়ে নিত অতসী। সে বলল, 'খেয়েই অফিসে যাব।'

লিমি বলল, 'তা হলে আজকের দিনটা তোমার একটু কষ্ট হবে দিদিমণি। আজ তোমাকে কিন্তু না খেয়েই অফিসে যেতে হবে। দুপুরের আগে ভাত দিতে পারব না। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা। একদিনে আর কী কষ্ট হবে!'

লিমি টাকা নিয়ে কেনাকাটা করতে চলে গেল। অতসী ড্রইংরুমের চেয়ারে বসে বাইরে তাকাল।

সূর্যটা আরেকটু ওপরে উঠে এসেছে। রোদের রং এখন বদলাতে শুরু করেছে। আকাশের বর্ডার ঘেঁষে কিছুক্ষণ আগেও যে কুয়াশার সাদা একটা ঘের ছিল সেটা আর নেই। এখন পাহাড়ের ঢালে, চড়াই-উতরাইতে আরও কিছু আদিবাসী দেখা যাচ্ছে।

প্রায়-নির্জন পাহাড় বনভূমি এবং উপত্যকার দিকে তাকিয়ে প্রবালের গলার স্বরটা মনে পড়ে গেল অতসীর। ঘুম থেকে ওঠার পর এতটা সময় সে তার কথা যে ভাবেনি তা নয়। কিন্তু সন্ধ্যারা এসে পড়ায় ভাবনাটা খুব স্পষ্ট ছিল না। স্মৃতির ভেতর কোথাও সেটা আবছাভাবে থেকে গিয়েছিল। এখন কণ্ঠস্বরটা কানের কাছে অনবরত বাজতে লাগল।

প্রবালের গলা শুনতে-শুনতে হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ল অতসীর। কাল সন্ধ্যাদের কোয়ার্টারে লণ্ঠনের আবছা আলোয় তাকে দেখে প্রথমটা চমকে উঠেছিল প্রবাল। পরে অবশ্য খুব সহজ ভাবেই সে কথা বলেছে। কিন্তু প্রথমে সেই চমকানোর কারণটা কী?

অতসী একবার ভাবল, মেসোমশাইকে চিঠি লিখে প্রবালের কথাটা জানিয়ে দেবে কিনা। পরক্ষণেই ভাবল, কিছু দিন দেখা যাক। তারপর চিঠিটা লেখা যাবে।

প্রবাল কাল বলেছিল, শিগগিরই তাদের দেখা হবে; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতসীকে সে ওদের মিশনের কাজকর্ম দেখিয়ে দেবে।

অতসী ঠিক করে ফেলল, দু-একদিনের ভেতর প্রবালের সঙ্গে দেখা না হলে সে নিজেই

স্কট এভাঙ্গেলিস্টদের মিশনে চলে যাবে।

দশটা পর্যন্ত দূরমনস্কর মতো বসে রইল অতসী। তারপর স্নান টান করে বাইরের দরজায় শেকল তুলে অফিসে চলে গেল।

সাত

অতসীর কোয়ার্টার থেকে মাত্র শ-দুয়েক গজ দূরে উঁচু টিলার মাথায় ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের অফিস। ধাতুরিয়াকে ঘিরে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা আদিবাসী গ্রাম এই অফিসটার আওতায় পড়ে।

ছিমছাম একতলা অফিস বাড়িটা খুব একটা বড় নয়। টিলার মাথায় বলে এখান থেকে চারপাশের অনেকটা দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। যেদিকে তাকানো যাক, সেই একই দৃশ্য—পাহাড়, টিলা, চড়াই-উতরাই, শালবন, দেওদারবন, অর্জুন আর সিসম গাছের অফুরন্ত জঙ্গল এবং এ-সবের ভেতরে বেশ কিছু নানা বয়সের আদিবাসী পুরুষ এবং মেয়ে।

বিনয়, রাকেশ এবং ক্লাস ফোর স্টাফের দশ-বারোজন এমপ্লয়ী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এদের ভেতর লিমির বাপ লাকড়াকেও দেখা গেল। বিনয় বলল, 'আসুন আসুন। আগে অফিসটা দেখুন। তারপর আপনার ঘরে যাবেন।'

প্রায় শোভাযাত্রা করে বিনয়রা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অফিসটা দেখাল অতসীকে। ব্যাপারটা তার কাছে খুব মজার লাগছিল! সে যে এতবড় একজন ভি-আই-পি আগে বুঝতে পারেনি। মনে-মনে অতসী হেসে ফেলল।

সবসুদ্ধু যেমন হয় এখানেও সেই একই চেহারা। সবগুলো ঘরই চেয়ার, টেবিল, আলমারি, র‍্যাক ইত্যাদি দিয়ে ঠাসা। অফিসের সব চাইতে বড় ঘরটা অতসীর; একটা ঘর বিনয় আর টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্ক রাকেশের! বাকি দুটো ঘরে অন্য স্টাফরা বসে। এ ছাড়া অবশ্য টালির শেডের একটা লম্বা গ্যারাজও রয়েছে।

অফিস দেখানো হলে বিনয়রা অতসীকে তার নিজের ঘরে পৌঁছে দিল। রাকেশ আর লাকড়ার সঙ্গে আগেই তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বিনয়। অন্যদের সঙ্গে এবারে পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের নাম হল ডুংডুং, কচ্ছপ, ধানুক, স্টিফেন ইত্যাদি। জানা গেল তারা এই ধাতুরিয়ার চারপাশের মানুষ। নিজের-নিজের দেহাত থেকে হেঁটে এখানে কাজে আসে।

পরিচয়ের পর অতসী বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগল। এখন থেকে তোমাদের মধ্যে থাকব। সব কাজে তোমাদের সাহায্য চাই।'

ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে স্টাফের লোকেরা জানালো, অতসীকে মাথার ওপর পেয়ে তারাও খুব খুশি। মেমসাহেব যখন যা হুকুম করবেন তক্ষুনি তারা সেটা করে দেবে।

অতসী বিব্রতমুখে বলল, 'আমাকে মেমসাহেব বোলো না, দিদি বলবে।'

লোকগুলো একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল। বিগলিত হয়ে মাথা নেড়ে সবাই একসঙ্গে বলল, 'জি দিদিজি—'

বিনয় ওদের বলল, 'এবার তোমরা যাও। দিদিজিকে কাজ করতে দাও।'

ঘর ফাঁকা করে সবাই চলে গেল। বিনয় আর রাকেশও যাচ্ছিল, তাদের ডেকে বসতে বলল অতসী। ওরা বসলে জিগ্যেস করল, 'এই ক'জনই আমাদের স্টাফ?'

বিনয় বলল, আরও কয়েকজন আছে।'

'তাদের তো দেখলাম না!'

'ওরা সব ফিল্ডে রয়েছে।'

অতসী বলল, 'দেখুন, জীবনে এই প্রথম চাকরিতে এসেছি। প্র্যাকটিক্যাল কোনওরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমাকে এখানকার কাজকর্মের প্যাটার্নটা একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়।'

বিনয় বলল, 'খুব সোজা কাজ, একদিন দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। তবু একটা আইডিয়া দিচ্ছি!'

এরপর বিনয় যা জানালো তা এইরকম। আদিবাসীদের মধ্যে এডুকেশনের ব্যবস্থার জন্য ওয়েলফেয়ার অফিস গোটাকয়েক প্রাইমারি স্কুল বসিয়েছে। তবে আরও স্কুল বসানো দরকার। ওখানে যারা পড়ায় তারা স্কুলের মধ্যেই থাকে। তা ছাড়া ছোটখাটো একটা মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট আছে। একজন ডাক্তার, একজন কমপাউন্ডার আর একজন ড্রইভার নিয়ে গ্রামে-গ্রামে তারা ঘুরে বেড়ায়। চারদিন-পাঁচদিন বাদে-বাদে একবার করে এই অফিসে আসে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি বাদেও চাষবাসের ব্যাপারে ওদের সার এবং দরকারমতো কিছু টাকাপয়সাও দেওয়া হয়। গ্রামে-গ্রামে কোথায় রাস্তাঘাটের দরকার, তাও ওয়েলফেয়ার অফিস তার মিনিস্ট্রিকে জানায়। মিনিস্ট্রি নোট দিয়ে সেই রিপোর্ট পাঠায় পাবলিক ওয়ার্কস মিনিস্ট্রিতে। ওরা সেই রিপোর্টের বেসিসে এখানে অনেক রাস্তা-টাস্তা বানিয়েছে।

অতসী বলল, 'ঘুরে-ঘুরে সব দেখতে হবে। নিজের চোখে না দেখলে পরিষ্কার আইডিয়া হয় না।'

বিনয় বলল, 'দেখতে তো হবেই। সবে এলেন। দু-একদিন রেস্ট নিয়ে নিন।'

আরও কিছুক্ষণ অফিসের ব্যাপারে কথা-টথা বলে একসময় বিনয় রাকেশ তাদের ঘরে চলে গেল। গেল ঠিকই, তবে আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরপর নোটটোট সই করাতে নিয়ে এল।

চাকরিতে আজই অতসীর প্রথম দিন। সব ব্যাপারেই এখন সে নার্ভাস। একদিনেই কি আর কারও আত্মবিশ্বাস জন্মায়? নোটগুলো একবারের জায়গায় দুবার করে পড়ল সে; বিনয়কে জিগ্যেস করে করে ওগুলো সম্পর্কে ভালো করে জেনে নিয়ে তবে সই-টই করল।

দুপুর একটা নাগাদ লিমি ডাকতে এল। তার রান্না-বান্না কমপ্লিট।

তিন চার ঘণ্টা সময়ের ভেতরে কখন লিমি বাজার করল, কখন ফিরে এসে রাঁধল, সেটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার।

লিমির সঙ্গে কোয়ার্টারে ফিরে অতসী অবাক হয়ে গেল। মেয়েটা সত্যি ম্যাজিক জানে। ঘরদোর এ-বেলা একেবারে ফিটফাট। শুধু তাই নয়। পরিপাটি করে তিন চার রকমের রান্নাও করে রেখেছে সে। পুরোপুরি বাঙালি রান্না। শুক্তো, আলুভাজা, নারকেল দিয়ে মুগের ডাল, কই মাছের ঝাল আর পুদিনার চাটনি।

চমৎকার রান্না। খেতে-খেতে অতসী বলল, 'তোর বাবা মিথ্যে বলেনি, সত্যি-সত্যি তোর বিশটা হাত রে।'

লিমি হাসল, 'আমার রান্না কী রকম লাগল, বলো।'

'ফার্স্ট ক্লাস। ফাইভ-স্টার হোটেলের বাবুর্চিরা তোর কাছে পাঁচ বছর অ্যাপ্রেন্টিস থাকতে পারে। রান্নায় নোবেল প্রাইজ হলে তুই সেটা নির্ঘাত পেয়ে যাবি।'

চোখে-মুখে হাসল লিমি; তৃপ্তি এবং খুশির উজ্জ্বল হাসি। বলল, 'টাটানগরে যে-বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার বাবুর বাড়ি থাকতাম তাঁরা আমাকে বলত—অন্নপূর্ণা।'

অতসী বলল, 'ও বাবা, তুই অন্নপূর্ণাও জানিস।'

'জানব না? আট বছর বয়েস থেকে বাঙালিদের বাড়ি-বাড়ি তা হলে ঘুরছি কেন?' বলে

একটু থামল লিমি।

তারপর আবার শুরু করল, 'আমি শুধু বাঙালি রান্নাই না, পাঞ্জাবি মাদ্রাজি চাইনিজ, অনেক রকম রান্না শিখেছি। একেক দিন তোমাকে একেকটা রেঁধে খাওয়াব।'

'খাওয়াস। আমি বাবা রাঁধতে-টাঁধতে পারি না। ভীষণ ভয় ছিল এখানে এসে কী খাব না খাব। তোকে পেয়ে বেঁচে গেলাম।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার অফিসে চলে এল অতসী। এ বেলা আর নোট-টোট নিয়ে হানা দিল না বিনয়। একা ঘরে বসে জানলার বাইরে পাহাড় উপত্যকা, আকাশ পাখি শালবন-টালবন দেখতে-দেখতে প্রবালের সেই কণ্ঠস্বরটা কানে ভেসে আসতে লাগল।

তিনটে সাড়ে-তিনটে পর্যন্ত বসে থাকার পর হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল অতসীর। নিশির ডাকের মতো দুর্বোধ্য কিছু একটা তাকে দূর পাহাড়ের দিকে যেন টানতে লাগল। দ্রুত উঠে সে বিনয়দের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনয়রা তাকে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে গেছে। ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু বলবেন?'

অতসী বলল, 'ভাবছি আজই চারপাশের গ্রামগুলো দেখতে যাব। শুধু-শুধু বসে থাকতে ভালো লাগছে না।'

'বেশ তো, চলুন আমি সঙ্গে যাচ্ছি।'

'না, আপনি অফিসে থাকুন। একজন রেসপনসিবল অফিসারের এখানে থাকা দরকার।' অতসীর ইচ্ছা একা-একাই সে এখন ঘুরবে। কেউ সঙ্গে যাক, এটা তার আদৌ কাম্য নয়।

'আপন যা বলছেন তা-ই হবে। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানকার রাস্তা-টাস্তা সবই তো আপনার অচেনা।'

অতসী বলল, 'রাস্তা চেনে এরকম একজন ড্রাইভার আর একটা গাড়ি পাওয়া যাবে?'

বিনয় বলল, 'আপনি বেরুবেন, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে?' তবে এমনি কোনও কমফোর্টেবল গাড়ি নেই; জিপ আছে।'

'ওতেই হবে।'

'লাকড়াকে ডেকে দিচ্ছি। ও খুব ভালো ড্রাইভার—'

'তাই ডাকুন।'

লাকড়াকে ডেকে বিনয় বলে দিল, 'দিদিজিকে চারপাশের ক'টা দেহাত দেখিয়ে নিয়ে আয়। আমাদের স্কুলগুলোও দেখাস। আর বেশি জোরে জিপ চালাবি না। বুঝলি?'

লাকড়া ঘাড় কাত করে বলল, 'জি—' তারপর শেডের তলা থেকে জিপ বার করে আনতে গেল।

বিনয় এবার অতসীকে বলল, 'সন্ধের পর আর ঘোরাঘুরি করবেন না। অন্ধকার হলেই এখানে ভাল্লুক আর চিতা-টিতা বেরোয়।'

অতসী বলল, 'আচ্ছা। আপনি লিমিকে একটু খবর দিয়ে দেবেন, আমাব ফিরতে দেরি হবে।'

'ঠিক আছে।'

একটু পরে দেখা গেল, জিপে করে অতসী বেরিয়ে পড়েছে। ফ্রন্ট সিটে লাকড়ার পাশের সিটটায় বসেছে সে।

এখানে পাহাড়ের পর পাহাড়, টিলার পর টিলা। তবে ওগুলো খুব উঁচু নয়। দুই টিলা

বা দুই পাহাড়ের মাঝখানে কোথাও অনেকটা করে সমতল জমি বা শাল মহুয়ার জঙ্গল। পাহাড়, টিলা বা বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা গেছে। রাস্তার চেহারা মোটামুটি খারাপ না; তবে সব জায়গায় পিচ নেই।

এক মাইল দেড় মাইল যেতে-না-যেতেই আদিবাসীদের গাঁ পড়ছে। গাঁ আর কি, মাটি বা কাঠের খানকয়েক করে এলোমেলো ঘর।

জিপের আওয়াজ পেয়েই গাঁ-গুলো থেকে কাচ্চা-বাচ্চা, খুনখুনে বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী এবং তাদের সঙ্গে গাদা-গাদা কুকুর আর শুয়োর ছানা বেরিয়ে আসছে। এরা সবাই কাল পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে অতসীকে দেখার জন্যে ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আজই যে অতসী তাদের গাঁয়ে চলে আসবে, এটা ভাবতে পারেনি। তাকে দেখে খুশিতে ওদের সরল নিষ্পাপ মুখ আলো হয়ে ওঠে। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলে, 'হোই মেমসাহেব, আমাদের ঘরে আয়—'

অতসী জিপ থামায় বটে, তবে নামে না। সিটে বসেই হাসি মুখে বলে, 'আজ যাব না, শিগগিরই আবার আসছি। তখন তোমাদের গাঁয়ে সারাদিন থাকব।' কথা বলতে-বলতে কোনও বাচ্চার গাল টিপে দেয়, কোনও যুবতীর চুলের ফুল ঠিক করে বসায়, কোনও বুড়োর কোঁচকানো মুখে হাত বুলোয়।

কেউ হয়তো বলে, 'তুই এলে আমাদের খুব আনন্দ হত।'

অতসী বলে, 'এখন থেকে তো তোমাদের কাছেই থাকব। দেখবে রোজ চলে আসছি।'

ঘুরতে-ঘুরতে অতসীর চোখে পড়ল, ধাতুরিয়ার ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিস প্রতি দুটো গ্রামের জন্যে একটা করে প্রাইমারি স্কুল বসিয়েছে। এইরকম দুটো স্কুলের টিচারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। রামনিবাস চৌবে আর সুরেশ ভার্মা। দু-জনেরই বয়স কুড়ির কাছাকাছি। রামনিবাস ইন্টারমিডিয়েট পাশ, সুরেশ গ্র্যাজুয়েট।

আলাপটা করিয়ে দিয়েছে লাকড়া। চিফ ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারকে সামনে দেখে তারা সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে প্রায় এক পায়ে খাড়া হয়ে রইল যেন। কথায়-কথায় জানা গেল, পাশ করার পর কোথাও চাকরি-টাকরি না পেয়ে তারা অনেক দূরে ছোটনাগপুরের এই সব গাঁয়ে চলে এসেছে। তবে ওরাওঁ মুন্ডাদের সঙ্গে থাকতে তাদের ভালোই লাগে। রামনিবাস শুধু বলল, 'এখানে যদি একটা সিনেমা হল থাকত, তা হলে এই সব জায়গা একেবারে স্বরগ্।' আর মা-বাবা ভাইবোনদের ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে বলে মাঝে-মাঝে সুরেশের ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। যাই হোক, ছেলে দুটোকে মোটামুটি ভালোই লাগল অতসীর।

শুধু সুরেশ আর রামনিবাসের সঙ্গেই না, জিপে করে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যেতে-যেতে তাদের মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যানটা দেখতে পেল অতসী। লাকড়াই ভ্যানটা থামিয়ে ইউনিটের ডাক্তার সহায়ের সঙ্গে অতসীর আলাপ করিয়ে দিল।

ডাক্তার সহায় প্রথম আলাপেই অবাক করে দিলেন। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের চেহারাটা বেঢপ। কোমরে কোনও রকম খাঁজ নেই। গলার পর থেকে শরীরটা মোটা একটা পাইপের মতো নীচের দিকে নেমে গেছে। গলা বলতে কিছু নেই; ঘাড়ের ওপর থেকে মুণ্ডুটা বসানো। মাথার মাঝখানে চকচকে টাক; চারপাশে কাঁচা-পাকা চুলের বর্ডার লাইন। বড়-বড় গোল চোখ, টিবির মতো নাক, নাকের তলায় চৌকো গোঁফ এবং সারা গায়ে অঢেল চর্বি। পরনে গ্যালিস দেওয়া ঢলঢলে ফুল প্যান্ট, ডবল কাফ দেওয়া ফুল শার্ট, পায়ে ধ্যাবড়া বুট, বুক পকেটে রুপোর চেনে বাঁধা পুরনো আমলের ওয়েস্ট এন্ড ওয়াচ কোম্পানির ঢাউস গোল ঘড়ি, মাথায় হ্যাট।

ডাক্তার সহায় বললেন, 'নমস্তে ম্যাডাম। আপনি কাল এসেছেন, সে-খবর আগেই পেয়েছি।

আমার 'বস' আপনি, দৌড়ে গিয়ে স্যালুট করে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তখন আমি একটা মুন্ডা মেয়েছেলেকে ডেলিভারি করাচ্ছি। স্যালুট করার চাইতে ডেলিভারি আমার কাছে অনেক ইমপর্টান্ট মনে হয়েছিল।' দম নিয়ে ফের বললেন, 'আমি ম্যাডাম আগেই বলে রাখছি, 'বস' হয়েছেন বলে আপনার চামচেগিরি করতে পারব না।'

কান লাল হয়ে উঠেছিল অতসীর। সে ব্যস্তভাবে বলল, 'এ আপনি কী বলছেন ডাক্তার সহায়।'

'বসেরা ফ্ল্যাটারি চায় কিনা, তাই বললাম।'

মুখ নীচু করে অতসী বলল, 'আমার ওসব দরকার নেই। আপনি আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়। আপনাকেই আমি শ্রদ্ধা করতে চাই।'

ডাক্তার সহায় বললেন, 'আপনি গ্রেট ম্যাডাম। যাক, আমার হাতে এখন সময় নেই। এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে তালডি তালুকে গিয়ে এক বুড়োর কুঁচকির ফোঁড়া কাটতে হবে। তবু নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে আপনার মনে কিছু কিউরিওসিটির উদয় হয়েছে। খুব শর্টে নিজের লাইফ-স্কেচ শুনিয়ে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।'

ডাক্তার যা বলল তা এইরকম। দুনিয়ায় তার কেউ নেই। দূরসম্পর্কের ভাইবোন বা চাচা জেঠা থাকলেও সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পাটনায় থাকতেন। পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করেননি। শুধু চুটিয়ে প্র্যাকটিশ করেছেন; দশ হাতে পয়সা কামিয়েছেন। অপারেশন, প্রেসক্রিপশন, ওষুধ, রোগী এই সব নিয়েই ছিল তাঁর ওয়ার্ল্ড। দিব্যি ছিলেন, হঠাৎ কী মতিভ্রম হল, দুম করে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট একটি মেয়েকে টাকার জোরে বিয়ে করে ফেললেন। আচমকা কিছু পেয়ে যাওয়া আর সেটাকে পজেশানে রাখা এক ব্যাপার নয়। একদিন তাঁর পঁচিশ বছরের সুন্দরী তরুণী ধরমপত্নী এক ছোকরা লেকচারারের সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল। টাকাপয়সা অঢেল থাকলে কী হবে, যার বউ পালায় সোসাইটিতে তার কোনও মর্যাদা থাকে না। সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গেল! রাস্তায় বেরুলেই লোকে ঠোঁট টিপে হাসাহাসি করত, তাঁকে দেখিয়ে গুজগুজ করে কী সব বলত। প্রায় রোজই টিটকিরি দিয়ে বেনামা চিঠি আসত। প্রতিটি চিঠিতেই তাঁর পুরুষত্ব অর্থাৎ শারীরিক ক্ষমতা সম্পর্কে যাচ্ছেতাই সন্দেহ ফুটে থাকত। তিনি ইমপোটেন্ট, নপুংসক, হিজড়ে। সুতরাং মনের অবস্থা কী হতে পারে তা নিশ্চয়ই ম্যাডাম অনুমান করতে পারছেন। যুবতী ভার্যাকে পাবার আক্কেলসেলামি হিসেবে একদিন সব টাকা-পয়সা আর বাড়ি-টাড়ি একটা অনাথ আশ্রমে দিয়ে তিনি ট্রাইব্যাল ওয়েফেয়ারে চলে এসেছেন। আদিবাসীদের গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে চমৎকার আছেন। বউ পালাবার জরিমানাস্বরূপ এখানে তার গায়ে কেউ থুতু দেয় না।

ঝড়ের বেগে নিজের লাইফ হিস্ট্রি শেষ করে ডাক্তার সহায় বললেন, 'ওয়েলফেয়ার অফিসের সব শালে হারামজাদা আমার কথা জানে। নতুন কাউকে পেলে প্রথমে এটা শুনিয়ে তবে তাদের অন্য কাজ। কোনও বানচোত হাঁ করার আগেই আমি বলে দিলুম। ওরা এখন মুখে আঙুল পুরে বসে থাক। আচ্ছা চলি, ফির মিলেঙ্গে।'

ভ্যান নিয়ে ডাক্তার সহায় সামনের উতরাইয়ের দিকে নেমে গেলেন। তারপরও অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল অতসী। এরকম লোক আগে আর কখনও দেখেনি সে। তাঁর মুখে কিছুই আটকায় না। বউ পালানো থেকে কুঁচকির ফোঁড়া কাটা, এবং নানা জাতের বাছাবাছা গালাগাল—সমস্ত কিছুই তাঁর মুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে এসেছে। শুনতে-শুনতে অতসীর নাক-মুখ ঝাঁঝাঁ করছিল। তবু লোকটাকে খুব খারাপ লাগল না।'

লাকড়া বলল, 'চলিয়ে দিদিজি—'

অন্যমনস্কর মতো আবার জিপে উঠে পড়ল অতসী।

আরও খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর হঠাৎ অতসীর চোখে পড়ল অনেক দূরে একটা উঁচু টিলার মাথায় একটা গির্জার চূড়া আকাশের দিকে উঠে গেছে। চূড়াটার মাথায় একটা সাদা ধবধবে প্রকাণ্ড ক্রুশ। অতসী জিগ্যেস করল, 'ওটা কীসের গির্জা?'

লাকড়া জানালো, 'ওখানে স্কটিশ এভাঞ্জেলিস্টদের মিশন রয়েছে। গির্জাটা মিশনের।'

আচমকা অতসীর মনে পড়ে গেল, প্রবাল স্কটদের মিশনে কাজ করে। সে জিগ্যেস করল, 'গির্জাটা এখান থেকে কতদূরে?'

'চার-পাঁচ কিলোমিটার হবে।'

'কতক্ষণ লাগবে ওখানে যেতে?'

'মিনিট পন্দর ষোল। লেকেন—'

'কী?'

'আজই ওখানে যাবে দিদিজি?'

কেন যে দুর্বোধ্য নিশির ডাকের মতো কিছু একটার টানে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, অতসী জানত না। ভেতরে-ভেতরে ওই মিশনটায় যাবার জন্যই যে সে উদগ্রীব হয়ে ছিল এতক্ষণ তা টের পাওয়া যায়নি। মনের কয়েক স্তর তলায় সেই সঙ্গোপন ইচ্ছাটা এই মুহূর্তে তার কাছে যেন পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রবালের কথা ভাবতে-ভাবতে দূরমনস্কর মতো সে বলল, 'হ্যাঁ, আজই যাব।'

সূর্যটা আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটনাগপুর রেঞ্জের ওধারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। রোদ দ্রুত নির্জীব, ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে এখন তাপ নেই; শীতল সুখদায়ক হাওয়া ছোটনাগপুরের পাহাড় মাঠ এবং উপত্যকার ওপর দিয়ে ঝিরঝির স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। লাকড়া চারিদিক দেখে নিয়ে বলল, 'দিদিজি, পন্দ্র বিশ মিনটের (মিনিটের) মধ্যে সাম উতার যায়েগা। এখন ওখানে গেলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

'হোক, আমাকে ওখানে যেতেই হবে।'

লাকড়া আর কিছু বলল না। জিপের মুখ ঘুরিয়ে মিশনের দিকে চলতে লাগল।

আট

উঁচু টিলার মাথায় প্রায় এক স্কোয়ার মাইল জুড়ে স্কটিশ এভাঞ্জেলিস্টদের বিরাট মিশন। তার একদিকে প্রকান্ড চার্চ, আরেক দিকে ছবির মতো সুন্দর-সুন্দর অগুনতি টালির বাড়ি। ওখানে ফাদাররা এবং মিশনের অন্যান্য কর্মীরা থাকে। আরেক দিকে লম্বা আরেকটা বাড়িতে প্রাইমারি এবং হাইস্কুল, ছেলেদের হোস্টেল, স্কুল আর হোস্টেলের পেছনে বেশ বড় হাসপাতাল। হাসপাতাল বিল্ডিংয়ের গায়েই ডাক্তার নার্স এবং অন্য স্টাফদের কোয়ার্টার। তার পাশে হ্যান্ডিক্র্যাফটের অনেকগুলো ইউনিট। স্কুল আর চার্চের মাঝখানে বিশাল ফাঁকা জায়গায় তিন-চারটে ফুটবল আর হকির মাঠ, দৌড়ের জন্যে ট্র্যাক, ভলিবল আর ব্যাডমিন্টনের কোর্ট, হাই জাম্পের পোস্ট, লংজাম্পের জন্যে বালি ভর্তি জায়গা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

লাকড়া ঠিক পনের মিনিটের মধ্যেই মিশন কম্পাউন্ডের ভেতর এনে জিপটা ঢুকিয়ে দিল। এখানকার সব ফাদার এবং অন্য স্টাফকে সে চেনে।

মাঠে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা খেলছিল। ওরা এখানকার হোস্টেলে থেকে পড়ে। সব খরচ

মিশনের। মাঠের পাশে বসে মিশনের চার-পাঁচজন ফাদার তাদের খেলা দেখছিলেন।

জিপের শব্দে ছেলেমেয়েরা একবার মুখ তুলে দেখল। তারপর আবার খেলতে লাগল। ফাদাররাও তাদের দেখছেন। একজন মধ্যবয়সি ফাদার উঠে জিপটার দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য ফাদাররাও আসতে লাগলেন।

ততক্ষণে লাকড়া এবং অতসী গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। মধ্যবয়সি ফাদারটি কাছে আসতেই লাকড়া অতসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। তাঁর নাম ফাদার বোথাম। সাড়ে ছ'ফুটের মতো হাইট। টান-টান চেহারার এই ফাদারটি মিশনের সর্বেসর্বা; তাঁরই নির্দেশ এবং পরামর্শে এখানকার সব কিছু চলছে। লোকে তাঁকে বলে বড় ফাদার।

অতসী বলল, 'আপনাদের মিশন দেখতে এলাম।'

ফাদার বোথাম বললেন, 'মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি যে গভর্নমেন্টের ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের চার্জ নিয়ে এখানে এসেছেন, সে খবর পেয়েছি। দয়া করে আমাদের মিশনে এসেছেন, সে জন্যে ধন্যবাদ।'

অতসী জিগ্যেস করল, 'আমার আসার খবর কে দিল?'

'আমাদের এখানে প্রবাল বলে একটি ছেলে কাজ করে। তার কাছেই শুনেছি।'

প্রবালের খোঁজেই যে এই মিশনে তার আসা সেটা আর বলা গেল না। অতসী শুধু বলল, 'ওঁর সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল।'

অন্য ফাদাররা ততক্ষণে কাছে এসে পড়ছেন। ফাদার বোথাম তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওঁরা হলেন ফাদার স্মিথ, ফাদার অ্যালেন, ফাদার ম্যাকমিলান ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলাপ পরিচয়ের পর ফাদার বোথাম বললেন, 'আজই মিশন দেখবেন?'

'অসুবিধা আছে?'

'একেবারেই না। তবে সন্ধে হয়ে আসছে কিনা। আমাদের বিরাট কমপাউন্ড। সবটা একদিনে কি দেখা হয়ে উঠবে?'

মনে-মনে অতসী ভেবে নিল, এই মুহূর্তে মিশন দেখাটা খুব জরুরি না। তবে চারিদিকে ঘুরতে-ঘুরতে প্রবালের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে। সেটা খুবই দরকার। অতসী বলল, 'যতটা দেখা যায়। মানে আপনাদের কাজ আর আমাদের কাজ অনেকটা একরকম। আমি নতুন চাকরি নিয়ে এসেছি। আপনাদের ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটি দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারব।'

'তা হলে চলুন। খানিকটা দেখার পর গল্প-টল্প করা যাবে।'

অতসীকে নিয়ে প্রথমে স্কুল আর হোস্টেল বাড়িগুলোতে গেলেন ফাদার বোথাম। অন্য ফাদাররাও সঙ্গে-সঙ্গে গেলেন। স্কুলের পর হাসপাতাল।

এ-অঞ্চলে আদিবাসীদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের জন্যে মিশন কী ধরনের কাজ করে যাচ্ছে সব দেখাতে-দেখাতে ফাদার বোথাম তা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর কথা বিশেষ কিছুই মাথায় ঢুকছিল না অতসীর। সে শুধু প্রবালের কথাই ভাবছিল।

ঘণ্টাখানেক দেখার পর ফাদার বোথাম বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক। প্রথম দিন এলেন; ইউ আর আওয়ার অনার্ড গেস্ট, এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়ানো হয়নি।'

এদিকে সূর্য ডুবে গেছে। ঝপ করে অন্ধকার নেমে এসেছে। আর হাঁটতে ভালো লাগছিল না অতসীর। সে বলল, 'ঠিক আছে। আরেক দিন এসে বাকিটা দেখা যাবে।'

'নিশ্চয়ই।'

মাঠের দক্ষিণ দিকে যে-ছবির মতো ছোট-ছোট টালির বাংলোগুলো রয়েছে, ফাদার বোথাম তার একটাতে অতসীকে নিয়ে গেলেন। অন্য ফাদাররা অবশ্য এবার আর অতসীদের সঙ্গ দিলেন

না। ফাদার বোথাম বললেন, 'এই বাড়িটায় আমি থাকি।'

ধাতুরিয়া তহশিলের তিরিশ-চল্লিশ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকার ভেতর ইলেকট্রিসিটি নেই। কিন্তু এই মিশনটা জেনারেটর আনিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে আলো জ্বালাচ্ছে।

ফাদার বোথামের বাংলোয় কফি খেতে-খেতে এলোমেলো নানা কথার ফাঁকে হঠাৎ একসময় অতসী বলেই ফেলল, 'আচ্ছা, প্রবালবাবুকে তো দেখতে পেলাম না!'

ফাদার বোথাম বললেন, 'ও মিশনে বেশিক্ষণ থাকে না। গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে আদিবাসীদের ভেতর কাজ করে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'খুব ডেডিকেটেড ছেলে। অপ্রেসড্ ব্যাকওয়ার্ড পিপলের জন্যে এরকম সার্ভিস দিতে আমার জীবনে আর কাউকে দেখিনি।'

অতসীর মনে পড়ল, এন্টালি এলাকার গরিব ক্রিশ্চান আর মুসলমানদের বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরে সঞ্জয়ও তো একইরকম সোশ্যাল সারভিসই দিত। দুজনের আশ্চর্য মিল। সে বলল, 'কতদিন এই মিশনে আছেন প্রবালবাবু?' এ প্রশ্নের উত্তর তারা জানা আছে। কাল রাত্তিরে প্রবাল বা বিনয় কার মুখে শুনেছিল এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না। তবে ফাদার বোথামের কাছ থেকে ব্যাপারটা সে বোধহয় যাচাই করে নিতে চায়।

ফাদার বোথাম বললেন, 'সাড়ে তিন কি চার বছরের মতো।'

সময়টা অবশ্য মিলছে না। ঠিক পাঁচ বছর আগে রাজীব খুন হয়েছিল। তারপর থেকে সঞ্জয় উধাও।

অতসী আবার কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজার কাছ থেকে খুব চেনা একটা গলা শোনা গেল, 'আরে আপনি? কতক্ষণ?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে অতসী দেখল প্রবাল ঘরে ঢুকছে। স্থির চোখে তাকে দেখতে-দেখতে সে বলল, 'সেই বিকেলে এসেছি।'

ফাদার বোথাম বললেন, 'উই হ্যাড অ্যান একসেলেন্ট টাইম উইদ মিস চ্যাটার্জি। তুমি খুব মিস করলে।'

একটা মজাদার ভঙ্গি করে প্রবাল বলল, 'ব্যাড লাক।'

'তারপর আজ ক'টা গ্রাম ঘুরলে?'

'পাঁচটা। গ্রামগুলোতে ইঞ্জেকশান দেওয়া কমপ্লিট করেছি।'

'তোমার হারকিউলিয়ান ক্ষমতা।'

অতসী জিগ্যেস করল, 'কীসের ইঞ্জেকশান দেওয়া হচ্ছে?'

প্রবাল বলল, 'কলেরা—'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর প্রবাল বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে। কুয়াশাও পড়ছে। যদি ফিরতে চান এখনই স্টার্ট করা দরকার। অন্ধকারে কুয়াশায় পাহাড়ি রাস্তা খুবই ডেঞ্জরাস। তাছাড়া এ-সময়টায় ভাল্লুকের উৎপাত রয়েছে। অবশ্য আপনি যদি থাকতে চান, আমাদের এখানে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

ফাদার বোথামও বললেন, 'মোস্ট গ্ল্যাডলি।'

এরপর থাকার আর উপায় থাকে না। অতসী উঠে পড়ল, 'থ্যাংকস। আজ থাকা সম্ভব নয়। আচ্ছা চলি। গুড নাইট।'

'গুড নাইট। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' ফাদার বোথামও উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তাঁকে যেতে দিল না প্রবাল। অতসীকে নিয়ে খেলার মাঠের পাশে সেই জিপটার দিকে যেতে-যেতে সে বলল, 'আমার মনে হয়েছিল আজ আপনি আমাদের মিশনে আসবেন।'

অতসীর চমক লাগল, 'হঠাৎ মনে হল? আপনাকে তো কাল আমি বলিনি, আজ আসব!'

'তা অবশ্য বলেননি। এমনিই ওটা মনে হয়েছে। এর পেছনে কোনও মনস্তাত্ত্বিক রিজন আছে কিনা বলতে পারব না। আমি সাইকোলজি পড়িনি।' বলে প্রবাল হাসল।

আবছা কুয়াশার ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে ওরা মাঠ পেরিয়ে জিপের কাছাকাছি চলে এসেছিল। বাতাস এখন বেশ ঠান্ডা; রীতিমতো শীত-শীত লাগছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে যেন।

একটু চিন্তা করে অতসী বলল, 'আপনাদের মিশনটা আজ ভালো করে দেখা হল না। ফাদার বোথাম বলছিলেন আবার এখানে আসতে।' বলে ঝাপসা অন্ধকারে সতর্ক চোখে প্রবালের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল।

প্রবাল এক সেকেন্ডও না ভেবে বলল, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

অতসী বলল, 'কিন্তু এলে তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'হবে না কেন? আপনার কি ধারণা এখান থেকে আজই আমি চলে যাব?'

অতসী কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই প্রবাল ফের বলে উঠল, 'এই মিশন ছেড়ে পৃথিবীর কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই।'

অতসী বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলেনি। তবে প্রবাল হঠাৎ চলে যাওয়ার কথাটা ওঠাল কেন? একটু চুপ করে থেকে অতসী বলল, 'ফাদার বোথাম বলছিলেন আপনি সারাদিন মিশনে থাকেন না; গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ান। এলে দেখা হবে কী করে? এখান থেকে আমি আপনার চলে যাবার কথা তো 'মিন' করিনি।'

কয়েক সেকেন্ড থতিয়ে রইল প্রবাল। তারপর বলল, 'চলে যাবার কথাটা এমনিই বলেছি। সারাদিন গ্রামে থাকলেও সন্ধের আগে মিশনে ফিরে আসি। আজই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। আপনি যদি—'

'আমি কী?'

'দয়া করে সন্ধের আগে কখনও এখানে আসেন, নিশ্চয়ই দেখা হবে। অবশ্য—'

'কী?'

'আপনাদের ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আর আমাদের মিশনের কাজ প্রায় একই রকম। সিনসিয়ারলি আর সিরিয়াসলি যদি কাজ করেন আপনাকে গ্রামে-গ্রামে ঘুরতেই হবে। ঘোরার সময় আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আবার দেখা হয়ে যাবে।'

জিপে ড্রাইভারের সিটে লাকড়া বসে ছিল। অতসী তার পাশে গিয়ে বসতে-বসতে বলল, 'আজ চলি।'

প্রবাল বলল, 'আসুন।' বলেই হঠাৎ কি মনে হতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ওই দেখুন আপনি এলেন, অথচ আমার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল না।'

'তাতে কী, আরেকদিন যাওয়া যাবে। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

লাকড়া জিপে স্টার্ট দিল।

নয়

ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের যাবতীয় কাজকর্ম বুঝে নিতে পুরো পাঁচটা দিন লেগে গেল। এর ভেতর অফিস থেকে এক সেকেন্ডের জন্যও বেরুতে পারেনি অতসী। বাড়িতে বাবাকে আর পুলিশ অফিসার মেসোমশাইকে একখানা করে চিঠি লেখা ছাড়া আর কিছু করার সময় পায়নি সে। বাবাকে যে

চিঠিটা লিখেছে তাতে এখানে ভালোভাবে পৌঁছে অফিসে জয়েন করার খবরটুকুই শুধু দিয়েছে। মেসোমশাইকে প্রবালের কথা কিছু জানায়নি; শুধু রাজীবের হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিয়েছে। অতসী ঠিকই করে রেখেছে, সাত দিন পরপর মেসোমশাইকে একটা করে চিঠি লিখবে। সে চলে এসেছে বলে খুনের ইনভেস্টিগেশনটা কোনওভাবেই যাতে ঝিমিয়ে না পড়ে, সেটাই তার উদ্দেশ্য।

অবশ্য এই ক'দিন প্রবালের সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। বারবার অতসীর ইচ্ছা হয়েছে, একটু ফাঁক পেলেই স্কটিশ এভাঙ্গেলিস্টদের মিশনে যায় বা গ্রামে-গ্রামে ঘুরে প্রবালকে ধরে। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু বার করা যায়নি।

পাঁচ দিন পর আজ সময় করতে পারল অতসী। অফিসে এসে ঘণ্টাখানেকও থাকল কি থাকল না, তারপর লাকড়াকে নিয়ে জিপে করে বেরিয়ে পড়ল।

দু-ঘণ্টার ভেতর আদিবাসীদের আটটা গ্রাম ঘুরল অতসী। আগের দিন সে কথা দিয়েছিল, পরে এসে সারাদিন গাঁয়ে থাকবে; প্রত্যেকের ঘরে-ঘরে যাবে। কিন্তু আজও সে গাড়ি থেকে নামল না। জিপে বসেই এর-তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলল, পরে সে গ্রামে থাকার প্রতিশ্রুতি দিল, আর জিগ্যেস করল প্রবালকে তারা চেনে কিনা। প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষ জানাল, প্রবালকে তারা শুধু চেনেই না, তাদের কাছে সে ভগবান যিশুখ্রিস্টের মতো।

অতসী আরও জানতে চাইল, আজ প্রবালকে কেউ দেখেছে কি না। আটটা গ্রামের ওরাওঁ এবং মুন্ডারা জানালো—দেখেনি। ক'দিন ধরেই এই দেহাতগুলোতে সে আসছে না।

দেড়শো স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে এই সুবিশাল এলাকায় আদিবাসীদের তো আর একটা আধটা গ্রাম নেই; কম করে পঞ্চাশ ষাটটা রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে-পূবে-পশ্চিমে ছড়ানো এই সব গ্রামের কোথায় প্রবাল ঘুরছে, কে জানে। আন্দাজে তাকে কোথায় খুঁজবে অতসী? অবশ্য মিশনে গিয়ে তার খবর নিয়ে আসা যেত। কিন্তু সেটা খারাপ দেখাত। প্রায়-অচেনা একটি যুবক সম্পর্কে এত আগ্রহ দেখালে সবাই কিছু ভাবতে পারে। কেউ তো বুঝবে না, কেন সে প্রবালকে খুঁজছে। কাউকে কোনওরকম সন্দেহ করার সুযোগ না দিয়ে চুপচাপ প্রবাল সম্পর্কে খোঁজখবর তাকে নিতে হবে।

আটটা গ্রাম ঘুরেও যখন প্রবালকে পাওয়া গেল না, অতসী কিছুটা হতাশই হয়ে পড়ল। তবে জেদ বা গোঁ ছাড়ল না। উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে লাকড়াকে বলল, 'ওখানে চলো।'

আশ্চর্য, উত্তরের প্রথম গ্রামটিতেই প্রবালকে পাওয়া গেল।

এ-গ্রামটা শালবনের ভেতর! দূর থেকেই চোখে পড়েছিল, মিশনের একটা মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। একজন ডাক্তার ফোল্ডিং চেয়ারে বসে ফোল্ডিং টেবলে তাঁর ডিস্পেনসারি সাজিয়ে বসেছেন। আর প্রবাল একেকজনকে জোরজার করে ধরে তাঁর কাছে নিয়ে আসছে; ডাক্তার প্যাট-প্যাট করে ইঞ্জেকশানের ছুঁচ তার হাতে ফুটিয়ে দিচ্ছেন।

অতসী সেদিনই মিশনে শুনেছে গ্রামে-গ্রামে প্রবালরা কলেরার ইঞ্জেকশান দিয়ে বেড়াচ্ছে। পরে এ-ব্যাপারে বিনয় এবং ডাক্তারসাহেবের কাছে খোঁজ নিয়েছিল। তার প্রশ্ন ছিল একই এলাকায় তাদের এবং মিশনের মেডিক্যাল ইউনিট একসঙ্গে কীভাবে কাজ করছে? এতে দু-পক্ষের অসুবিধা হচ্ছে না? বিনয়রা জানিয়েছে, এতে কোনও অসুবিধা নেই। দু-পক্ষই আলোচনা করে গ্রামে-গ্রামে মেডিক্যাল ইউনিট পাঠায়। যে-গ্রামে মিশনের ইউনিট যায় সেখানে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ইউনিট পাঠায় না। এডুকেশনের ব্যাপারেও সহাবস্থান চলছে। মিশন তাদের কম্পাউন্ডে স্কুল-টুল বসিয়েছে; তবে গ্রামে তাদের পড়ানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অনেকগুলো প্রাইমারি স্কুল বসিয়েছে।

যত সহজে ইঞ্জেকশানের ব্যাপারটা বলা হল তত সহজে কিন্তু ওটা হচ্ছে না। ছুঁচ ফোটানোর ভয়ে গোটা গ্রামটা যেন কুঁকড়ে আছে। চারিদিকে চিৎকার, চেঁচামেচি, ছোটাছুটি। কিন্তু প্রবাল কাউকে ছাড়ছে না। ঘর থেকে, মাঠ থেকে, জঙ্গল থেকে একেক জনকে ধরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসছে। যাকে ধরা হচ্ছে তার মুখ দেখবার মতো; যেন বধ্যভূমিতে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের কেউ কেউ প্রবালকে আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছে।

অতসী অবাক হয়ে যাচ্ছিল। প্রবাল সম্পর্কে ভেতরে-ভেতরে নিজের অজান্তেই যেন শ্রদ্ধা হচ্ছে। আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের জন্য কেউ এত কষ্ট করতে পারে, ভাবা যায় না।

ছোটাছুটি করে ইঞ্জেকশানের জন্য মুন্ডাদের বাচ্চা-কাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি কিংবা জোয়ান বয়সের ছেলেমেয়েদের ধরতে-ধরতে হঠাৎ অতসীকে দেখতে পেল প্রবাল। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, 'দেখলেন তো, যা বলেছিলাম তা-ই হল।'

প্রবাল কী বলেছিল মনে করতে পারল না অতসী। বলল, 'কী বলেছিলেন যেন?'

'গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরতে-ঘুরতে আমাদের দেখা হয়ে যাবে।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ!' জিপ থেকে নেমে অতসী বলতে লাগল, 'ইঞ্জেকশানের জন্যে আপনার লোক ধরা দেখছিলাম। দারুণ দৃশ্য।'

প্রবাল হেসে ফেলল, 'ইঞ্জেকশানকে ওরা ভীষণ ভয় পায়। হাতে কোপ মারুন, মুখে টুঁ শব্দটি বার করবে না, কিন্তু ছুঁচ ফোটাতে ভীষণ ভয়।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন আসুন। ওখানে চেয়ার পেতে দিচ্ছি—' শালবনের ছায়ায় যেখানে ডাক্তার বসে ছিলেন, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল প্রবাল।

অতসী বলল, 'এখন আর বসব না। আমাদের অন্য গ্রামে যেতে হবে!'

একটু ভেবে প্রবাল জিগ্যেস করল, 'আজ ক'টা গ্রাম ঘুরলেন?'

'এটা নিয়ে ন'টা।'

'এখানকার মানুষজন কে কীরকম লাগছে?'

আজ নিয়ে দু-দিন আদিবাসীদের গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অতসী। এখানকার মানুষজন দেখা তার আসল উদ্দেশ্য নয়। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রবালকে। কিন্তু সে কথা তাকে বলা যায় না। অতসী শুধু বলল, 'ভালো, খুব সরল।'

প্রবাল বলল, 'ঠিকই বলেছেন। তবে শহর থেকে যেরকম লোকজন এসব দিকে আসছে, তাতে কতদিন এরা নিজেদের পিউরিটি আর সিমপ্লিসিটি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, বলা মুশকিল।'

এরপর আর বলার কিছু নেই। অতসী বলল, 'আজ চলি। আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

অতসী জিপে উঠে পড়ল।

এরপর রোজই দুপুরের দিকে অফিস থেকে লাকড়াকে নিয়ে জিপে করে বেরিয়ে পড়তে লাগল অতসী। প্রবালের সমস্ত খবর যেভাবেই হোক তার চাই।

রোজ পাঁচ সাতটা গ্রাম ঘুরলে কোথাও না কোথাও প্রবালের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে লাগল। অতসীর চোখে পড়ে কোথাও আদিবাসীদের জন্যে ঘরে-ঘরে সে পাউডার-মিল্কের প্যাকেট বিলোচ্ছে। ওখানে ওরাওঁ মুন্ডাদের ভেতর অনেকেই কুষ্ঠে ভোগে। চোখে পড়ে প্রবাল নিজের হাতে ঘায়ের পুঁজ-টুঁজ মুছিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছে। কোথাও বা শালবনের ভেতর আদিবাসী বাচ্চাদের নিয়ে হই-হল্লোড় বা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

দেখা হলে প্রবাল এগিয়ে এসে দু-একটা কথা বলে। অতসীকেও তার কথায় উত্তর দিতে হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। তাকে তো আর সোজাসুজি জিগ্যেস করা যায় না— আগে কোথায় ছিল, এখানে কেমন করে এল কিংবা কেন তার কণ্ঠস্বর সঞ্জয়ের মতো।

চারিদিকে ছড়ানো ট্রাইব্যাল ভিলেজের লোকজনকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রবাল সম্পর্কে অনেক কথা জিগ্যেস করেছে অতসী কিন্তু কেউ তার ব্যাকগ্রাউন্ড বা অতীত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কোনও খবর-টবর দিতে পারেনি। তবে এটা বোঝা গেছে দেড়শো স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকার পঞ্চাশ-ষাটটা আদিবাসী গ্রামের প্রতিটি মানুষ প্রবালকে ঈশ্বরের মতো মনে করে। তাকে যত দেখছে, তার সম্পর্কে যত শুনছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে অতসী। তার ওপর শ্রদ্ধাটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। প্রবালের কথা ভাবলেই কী এক অনিবার্য নিয়মে সঞ্জয়কে মনে পড়ে যায়। সে-ও তো প্রবালের মতোই হিউম্যানিটারিয়ান, ফিলানথ্রপিস্ট এবং সোশাল ওয়ার্কার ছিল।

অতসী ভাবে যেভাবে সে চলছে তাতে প্রবাল সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যাবে না। তাকে অন্য দিক থেকে এগুতে হবে।

দশ

দেখতে-দেখতে আরও দশ-বারোটা দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে বাবা আর মেসোমশাইর চিঠি এসে গেছে। বাবা অতসীকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছেন। এত দূরে কাজ নিয়ে আসার ব্যাপারে বাবা-মা থেকে শুরু করে বাড়ির সবারই আপত্তি ছিল। একরকম জোর করেই সে এখানে চলে এসেছিল। বাবার অনিচ্ছাটা এখনও প্রবল, চিঠির প্রতিটি লাইনে তা ফুটে আছে।

মেসোমশাই জানিয়েছেন অতসী কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে বলে রাজীবের খুনের ইনভেস্টিগেশনে ঢিলেমি দেওয়া হবে, এটা যেন সে কখনও না ভাবে। পুরোদমেই এ-ব্যাপারে কাজ চলছে। তবে রাজীব সম্পর্কে মেসোমশাই আগে যে খারাপ খবর দিয়েছিলেন এবারও সেই একই কথা লিখেছেন। রাজীবের ব্যাকগ্রাউন্ড নাকি ভালো নয়। মেসোমশাই এ-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত; তবে আরেকটু কনফার্মড না হয়ে অতসীকে ডিটেলে জানাবেন না।

রাজীব সম্পর্কে মনের ভেতর যে-অস্বস্তি নিয়ে কলকাতা থেকে অতসী চলে এসেছিল মেসোমশাইয়ের চিঠিতে সেটা আরেকটু বাড়ল। কিছুটা জানিয়ে, বেশির ভাগটা গোপন করে মেসোমশাই তাকে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। হয় কিছুই তাঁর বলা উচিত ছিল না, নইলে পুরোটা একসঙ্গে জানাতে পারতেন। এভাবে কাউকে কষ্ট দেবার মানে হয় না।

মেসোমশাই যখন ইচ্ছা হয় জানাবেন। কিন্তু অতসী হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। বুকের কয়েক স্তর তলায় এখনও প্রতিহিংসা গনগনে আগুনের মতো জ্বলছে। প্রবালের ব্যাকগ্রাউন্ড তাকে জানতেই হবে। তবে কোন দিক থেকে এ-ব্যাপারে এগুবে সেটাই বুঝতে পারছে না। যখন সে রাস্তা হাতড়াচ্ছে সেই সময় হঠাৎ স্কটিশ মিশনের বড় পাদরি ফাদার বোথামের কাছ থেকে একজন লোক এল। পরের ছুটির দিন সকালের দিকে তিনি তাঁকে মিশনে যেতে অনুরোধ করেছেন। আগের দিন মিশনের নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটির খানিকটা-খানিকটা মাত্র অতসীকে তিনি দেখাতে পেরেছেন। ছুটির দিনে গেলে বাকিটা দেখাবেন। তাঁর ইচ্ছা, দুপুরবেলা অতসী ওখানে খাবে এবং সারাটা দিন মিশনের লোকজনের সঙ্গে কাটাবে। জরুরি কাজে ব্যস্ত বলে নিজে এসে তিনি নেমন্তন্ন করতে পারলেন না। অতসী সে-জন্য মনে কিছু না করে!

ফাদার বোথামের চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ অতসীর মনে হল, এবার হয়তো একটা রাস্তা পাওয়া যাবে। ফাদার বোথাম নিশ্চয়ই প্রবাল সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। তাঁকে বুঝতে না দিয়ে এ-নিয়ে অতসী জানতে চেষ্টা করবে।

পরের রবিবার সকালেই মিশনে চলে এল অতসী। চা-টা খাওয়ার পর ফাদার বোথাম এবং অন্যান্য ফাদাররা মিশনের বাকি অংশগুলো তাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। খুবই আগ্রহ নিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে অতসী, কিন্তু বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। ফাদারদের যে-টিমটা তাকে নিয়ে ঘুরছে তার মধ্যে প্রবাল নেই। অতসী একবার ভাবল, প্রবাল সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করে। পরক্ষণেই ঠিক করল, এখন না, এ-সম্পর্কে সতর্কভাবে এগুতে হবে।

দুপুরের মধ্যে সব কিছু দেখা হয়ে গেল। তারপর বিরাট ডাইনিং হলে মিশনের সব কর্মী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসল অতসী। ফাদার বোথাম ঠিক তার পাশেই বসেছেন। অতসী জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা সবাইকে দেখছি, কিন্তু মিশনের একজন কর্মীকে মিসিং মনে হচ্ছে।'

ফাদার বোথাম মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কার কথা বলছেন?'

'প্রবালবাবু—'

'আর বলবেন না। রোজ একবার আদিবাসীদের গ্রামে না গেলে ওর শান্তি নেই। আজ সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়েছে।'

অতসী জিগ্যেস করল, 'আমি আসব, উনি জানতেন না?'

ফাদার বোথাম বললেন, 'নিশ্চয়ই।' বলতে-বলতে আচমকা কিছু মনে পড়ে যেতে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'প্রবাল বারবার বলে গেছে যতক্ষণ না সে ফিরছে আপনি যেন থাকেন।'

'উনি কখন ফিরবেন তার কি কিছু ঠিক আছে?'

'বলে গেছে তাড়াতাড়িই ফিরবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর অতসী খুব সতর্ক ভঙ্গিতে তার লক্ষ্যের দিকে পা বাড়াল। আস্তে করে বলল, 'জানেন, এর ভেতর প্রবালবাবুর সঙ্গে আট-দশ দিন আদিবাসীদের গ্রামে আমার দেখা হয়েছে।'

ফাদার বোথাম বললেন, 'শুনেছি। প্রবাল আমাকে বলেছে।'

'আমি এরকম ডেডিকেটেড মানুষ আর দেখিনি।'

'ঠিকই বলেছেন।'

অতসী বলল, 'একটা কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে।'

ফাদার বোথাম বললেন, 'কী?'

'প্রবালবাবুকে সেদিন দেখলাম লেপারদের সেবা করছেন। ওঁর রোগের ভয়ও কি নেই?'

'মানুষের সেবার মধ্যে যে আনন্দ পেয়েছে তার কোনও ভয়ই থাকে না।'

'ওঁর মা-বাবা কেউ নেই?'

'শুনেছি নেই।'

'এখানে আসার আগে উনি কোথায় ছিলেন?'

'যতদূর জানি কলকাতায়।'

'কোনও মিশন-টিশনে এর আগে কাজ করেছেন?'

'আমার জানা নেই। খুব সম্ভব করেনি। কিন্তু—' বলতে-বলতে ফাদার বোথাম থেমে অতসীর দিকে তাকালেন।

অতসী বলল, 'কী?'

'আপনার সঙ্গে প্রবালের তো আলাপ আছে। ওকে জিগ্যেস করলে ঠিক উত্তর পাবেন।

আমার বলার মধ্যে ভুল থেকে যেতে পারে।'

অতসী নিজের মধ্যে কিছুটা গুটিয়ে গেল। কিন্তু মনোভাবটা একেবারেই বুঝতে দিল না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'অদ্ভুত মানুষ কিনা। তাই ওঁর সম্বন্ধে খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'সেটা ঠিক। প্রবালকে যে একবার দেখেছে সে-ই ওর সম্বন্ধে জানতে চায়।'

অতসী বলল, 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে প্রবালবাবুর কীভাবে আলাপ হয়েছে? মানে, আমি জানতে চাই উনি কেমন করে এই মিশনে এলেন?'

ফাদার বোথাম যা উত্তর দিলেন তা এইরকম। রাঁচির কাছে প্রবালের একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। তখন অবশ্য তিনি ওঁকে চিনতেন না। একটা দরকারি কাজে ফাদার বোথাম রাঁচি গিয়েছিলেন। ফেরার পথে অ্যাকসিডেন্টের স্পটে আসতেই দেখতে পেলেন প্রচুর লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝখানে একটি আনকনশাস রক্তাক্ত যুবক পড়ে আছে। লোকগুলো তাকে নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ফাদার বোথাম তাকে তুলে নিয়ে সোজা রাঁচি হাসপাতালে যান, কিন্তু সেখানে পুরোপুরি সেরে ওঠেনি প্রবাল। পরে তাকে পাঠানো হয়েছিল মাদ্রাজে। সেখানে তার মুখে প্লাস্টিক সার্জারি এবং পেটে মেজর অপারেশন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতাল থেকে যখন ছেড়ে দেওয়া হল, ফাদার বোথাম প্রবালকে মিশনে নিয়ে এলেন। সেই থেকে সে এখানেই আছে।

খাওয়াদাওয়ার পর ফাদার বোথাম অতসীকে তাঁর বাংলোয় নিয়ে গেলেন। আরও কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করতে-করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ছোটনাগপুরের আকাশ ডিঙিয়ে সূর্যটা পশ্চিমের ঢালে অনেকখানি নেমে গেছে ততক্ষণে।

অতসী বলল, 'প্রবালবাবু বোধহয় কোথাও আটকে গেছেন। আমি আজ যাই। ওঁর সঙ্গে পরে দেখা করে নেব।'

ফাদার বোথাম বললেন, 'না-না, যাবেন না। ও যখন বলেছে নিশ্চয়ই এসে পড়বে। আর কিছুক্ষণ ওয়েট করে যান।' একটু ভেবে ফের বললেন, 'আমাকে আজ একবার রাঁচি যেতে হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হব। আপনি এক কাজ করুন, প্রবালের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছা করলে আপনি ওখানেও বসতে পারেন, নইলে আমার বাংলোতেও থাকতে পারেন। আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।'

অতসী একটু ভেবে বলল, 'প্রবালবাবুর ঘরেই বসি। উনি এলে দেখা করেই চলে যাব।'

'আসুন।'

ফাদার বোথামের বাংলোটা যেখানে তার ঠিক উলটো দিকে একটা টালির দোতলা ব্যারাক বাড়ির বড় একটা ঘরে থাকে প্রবাল। ঘরটার পুব-দক্ষিণ খোলা। আসবাব-টাসবাব বিশেষ কিছুই নেই। একটা ফিতের ক্যাম্প খাট, পড়াশোনা করার জন্য মাঝারি একটা টেবল আর চেয়ার। এধারে-ওধারে গেস্টদের জন্য খান তিন চারেক বেতের সোফা অবশ্য আছে। আর আছে চার-পাঁচটা নানা মাপের আলমারি। আলমারিগুলো বইয়ে-বইয়ে ঠাসা। বই শুধু আলমারিতেই নেই, পড়ার টেবলের ওপরও ডাঁই হয়ে আছে।

অতসীকে প্রবালের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফাদার বোথাম চলে গেলেন।

দোতলায় প্রবালের এই ঘরটা থেকে গোটা মিশনটা দেখা যায়। হু-হু করে উলটো-পালটা হাওয়া আসছে ঘরে। ছেলেমেয়েরা বল বা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট-ট্যাকেট নিয়ে এখন মাঠে নেমে পড়েছে।

বেতের সোফায় বসে খানিকক্ষণ মাঠে ছেলেমেয়েদের খেলা দেখল অতসী, ছোটনাগপুরের মেঘশূন্য নীলাকাশ দেখল, তারপর আস্তে-আস্তে প্রবালের পড়ার টেবলের কাছে এসে চেয়ারে

বসে পড়ল।

হাতের সামনেই বইয়ের পাহাড়। নানা জাতের বই—সোশিওলজি, হিস্ট্রি, আর্কিওলজি, ফিলজফি—এমনি নানা বিষয়। তবে বেশির ভাগই ধর্মের।

অন্যমনস্কর মতো বই নাড়াচাড়া করতে-করতে একটা ডায়েরি হাতে উঠে এল। আজ থেকে তিন বছর আগের ডায়েরি। চেহারাটা অবিকল বাঁধানো বইয়ের মতো বলে ওটা তুলে নিয়েছিল অতসী।

কিন্তু পরের দিনলিপি লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখাটা খুবই অশোভন, জঘন্য ধরনের ইতরামো। সব বুঝেও ডায়েরিটা নামিয়ে রাখতে পারল না অতসী। নিজের ইচ্ছায় নয়, প্রবল শক্তিমান কেউ যেন তার ওপর ভর করে তাকে দিয়ে পাতার পর পাতা পড়িয়ে নিতে লাগল।

গোপন কিছুই তাতে লেখা নেই। প্রতিদিন ওরাওঁ আর মুন্ডাদের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে কী কী কাজ করেছে সংক্ষেপে তার বিবরণ লিখে রেখেছে প্রবাল। মাঝে-মাঝে আদিবাসী মেয়ে, পুরুষ, শিশু বা নেচারের নানা দৃশ্য যেমন আকাশ, সূর্য, শালবনের ছবিও এঁকেছে।

ডায়েরির পাতা ওলটাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু অতসীর মাথার ভেতর প্রবাল আর সঞ্জয় পাশাপাশি ফোটোগ্রাফের মতো ফুটে উঠছিল।

সঞ্জয়ের হাতের লেখা খুব আবছাভাবে মনে আছে তার। বৈশিষ্ট্যহীন। ডায়েরির এই হাতের লেখাও তা-ই। সঞ্জয়ের লেখার সঙ্গে এই হাতের লেখাটার কতটা মিল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

একটা ডায়েরি শেষ হওয়ার পর আরেকটা ডায়েরি তুলে নিল অতসী। সেই একই ধাঁচের বিবরণ। কোথাও প্রবালের নিজস্ব ব্যক্তিগত কথা নেই, সবই এখানকার প্রকৃতির সন্তান সরল নিষ্পাপ দরিদ্র আদিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি।

তিনটে ডায়েরি দেখবার পর শেষ ডায়েরিটা তুলে নিয়ে দু-চার পাতা ওলটাতে ওলটাতে স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল অতসীর। এক জায়গায় প্রবাল লিখেছে ঃ

‘উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে-ঘুরতে রাঁচি এসেছিলাম। বেঁচে থাকা আমার কাছে টোটালি মিনিংলেস হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুই ছিল মোস্ট ডিজায়ার্ড থিং। সেই কাম্য মৃত্যুর জন্যে নিজেকে হেভি ট্রাকের সামনে ছুড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু মরা হল না। শুনেছি, দুর্দান্ত অ্যাক্সিডেন্টের পর ফাদার বোথাম আমার আনকনশাস বডি তুলে নিয়ে রাঁচি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমাকে পাঠানো হয় মাদ্রাজে। বিরাট বিরাট তিন-চারটে অপারেশন হল। সবই প্লাস্টিক সার্জারি। ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান ডাক্তাররা আমাকে নতুন লাইফ দিলেন। সব দিক থেকে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে এই মিশনে চলে এলাম। তারপর—’

পুরো পাতাটা শেষ হওয়ার আগেই বাইরের টানা বারান্দার দিক থেকে পায়ের আওয়াজ কানে এল। চমকে ডায়েরিটা দ্রুত টেবলে রেখে ঘুরে বসল অতসী। আর তখনই প্রবাল এসে ঘরে ঢুকল। অতসীকে দেখে হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে বলল, ‘একেবারে আনকন্ডিশনাল ক্ষমা চাইছি মিস চ্যাটার্জি। বলুন ক্ষমা করলেন।’

চুরি করে অতসী যে ডায়েরি পড়ছিল তা কি দেখে ফেলেছে প্রবাল? খুব সম্ভব না। তব এক ধরনের অপরাধবোধ তাকে ভেতরে-ভেতরে কুঁকড়ে দিচ্ছিল। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে-জোরে ওঠানামা করছিল যে, তার শব্দ নিজের কানেই যেন শুনতে পাচ্ছিল সে। তবে চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকতে চাইছে অতসী। বলল, ‘প্লিজ, ক্ষমার কথা বলবেন না। তবে আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।’

‘আমি আর ভদ্রলোক নেই মিস চ্যাটার্জি। আজকাল কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না।’

'মানুষের এত সেবা করে বেড়ালে কথা রাখবেন কী করে?' বলে একটু হাসল অতসী। তারপর ফের বলল, 'সারভিস টু দি হিউম্যানিটি—এর চাইতে বড় কাজ আর কী আছে!'

প্রবাল বলল, 'কী যে বলেন। আমি খুব সামান্য মানুষ, ভেরি স্মল ম্যান।'

অতসী বলল, 'ফাদার বোথাম জানালেন আপনি আমাকে ওয়েট করতে বলেছেন। আমাকে তিনি আপনার ঘরে রেখে গেলেন। সেই বিকেল চারটে থেকে বসে আছি। আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন কেন? কোনও দরকার আছে?'

'না, দরকার আর কী? ভেবেছিলাম, অনেকক্ষণ বসে গল্প-টল্প করব। আমার লাইফের খানিকটা সময় কলকাতায় কেটেছে। ভেবেছিলাম, কলকাতার কথা জিগ্যেস করব।'

অতসীর মনে সংশয় দেখা দিল। প্রবাল সম্পর্কে সে যা ভাবছে তা যদি আদৌ সত্যি হয় তা হলে কলকাতায় থাকার কথা সে কিছুতেই বলত না। যাই হোক, অতসী বলল, 'সেই সকালবেলা এসেছি। এখন আমাকে ফিরতে হবে। আরেক দিন এসে গল্প-টল্প করব।'

'আরেকটু বসবেন না?'

'প্লিজ, আজ আর বসতে বলবেন না।'

অগত্যা প্রবাল অতসীকে তার জিপে তুলে দিয়ে গেল।

ধাতুরিয়ায় নিজের কোয়ার্টারে ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা নেমে আসতে লাগল। আকাশ, বনভূমি বা চারপাশের ঝাপসা ল্যান্ডস্কেপের কোনওদিকেই লক্ষ্য ছিল না অতসীর। লাকড়ার পাশে বসে উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে থাকতে-থাকতে প্রবালের ডায়েরিটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার! এক জায়গায় প্রবাল লিখেছে, মাদ্রাজে তার প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল। ফাদার বোথামের কাছেও একই কথা শুনেছে সে।

অতসী জানে প্লাস্টিক সার্জারিতে মুখের চেহারা বদলে যেতে পারে। কয়েক বছর আগে এক মাসতুতো দিদিকে লন্ডনে মুখের ওপর অপারেশন করার জন্য পাঠানো হয়। চার মাস পর প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে যখন সে ফিরে এল, তখন আর তাকে চেনা যাচ্ছিল না। অপারেশনটা এত চমৎকার হয়েছিল যে হঠাৎ দেখলে মুখে কোনও দাগই চোখে পড়ত না। তবে অনেকক্ষণ লক্ষ করলে চুলের মতো সরু-সরু দু-তিনটে রেখা দেখা যেত। বিদ্যুৎচমকের মতো অতসীর মনে হল, প্লাস্টিক সার্জারির জন্য প্রবালের মুখের চেহারা একেবারে বদলে যায়নি তো? কাল থেকে তাকে খুব ভালো করে লক্ষ করতে হবে। তা ছাড়া টেবলের ওপর আরও দু-তিনটে ডায়েরি রয়েছে। সেগুলো পড়বার সময় পাওয়া যায়নি। যেভাবেই হোক, ওগুলো পড়তে হবে! অতসীর কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই ডায়েরিগুলোর মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া যাবে।

এগারো

পরের দিনই আদিবাসীদের একটা গ্রামে প্রবালের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। আসলে অতসী এখন অনবরত তার পেছনে ছায়ার মতো ছুটছে।

এখন বিকেল। ছোটনাগপুরের পাহাড় এবং বনভূমি দ্রুত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর খানিকটা পরেই সন্ধে নেবে যাবে।

একটা মধ্যবয়সী আদিবাসী ওরাওঁকে নিজের হাতে ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল প্রবাল! লোকটা শালবনে কাঠ কাটতে গিয়ে ভাল্লুকের খপ্পরে পড়ে। কুড়াল দিয়ে জন্তুটার সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়ে তাকে জখম করে দেয়, তবে নিজেও তার আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে

গ্রামে ফিরে আসে। আর তখনই ঘুরতে-ঘুরতে এখানে এসে পড়েছিল প্রবাল। ও যেখানেই যায়, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো থাকে। তাতে ফার্স্ট এইডের জিনিসপত্র ছাড়াও নানারকম ট্যাবলেট, ক্যাপসিউল আর ইঞ্জেকশনের সরঞ্জাম থাকে। মোটামুটি জ্বর-টর বা জখম টখম হলে মেডিক্যাল ইউনিটকে ডাকার দরকার হয় না, প্রবালই সামলে নিতে পারে।

ওরাওঁটাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে প্রবাল ব্যান্ডেজ করতে বসে গিয়েছিল। কিন্তু সারা শরীরে এত জায়গায় তার চামড়া এবং মাংস ছিঁড়ে গেছে যে একা সবটা ব্যান্ডেজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল প্রবালের। হঠাৎ এই সময় অতসীকে দেখে প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, 'ইউ আর হেভেনসেন্ট। কাইন্ডলি, একটু হেলপ্ করুন; একা আমি পেরে উঠছি না।'

অতসী এগিয়ে গিয়ে প্রবালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিল। প্রবাল যা-যা বলছিল, সে তাই তাই করে চলেছে। তবে স্থির দৃষ্টিতে প্রবালের মুখটা দেখে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ লক্ষ করতে প্রবালের থুতনিতে কপালে গালে এবং নাকে সরু-সরু চুলের মতো কয়েকটা দাগ চোখে পড়ল। কিন্তু ওগুলো প্লাস্টিক সার্জারির চিহ্ন কি না সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রবালকে আরও বেশ কয়েক দিন লক্ষ করতে হবে।

একজন দারুণ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো ইঞ্জেকশান দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে যাচ্ছিল প্রবাল। অতসী তার মুখের দিক থেকে হাতের ওপর চোখ দুটো নামিয়ে আনল। আস্তে করে জিগ্যেস করল, 'আপনি কি মেডিক্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলেন?'

প্রবাল বলল, 'একেবারেই না। কেন বলুন তো?'

'যেভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধছেন তা একমাত্র এক্সপিরিয়েন্সড ডাক্তাররাই পারে।'

'আমাদের মেডিক্যাল ইউনিটের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে ডাক্তারদের হেলপ্ করতে-করতে এসব শিখে গেছি।'

অতসী আর কোনও প্রশ্ন করল না।

ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ হয়ে যাওয়ার পর প্রবাল বলল, 'আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি; প্লিজ কিছু মনে করবেন না। কিন্তু আপনাকে আর-একটু কষ্ট দেব।'

অতসী বলল, 'কী বলুন—।'

'এখান থেকে তিনটে গ্রামের পর ফোর্থ গ্রামটায় আমাদের মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটটা রয়েছে। কাইন্ডলি আমাকে ওখানে একটু পৌঁছে দেবেন? ইউনিটটাকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে আসতে হবে!'

'চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু—'

'কী?'

'এই উন্ডেড লোকটার জন্যে ইউনিট আনতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনিই তো সব করে দিলেন।'

প্রবাল বলল, 'ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। আমি তো 'কোয়াক' ডাক্তার; জেনুইন ডাক্তার এনে লোকটাকে একবার দেখানো দরকার। এত ব্লিডিং হয়েছে যে ভীষণ ভয় পাচ্ছি।'

জিপে করে তিনটে গ্রাম পেরিয়ে যেতে-যেতে সেই পুরনো ভাবনাটা মাথায় ফিরে এল অতসীর। যখনই দেখা হবে প্রবালকে চোখে-চোখে রাখতে হবে। অনেকক্ষণ পর একসময় সে বলল, 'একটা কথা বলব?'

প্রবাল অন্যমনস্কর মতো পাহাড় উপত্যকা এবং বনভূমির ল্যান্ডস্কেপ দেখছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের কাজ আমি প্রায় কিছুই জানি না। আপনি এখানে যেভাবে সারভিস দিচ্ছেন তাতে খুব ইন্সপায়ার্ড ফিল করছি। কিছুদিন আপনার সঙ্গে থেকে-থেকে যদি একটু কাজ শিখি, আপনার আপত্তি আছে?'

ভারি কোমল আর স্নিগ্ধ একটু হাসি ফুটল প্রবালের মুখে। সে বলল, 'আমি তুচ্ছ মানুষ। আমার সঙ্গে কাজ করতে চাইছেন, এটা আমার পক্ষে গৌরবের ব্যাপার।'

'আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'একেবারেই না।'

কথায় কথায় তিনটে গাঁ পেরিয়ে এসেছিল ওরা। অতসী বলল, 'কাল থেকেই আমি শুরু করতে চাই।'

প্রবাল বলল, 'ঠিক আছে।'

'কাল কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা করব?'

'এখান থেকে নর্থে দশ কিলোমিটার গেলে একটা গ্রাম পড়বে। নাম তালডি। সকালবেলা আমি ওখানে চলে যাব।'

তালডি গাঁ থেকেই নতুন একটা চ্যাপটার শুরু হয়ে গেল। এরপর রোজই একটা না একটা গ্রামে প্রবালের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে লাগল। কোথায় দেখা হবে, আগের দিনই জানিয়ে দেয় প্রবাল। সেই অনুযায়ী অতসী পরের দিন সেখানে চলে যায়।

কোনওদিন ওরাওঁ ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে, কোনওদিন পাউডার-মিল্ক বিলিয়ে, কোনওদিন কুষ্ঠ রোগীদের সেবা-টেবা করে সন্ধেবেলা ফিরতে ফিরতে ছোটনাগপুরের আকাশে চাঁদ উঠে যায়। বেশির ভাগ দিনই প্রবালকে মিশনে পৌঁছে দেয় অতসী। জ্যোৎস্না-ধোয়া পাহাড় আর বনভূমির ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে রোজই তার মনে হয়, প্রবাল যেন মানুষ না, দুঃখ-কষ্টের এই জগতে ঈশ্বরপ্রেরিত কোনও দেবদূত। যে এভাবে 'সার্ভিস টু দি হিউম্যানিটি' অর্থাৎ মানুষের সেবা করতে পারে তার সম্পর্কে কোনওরকম সন্দেহ করাও অন্যায়। কিন্তু সঞ্জয়ও তো দুঃখী মানুষের মধ্যে কাজ করেছে। তাকেও একসময় দেবদূত মনে হত। কিন্তু সে খুন করে ফেরার। প্রবাল সম্পর্কে শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে আপ্লুত হতে-হতে ভেতরে-ভেতরে থমকে যায় অতসী।

ফেরার সময় টুকরো-টুকরো কথা হয় দুজনের। অতসীই প্রশ্ন করে যায়; প্রবাল শুধু উত্তর দিতে থাকে।

কোনওদিন অতসী জিগ্যেস করে, 'জানেন, আপনাকে আর মানুষ সম্পর্কে আপনার ডেডিকেশন, নিঃস্বার্থ সার্ভিস, এইসব দেখতে-দেখতে আরেক জনের কথা মনে পড়ে যায়। এগ্‌জাক্টলি আপনার মতোই ছিল সে।'

প্রবাল বলে, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীতে একই চরিত্রের দুজন মানুষ থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আপনাদের দুজনের আরেক দিক থেকেও খুব মিল।'

'কোন দিক থেকে?'

'গলার স্বরে। দুজন মানুষের একইরকম কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শুনিনি।'

'আশ্চর্য তো। ভদ্রলোক কে?'

'একসময় আমার বন্ধু ছিল; একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। তার নাম সঞ্জয়।' বলে তীক্ষ্ণ চোখে প্রবালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অতসী।

প্রবালের মুখের একটা রেখাও স্থানচ্যুত হয় না। অল্প হেসে সে বলে, 'আপনার বন্ধুকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। তিনি এখন কোথায়?'

চোখের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করে অতসী বলে, 'আমার আরেক বন্ধুকে খুন করে অ্যাবস্কন্ড করেছে।'

'ব্যাপারটা খুব জটিল মনে হচ্ছে। তবু ভদ্রলোককে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

যেভাবে উদ্বেগশূন্য স্বাভাবিক গলায় প্রবাল উত্তর দেয় তাতে কিছুটা হতাশ হয়ে যায় অতসী। প্রবালের মধ্যে কোনওরকম গোলমাল থাকলে সে কি এতটা সহজভাবে কথা বলতে পারত?

একদিন অতসী জিগ্যেস করে, 'আচ্ছা, আপনার তো খুব বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। মুখে চোট-টোট লেগেছিল?'

প্রবাল বলে, 'ডেফিনিটলি। তার জন্যে বিরাট অপারেশনও করাতে হয়েছিল।'

'কই, আপনার মুখ দেখে তো বোঝা যায় না কোনওরকম অপারেশন হয়েছে—'

'প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল তো। যিনি অপারেশন করেছিলেন তাঁর মতো সার্জন ইন্ডিয়াতে আর নেই। এমনভাবে তিনি অপারেশন করে চামড়া-টামড়া জোড়া লাগান যাতে বোঝাই যায় না কোথাও কোনও কাটা-ছেঁড়া করা হয়েছে।'

একটু ভেবে অতসী বলে, 'লন্ডনে আমার এক মাসতুতো দিদির মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছিল। সরু-সরু দু-একটা দাগ ছাড়া অপারেশনের কোনও চিহ্নই ছিল না মুখে। তবে—'

'তবে কী?'

প্রবালের দিকে খানিকটা ঝুঁকে অতসী বলেছিল, 'অপারেশনের জন্যে মুখের চেহারাটা একেবারেই বদলে গেছে দিদির। আগে যারা তাকে দেখেছে, অপারেশনের পর আর তাকে চিনতে পারত না। টোটালি ডিফারেন্ট পার্সন যেন।'

প্রবাল বলে, 'হ্যাঁ বেশিরভাগ সময়ই ফেসিয়াল অপারেশনে মুখের চেহারা বদলে যায় বলে শুনেছি।'

এরপর যে-প্রশ্নটা অতসীর মুখে প্রায় এসে যায় সেটা আর বলে উঠতে পারে না। তবে প্রবালকে মিশনে নামিয়ে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যেতে-যেতে হঠাৎ তার মনে হয় মেসোমশাইকে একটা চিঠি লেখা খুবই জরুরি। চার বছর আগে মাদ্রাজের এক হাসপাতালে প্রবাল নামে যে যুবকটির প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল সে কে? তার আইডেন্টিটি কি? সত্যি-সত্যিই সে আসল না নকল? মেসোমশাই যেন ব্যক্তিগতভাবে এসব খোঁজ করেন। তিনি যদি নিজে মাদ্রাজে যান সঙ্গে করে সঞ্জয়ের একটা ফোটো অবশ্যই নিয়ে যাবেন। যে-সার্জন অপারেশন করেছেন তাঁকে খুঁজে বার করে সঞ্জয়ের ফোটো দেখিয়ে যেন জিগ্যেস করেন, এরকম চেহারার কোনও যুবকের ওপর প্লাস্টিক সার্জারি তিনি করেছেন কি না। তা ছাড়া প্রবালের নাম বা ঠিকানা না জানিয়ে অতসী লিখেছে, এমন একজন যুবকের সঙ্গে ধাতুরিয়ায় তার আলাপ হয়েছে যার কণ্ঠস্বর হুবহু সঞ্জয়ের মতো। এখন মাদ্রাজের ইনভেস্টিগেশনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেসোমশাই যেন ওইসব ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে তাকে জানিয়ে দেন।

দিন কুড়ি বাদে কলকাতা থেকে মেসোমশাইয়ের চিঠি এল। তিনি যা লিখেছেন তা এইরকম।

'স্নেহের সোনা,

'তোমার চিঠি পাওয়ামাত্র সঞ্জয়ের ফোটো নিয়ে আমি মাদ্রাজ ছুটে গিয়েছিলাম। ওখানকার

প্রতিটি হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমের রেকর্ড দেখে শেষ পর্যন্ত চার বছর আগের সেই প্লাস্টিক সার্জেনের খোঁজ পাই। যিনি ওই অপারেশনটা করেছিলেন তাঁর নাম ডাক্তার কৃষ্ণান। ডাক্তার কৃষ্ণানের সঙ্গে তাঁর ময়ালপুরের বাড়িতে দেখা করে সঞ্জয়ের ফোটোটা দেখিয়ে জিগ্যেস করি বছর চারেক আগে রাঁচি হাসপাতাল থেকে যে-যুবকটিকে তাঁর কাছে অপারেশনের জন্যে পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে এই ফটোটার মিল আছে কিনা। অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফোটোটা দেখে ডাক্তার কৃষ্ণান বললেন, অনেকদিন আগের ঘটনা, মনে রাখা খুবই কঠিন, তা ছাড়া যুবকটির মুখটুখ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিল, তবু তাঁর ধারণা ফোটোর চেহারার সঙ্গে যুবকটির মিল ছিল। তিনি আরও জানালেন, অপারেশনের পর যুবকটির মুখ একেবারে বদলে গেছে।

'সোনা, আমার ধারণা তুমি যে-ছেলেটির কথা লিখেছ সে-ই সঞ্জয়। মুখের চেহারা বদলে গেলে খুনির সব চাইতে সুবিধা হয়; তখন তাকে খুঁজে বার করা খুবই শক্ত কাজ। যাই হোক, সে সঞ্জয় হোক বা না-ই হোক তাকে আমার একবার দেখা দরকার। খুনের কেসে সন্দেহজনক কোনও লোককেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। ছেলেটি কোথায় আছে, পত্রপাঠ আমাকে জানাবে। তোমার চিঠির জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

'স্নেহ নিও। ইতি মেসোমশাই।'

চিঠিটা এসেছিল অফিসে। ওটা পড়ার পর কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল অতসী। মেসোমশাই যা লিখেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। সন্দেহ যখন হচ্ছে তখন প্রবালকে একবার বাজিয়ে দেখা দরকার। অতসী প্রবালের ঠিকানা-টিকানা দিয়ে মেসোমশাইকে একটা চিঠি লিখে অফিসের বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'এটা পোস্ট করে দিয়ে এসো।' তারপর লাকড়াকে নিয়ে জিপে করে বেরিয়ে পড়ল। এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে আজ প্রবালের সঙ্গে দেখা করার কথা।

তেরো

কাল মেসোমশাইকে আবার চিঠি দিয়েছে অতসী। এখানকার চিঠিপত্র কলকাতায় পৌঁছুতে তিন চার দিন লেগে যায়। তার মানে মেসোমশাই তার চিঠিটা পাবেন পরশু সকালে কিংবা বিকেলে।

চিঠি ডাকে দেওয়ার পর থেকেই অতসীর মাথায় প্রবাল সম্পর্কে উলটো-পালটা নানারকম ভাবনা কাজ করে যাচ্ছে। একবার মনে হচ্ছে, সঞ্জয়ই প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের চেহারা পুরোপুরি বদলে ফেলে ফাদারদের হাতে-পায়ে ধরে মিশনে লুকিয়ে আছে। একজন হত্যাকারীর পক্ষে চার্চের চাইতে নিরাপদ আশ্রয় আর কী হতে পারে? কোনও হত্যাকারী যে ধর্মস্থানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে, এটা কেউ ভাবতেও পারবে না। পরক্ষণেই আবার মনে হয়, যে-মানুষটা এই ছোটনাগপুরে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, এখানকার হাজার-হাজার গরিব দুঃখী অসহায় আদিবাসীর কাছে যে দেবদূতের মতো সে কি কখনও কাউকে খুন করতে পারে?

তার চিঠি পেলেই মেসোমশাই এখানে ছুটে আসবেন। তারপর শুরু হবে পুলিশি ইনভেস্টিগেশন। এই ব্যাপারটা যে কী নির্মম সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আছে অতসীর। যদি ইনভেস্টিগেশনের পর দেখা যায়, প্রবাল আর সঞ্জয় এক নয় তা হলে? একজন সৎ, মহৎ সেবাব্রতী যুবককে লাঞ্ছিত করার ক্ষতিপূরণ কী করে হবে?

মেসোমশাই এসে পড়ার আগেই প্রবাল সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে হবে। যদি বোঝা যায় সে সঞ্জয় নয়, তা হলে মেসোমশাইকে আটকাতে চেষ্টা করবে অতসী, কিছুতেই প্রবালকে

ছুঁতে দেবে না। কিন্তু বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেলে তা তো ফেরানো যায় না। মেসোমশাই হলেও তিনি পুলিশ অফিসার, ছোটবেলা থেকে মেসোমশাইকে দেখে-দেখে তাঁর সাইকোলজিটা ভালোই বোঝে অতসী। গন্ধ যখন একবার পেয়েছেন, প্রবালকে না দেখে কিছুতেই ছাড়বেন না মেসোমশাই। তিনি আসার আগে প্রবাল সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

ভাবতে-ভাবতে অতসীর মনে পড়ে যায়, গ্রামে ক'দিন একসঙ্গে ঘোরার জন্য প্রবালের বাকি ডায়েরিগুলো এখনও দেখা হয়নি। ওগুলো দেখতেই হবে। হয়তো ওর মধ্যে প্রবাল সম্পর্কে চমকে দেবার মতো কোনও খবর পাওয়া যাবে।

আজ দুপুরে একটা গ্রামে তার জন্য প্রবালের অপেক্ষা করার কথা আছে। অতসী ঠিক করে ফেলল, সেখানে যাবে না। তার বদলে লাকড়াকে নিয়ে সোজা চলে গেল মিশনে। আজ একটা বড় রকমের ঝুঁকি নেবে সে।

ফাদার বোথামের সঙ্গে দেখা করে দু-একটা সাধারণ কথার পর অতসী বলল, 'প্রবালবাবু আমাকে তাঁর ঘরে বসতে বলেছেন। উনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন। আমি একটু ওয়েট করতে চাই।' খুব স্বাভাবিক থাকতে চাইছিল সে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে টের পাচ্ছিল ডাহা মিথ্যে গলা দিয়ে বার করতে তার পা কাঁপছে।

ফাদার বোথাম বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' কফি টফি খাইয়ে তিনি নিজে গিয়ে অতসীকে প্রবালের ঘরে রেখে এলেন।

অতসী জানে প্রবাল সন্ধের আগে মিশনে ফিরবে না। এখন দুটো বাজে। তার মানে হাতে চার ঘণ্টা সাড়ে-চার ঘণ্টার মতো সময় আছে। এর মধ্যে যা করার করে ফেলতে হবে।

প্রবালের পড়ার টেবিলে গিয়ে প্রথমে সবগুলো ডায়েরি বার করল অতসী। তারপর স্নায়ুগুলো টান-টান করে পাতা উলটে যেতে লাগল।

ঘণ্টাদুয়েক বাদে একটা ডায়েরি খুলেই চমকে উঠল অতসী। প্রথম পাতাতেই যা লেখা রয়েছে তা এইরকম।

'রাজীব আমার প্রিয়তম বন্ধু। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবু যা সত্যি তা অস্বীকার করা যাবে না। ওর মতো দুশ্চরিত্র ডিবচ এবং মাতাল আমি সারা জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। এলাহাবাদে ও বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে।

'যাই হোক, অতসীকে আমি ভালোবাসি। আমি ওর ভালো চাই। আমার ভালোবাসার কথা কোনওদিনই ওর কাছে বলতে পারব না। প্রথম বাধা আমি ক্রিশ্চান, অতসী হিন্দু ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়ত আমাদের জীবনযাত্রাও সম্পূর্ণ আলাদা। অতসী সম্পর্কে আমার ফিলিং চিরকাল অব্যক্তই থাকবে। ভেতরে-ভেতরে ওর সম্বন্ধে যাই ভাবি না কেন, ওকে তা বুঝতে দেব না। বড় ভালো মেয়ে অতসী এবং ওদের বাড়ির লোকজন। আমি চিরকাল ওর বন্ধু হয়েই থাকতে চাই।

'মোটামুটি দিন ভালোই কেটে যাচ্ছিল কিন্তু কয়েকদিন হল রাজীব দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছে। অতসীর সঙ্গে আমার পিসির বাড়িতেই ওর আলাপ হয়েছে। ক'দিন ধরেই দেখছি রাজীব আমাকে না জানিয়ে অতসীদের বাড়ি যাচ্ছে। ওর মধ্যে একটা ট্রিমেন্ডাস ম্যাগনেটিক চার্ম আছে, যে-কোনও মেয়ের পক্ষে তা ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। যা আশঙ্কা করেছি তাই মনে হয় ঘটছে। অতসী রাজীবের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। যেভাবেই হোক তাকে আটকাতে হবে।'

কয়েক পাতার পর প্রবাল আবার লিখেছে, 'অতসীকে আমি রাজীবের দিক থেকে ফেরাতে

চাইছি কিন্তু সে আমাকে ভুল বুঝছে। ওর ধারণা আমি রাজীব সম্পর্কে জেলাস। একেবারেই ভুল ধারণা। রাজীব আমার প্রিয়তম উপকারী বন্ধু, তার বিরুদ্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু অতসীর আমি শুভাকাঙক্ষী, তাকে বাঁচাতেই হবে। কীভাবে, সেটাই বুঝতে পারছি না। জীবনে এমন বিপদে আর কখনও পড়িনি।'

আরও কয়েক পাতার পর লেখা আছে, 'রাজীব আর অতসীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অতসীকে আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে নিয়ে গিয়ে রাজীবের বিরুদ্ধে একটা কথাও না বলে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এ-বিয়ে ঠিক হবে না। অতসী আমাকে ভুল বুঝল।'

এরপর অনেকগুলো ফাঁকা পাতার পর লেখা আছে, 'ক-দিন আগে আমার জীবনের সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে। অতসী আর রাজীবের বিয়ের ঠিক আগের দিন দিল্লির এক বন্ধুর কাছ থেকে হঠাৎ খবর পেলাম রাজীব ওখানকার একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল। অতসীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য দিল্লি গিয়ে স্ত্রীকে খুনের ভয় দেখিয়ে ডাইভোর্সের পেপার সই করতে বাধ্য করে। স্ত্রী সই করে দেয় কিন্তু পরে অপমানে দুঃখে আত্মহত্যা করে। এমন একটা ক্রিমিনালের সঙ্গে অতসীর বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। এ-বিয়ে যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। আমি পাগলের মতো অতসীদের বাড়ি দৌড়ে গেলাম, কিন্তু অতসী আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল।

'আমি এবার চলে এলাম রাজীবের ফ্ল্যাটে। তাকে বললাম, এ-বিয়ে বন্ধ করতে। এই নিয়ে চিৎকার এবং উত্তেজনার চরম হল। ও ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিল। আমি অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমিও তাকে ছেড়ে দিইনি। একসাইটমেন্টের মাথায় আচমকা রাজীব একটা রিভলবার টেনে বার করল, কিন্তু ও ট্রিগার টিপবার আগেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রিভলবারের মুখ ঘুরে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে ফায়ার হল, একটা গুলি রাজীবের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। আমার সব চাইতে প্রিয় এবং উপকারী বন্ধু আমার হাতেই খুন হল।

'রাজীব চিৎকার করে পড়ে গিয়েছিল। রক্তে ঘরটা ভেসে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। হঠাৎ চারপাশ থেকে অনেক মানুষের চেঁচামেচি কানে এল, তারা রাজীবের ঘরের দিকেই আসছে বলে মনে হল। সেই মুহূর্তে নিজেকে বাঁচানো ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। অন্ধের মতো খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

এরপর ওই ডায়েরিটায় আর কোনও কিছু লেখা নেই। বাকি পাতাগুলো সব সাদা।

বছর মিলিয়ে আরেকটা ডায়েরি তুলে নিল অতসী। ওটারও আধাআধি পর্যন্ত কিছু লেখা হয়নি। তারপর এক জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল অতসীর। সেখানে লেখা আছে, 'আজ আমার পুনর্জন্ম। ফাদার বোথাম মাদ্রাজ থেকে আমাকে তাঁদের মিশনে নিয়ে এলেন। এখন থেকে আমি এখানেই থাকব।

'রাজীব খুন হয়ে যাবার পর একটা বছর উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে ছুটে বেড়িয়েছি। বন্ধুকে হত্যা করার গ্লানিতে আর পাপবোধে আমি এই একটা বছর খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছিলাম, আত্মহত্যা করব, রাঁচির কাছে এক জায়গায় এসে ট্রাকের তলায় লাফও দিয়েছিলাম। কিন্তু মরা হল না। প্লাস্টিক সার্জারির পর চেহারা বদলে গেল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নামটাও পালটে ফেললাম। এখানে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ আর মুন্ডাদের মধ্যে কাজ করতে-করতে তাদের ভালোবেসে ফেলেছি। তারাও আমাকে এত ভালোবাসে যে আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। এখানে আছি ঠিকই কিন্তু সেই পাপবোধটা আমার পিছু ছাড়েনি। প্রায়ই মনে হয় পুলিশের কাছে সারেন্ডার করব, কিন্তু পারিনি। ফাদার বোথাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন না, একদিন তাঁকে সবটা বলে তাঁর পরামর্শ চাইব।'

এরপর পরপর তিন বছরের ডায়েরিতে রাজীব বা অতসী সম্পর্কে কোনও প্রসঙ্গ নেই। তারপর এই বছরের ডায়েরিতে একটা পাতায় অতসীর চোখ আটকে গেল।

'বিনয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ক'দিন আগে চমকে উঠেছিলাম। অতসী এখানকার ট্রাইব্যাল ওয়েলফেরার অফিসের চার্জ নিয়ে এসেছে। সেদিনের পর থেকে ও প্রায়ই আমার খোঁজে মিশনে আসছে কিংবা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। আমার বিশ্বাস, অতসী আমার সম্পর্কে কিছু একটা সন্দেহ করেছে। আমি কে, আমার আইডেনটিটি কী, পুরোপুরি না হলেও খানিকটা নিশ্চয়ই ও আন্দাজ করতে পেরেছে। অতসী যাতে আমাকে সম্পূর্ণ চিনতে পারে সেই জন্য ডায়েরিগুলো টেবলের ওপর সাজিয়ে রাখলাম। আমি নিশ্চিত ও আমার ঘরে এসে ডায়েরিগুলো দেখলেই পড়বে। নিজের পাপবোধের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর পারছি না।' আরও কয়েক পাতার পর লেখা আছে, 'ফাদার বোথামকে আজই সব জানিয়ে বললাম, পুলিশে সারেন্ডার করব। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দিনকয়েক অপেক্ষা করতে বললেন।'

ডায়েরিগুলো শেষ করে অতসী যখন উঠল, সন্ধে নামতে আর খুব দেরি নেই। চোখের সামনে কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সে, পৃথিবীর কোনও শব্দই শুনতে পাচ্ছে না। তার হৃৎপিন্ডে ঝড়ের মতো কী যেন বয়ে যাচ্ছে।

প্রায় অন্ধের মতো অতসী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। মিশনের মাঠের পাশে অফিসের সেই জিপটায় উঠে লাকড়াকে বলল, 'ডিহিরিতে চল।' ডিহিরি হল সেই গ্রাম যেখানে আজ প্রবালের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা।

ডিহিরিতে আসতে-আসতে সন্ধে হয়ে গেল! প্রবাল ওখানে নেই। বিকেলেই নাকি এখান থেকে সে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। খুব সম্ভব মিশনেই ফিরে গেছে।

অতসী একবার ভাবল আবার মিশনে যাবে কি না। পরমুহূর্তে ঠিক করে ফেলল, নিজের কোয়ার্টারেই ফিরবে। এখন কী করা উচিত সে ভাবতে পারছে না। কোয়ার্টারে গিয়ে চুপচাপ বসে সব ব্যাপারটা তাকে ঠিক করে নিতে হবে। যেমন করে হোক প্রবাল অর্থাৎ সঞ্জয়কে বাঁচাতেই হবে।

চোদ্দো

পরের দিন ভোরে মিশনে চলে এল অতসী। আগের রাতে এক সেকেন্ডও ঘুমোতে পারেনি সে, শুধু সঞ্জয়ের কথাই ভেবেছে।

সবে রোদ উঠেছে। এখনও সঞ্জয় মিশন থেকে বেরিয়ে পড়েনি।

অতসীকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'আসুন, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ঝাপলা গলায় অতসী বলল, 'আমি আসব আপনি জানতেন নাকি?'

'জানতাম। ও কি, দাঁড়িয়ে কেন—বসুন। সকালবেলা আজ আপনাকেই প্রথম দেখলাম, দিনটা ভালো যাবে।'

'একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

'কী দরকার?'

'একটা কথা রাখতে হবে। বলুন রাখবেন?'

সঞ্জয় হাসল, 'না শুনে কী করে বলব আপনার কথা রাখতে পারব কি না।'

অতসী বলল, 'না শুনেই বলতে হবে।'

সঞ্জয় বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আগে বলুন তো।'

'আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

'কেন?'

'তা জানতে চাইবেন না। শুধু শুনে রাখুন এখানে থাকলে আপনার খুব বিপদ হবে।'

'তাই নাকি।' বলে চুপ করে রইল সঞ্জয়। কী বিপদ জানতে চাইল না।

অতসী বলল, 'কী, যাচ্ছেন তো?'

'না।'

'আপনাকে যেতেই হবে।'

'তা হয় না।'

'হতেই হবে। আমার এই কথাটা তোমাকে রাখতেই হবে সঞ্জয়।' হঠাৎ কী হয়ে গেল অতসীর। দু-হাত দিয়ে সঞ্জয়ের একটা হাত ধরে অবরুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, 'আমি তোমার কত বড় ক্ষতি করে ফেলেছি তুমি জানো না।'

সঞ্জয় এতটুকু উদ্বিগ্ন হল না। বলল, 'কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না অতসী। এখানকার মানুষ বড় দুঃখী, তাদের ছেড়ে কোথাও আমার যাওয়ার উপায় নেই।'

'তুমি যদি সব শোনো, আমার কথাটা রাখবে। আমি পুলিশকে খবর দিয়েছি।'

'পুলিশ একদিন আসতই অতসী। তুমি তাদের খবর না দিলেও আমি নিজে গিয়েই সারেন্ডার করতাম। আমি যে-পাপ করেছি তার শাস্তি তো নিতেই হবে।'

'তুমি কোনও পাপ করোনি! বরং একটি মেয়েকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছ। আর সে তোমাকে ঘৃণা করেছে, অপমান করেছে, শেষ পর্যন্ত ফাঁসিরও ব্যবস্থা করেছে—' বলতে-বলতে গলার স্বর বুজে গেল অতসীর।

সঞ্জয় বলল, 'এসব কথা বোলো না অতসী। কারও সম্বন্ধেই আমার কোনও অভিযোগ নেই। অনেক বেলা হয়ে গেল, এবার আমাকে বেরুতে হবে।'

এর পর রোজ এসে একই কথা বলতে লাগল অতসী, 'এখান থেকে চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও—'

সঞ্জয়ের একই উত্তর, সে কোথাও যাবে না।

অতসী বলল, 'আমার ওপর রাগ করে তুমি কি নিজের ক্ষতি করে যাবে?'

সঞ্জয় বলল, 'আমাকে দেখে কখনও কি তোমার মনে হয়েছে—রাগ করেছি?'

'তোমার কি এতটুকু ভয়ও হচ্ছে না?'

'আগে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু যেখানে এসে আশ্রয় পেয়েছি সেখানে কারও ভয় থাকে না। নিজের কথা আমি ভাবি না, ঈশ্বরের ওপর ওটা ছেড়ে দিয়েছি।'

পনেরো

দিন তিনেক বাদে সন্ধেবেলায় মেসোমশাইয়ের টেলিগ্রাম এল। আজকালের মধ্যে তিনি ধাতুরিয়ায় আসছেন। বিহার পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবে।

কোন ট্রেনে তিনি আসবেন সে-কথা জানাননি মেসোমশাই। ফলে অতসী যে স্টেশনে গিয়ে তাঁকে ধরবে তার উপায় নেই।

টেলিগ্রামটা করা হয়েছে কাল। কালই যদি মেসোমশাই রওনা হয়ে থাকেন আজ এতক্ষণে

এসে পড়ার কথা। এখনও যখন আসেননি, নিশ্চয়ই তা হলে আজ রওনা হবেন। কাজেই মেসোমশাইয়ের আসতে-আসতে কাল।

কলকাতা থেকে এখানে আসার তিনটে ট্রেন আছে, একটা আসে ভোরে, একটা দুপুরে, একটা বিকেলে। মেসোমশাই কোন ট্রেনে আসবেন ঠিক নেই। তা ছাড়া সোজা তিনি অতসীর কাছেই আগে আসবেন, না মিশনে চলে যাবেন, তাও বোঝা যাচ্ছে না। যখনই আসুন আর যেখানেই আসুন, শেষ পর্যন্ত মিশনে তিনি হানা দেবেনই। অতসী ঠিক করে ফেলল, কাল সকালে উঠে সে মিশনে চলে যাবে। সঞ্জয় যাতে এখান থেকে চলে যায়, প্রাণপণে শেষ একটা চেষ্টা করবে।

দরকার হলে জোরই খাটাবে সে।

পরের দিন সকালে মিশনে এসে চমকে উঠল অতসী। গোটা মিশনটা বিহার পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে। তার মধ্যে ফাদার বোথাম, সঞ্জয় আর মেসোমশাইকে দেখা যাচ্ছে। দূরে অন্য ফাদাররা আর মিশনের ছেলেমেয়েরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেসোমশাই তাহলে ভোরের ট্রেনে এসে সোজা পুলিশ ফোর্স নিয়ে এখানে চলে এসেছেন!

সঞ্জয়কে দেখিয়ে মেসোমশাই অতসীকে বললেন, 'এই ছেলেটাই তো?'

অতসী উত্তর দিতে চেষ্টা করল, পারল না, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

সঞ্জয় বলল, 'ওকে জিগ্যেস করার দরকার নেই। আমি বলছি আমিই সঞ্জয়। চলুন—'

অতসী বুঝতে পারছিল তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে আর দুই চোখ বেয়ে উষ্ণ স্রোত নেমে আসছে। সঞ্জয়কে কিছু বলতে চেষ্টা করল সে, পারল না।

সঞ্জয় কাছে এসে বলল, 'দুঃখ কোরো না; এটা আমার প্রাপ্য। চলি—'

মেসোমশাইও বললেন, 'চলি রে সোনা, এবার আর তোর ওখানে যেতে পারব না। কালপ্রিটকে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে হবে। পরে যখন আসব, তোর ওখানে নিশ্চয়ই দিন কয়েক থেকে যাব।'

একটু পরে সঞ্জয়কে নিয়ে পুলিশের অনেকগুলো ভ্যান সামনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অনেক দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফাদার বোথাম ওধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এগিয়ে এসে অতসীর কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর মমতায় বললে, 'কেঁদো না অতসী, কেঁদো না। গড উইল ব্লেস হিম।'

অতসী উত্তর দিল না। তার চোখের সামনে ছোটনাগপুরের রমণীয় ল্যান্ডস্কেপ দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।



অন্য রূপ

প্রথম পর্ব

বিবিবাজারের মাঝখান দিয়ে মেন রাস্তাটা শিরদাঁড়ার মতো সোজা চলে গেছে। তার এক মাথায় রেল স্টেশন, আরেক মাথায় গঙ্গার লঞ্চঘাটা। স্টেশনে গেলে পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে হয় না; কলকাতার ট্রেন পাওয়া যায়। হাওড়া লাইনের সব লোকাল ট্রেনই বিবিবাজারে একবার থামবেই। লঞ্চঘাটা থেকে পনেরো মিনিট পরপর মোটর লঞ্চ ছাড়ে। গঙ্গার ওপারে বিশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। চটকল, কাচকল, কটন মিল, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ইত্যাদি। বিরাট-বিরাট অগুনতি চিমনি খাড়া মাথা তুলে আছে আর দিনরাত গলগল করে কালচে ধোঁয়া ছেড়ে ঝকঝকে নীলাকাশকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে।

স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে মেন রাস্তার ঠিক গায়েই একটা বহুকালের পুরোনো রেন-ট্রি। কয়েক বছর আগে এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি গাছটার গোড়া লাল সিমেন্ট দিয়ে গোল করে বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আগে-আগে সকাল-সন্ধে এ-শহরের বয়স্ক রিটায়ার্ড লোকেরা এখানে এসে বসত। ইদানীং জায়গাটা ছোকরাদের দখলে চলে গেছে। এদের বেশির ভাগই বেকার, রকবাজ, হাফ-মস্তান। কেউ-কেউ আবার পার্ট-টাইম ওয়াগন ব্রেকারও। বুড়োরা রেন-ট্রির ছায়াও আজকাল মাড়ায় না।

রেন-ট্রির গা ঘেঁষে ক'টা চায়ের দোকান এবং সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ড। ট্রেন থেকে নেমে এ-শহরের লোকজন উঁচু প্ল্যাটফর্মের পাশের সিঁড়ি ভেঙে নীচে এসে ওখান থেকে রিকশা ধরে। কিংবা যারা কলকাতা বা অন্য কোথাও যায় তাদের অনেকেই সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ড পর্যন্ত এসে উঁচু প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ওঠে।

রিকশা স্ট্যান্ড এবং চায়ের দোকানের পর থেকেই শহরের জমজমাট অংশের শুরু। ঝকমকে টেলরিং শপ, রেস্তোরাঁ, সিনেমা হল, টিভি, রেডিও, রেকর্ডপ্লেয়ারের শো-উইন্ডো, জিনসের দোকান, রেফ্রিজারেটরের শো-রুম ইত্যাদি। ছোট শহরের এটাই নিউ মার্কেট বা পার্ক স্ট্রিট।

শীত শেষ হয়ে এসেছে। আর দু-চারদিন পরেই ফাল্গুন মাস পড়ে যাবে। বাতাসে যে ঠান্ডা আমেজটুকু রয়েছে তা বেশ আরামদায়ক। এরই ভেতর এ-শহরে পলাশ এবং কৃষ্ণচূড়া দু-একটা করে ফুটতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যেই ডগডগে আগুনের মতো থোকা-থোকা লাল ফুলে চারদিক ছেয়ে যাবে।

সবে সন্ধে হয়েছে। তবে ঘন অন্ধকার এখনও নামেনি। গোটা বিবিবাজার শহরটা সারা গায়ে আবছা উলঙ্গ-বাহার শাড়ি জড়িয়ে আছে যেন।

অবশ্য এরই মধ্যে দোকানে-দোকানে, শো-রুমে, সিনেমা হলে অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তায় যদিও মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে বাতিগুলো এখনও জ্বালানো হয়নি তবু দোকান-টোকানের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে।

কলকাতার দিক থেকে বটেই, উলটো দিক থেকেও লোকাল ট্রেন আসছে অনবরত। মিনিটখানেক থেমে, গাদা-গাদা লোক নামিয়ে আবার সেগুলো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাচ্ছে।

দেশভাগের পর এ-শহরে মানুষ বেড়েছে দশগুণ। পপুলেশন এক্সপ্লোশন বা জন বিস্ফারণ

কাকে বলে, এখানে এলে টের পাওয়া যায়। সকাল থেকে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত বিবিবাজারের রাস্তায়-রাস্তায় থিকথিকে ভিড়। ভিড়টা সবচাইতে বেশি ওই সন্ধেবেলায়। সকালে যারা নানা কাজে কলকাতায় বা চারপাশের ফ্যাক্টরিগুলোতে যায়, এ-সময় তারা ফিরে আসে। যারা বিবিবাজার থেকে বেরোয় না, তারাও সন্ধেবেলায় বাড়ি বসে থাকে না, ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে। এখন সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, শাড়ির দোকান, সব বোঝাই।

রেন-ট্রির তলায় লাল সিমেন্টের গোল সিটটার একধারে বসেছিল মলয়। তার থেকে সামান্য দূরে বিজন, মতি, লালকু এবং ঝন্টে। ওদের বয়স কুড়ি থেকে আটাশের ভেতর।

বাঙালিদের তুলনায় মলয়ের হাইট বেশ ভালোই। পাঁচ ফুট সাত-আট ইঞ্চি তো হবেই। নাক-মুখ কাটা-কাটা, চওড়া কপাল, মাঝারি চোখ। চুলগুলো নিতান্ত অবহেলায় পেছন দিকে উলটে দেওয়া। গায়ের রং বাদামি। লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যাবে ছেলেটার মধ্যে কোথাও একটা ধারালো ব্যাপার আছে। একেই হয়তো ব্যক্তিত্ব বলা যায়।

তার পরনে কোঁচকানো ময়লা ট্রাউজার্স আর পুরোনো বুশ-শার্ট। শার্টটার দুটো বোতাম নেই। পায়ে তালিমারা চটি।

মলয়ের মুখে তিন-চার দিনের জমানো দাড়ি। চোখের তলায় কালচে ছোপ। অন্যমনস্ক এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। বোঝা যায়, বেশ কিছুদিন তার ঘুম হয়নি।

এই মুহূর্তে স্টেশনের দিকে তাকিয়ে আছে মলয়। তার তাকানোটা উদ্দেশ্যহীন, কিছুটা বা ক্লান্ত। অবিরাম ট্রেন আসছে যাচ্ছে, লোকজন নামছে বা উঠছে, চারদিকে হইচই, চিৎকার। কিন্তু মলয় কিছুই যেন দেখছিল না।

রেন-ট্রির তলায় অন্য যে চারজন রয়েছে তার মধ্যে বিজনের বয়সই তার চাইতে বেশি। ঢ্যাঙা চোয়াড়ে চেহারা। কম্পার্টমেন্টালে স্কুল ফাইনাল পাস করার পর কয়েক বছর এমপ্লয়েমেন্ট এক্সচেঞ্জে আর ডালহৌসি পাড়ার অফিসে-অফিসে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথায়ও কিছু জোটাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ছেনতাই শুরু করেছে। রাত একটু বেশি হলে রাস্তায় লোক চলাচল যখন কমে যায়, বিবিবাজারের কোনও নির্জন গলির মুখে হাতে দশ ইঞ্চি ড্যাগার নিয়ে দাঁড়ায় বিজন, ঘণ্টা দুই দাঁড়ালেই কারও গলার হার কি হাতের চুড়ি কিংবা কারও মানি-ব্যাগ তার পকেটে চলে আসে। দিনের বেলাটা প্রায় সারাক্ষণই রেট-ট্রির তলায় বসে আড্ডা দেয় সে।

মতি কনফার্মড বেকার। নানা জায়গায় অনেকদিন ঘোরাঘুরি করেও চাকরি-বাকরি পায়নি। রেট-ট্রির নীচেই দিনরাত বসে থাকে, সিগারেট ফোঁকে, খিস্তিখাস্তা দেয়। খুব শিগগিরই ছেনতাই বা ওয়াগন-ভাঙার লাইনে চলে যাবে সে।

লালকুর পেটানো চেহারা, মঙ্গোলিয়ান মুখ। 'এই এডুকেশন সিস্টেমে কিছুই হবে না' ধরে নিয়ে কবেই কলেজ ছেড়ে ওয়াগন-ব্রেকার হয়ে উঠেছে। তার ওপর পুলিশের কড়া নজর আছে। তবে এখনও লালকুকে অ্যাকশানের অবস্থায় ধরতে পারেনি।

ঝন্টে বিবিবাজারের বিখ্যাত মস্তান। দুর্দান্ত ছুরি চালায়। এই শহরে তার মতো বোমা বানাতে আর কেউ পারে না। শোনা যায়, দু-তিনটে নাকি মার্ডারও করেছে। এক পার্টি লিডারের শেলটারে আছে। পুলিশ ধরে নিয়ে গেলেও আধঘণ্টায় বেশি লক-আপে পুরে রাখার ক্ষমতা নেই।

লালকু চাপা ফুল-প্যান্টের হিপ পকেট থেকে লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরিয়ে নিল। দুই পা সামনে ছড়িয়ে ক্রস করে কায়দা করে ধোঁয়ার সার্কেল হাওয়ায় ছেড়ে মলয়ের দিকে তাকাল। চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করতে-করতে তাকে বলল, 'কি গুরু, তোমার মতো গুড বয় আমাদের মতো খচড়াদের দলে ভিড়লে কেন?'

মলয় একবার লালকুর দিকে তাকিয়েই ফের স্টেশনের লোকজনের এবং ট্রেনের যাতায়াত দেখতে লাগল।

লালকু আবার বলল, 'ক'দিন ধরেই দেখছি সকাল-বিকেল এখানে বডি ফেলে রেখেছ। অ্যান্টি-সোশাল মাকড়াদের সঙ্গে মিশলে ক্যারেক্টারের বারোটা বেজে যাবে গুরু।'

বাকি সবাই দাঁত বার করে হাসতে থাকে, 'টেরিফিক বলেছিস মাইরি। আমরা যা মাল, আমাদের গায়ে টাচ লাগলেও হেভি বদনাম।'

লালকু বলল, 'এখান থেকে হড়কে যাও গুরু। তুমি হলে বিবিবাজারের হিরো—একখানা জুয়েল। কেন এখানে এসে লাইফটা বেকার পাংচার করছ? ওঠো গুরু, ওঠো। ফুটে যাও—'

একই শহরের ছেলে। সবাই সবাইকে চেনে। মলয় যে ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট, বিবিবাজারের কারও জানতে বাকি নেই। স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করেছিল। খবরের কাগজে তার নাম এবং ছবি বেরিয়েছে। বিএ পার্ট ওয়ানেরও হিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে সে, কিন্তু থার্ড ইয়ারে ওঠার পর এই কিছুদিন হল কলেজে যাচ্ছে না। আজকাল মাঝে-মাঝেই তাকে এই রেন-ট্রির তলায় দেখা যায়।

মলয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই খানিকটা দূরে রেডিও টিভির দোকানটার সামনে একটা ঝকঝকে সাদা রঙের অ্যামবেসেডর এসে দাঁড়াল।

বিবিবাজারের প্রায় সবাই গাড়িটা চেনে। ঝন্টেদের চোখ সেদিক ঘুরে গিয়েছিল। মতি বলল, 'উমানাথ ঘোষালের গাড়ি এখানে কেন?'

'উমানাথ' শুনেই চমকে স্টেশনের দিক থেকে মুখ ফেরাল মলয়। আর তখনই দেখা গেল, গাড়ির দরজা খুলে আজিজুল নেমে আসছে। লোকটা উমানাথের ড্রাইভার। বয়স পঞ্চাশ পেরুলেও মজবুত চেহারা তার। পরনে ধবধবে উর্দি, মাথায় টুপি। আজিজুলকে বেশ ভালো করেই চেনে মলয়।

প্রথমে মনে হয়েছিল, কোনও দরকারি কাজে হয়তো এদিকে এসেছে আজিজুল। কিন্তু কোনওদিকে না তাকিয়ে সে সোজা রেন-ট্রির তলায় মলয়ের কাছে চলে গেল। বলল, 'আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। শুনলাম, আপনি এখানে এসেছেন।'

আজিজুল আগে কখনও, কোনও কারণেই তাদের বাড়ি যায়নি। মলয় যতটা অবাক হল, তার চাইতে ঢের বেশি উদ্বিগ্ন। বলল, 'আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে কেন?'

'সাহেব আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

সাহেব অর্থাৎ উমানাথ ঘোষাল। মলয়ের উদ্বেগ হঠাৎ দশগুণ বেড়ে গেল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'কেন?'

আজিজুল ইউ পি'র লোক। তবে দশ বছর বয়স থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে। বাংলাটা যে-কোনও বাঙালির মতোই বলে। সে বলল, 'আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছেন। গাড়ি নিয়ে এসেছি। চলুন।'

ভেতরে-ভেতরে এক ধরনের চাপা উদ্বেগ টের পেল মলয়। উমানাথ ঘোষালকে সে ভালোই চেনে। বিবিবাজারের বিখ্যাত পয়সাওয়লা লোক। কলকাতায় স্টিভেডরি, কেমিক্যালস এবং আরও নানারকমের বিজনেস আছে। শোনা যায়, তাঁর দেশি আর ইমপোর্টেড গাড়ির সংখ্যাই নাকি দশ-বারোটা। ক্যামাক স্ট্রিটে জমকালো অফিস ছাড়া তিন-চারটে দামি ফ্ল্যাট আছে। আরও কী-কী আছে কে জানে। বিবিবাজারে কয়েক বিঘা জমি জুড়ে তাঁদের বিশাল বাড়ি। উমানাথ ঘোষাল ওখানেই থাকেন সপরিবারে এবং বিবিবাজার থেকেই নিয়মিত রোজ কলকাতার অফিসে যাতায়াত করেন।

মলয় যেমন উমানাথকে চেনে, তেমনি তিনিও হয়তো মলয়কে চেনেন। কেন না, কয়েক জেনারেশন ধরে উমানাথরা এবং মলয়রা এই শহরে আছে। তবে, আলাপ-টালাপ কখনও হয়নি। হওয়ার কোনও সুযোগই নেই। মলয়দের বাড়ি থেকে উমানাথদের বাড়িটা মাত্র দেড় মাইল দূরে। কিন্তু সামাজিক স্টেটাসের দিক থেকে তাদের মাঝখানের দূরত্বটা কয়েক হাজার মাইলের। চার স্কোয়ার

মাইল আয়তনের এই ছোট্ট শহর বিবিবাজারে পুরুষানুক্রমে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো বাস করছে।

উমানাথ ঘোষালের মতো প্রচণ্ড বড়লোক হঠাৎ তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি পাঠালেন কেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে কি শর্মিলার ব্যাপারটা—

আজিজুল তাড়া লাগায়, 'কী হল, চলুন। সাহেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

এতক্ষণ ভেতরে-ভেতরে উদ্বেগটা চলছিল। তার সঙ্গে এবার খানিকটা ভ মিশল। তবে সেটাকে কোনওভাবেই চোখেমুখে ফুটে উঠতে দিল না মলয়। আজিজুলের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'তোমার সাহেব আমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন কেন?'

'জানি না।'

চোখ কুঁচকে কী ভেবে মলয় বলল, 'যদি আমি না যাই।'

আজিজুল বলল, 'তা হলে সাহেবকেই আপনার কাছে আসতে হবে?'

কী এমন ঘটেছে যাতে সে না গেলে উমানাথই তার কাছে চলে আসবেন? ব্যাপারটা কিছুতেই মলয়ের মাথায় ঢুকছে না। আবার কী বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই ওধার থেকে ঝন্টে চেঁচিয়ে উঠল, 'এত্তে বড় আদমি গাড়ি পাঠিয়েছে। ভ্যানতাড়া না করে স্ট্রেট চলে যাও গুরু। শ্লার হেভি ক্যাশ। আসার সময় মালকড়ি খসিয়ে এনো।' ঝন্টে হিন্দি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে অদ্ভুত এক ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে।

বাকি সবাই কোরাসে গলা মেলাল, 'চলে যাও গুরু। আমাদের মতো খচড়াদের বডিতে বডি ঠেকিয়ে বসে থাকলে ফায়দা নেই। ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো—'

ভয় আর দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও কিছুটা কৌতূহল হচ্ছিল মলয়ের। কী কারণে উমানাথ তার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন, সেটা জানাই যাক। নিজের অজান্তে উঠে পড়ল মলয়, তারপর নিঃশব্দে আজিজুলের পাশাপাশি কয়েক পা হেঁটে গিয়ে ঝকঝকে অ্যামবেসেডরটায় উঠল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই স্টার্ট দিল আজিজুল। মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটা তেলের মতো গড়িয়ে চলল।

দুই

দশ মিনিটও লাগল না, সাদা অ্যামবেসেডর উমানাথ ঘোষালদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ধবধবে ইউনিফর্ম পরা দরোয়ান লোহার প্রকাণ্ড গেট খুলে দিতেই গাড়িটা বিশাল কম্পাউন্ডের ভেতর ঢুকে গেল।

সামনের দিকে সবুজ গালিচার মতো মস্ত লন। একপাশে ফুলের বাগান। অজস্র মরশুমি ফুলে বাগানটা আলো হয়ে আছে। বাগান এবং লনের মাঝখান দিয়ে নুড়ির রাস্তা। দু-ধারে কয়েক ফুট পরপর ছাতার আকারে সমান মাপের ঝাউ। আর আছে সুদৃশ্য রঙিন টবে নানা জাতের দুর্লভ অর্কিড।

লন এবং বাগানের পর বড় তেতালা বাড়ি। এই সেঞ্চুরির প্রথম দিকের মতো অর্কিটেকচার। পুরু দেওয়াল, উঁচু সিলিং, গরাদহীন জানালা এবং বিরাট-বিরাট দরজা। সামনের দিকে পোর্টিকো।

অ্যামবেসেডরটাকে সোজা পোর্টিকোর তলায় নিয়ে গেল আজিজুল। মলয় ব্যাক সিটে বসেছিল। গাড়ি থেকে নেমে পেছন দিকের দরজা খুলে আজিজুল বলল, 'আসুন।'

বাইরে আসতেই মলয়ের চোখে পড়ল, পোর্টিকোর তলা থেকে যে সাত-আটটা সিঁড়ি ওপরের বারান্দায় উঠে গেছে সেখানে মধ্যবয়সি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায়, এ-বাড়ির কাজের লোক।

মলয়কে দেখিয়ে আজিজুল লোকটাকে বলল, অনাথদা, সাহেব এঁকে সঙ্গে করে আনতে বলেছিলেন।'

'জানি। ওনার জন্যেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' অনাথ মলয়ের দিকে ফিরে বলল, 'সাহেব আপনাকে বসতে বলেছেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

ড্রাইভার পাঠিয়ে ডেকে আনা, রিসিভ করার জন্য লোক দাঁড় করিয়ে রাখা—সমস্ত ব্যাপারটা যেন সত্যি নয়, কোনও এক অপার্থিব স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে মলয় টের পেল, বুকের ভেতর সেই উদ্বেগটা আরও বেড়ে গেছে।

একটু পর অনাথের সঙ্গে একতলারই ডান পাশে প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে এসে ঢুকল মলয়। গোটা মেঝেটা ছ'ইঞ্চি পুরু ইজিপশিয়ান কার্পেটে মোড়া। কয়েক সেট দামি-দামি ফ্যাশনেবল সোফা এবং সেন্টার টেবল চমৎকার করে সাজানো। ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালে বিখ্যাত আর্টিস্টদের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। একধারে সুদৃশ্য স্ট্যান্ডে রঙিন টিভি। আরেক দিকে পুরো দেওয়ালের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত ফুট চারেক চওড়া করে কেটে, কাচ বসিয়ে অ্যাকুয়েরিয়াম বসানো হয়েছে। নানা রং-এর আলো জ্বলছে তার ভেতর। সেই আলোয় দুষ্পাপ্য রঙিন মাছেরা খেলে বেড়াচ্ছে। হিন্দি এবং হলিউডের চোখ ধাঁধানো সিনেমাতেই শুধু এই ধরনের ড্রইংরুমে দেখা যায়।

এ-বাড়িতে আগে আর কখনও আসেনি মলয়। তেমন সুযোগই হয়নি। সে জানে উমানাথ ঘোষালরা দারুণ বড়লোক। কতটা বড়লোক, এই ড্রইংরুমে পা দিলে খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

একটা কথা মনে পড়তে রক্তস্রোতে এক ধরনের শিহরণ বা উত্তেজনা টের পেল মলয়। এ-বাড়িতে শর্মিলা থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে এখানে দেখা হবে কি?

অনাথ বলল, 'বসুন। আমি সাহেবকে আপনার খবর দিয়ে আসি।'

এমনিতে মলয় খুবই স্মার্ট এবং ঝকঝকে। কিন্তু এই বিশাল ড্রইংরুমে এসে খুবই অস্বস্তি হতে লাগল। কোনওরকমে জড়সড় হয়ে একটা সোফার কোণে বসে পড়ল সে।

অনাথ চলে গেছে। ফাঁকা ঘরে বসে-বসে উমানাথের ভাবনাটা ঘুরে-ঘুরে মলয়ের মাথায় পাক খেতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানা যাবে, উমানাথ ঘোষাল কী উদ্দেশ্যে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে ধরে এনেছেন। তবু যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে, দুশ্চিন্তা কাটছে না।

কিছুক্ষণ বাদে অনাথ ফিরে এল। তার পেছন-পেছন চাকাওয়লা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রলি ঠেলতে-ঠেলতে একটা বেয়ারাও ঢুকল। হাসপাতালে মলয় দেখেছে এরকম গাড়িতে করেই পেশেন্টদের বেডের কাছে খাবার দিয়ে যায়। তবে এই ট্রলিটা অনেক বেশি দামি এবং সুন্দর। খুব সম্ভব ইমপোর্টেড।

ট্রলিটার মাথায় অনেকগুলো রুপোর প্লেট সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। একটা রুপোর গেলাসও দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, ওটাতে জল রয়েছে। ওটার ঢাকনিও রুপোর।

অনাথ কাছে এসে বলল, 'সাহেব আসছেন। তার আগে একটু চা-টা খান।'

মলয় বলল, 'চায়ের দরকার নেই। তোমাদের সাহেবের জন্যে কতক্ষণ আর বসে থাকতে হবে?'

'এক সেকেন্ডও নয়। আমি এসে গেছি।' দরজার কাছে একটি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কণ্ঠস্বরটি গম্ভীর হলেও ভীতিকর নয়, বরং বেশ নরম আর আন্তরিক।

চমকে মুখ ফেরাল মলয় এবং সঙ্গে-সঙ্গেই উমানাথ ঘোষালকে দেখতে পেল। টকটকে ফরসা রং। ছ-ফুটের ওপর হাইট। বড় আকারের গোল মুখ। ভারী চোয়াল। মসৃণ গাল নিখুঁত করে কামানো। মাঝারি মাপের চোখ দুটি দারুণ ঝকঝকে আর ধারালো। সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। চওড়া কপাল উমানাথের। চুল পাতলা, মাথার মাঝখানে বেশ টাক পড়েছে।

তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু স্বাস্থ্য দারুণ মজবুত। হাত দুটো কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত

নেমে এসেছে। এত বয়সেও চেহারায় মেদের চিহ্ন মাত্র নেই।

এই মুহূর্তে উমানাথের পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি। পায়ে বাঘের চামড়ার চটি। সবচেয়ে বেশি করে যেটা চোখে পড়ে তা হল, দু-হাতের আঙুলে হিরে-চুনি-পান্না বসানো ছ-সাতটা আংটি। জামার বোতামেও হিরে সেট করা। তাঁর রোমশ হাতে যে ঘড়িটা রয়েছে তেমন ঘড়ি জীবনে কখনও চোখে দেখেনি মলয়।

ঘরে ঢুকে মলয়ের মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে-বসতে উমানাথ বললেন, 'চা খাবে না কেন?'

মলয় মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, উমানাথের সামনে কিছুতেই নার্ভাস হয়ে পড়বে না। এই ভদ্রলোককে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অবশ্য শর্মিলার ব্যাপারটা—

উমানাথ তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেয়ারাটাকে বললেন, 'প্লেটগুলো এই টেবলে সাজিয়ে দাও।' বলে মলয়ের সামনের সেন্টার টেবলটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'পনেরো মিনিট পর বৈজনাথকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দেবে।'

মোট ছ'খানা রুপোর প্লেট আর একটা রুপোর গেলাস সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে বেয়ারাটা ট্রলি নিয়ে চলে গেল। অনাথও আর দাঁড়াল না। বেয়ারার সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে গেল।

এখন এই ড্রইংরুমে মলয়রা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। সে দেখল, প্লেটগুলোতে নানারকম কেক প্যাস্ট্রি সন্দেশ থেকে শুরু করে সিঙাড়া, কাটলেট, কাজুবাদাম পর্যন্ত অনেক কিছুই রয়েছে।

উমানাথ বললেন, 'হাত গুটিয়ে রইলে কেন? শুরু করো—'

বাড়িতে ডাকিয়ে এনে হঠাৎ এমন রাজকীয় আপ্যায়ন করার কারণটা বোঝা যাচ্ছে না। মলয় ভাবতেই পারেনি উমানাথ ঘোষালের মতো বিখ্যাত বিজনেসম্যান এবং প্রচণ্ড বড়লোক তাকে সামনে বসিয়ে খাওয়ার জন্য এমন নরম গলায় অনুরোধ করবেন। সে লক্ষ করল যে-সব খাবার এই মুহূর্তে তার সামনে সাজানো রয়েছে, তার দাম দিয়ে, তাদের ফ্যামিলির দু-সপ্তাহের রেশন তোলা যায়। মলয় সবিনয়ে জানাল, এখানে খাওয়ার জন্য সে আসেনি; যে উদ্দেশ্যে তাকে ধরে আনা হয়েছে, দয়া করে তা জানিয়ে দিলেই সে খুশি হবে।

উমানাথ হাত তুলে মলয়কে থামিয়ে দিলেন, 'তা তো বলবই। প্রথম দিন আমাদের বাড়ি এলে। একটু মিষ্টিমুখ না করলে আমার খুব খারাপ লাগবে। পরে কাজের কথা হবে। প্লিজ—' বলে আঙুল বাড়িয়ে প্লেটগুলো দেখিয়ে দিলেন।

অগত্যা একটা প্লেটের সব খাবার অন্য প্লেটে রেখে শুধু সন্দেশ, সামান্য ক'টা কাজুবাদাম আর একটা সিঙাড়া তুলে নিল মলয়। তারপর খেতে-খেতে চোখের কোণ দিয়ে বারবার উমানাথকে দেখতে লাগল। এখন পর্যন্ত ভদ্রলোকের আচরণে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। বরং তাঁকে যথেষ্ট আন্তরিক এবং সহৃদয় মনে হচ্ছে। তবু ভেতরকার সেই চাপা উদ্বেগটা কাটছে না।

উমানাথ বললেন, 'ড্রাইভার পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনার জন্যে হয়তো তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ। আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছু না। অনেকদিন থেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল; সময় করে উঠতে পারছিলাম না। তাই—'

তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য উমানাথ কেন এত উদ্‌গ্রীব, কে জানে। মলয় উত্তর না দিয়ে খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর উমানাথ হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা তো স্টেশনের ওদিকটায় থাক?'

এবার সোজাসুজি উমানাথের মুখের দিকে তাকাল মলয়। বলল, 'হ্যাঁ, কোর্টপাড়ায়।'

'তোমার বাবার নাম যতদূর মনে পড়ছে নিশাপতি দত্ত, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'উনি তো চার মাস আগে মারা গেছেন?'

মলয়ের খাওয়া বন্ধ হল। উমানাথের মতো বিরাট বড়লোকের পক্ষে তার বাবার মতো তুচ্ছ মানুষের খবর রাখা অভাবনীয়। নিজের অজান্তেই তার স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে গেল। উমানাথের চোখে চোখ রেখে মলয় বলল,'হ্যাঁ।'

উমানাথও মলয়কে লক্ষ করছিলেন। তাঁর চোখে পড়ল মলয় খাচ্ছে না। বললেন, 'এ কি, খাও—খাও—'

কাজুবাদাম মুখে পুরে অন্যমনস্কের মতো চিবুতে-চিবুতে মলয় উমানাথের পরবর্তী প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

উমানাথ এবার জিগ্যেস করলেন, 'এখানকার কোর্টে তোমার বাবা কী কাজ যেন করতেন?'

মলয়ের আচমকা মনে হল, উমানাথ তাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে যাবতীয় খবর জোগাড় করেছেন। যিনি বাবার মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত রাখেন, তিনি কি আর জানেন না লোকটা কী কাজ করতেন। খুব আস্তে-আস্তে মলয় বলল, 'বাবা গভর্নমেন্ট প্লিডার সারদাবাবুর মুহুরিগিরি করতেন।'

'আই সী। আমি যেন শুনেছিলাম, তোমার বাবা নিজেই প্লিডার ছিলেন, ওকালতি করতেন।'

মলয়ের চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। ভদ্রলোক কি খুব সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করছেন? কিন্তু উমানাথের তেলতেলে অমায়িক মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না। ঈষৎ রুক্ষ গলায় বলল, 'আমার বাবা যেটুকু পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে মুহুরিগিরির বেশি তাঁর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব ছিল না।'

আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন উমানাথ, 'রাইট, রাইট। সবাই টাটা-বিড়লা-ফোর্ড-ওনাসিস হতে পারে না। যে যেটুকু করার সুযোগ পায় সেটুকু অনেস্টলি করলেই হল।'

মলয় বলল, 'আমার বাবা সেন্ট পারসেন্ট অনেস্ট ছিলেন।'

উমানাথ উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তোমরা তো সবসুদ্ধু পাঁচজন ভাইবোন। আর তুমিই সবার বড়—'

দুম করে মলয় বলে ফেলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

অদ্ভুত হাসলেন উমানাথ। 'সামহাউ জেনেছি। বলতে পারো, জানতে বাধ্য হয়েছি। ফ্রাঙ্কলি স্পীকিং, এ জন্যে অনেকের সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে।'

মলয় যা আন্দাজ করেছিল তা-ই। নিশ্চয়ই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লাগিয়ে তাদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছেন উমানাথ। কিন্তু একজন নগণ্য মুহুরির ফ্যামিলি হিস্ট্রি তাঁর কী দরকারে লাগবে, কে জানে। খুব সর্তক ভঙ্গিতে মলয় তাকিয়ে রইল।

উমানাথ এবার বললেন, 'শুনেছি তোমার বাবা মৃত্যুর সময় টাকা-পয়সা কিছুই রেখে যেতে পারেননি।'

'না। বিরাট সংসার আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে একজন মুহুরির পক্ষে কী আর জমানো সম্ভব?'

'কারেক্ট।'

এই সময় অন্য একটা বেয়ারা—যার নাম বৈজনাথ—ওভাল শেপের নকশা-করা দামি ট্রেতে চোখ ধাঁধানো বিদেশি কাপ-প্লেট, মিল্ক পট, সুগার পট ইত্যাদি সাজিয়ে ড্রইং-রুমে ঢুকল। টি-পটটা ভেলভেটের টি-কোজি দিয়ে ঢাকা। উমানাথ বেয়ারাটাকে ট্রে রেখে চলে যেতে বললেন। বৈজনাথ বেরিয়ে গেলে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল। উমানাথ নিজের হাতে চা বানিয়ে এক কাপ মলয়কে দিলেন, একটা কাপ নিজে নিলেন।

উমানাথের মতো মানুষ চা করে হাতে তুলে দিবেন, এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার মলয়ের জীবনে আর কখনও ঘটেনি। তার দারুণ অস্বস্তি হতে লাগল।

চায়ে হালকা চুমুক দিয়ে উমানাথ এবার বললেন, 'তোমাদের একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি

ছাড়া আর বোধহয় কোনও প্রপার্টি নেই?'

'না।'

'ওই বাড়িটা তো তোমার ঠাকুরদা পঞ্চাশ বছর আগে করিয়েছিলেন।'

'সেই রকমই শুনেছি।'

চা খেয়ে প্লেটসুদ্ধু কাপটা সেন্টার টেবিলে রাখতে-রাখতে উমানাথ বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, বাড়ির বড় ছেলে বলে ফ্যামিলির সব দায়িত্ব তোমার ওপর এসে পড়েছে। তোমাদের সাহায্য করার নিশ্চয়ই আর কেউ নেই। অ্যাম আই কারেক্ট?'

মলয় জানাল, উমানাথের কথার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। তার দুই কাকা অবশ্য আছে, কিন্তু তারা জুট মিলে এত সামান্য চাকরি করে যে নিজেদের সংসার চালিয়ে মৃত দাদার বিরাট ফ্যামিলি টানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

একটু ভেবে উমানাথ বললেন, 'শুনেছি স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেন্ডারি, আর বি.এ. পার্ট ওয়ানে তুমি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ।'

বিব্রত বোধ করল মলয়। বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট আর কি, মোটামুটি—'

'মোটামুটি কি হে, তুমি তো এই শহরে আমাদের গৌরব।' উমানাথ বলতে লাগলেন, 'কিন্তু একটা কথা শুনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি।'

উমানাথের কষ্টের কারণ কী হতে পারে, বুঝতে না পেরে মলয় জিগ্যেস করল, 'কী কথা?'

'তুমি নাকি বেশ কিছুদিন ধরে কলেজে যাচ্ছ না?'

এখন পর্যন্ত উমানাথকে বেশ হৃদয়বান এবং সহানুভূতিশীল মনে হচ্ছে। তাঁর ব্যবহার বা কথাবার্তায় কোথাও সন্দেহজনক কিছু নেই। মলয় বলল, 'না।'.

উমানাথ বললেন, 'খবর পেলাম লাস্ট এক উইক তুমি স্টেশনের কাছে রেন-ট্রির তলায় অ্যান্টি-সোশালদের কাছে গিয়ে বসছ। আমি অবশ্য কথাটা বিশ্বাস করিনি।'

মলয় বলল, 'অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ব্যাপারটা সত্যি। আপনার ড্রাইভার আজিজুলকে জিগ্যেস করে দেখবেন, কিছুক্ষণ আগে সে আমাকে ওখান থেকে ধরে এনেছে।'

'তুমি কি আর কলেজে যাবে না?'

'নিজের পড়াশোনার চাইতে ভাইবোনদের বাঁচানো অনেক বেশি জরুরি। আপনি কি বলেন?'

'এই লজিকটা হয়তো ঠিক। কিন্তু তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে, সেটা আমার খুব খারাপ লাগছে।'

মলয় আবছাভাবে কীসের যেন একটা সংকেত পেল। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ঈষৎ চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'আমার চাইতেও অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের লেখাপড়া পভার্টির জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আপনি কি তাদের কথাও ভাবেন?'

'সবাইকে নিয়ে মাথা ঘামানো কি সম্ভব? তুমি আমাদের এই শহরের গর্ব। তোমার কথা যদি না ভাবি, লোকে কী বলবে?'

লোকনিন্দাকে উমানাথ ঘোষাল যে এত সমীহ করে চলেন, আগে জানা ছিল না। বিবিবাজারে মলয়ের মতো অনেক ভালো ছেলের কেরিয়ার দারিদ্র্যের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের কারও জন্য উমানাথ কোনওদিন কিছু করেছেন বলে মলয় শোনেনি। তবে একমাত্র তাকেই বেছে নিলেন কেন ভদ্রলোক? সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মলয় জিগ্যেস করল, 'আমার কথা ভেবে আপনার কী লাভ?'

উমানাথ পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস এবং লাইটার বার করে সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। হালকা ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে উৎসুক মুখে বললেন, 'দেয়ার ইউ আর। এবার আমরা কারেক্ট পয়েন্টে পৌঁছে গেছি। দেখো, আমি বিজনেসম্যান, নিঃস্বার্থ পরোপকার আমার ধাতে নেই। তুমি লেখাপড়া চালিয়ে গেলে আমার কিছু লাভ আছে।'

'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি চাই তুমি পড়া চালিয়ে যাও। তার জন্যে যা খরচ লাগে, আমি দেব।'

খানিকক্ষণ অবাক তাকিয়ে রইল মলয়। তারপর বলল, 'আপনার টাকায় পড়ব কেন? আত্মসম্মান বলতে একটা ব্যাপার এখনও আমার আছে।'

উমানাথ শান্ত গলায় বললেন, 'বললাম তো, বিনা লাভে একটি পা-ও আমি ফেলি না। তোমার সেলফ-রেসপেক্টের কথাও ভেবে রেখেছি। সেটা নষ্ট হবে না। আসল ব্যাপারটা হল, আই গিভ ইউ সামথিং, ইউ গিভ মি সামথিং ইন রিটার্ন। আমি তোমাকে কী-কী দিতে চাই, শুনে নাও। বিএ পাস করে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তোমার পড়ার দিকটা তো দেখবই, তোমাদের ফ্যামিলি যাতে অচল না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থাও করব। এমনকী, বিএ পাস করার পর চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্বটাও আমিই নিচ্ছি।'

'আপনার মহানুভবতার জন্যে ধন্যবাদ। দয়া করে এবার বলুন আমাকে কী-কী দিতে হবে?'

'বেশি কিছু না। বিবিবাজারে তোমরা থাকতে পারবে না। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে মা আর ভাইবোনদের নিয়ে চলে যাবে। আমি যখন বলব তখন বিবিবাজারে ফিরে আসবে। তার আগে নয়। কলকাতায় বাড়ির ব্যবস্থা আমিই করে দেব। ফোর্থ ইয়ারে ওখানকার কলেজে যাতে ভরতি হতে পারো, সে জন্যে কথাবার্তাও বলে রেখেছি। তোমার সঙ্গে একটা জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্ট হয়ে গেলেই তিন-চার দিনের ভেতর সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেব। এখন বলো কবে কলকাতায় যেতে চাও।'

উমানাথ ঘোষাল কেন তাকে বিবিবাজার থেকে তাড়াতে চান তার কারণট মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছিল মলয়। সে যতটা না অবাক হচ্ছিল, তার চাইতে অনেক বেশি মজা পাচ্ছিল। যাতে মা এবং ভাইবোনদের টানে সে বিবিবাজারে ফিরে আসতে না পারে সেজন্য সবাইকেই কলকাতায় পাঠাতে চাইছেন উমানাথ। কী উদ্দেশ্যে উমানাথের এই সূক্ষ্ম পরিকল্পনা বা চতুর স্ট্র্যাটেজি তা ধরতে পারলেও খুব নিরীহ মুখে মলয় জিগ্যেস করল, 'এ জন্যে আপনার অনেক খরচ হয়ে যাবে যে।'

'খরচের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। শুধু বলো রাজি আছ কিনা?' উমানাথের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

'আমাদের এখানকার বাড়িটার কী হবে?'

'সে দায়িত্ব আমার, একজন কেয়ারটেকার রেখে দেব। আশা করি আপত্তি করার মতো তোমার আর কোনও পয়েন্ট নেই।'

'শুধু একটা কথা জিগ্যেস করব—'

'করো।'

সব বুঝেও মলয় জানতে চাইল, উমানাথ তাদের কলকাতায় নির্বাসন দিতে চাইছেন কেন?

উমানাথের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তীব্র চাপা গলায় বললেন, 'তুমি তো জানো। তবু বলছি, কারণটা শর্মিলা।'

মলয় উত্তর দিল না।

উমানাথ বললেন, 'কি, চুপ করে রইলে যে?'

মলয় আস্তে-আস্তে এবার বলল, 'আমার সঙ্গে যে এগ্রিমেন্টটা করতে চাইছেন, শর্মিলা জানে?'

দাঁতে দাঁত চাপলেন উমানাথ। বললেন, 'আমি এ বাড়ির সুপ্রিম অথরিটি। কী করব, কাউকে জানাবার প্রয়োজন মনে করি না। কোনও ব্যাপারে আমি যা ডিসিশান নিই, সেটাই ফাইনাল।'

উমানাথ ঘোষাল যে তাঁদের ফ্যামিলিতে একজন মারাত্মক টাইপের ডিকটেটর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মলয় কী উত্তর দেবে যখন ভাবছে সেই সময় উমানাথ ফের বললেন, 'তা হলে এ কথাই ঠিক রইল। কাল সকালে আজিজুলকে পাঠিয়ে দেব। কবে কলকাতা যেতে পারবে, মায়ের

সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে দিও। আমাকে আবার সব ব্যবস্থা করতে হবে তো।'

'আজিজুলকে পাঠাবেন না।'

'মানে?'

মলয় উত্তর দিল না। দূরমনস্কর মতো কী একটু ভেবে হঠাৎ বলল, 'দয়া করে শর্মিলাকে যদি এ ঘরে ডাকেন—'

মলয় যে এরকম কিছু বলে বসবে, উমানাথ ভাবতে পারেননি। অসহ্য রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল। প্রবল রক্তচাপে দু-চোখ যেন ফেটে পড়বে। একটা বিস্ফোরণই হয়তো ঘটে যেত; প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলেন উমানাথ। চেঁচামেচি করলে চাকর-বাকররা সব জেনে ফেলবে এবং চারিদিকে চাউর করে বেড়াবে। তিনি চান না, মলয় এবং শর্মিলার ব্যাপারটা কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করুক। ওটা যাতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, সেই কারণেই তো মলয়দের ফ্যামিলির পেছনে এত টাকা ঢালতে চাইছেন। গোপনে নিঃশব্দে ব্যাপারটা মিটে যাক, এটাই তাঁর ইচ্ছে। নীচু রুক্ষ গলায় উমানাথ বললেন, 'তোমার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।' একটু থেমে কী চিন্তা করে ফের বললেন, 'কী দরকার শর্মিলার সঙ্গে?'

মলয় বুঝতে পারছিল, উমানাথের বাইরের চেহারাটা যতই ভীতিকর হোক, ভেতরে-ভেতরে তিনি তাকে ভয় পাচ্ছেন। উমানাথের যা সামাজিক মর্যাদা বা স্টেটাস তাতে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তার মতো একটা তুচ্ছ মুহুরির ছেলের নাম জড়িয়ে স্ক্যান্ডাল রটে গেলে মাথা কাটা যাবে; কারও কাছে আর মুখ দেখাতে পারবেন না। উমানাথের ভয়টা সেই কারণে। মলয় বলল, 'আপনি যে এগ্রিমেন্টটা করতে চাইছেন, শর্মিলার সঙ্গে সে বিষয়ে কথা বলতে চাই।'

মলয়ের অসীম স্পর্ধায় কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন উমানাথ। তারপর বললেন, 'আমার বাবা এখন বেঁচে থাকলে কী করতেন জানো?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মলয়, 'কী?'

উমানাথ বলতে লাগলেন, 'এত খাতির করে বাড়িতে ডেকে এনে সোফায় বসিয়ে চা-ও খাওয়াতেন না, গল্পও করতেন না। তুমি তাঁর নাতনিকে ডেকে দেওয়ার কথাটা যে বলবে, তেমন সুযোগই পেতে না। একটা মুহুরির বাচ্চা শর্মিলার সঙ্গে ইন্টিম্যাসি করছে, এ খবরটা পাওয়া মাত্র কুকুরের মতো গুলি করে তিনি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতেন।' রাগ এবং উত্তেজনায় উমানাথের গাল এবং থুতনি কাঁপতে লাগল।

অপমানে চোখ-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে মলয়ের। নিঃশ্বাস লু-বাতাসের মতো গরম হয়ে ওঠে। তবু সে খেপে যায় না। খুব আস্তে-আস্তে বলে, 'আপনার বাবার পদ্ধতিটা একসেলেন্ট। সমস্যা সমাধানের এর চাইতে সাকসেসফুল ইজি মেথড আর হয় না।'

ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন উমানাথ। ফেটে পড়তে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। এতক্ষণে শরীরের সব রক্ত তাঁর চোখে উঠে এসেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

'একেবারেই না। সোশাল স্টেটাস, বয়স, প্রতিষ্ঠা কোনও দিক থেকেই আপনার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আপনি আছেন সোসাইটির টপমোস্ট লেভেলে। আর আমি? না, আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করার ধৃষ্টতা আমার নেই।'

এই কৈফিয়তে উমানাথ কতটা খুশি হলেন, তিনিই জানেন। শুধু বললেন, 'বাবার মেথড আমার পছন্দ নয়। আমি বিজনেসম্যান। সবকিছু পিসফুলি মিটিয়ে ফেলতে চাই।'

মলয় অল্প হাসল, 'তার মানে আপনি আমাকে পয়সা দিয়ে কিনতে চাইছেন। আপনার মেথডটা আপনার বাবার মতো ক্রুড না, অনেক বেশি সায়েন্টিফিক আর মডার্ন।'

উমানাথ সঙ্গে-সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর রক্তচাপ

একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেছে। গাল থুতনি এবং হাতের আঙুলগুলো অসহ্য কাঁপছে।

মলয় আবার বলল, 'একটা কথা জিগ্যেস করব?'

আরক্ত চোখে তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় উমানাথ বললেন, 'কী?'

'কী ধরনের ছেলের সঙ্গে আপনি শর্মিলার বিয়ে দিতে চান?'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন উমানাথ, 'নিশ্চয়ই একটা মুহুরির বাচ্চার সঙ্গে নয়।'

মলয় নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে বলল, 'তা তো জানিই। মুহুরির বাচ্চাটা যাতে রাস্তা ছেড়ে দেয় সেই জন্যেই লাখখানেক টাকাও খরচ করতে চাইছেন।'

একটু চিন্তা করে উমানাথ বললেন, 'আইএএস, আইপিএস বা ফরেন সারভিসের কোনও ব্রাইট ছেলে ছাড়া শর্মিলার বিয়ে অন্য কারও সঙ্গে দেব না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর মলয় বলল, 'ফাইন। কাইন্ডলি আপনি আমাকে বছর চারেক সময় দিন।'

ভুরু কুঁচকে গেল উমানাথের। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, মলয় বুঝি বা কোনও দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে। বললেন, 'মানে?'

'দেখা যাক, ওই সময়টা গেলে আই এ এস কি আই পি এস হওয়া যায় কিনা। তবে মুহুরির বাচ্চা কিন্তু তখনও থেকে যাব; এ জীবনে এই পরিচয়টা আর মুছে ফেলা যাবে না।'

মলয়ের শেষ দিকের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন না উমানাথ। চড়া কর্কশ গলায় বললেন, 'চার বছর কেন, চৌষট্টি বছরেও তুমি ওসব হতে পারবে না।'

মলয় বলল, 'আপনি বোধহয় কারও মুখ দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন?'

গলার স্বর কয়েক পরদা তুলে উমানাথ বললেন,'কী বলতে চাইছ?'

'বলতে চাইছি, এরকম ক্ষমতা না থাকলে কী করে বললেন আমি আইএএস, আইপিএস হতে পারব না?'

উমানাথ উত্তর দিলেন না। গলার ভেতর তাচ্ছিল্য এবং বিদ্রূপ মেশানো একটা শব্দ করলেন। তারপর বললেন, 'বাজে কথা থাক। আমি যে প্রপোজালটা দিয়েছি সে সম্বন্ধে কী করতে চাও?'

মলয় বলল, 'তখনই তো বললাম, শর্মিলার সঙ্গে আলোচনা না করে আপনাকে কিছুই বলতে পারব না।'

উমানাথের সহিষ্ণুতা এবার অনেকটাই ভেঙে পড়ল। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'শর্মিলার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।'

'আজ না হোক কাল, না হলে পরশু-তরশু একদিন-না-একদিন নিশ্চয়ই হবে।'

উমানাথ পলকহীন মলয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

মলয় আবার বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার চলি। চার বছর পর আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।' একটু থেমে বলল, 'যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু নিজেকে বিক্রি করে দেওয়ার স্টেজে এখনও নেমে যাইনি।' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সে।

মলয় যখন দরজার কাছে চলে গেছে সেই সময় উমানাথ ডাকলেন, 'শোনো—'

মলয় দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। আমার প্রপোজালে রাজি হলে ভালো করতে।'

'দয়া করে আমাকে লোভ বা ভয় দেখাবেন না।'

'কোনওটাই দেখাচ্ছি না। তোমার বয়েস কম, মনে এখনও কাঁচা রোমান্টিসিজম। কিন্তু যা ইমপসিবল, তার পেছনে ছোটার মানে হয় না। জীবনের রিয়ালিটিটাকে বুঝতে চেষ্টা করো।'

রীতিমতো অবাকই হয়ে গেল মলয়। উমানাথ ঘোষাল কিছুক্ষণ আগেও তার নার্ভের ওপর প্রেসার দেওয়ার জন্য তাঁর বাবার গুলি করার কথা বলছিলেন। পরক্ষণেই বহু টাকার ফাঁদ

পেতে তাকে মুঠোর ভেতর পুরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নরম-গরম কোনও ট্রিটমেন্টেই কাজ দিল না দেখে ভদ্রলোক হঠাৎ দার্শনিক হয়ে গেলেন নাকি? মলয় বলল, 'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

'আরেকটা কথা শুনে যাও, আমার মেয়েকে ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে।'

ভাইরাসটা যে মলয় সম্পর্কেই বলা সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটু হেসে সে বলল, 'নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন।'

ছোকরা স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বলল, না বিদ্রূপ করল, ঠিক বোঝা গেল না। উমানাথ বললেন, 'ভালো রেজাল্ট করেছিলে। ভেবেছিলাম জীবনে দাঁড় করিয়ে দেব। কিন্তু আমার কথা শুনলে না।' একটু থেমে বললেন, 'সে যাক। কিন্তু আমার মেয়ের নামে যদি স্ক্যান্ডাল রটে, আমি তোমাকে ছাড়ব না, আই উড ফিনিশ ইউ।' উমানাথের মুখ হিংস্র দেখাল।

মলয় বলল, 'আপনার এই কথাটাও আমার মনে থাকবে। তবে কেউ কাউকে ভালোবাসলে স্ক্যান্ডাল রটিয়ে তার ক্ষতি করে না।'

মলয়ের কথাটা হয়তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হল উমানাথের। তাঁর মুখ চোখের ভাব কিছুটা নরম হল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'ভালোবাসাটা মনের মধ্যেই রেখো। ঢাক পিটিয়ে বাইরে রটিও না।' অনেকক্ষণ পর বললেন, 'স্টেশনের পাশে রেন-ট্রির তলায় অ্যান্টি-সোশালদের কাছে গিয়ে আজকাল বসছ। ব্যাড কোম্পানি খুব খারাপ জিনিস। যাই হোক, সৎভাবে থাকতে চেষ্টা করো। সততা ডিসেন্সি অনেস্টি—এগুলো খুব বড় ব্যাপার।'

'সততা, অনেস্টি—' উমানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসে মলয়। বলে, 'আপনার উপদেশ ভুলব না।' বলে আর দাঁড়ায় না। লম্বা-লম্বা পা ফেলে পোর্টিকোর তলায় চলে আসে; তারপর লন পেরিয়ে বাইরের রাস্তায়।

লোভ বা ভয় দেখিয়ে নিজের রাস্তায় না আনতে পেরেই কি শেষ পর্যন্ত সৎভাবে জীবন-যাপনের উপদেশ বর্ষণ করলেন উমানাথ? এর মধ্যেও কি তাঁর কোনও চতুর চাল রয়েছে? মলয় ঠিক বুঝতে পারল না।

একটা ব্যাপার সে লক্ষ করেছে, আজিজুলকে পাঠিয়ে উমানাথ তাকে ধরে এনেছিলেন, কিন্তু তাদের বাড়িতে বা তার পছন্দমতো কোনও জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কথা একবারও বলেননি। তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলে যে বলতেন তা অবধারিত। কথাটা ভাবতেই বেশ মজা লাগল মলয়ের।

তিন

উমানাথদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূরমনস্কর মতো হেঁটে যাচ্ছিল মলয়। পাশ দিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে সাইকেল রিকশা ঘণ্টি বাজাতে-বাজাতে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে। ক্বচিৎ দু-একটা প্রাইভেট কার। তবে লোকজন রয়েছে প্রচুর।

এরই মধ্যে বেশ রাত হয়ে গেছে। এখন শুক্লপক্ষ। গলানো রুপোর মতো মায়াবি জ্যোৎস্নায় এই শহরের বাড়িঘর রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে যেন। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। এ দিকটায় দোকান-টোকান নেই। তবে দু-ধারের বাড়ি-টাড়ি থেকে প্রচুর আলো এসে পড়েছে বাইরে।

জ্যোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া শহর, চারপাশের দৃশ্যাবলি, লোকজন—কোনওদিকেই লক্ষ নেই

মলয়ের। দু-বছর আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। ব্যাপারটা যেন সত্যি নয়, অপার্থিব কোনও স্বপ্নের মতো।

এই শহরেরই বিখ্যাত গভর্নমেন্ট কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে তখন পড়ছে মলয়। সেদিন বিকেলে কলেজ লাইব্রেরিতে বসে বিদেশি অথরের একটা বই থেকে নোট নিচ্ছিল সে। আরও দশ-বারোটা ছেলেমেয়ে এধারে-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। কেউ পড়ছিল, কেউ বা ঘাড় গুঁজে তার মতো কিছু টুকছিল।

হঠাৎ মলয়ের মনে হয়েছিল, কেউ তার টেবলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলতেই অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। যে দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়—শর্মিলা। লম্বাটে ডিমের মতো মুখ। টান-টান চেহারা। বাঙালি মেয়েদের তুলনায় তার হাইট বেশ ভালো—পাঁচ ফুট ছয় বা সাত ইঞ্চি। গায়ের রং যেন আশ্বিনের রৌদ্রঝলক। সরু কোমর। গলাটা যেন সোনার নিটোল ফুলদানি। দু-চোখে একইসঙ্গে মায়াবী স্নিগ্ধতা এবং বুদ্ধির দীপ্তি।

শর্মিলার পরনে নীলাভ সিল্কের শাড়ি, তার জমিতে ছোট-ছোট সোনালি ময়ূর ছাপ। পায়ে সাদা চামড়ার লেস লাগানো হালকা সুদৃশ্য স্লিপার। বাঁ-হাতে সোনার ব্যান্ডে ছোট্ট চৌকো ঘড়ি। গয়না বলতে গলায় সরু লম্বা হার, সেটার লকেটে একটা মীনে করা নৌকো। ডান হাতে আলতো করে ধরা চমৎকার লেডিজ ব্যাগ। তার শাড়িটাড়ি থেকে দামি সেন্টের মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছিল।

বিরাট বিজনেসম্যান উমানাথ ঘোষালের মেয়ে শর্মিলাকে আগেই চিনত মলয়। তাদের এই ছোট শহরে সবাই সবাইকে চেনে। রাস্তায় চলতে-চলতে কখনও-কখনও মলয়ের চোখে পড়ত, বিদেশি লিমুজিনের জানলার পাশে বসে আছে শর্মিলা। এক ঝলক দেখতে না দেখতেই হুস করে গাড়িটা বেরিয়ে যেত।

মলয় শুনেছিল, হায়ার সেকেন্ডারির পর শর্মিলা তাদের কো-এডুকেশন কলেজে অ্যাডমিশান নিয়েছে। কলেজের বিরাট মাঠে বা ক্লাসে যাতায়াতের সময় বেশ কয়েকবার তাকে দেখেছে। কিন্তু আলাপ-টালাপ হয়নি; আলাপের কোনও কারণই ঘটেনি। প্রথমত তাদের সাবজেক্ট এক নয়, এক ইয়ারেও তারা পড়ে না।

কিন্তু সেই শর্মিলা যে এভাবে তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে, এ ছিল অভাবনীয়।

মলয় খুবই স্মার্ট। দুর্ধর্ষ রেজাল্টই শুধু করেনি, স্পোর্টসম্যান হিসেবেও তার খুব নাম। ফুটবল এবং ব্যাডমিন্টনে সে কলেজ টিমের ক্যাপ্টেন। দুর্দান্ত ডিবেটর মলয়। একমাত্র তারই জন্য বছর খানেক আগে ইন্টার কলেজ ডিবেটিং-এ তাদের কলেজ সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যতই স্মার্ট হোক, মেয়েদের ব্যাপারে সে কিন্তু ভীষণ লাজুক; কো-এডুকেশন কলেজে পড়লেও তাদের সঙ্গে মিশতে-টিশতে পারে না। আসলে তাদের যে ধরনের পারিবারিক গড়ন তাতে দারুণ ঝকঝকে মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কখনও পায়নি। তবে সে টের পেত, কলেজের অনেক মেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য পা বাড়িয়েই আছে কিন্তু সে-ই এগিয়ে যেতে পারেনি।

মলয়ের খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। শর্মিলাকে কী বলবে যখন বুঝে উঠতে পারছে না সেই সময় শর্মিলাই বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।'

বিব্রত মুখে মলয় বলেছিল,'আমার সঙ্গে। মানে—'

'মানে কিছু নয়। এক কলেজে পড়ছি, আর আমাদের শহরের সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের সঙ্গে আলাপ থাকবে না, তা কি হয়!' বলে স্নিগ্ধ হেসেছিল শর্মিলা। সেই হাসিতে কোমল আভার মতো কিছু মেশানো ছিল।

শর্মিলাকে আগে আর কখনও এত কাছাকাছি দেখেনি মলয়। তার কথা শুনে মনেই হয়নি

সে বিরাট বড়লোকের মেয়ে বা তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড এত জমকালো। তার আচরণে বা কথাবার্তায় কোথাও বড়লোকের চাল বা অহঙ্কার নেই। বাতাস বা রোদের মতোই সে আশ্চর্য সহজ আর স্বচ্ছন্দ।

এমন একটি মেয়ে কাছে এলে ভালো না লেগে পারে না। কিন্তু অভ্যাস না থাকায় আড়ষ্টতা কাটছিল না মলয়ের। কোনওরকমে বলেছিল, 'বসুন'—টেবলের উলটোদিকে একটা ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে দিয়েছিল সে।'

'না, এখন বসব না। আপনি নোট নিচ্ছিলেন, ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। আচ্ছা চলি। আলাপ হল। আশা করি, দেখা হলে কথা-টথা বলবেন।'

ভদ্রতার খাতিরে মলয়কে বলতে হয়েছিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'চলি' বলেও কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে যায়নি শর্মিলা। টেবিলের ওধারে দাঁড়িয়েই ছিল। এবার সে বলেছিল, 'পিকিউলিয়ার ছেলে তো আপনি।'

মলয় হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রতিধ্বনির মতো করে বলেছিল, 'পিকিউলিয়ার?'

'ডেফিনিটলি। একটা মেয়ে যেচে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এল। অথচ সে কে, কোথায় থাকে, একবার জিগ্যেস করলেন না। আমার সম্বন্ধে আপনার কি কিউরিওসিটি নেই!' বলে আবার হেসেছিল শর্মিলা। সেই স্নিগ্ধ নরম আলোর মতো হাসি।'

শর্মিলা যা বলছে সেসব অবশ্যই জিগ্যেস করা উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে মেশার অভ্যাস না থাকায় মনে পড়েনি। ভেতরে-ভেতরে খুবই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে। আস্তে করে বলেছিল, 'আপনাকে আমি চিনি।'

'কীরকম?' কপাল সামান্য কুঁচকে মজার ভঙ্গি করে তাকিয়েছিল শর্মিলা।

'আপনার বাবা বিরাট বিজনেসম্যান উমানাথ ঘোষাল। আপনাদের ফ্যামিলি এ শহরের সব চাইতে ফেমাস ফ্যামিলি। আর—'

'উঁহু, উঁহু—' হাত তুলে মলয়কে থামিয়ে দিয়েছিল শর্মিলা, 'ও সব তো আমার বাবা আর আমাদের ফ্যামিলির পরিচয়। আলাদা করে বলবার মতো আমার কি কিছু নেই?'

কথায়-কথায় সংকোচ অনেকটা কেটে আসছিল। এবার হেসে ফেলেছে মলয়, 'নিশ্চয়ই আছে। আপনার নাম শর্মিলা। চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত আর অতুলপ্রসাদের গান গাইতে পারেন। সেই সঙ্গে পপ সঙও। ইংরেজি নাটকে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। আর দেখতেও দারুণ—' বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল মলয়। কোনও মেয়েকে সুন্দর বলতে তখনও তার জিভ আটকাত। কেমন একটা অশ্লীল গন্ধ যেন কথাটায় মাখানো।

শর্মিলা তার কথার শেষ দিকটা লক্ষ করেনি। চোখ বড় করে নকল বিস্ময়ের গলায় বলেছিল, 'আমার সম্বন্ধে আপনি এত সব জানেন! আর কী জানেন?'

'আপনি খুব ভালো স্টুডেন্ট। হায়ার সেকেন্ডারিতে একসেলেন্ট রেজাল্ট করেছিলেন।'

'রেজাল্টের কথা বলে প্লিজ লজ্জা দেবেন না। আপনি স্কলারশিপ হোল্ডার আর আমি অনেক কষ্ট করে কোনওরকমে ফার্স্ট ডিভিসনটা পেয়েছি।' বলেই হঠাৎ কী মনে পড়তে গলার স্বর সামান্য উঁচুতে তুলে বলেছিল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

একটু অবাক হয়েই মলয় জিগ্যেস করেছিল, 'কী হল?'

'আপনার সম্বন্ধে তবে যে অন্য কথা শুনেছিলাম!'

হকচকিয়ে গিয়েছিল মলয়, 'কী কথা বলুন তো?'

মুখ গম্ভীর করে শর্মিলা বলেছিল, 'নিজের পড়াশোনা আর স্পোর্টস ছাড়া অন্য কোনওদিকে আপনার নজর নেই।'

'না না, মানে—' মুখ লাল হয়ে উঠেছিল মলয়ের, গুছিয়ে উত্তর দিতে বেশ সময় লেগেছিল।

সে বলেছিল, 'এই শহরের ঘোষাল ফ্যামিলি এত বিখ্যাত যে তাঁদের বাড়ির কে কী করছেন, কার কী অ্যাকটিভিটি সবকিছু এক সেকেন্ডে চারিদিকে জানাজানি হয়ে যায়।'

'বলেন কি! আমাদের নিয়ে সবাই তবে আলোচনা করে!'

'নিশ্চয়ই! ফেমাস হওয়ার এটাই তো অ্যাডভানটেজ। তাদের খবর হাওয়ায় উড়তে থাকে।' মলয় বলেছিল, 'নানা লোকের কাছে কতবার যে আপনার কথা শুনেছি।'

শর্মিলা বলেছিল, 'আপনি আমার সম্বন্ধে এত খবর যে মনে করে রেখেছেন, সে জন্যে আমি রিয়ালি গ্রেটফুল। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।'

এরপর থেকে প্রায় রোজই শর্মিলার সঙ্গে দেখা হত। বেশির ভাগই কলেজের করিডরে বা লাইব্রেরিতে। দেখা হলেই একটু দাঁড়িয়ে দু-একটা কথা বলত। সেসব কথার তেমন কোনও মানে নেই। তবে এটা ঠিক, শর্মিলাকে দেখলে ভালো লাগত।

বেশ কিছুদিন এ ভাবেই চলেছে। তারপর কবে থেকে যে তারা পরস্পরের খুব কাছে চলে এসেছে, প্রথমটা খেয়াল ছিল না। একসময় মলয় আবিষ্কার করেছিল, কলেজের ক্যানটিনে বা সামনের খেলার মাঠের একধারে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা গল্প করছে। শুধু তাই নয়, কলেজে সামার ভ্যাকেশানে যে অ্যানুয়াল সোশাল ফাংশান হয়, তারাই ছোটাছুটি করে সেটা অরগানাইজ করছে। পুজোর ছুটির পরে কলেজ খুললে ছাত্রছাত্রীরা যে নাটক করে তার পেছনেও ওরা দুজন। স্পোর্টস, ডিবেটিং, লিটারারি সেমিনার—শর্মিলা ও মলয় ছাড়া কলেজে কিছু হওয়ার কথা ভাবাই যেত না। প্রথম দিকে অবশ্য শর্মিলার সঙ্গে এসব ব্যাপারে মাতামাতি করতে মলয়ের বেশ আড়ষ্টতা ছিল। শর্মিলাই তার সব সংকোচ কাটিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ছে, রোজই একটা ঝকঝকে সাদা রঙের ফিয়াট শর্মিলাকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে যেত, ছুটির সময় কলেজ কম্পাউন্ডের বাইরের রাস্তায় এসে সেটা দাঁড়িয়ে থাকত। ফিয়াটটা চালিয়ে আসত আজিজুল। তখন থেকেই মলয় তাকে চেনে।

ছুটির পর মলয় শর্মিলার সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে দিত। বলত, 'কাল দেখা হবে।'

শর্মিলা হাসত। বলত, 'নিশ্চয়ই। উঠে এসো। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।'

পরস্পরকে কবে তারা 'তুমি' করে বলতে শুরু করেছে, এখন আর মনে পড়ে না। মলয় বলত, 'প্লিজ, না। তোমার সঙ্গে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কেউ দেখে ফেললে কী মনে করবে।'

শর্মিলা মজা করে ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বলত 'স্ক্যান্ডালের ভয়!'

'আমাদের মতো আজেবাজে মানুষদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ভয় তোমার জন্যে। অকারণে তোমার নামে লোকে ডার্টি গসিপ বানাবে। আমার পক্ষে সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।'

কী বুঝেছিল শর্মিলা, সে-ই জানে। প্রথম-প্রথম দু-একদিন জোরজার করলেও গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়ার কথা পরে আর বলত না।

মনে আছে, মাঝে-মাঝে শর্মিলা খুবই দুঃসাহসী হয়ে উঠত। বলত, 'রোজ-রোজ গাড়িতে আসা, আবার গাড়িতে করে ফেরা—এ আমার একেবারেই ভালো লাগে না। কিছু একটা করতে হবে।'

অবাক হয়ে মলয় জিগ্যেস করেছে, 'কী করতে চাও তুমি?'

'রিভোল্ট।'

'মানে।'

'বিদ্রোহ।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থেকেছে মলয়। শর্মিলার কথা কিছুই তার মাথায় ঢোকেনি।

শর্মিলা সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'কিছুই বুঝলে না তো?'

'না—' আস্তে মাথা নেড়েছে মলয়।

শর্মিলা এবার যা জানিয়েছে তা এইরকম। অঢেল আরাম, অজস্র টাকা, দামি-দামি ফ্যাশনেবল পোশাক, দুর্লভ খাবার, সুখের নানা উপকরণ, নতুন-নতুন মডেলের গাড়ি—এসব তার চারপাশে অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দিয়েছে যেন। কোনওদিন নিজের হাতে কিছু করেছে বলে সে জানে না। মুখ থেকে কথা খসালেই দশটা চাকর দৌড়ে আসে। কোথায় যে পায়ে হেঁটে বেরুবে তার উপায় নেই; পোর্টিকোর তলায় অমনি তিনটি গাড়ি ছুটে আসবে। তাদের বাড়ির সবার জন্য এমন একটা জাদু-কার্পেট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে তাতে করে তারা স্বপ্নের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। সুখ আরাম এবং পারিবারিক অহঙ্কারের মধ্যে থেকে-থেকে অদ্ভুত এক ক্লান্তি এসে গেছে শর্মিলার। চারিদিকের দেওয়াল ভেঙে মাঝে-মাঝে মুক্ত হাওয়ায় ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে সাধ হয়।

চোখ কুঁচকে মজার একটা ভঙ্গি করে মলয় বলেছে, 'রোমান্টিক?'

'নো, রেবেল—বিদ্রোহিণী।'

'বিদ্রোহটা কীভাবে করবে সেটা ঠিক করেছ?'

'করেছি।'

'কীরকম?'

'পরে জানতে পারবে।'

একদিন কী একটা কারণে চার পিরিয়ডের পর কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছিল। অন্য সব দিনের মতোই শর্মিলাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল মলয়। কিন্তু আজিজুল এবং সেই ঝকঝকে ফিয়াটটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

মলয় বলেছিল, 'তোমার গাড়ির কী হল?'

শর্মিলা বলেছে, 'আজ গাড়ি আসবে না। কলেজে আসার সময় আজিজুলকে বারণ করে দিয়েছি।'

বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে মলয়। তারপর বলেছে, 'গাড়ি না এলে ফিরবে কী করে?'

'পৃথিবীর কোটি-কোটি লোক গাড়ি ছাড়াই বাড়ি ফেরে। আমিও ফিরতে পারব।'

'তা না হয় পারবে। কিন্তু—'

'কী?'

'হঠাৎ ড্রাইভারকে আসতে বারণ করলে! বাড়িতে ভাববে না?'

'আজিজুলকে বলে দিয়েছি, আমি এক বন্ধুর বাড়ি যাব। মাকে সে খবরটা দিয়ে দেবে।'

'সত্যিই বন্ধুর বাড়ি যাবে?'

'সত্যিই কোনও বন্ধুর বাড়ি যাব না।'

শর্মিলাকে সেদিন খুব দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল। মলয় তাকে লক্ষ করতে-করতে জিগ্যেস করেছিল, 'তা হলে?'

শর্মিলা বলেছিল, 'আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে যাব।'

ভয়ানক চমকে উঠেছিল মলয়। তার হৃৎপিণ্ড পলকের জন্য থমকে গিয়েই দুরন্ত বেগে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। হৃৎপিণ্ডের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল যেন। বলেছিল, 'মানে?'

'রিভোল্ট।'

অবাক বিস্ময়ে এবার তাকিয়েই থেকেছে মলয়। কিছু বলতে পারেনি।

শর্মিলা ফের বলেছে, 'বিদ্রোহটা কেমন করে স্টার্ট করব জানতে চেয়েছিলে না? তোমাকে দিয়েই শুরু করলাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে?' রাস্তায় এসে একটা রিকশা ডেকে বিমূঢ় বিস্মিত মলয়কে একরকম জোর করে তুলে রিকশাওলাকে বলেছিল, 'স্টেশনে চল।'

জোরে শ্বাস টানার মতো শব্দ করে মলয় বলেছিল, কিন্তু শর্মিলা—' অদ্ভুত এক উত্তেজনায়, কিছুটা বা ভয়ে গলার স্বর বুজে এসেছিল তার।

'আবার কী হল?' শর্মিলা মলয়ের দিকে ফিরে জিগ্যেস করেছে।

'এভাবে যে আমরা যাচ্ছি, কেউ দেখে ফেলবে।'

'দেখতেই পারে।' গভীর কৌতুকে মলয়কে লক্ষ করতে-করতে শর্মিলা বলেছিল, 'তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ দেখছি।'

'হ্যাঁ, পড়েছি।' মলয়ের গলা কাঁপছিল, 'তবে নিজের জন্যে না, তোমার জন্যে। তোমাদের বাড়িতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে রি-অ্যাকশানটা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি।' ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছিল শর্মিলা।

'এখনও সময় আছে; বাড়ি ফিরে যাও।'

'বাড়িতে তো ফিরতেই হবে। তবে এখন নয়। আগে কলকাতা থেকে ঘুরে আসি।'

স্টেশনে এসে টিকিট কাটতে না কাটতেই হুড়মুড়িয়ে ট্রেন এসে গিয়েছিল। মোটামুটি একটা ফাঁকা কামরায় উঠে জানলার পাশে মুখোমুখি বসেছিল তারা। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করেছিল।

দু-ধারে মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র, গাছপালা। টেলিগ্রাফের তার উর্ধ্বশ্বাসে পেছনে ছুটে যাচ্ছে। ঝকঝকে নীলাকাশকে পালিশ-করা আয়নার মতো লাগছিল। চারিদিকে ঝলমলে অঢেল রোদ। কিন্তু কোনও কিছুই যেন মলয় দেখতে পাচ্ছিল না। দারুণ এক উৎকণ্ঠায় তার শ্বাস আটকে আসছিল।

ট্রেনে ওঠার পর থেকে একদৃষ্টে মলয়ের দিকে তাকিয়েই ছিল শর্মিলা। এক সময় সে বলেছে, 'কী ভাবছ অত?'

চমকে উঠেছিল মলয়, 'না, মানে—'

'বাড়িতে গোলমাল হলে সেটা আমাকেই ফেস করতে হবে। তুমি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছ কেন?' শর্মিলা হেসে ফেলেছে।

মলয় উত্তর দেয়নি।

সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে হেসে-হেসে মজার গলায় এবার শর্মিলা বলেছে, 'রিভোল্ট করব, আর কোথাও একটা ঢেউ উঠবে না, তা তো আর হয় না।'

মেয়েটার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল মলয়। এবারও সে কিছু বলেনি।

শর্মিলা বলে যাচ্ছিল, 'কোনও ব্যাপারে লুকোচুরি আমার ভালো লাগে না। বাড়িতে জানুক, এটাই আমি চাই।' একটু থেমে ফের বলেছে, 'অত গম্ভীর হয়ে থেকো না। জীবনে প্রথম বাড়িতে না জানিয়ে দারুণ একখানা অ্যাডভেঞ্চার করতে যাচ্ছি। প্লিজ মুডটা নষ্ট করে দিও না।'

শর্মিলা যতই বলুক, উৎকণ্ঠা কিছুতেই কাটছিল না মলয়ের। ওদের বাড়ির ব্যাপারটা তার মাথায় ফিক্সেশানের মতো আটকে গিয়েছিল যেন। সে বলেছে, 'একটা কথা শুধু জানতে চাই।'

'কী?'

'বাড়িতে ফিরে তুমি কী বলবে?'

মলয় চাইছিল, আগে থেকেই কলকাতায় যাওয়ার ব্যাপারে শর্মিলা এমন একটা নিশ্ছিদ্র জোরালো কৈফিয়ত তৈরি রাখুক যাতে তাকে বিপন্ন না হতে হয়। শর্মিলা ওদের বাড়িতে পারিবারিক অশান্তি এবং উত্তেজনার কারণ হয়ে উঠুক, সেটা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ভুরু সামান্য কুঁচকে শর্মিলা বলেছে, 'অত ক্যালকুলেশন-ট্যালকুলেশন করে অ্যানসার বানিয়ে রাখতে পারব না। বাড়িতে কিছু জিগ্যেস করলে তখন দেখা যাবে।'

'কিন্তু তোমাদের ফ্যামিলির কিছু নিয়ম আর ডিসিপ্লিন তো আছে। সেসব—'

মলয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই শর্মিলা বলে উঠেছে, 'সেসব ভাঙার জন্যেই তো আজ বেরিয়ে পড়েছি।'

কলকাতায় গিয়ে কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না মলয়। এধারে-ওধারে একটু-আধটু ঘুরেই একরকম জোরজার করে শর্মিলাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল। স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল রিকশায় তাকে তুলে দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে জিগ্যেস করেছিল, 'কাল কলেজে দেখা হচ্ছে তো?'

'হবে না কেন?' বলেই গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে শর্মিলা বলেছিল, 'তোমার কি ধারণা, কলকাতায় বেড়াতে যাওয়ার জন্যে মা-বাবা আমাকে খুন করে ফেলবেন?'

মলয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হাত নেড়ে হাসতে-হাসতে চলে গিয়েছিল শর্মিলা।

মনে পড়ে, সেদিন রাত্তিরে একেবারেই ঘুমোতে পারেনি মলয়। কতবার যে বিছানায় উঠে বসেছে, ঠিক নেই। এক-একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, শর্মিলাদের বাড়ি গিয়ে তার খবর নিয়ে আসে। জানলার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হচ্ছিল, সেই রাতটা আর কাটবে না। অসীম দুর্বহ অন্ধকার তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল। বাড়ি ফেরার পর শর্মিলাকে কতটা লাঞ্ছনা বা মানসিক নির্যাতন সইতে হয়েছে, ভাবতেও সাহস হচ্ছিল না তার।

পরের দিন একটু আগে-আগেই কলেজে চলে গিয়েছিল মলয়; তবে ভেতরে না ঢুকে বাইরের রাস্তায় শর্মিলার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। সারারাত ঘুম হয়নি; সে জানত তার চোখ তখন টকটকে লাল। মাথা টিপটিপ করছিল, কপালের দুপাশের রগ দুটো খ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না মলয়। শারীরিক কষ্টের সবরকম অনুভূতিই খুব সম্ভব অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পরিচিত ঝকঝকে ফিয়াট গাড়িটা পাশে এসে থেমেছিল। আজিজুল তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে পেছন দিকের দরজা খুলে দিতেই শর্মিলা বেরিয়ে এসেছিল। তার পরনে সেদিন ছিল ধবধবে শাড়ি এবং ব্লাউজ, পায়ে সাদা চটি, হাতে সাদা লেডিজ ব্যাগ। সব মিলিয়ে কোনও অলৌকিক হ্রদের রাজহংসী।

মলয়কে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল শর্মিলা। তারপর হেসে-হেসে বলেছিল, 'কী ব্যাপার, আমাকে রিসিভ করার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে আছ নাকি?' পরক্ষণেই তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। ভালো করে মলয়কে লক্ষ করতে-করতে জিগ্যেস করেছিল, 'কী হয়েছে তোমার? চোখ এত লাল, ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

মলয় জানিয়েছিল, সে অসুস্থ নয়, রাত্তিরে ঘুম না হওয়ার কারণে চোখ লাল হয়েছে।

তাকে নিয়ে কলেজ কম্পাউন্ডের দিকে যেতে-যেতে শর্মিলা বলেছিল, 'কী ব্যাপার, আমার কথা ভেবে-ভেবে ঘুমোতে পারোনি নাকি?' তার চোখ এবং ঠোঁটে হাসির মতো কিছু ভাসছিল।

মলয় বলেছিল, 'ঠিক তাই। কাল বাড়ি যাওয়ার পর কী হল?'

'আমার ব্যাপারে তুমি খুব ওরিড হয়ে আছ, তাই না?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। বল রিসেপশানটা কীরকম হল?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে শর্মিলা বলেছে, 'তেমন কিছু হলে আজ কলেজ আসার পারমিশান পেতাম?'

এরকম ভাসা-ভাসা জবাব শুনতে চায়নি মলয়। শর্মিলা বাড়ি ফেরার পর ঠিক কী-কী ঘটেছে, কে কী বলেছে—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে। কিন্তু বারবার প্রশ্ন করেও জানা যায়নি। হেসে-হেসে শর্মিলা শুধু এড়িয়ে গেছে।

সেই যে শর্মিলা মলয়ের সঙ্গে কলকাতায় গেছে, তারপর থেকে তার সাহস বেড়ে যাচ্ছিল। সাহস নয়, এখন মনে হয়, সেটা জেদ।

তখন মাঝে-মাঝেই আজিজুলকে ছুটির পর আসতে বারণ করে মলয়কে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে চলে যেত শর্মিলা। কোনওদিন এখানে-ওখানে কিছুক্ষণ ঘুরে কিংবা ইংরেজি ছবি-টবি বা আর্ট একজিবিশন দেখে ফিরে আসত।

ব্যাপারটা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল মলয়ের কাছে। প্রথম দিনের সেই উৎকণ্ঠা এবং ভয় অনেকটাই কেটে যাচ্ছিল তার। যতক্ষণ শর্মিলা সঙ্গে থাকত, কী ভালো যে লাগত। সে চলে যাওয়ার সময় মলয়ের স্নায়ুর ভেতর আশ্চর্য এক সুগন্ধ যেন রেখে যেত। সেই সুঘ্রাণ সারাক্ষণ সুখকর নেশার মতো তাকে জড়িয়ে রাখত।

হঠাৎ কখন যেন মলয় আবিষ্কার করেছিল, শর্মিলাকে একদিন না দেখলে খুব খারাপ লাগছে। ছুটির দিনগুলো ভীষণ ফাঁকা লাগত। সামার বা পুজো ভ্যাকেশনে আর এক্সমাসের লম্বা ছুটি যেন ফুরোতে চাইত না। এই ছুটিগুলোতে উটি কাশ্মীর দার্জিলিং বা গোয়ায় বেড়াতে যেত শর্মিলারা। যেখানেই যেত সুদৃশ্য নীল খামে চিঠি লিখত সে। তবে মলয় উত্তর দিত না। এই নিয়ে শর্মিলার দুঃখ ছিল। কিন্তু মলয়ের ভয়, তার চিঠি যদি শর্মিলার মা বাবা বা অন্য কারও হাতে পড়ে, তাকে অনেকরকম কৈফিয়ত দিতে হবে। তার জন্য শর্মিলা বিন্দুমাত্র কষ্ট পাক, মলয় কোনওভাবেই তা চাইত না।

শর্মিলাকে দারুণ ভালো লাগলেও একটা ব্যাপার মলয় কখনও ভোলেনি। শর্মিলারা অভিজাত, বড়লোক, তাদের বিরাট ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আর সে মুহুরির ছেলে, তারা গরিবের চাইতেও গরিব, জমকালো পেডিগ্রি বলতে তাদের কিছুই নেই। সামাজিক স্টেটাসের দিক থেকে তাদের মধ্যে লক্ষ মাইলের তফাত। এক-এক সময় সে বলত, 'এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না—'

শর্মিলা বলত, 'কোনটা?'

'এই যেভাবে আমরা মিশছি।'

'এর মধ্যে গোলমালটা কোথায়?'

'তোমাদের আর আমাদের ভেতর ডিফারেন্সটা এত বেশি যে—'

মলয়কে শেষ করতে দিত না শর্মিলা। তার যত দ্বিধা সব এক কথায় উড়িয়ে দিত, 'প্লিজ থাম তো।'

মলয় এবং শর্মিলার ব্যাপারটা কলেজের অনেকেরই চোখে পড়েছিল। এই নিয়ে হাওয়ায়-হাওয়ায় কিছু গুজবও ছড়াচ্ছিল। বন্ধুদের চোখে চোখ পড়লে তারা অদ্ভুত হাসত। মেয়েরাও তাদের দেখলে ফিসফিস করত।

মলয়দের ক্লাসেরই একটি ছেলে, নাম সুব্রত, ছিল দারুণ তুখোড় আর আমুদে টাইপের। হইচই করে সারা কলেজ মাতিয়ে রাখত। একদিন মলয়কে সামনের মাঠে ডেকে নিয়ে ভুরু নাচাতে-নাচাতে বলেছিল, 'ব্যাপারটা কী?'

খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল মলয়ের। জিগ্যেস করেছিল, 'কীসের?'

এবার তুর-তুর করে গালের মাংস নাড়াতে-নাড়াতে সুব্রত বলেছিল, 'বেশ ডুবে-ডুবে আর ভেসে-ভেসে জল খাচ্ছ চাঁদ।'

'মানে?'

'মানেটা তুমিই তো সব চাইতে বেশি করে জানো। চালিয়ে যা, চালিয়ে যা। টেরিফিক জিনিস গেঁথেছিস। কেয়ারফুলি খেলিয়ে তুলিস। দেখিস স্লিপ করে বেরিয়ে না যায়।'

সুব্রতর ইঙ্গিতটা এবার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শুনতে-শুনতে মলয়ের চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। কান-টান ঝাঁঝাঁ করছিল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই তার নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে 'চিয়ার ইউ লাকি ডগ। বেস্ট অফ লাক।' বলেই অদ্ভুত এক রগড়ের ভঙ্গিতে পা

ফেলে-ফেলে চলে গিয়েছিল সুব্রত।

কলেজেই শুধু নয়, ব্যাপারটা মলয়দের বাড়িতেও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। মা কিছু বলেনি। তবে বাবা কয়েকদিন তার ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে। ভেতরে ঢুকতে গিয়েও ঢোকেনি।

বাবার চেহারা ছিল রোগা, ক্ষয়াটে ধরনের। মুহুরিগিরির রোজগারে সংসার টেনে-টেনে তার পিঠ বেঁকে দুমড়ে গিয়েছিল। তার ওপর ছিল বারোমাস হাঁপানির টান। জগতের সবাইকেই বাবা ভয় পেত। এমনকি নিজের বিখ্যাত মেধাবী ছেলেকেও।

বেশ কিছুদিন দ্বিধার পর হঠাৎ একদিন সকালে মলয়ের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বাবা। খুব আস্তে, ভয়ে-ভয়ে ডেকেছিল, 'হারু—' মলয়ের ডাকনাম হারু।

মলয় তখন সবে বই-টই খুলে বসেছে। চমকে মুখ তুলে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাবা কখনও তার ঘরে আসে না৷ বিশেষ করে এই সময়ে। সে জিগ্যেস করেছে, 'কিছু বলবে বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এসো না।'

খুবই কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে মলয়ের বিছানার এক কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল বাবা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেছিল, 'আমরা সবাই তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি বাবা। তোর কিছু হলে আমাদের ফ্যামিলিটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার শরীরের হাল তো দেখছিস, কবে আছি কবে নেই।'

বাবা যা বলেছে তা নতুন কিছু নয়। এসব আগেও অনেকবারই শুনেছে মলয়। সে বুঝতে পারছিল, বাবার অন্য কিছু বলার আছে, জিজ্ঞাসু চোখে মলয় তাকে লক্ষ করে যাচ্ছিল।

বাবা এবার বলেছে, 'আমরা খুব গরিব হারু। আর—আর—'

'আর কী?'

বাবা একটা ঢোক গিলে শ্বাসরুদ্ধের মতো বলেছিল, 'উমানাথ ঘোষালরা বিরাট বড়লোক।'

মলয়ের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু খেলে গিয়েছিল। উমানাথের নাম যে বাবা অকারণে করেনি তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এর মধ্যে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। মলয় টান-টান হয়ে বসে বলেছে, 'তাতে আমাদের কী?'

'মা, মানে—' বাবা অত্যন্ত বিপন্নমুখে বলেছিল, 'নানা লোকে তোর সম্বন্ধে অনেক কথা বলছে।'

'কী বলছে?'

'তুই নাকি উমানাথ ঘোষালের মেয়ে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল বাবা।

মলয় তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠেছিল, 'চুপ করলে কেন? বলো। উমানাথ ঘোষালের মেয়ের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে কী শুনেছ?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাবা ভীরু গলায় বলেছিল, 'উমানাথ লোক ভালো না। ওদের অনেক টাকা। কখন কী করে বসবে! ভয়ে আমার ঘুম হয় না।'

বাবা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল, শর্মিলার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করাটা বিপজ্জনক। উমানাথ ঘোষাল ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়ে তার ক্ষতি করতে পারে। বাবার হিসেবে কোনও গোলমাল নেই। মলয়ের ওপর তাদের পরিবারের সমস্ত ভবিষ্যৎ বাজি ধরে বসেছিল সে। বাবার যা আয় তার তিন ভাগের এক ভাগই তাঁর পেছনে ঢালা হত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ভালো রেজাল্ট করে, দামি চাকরি-বাকরি জুটিয়ে মলয় সংসারটাকে টেনে তুলে একটা ভদ্র লেভেলে এনে দাঁড় করাবে। এই হিসেব যদি এদিক-সেদিক হয়ে যায়, ভয় পাওয়ারই কথা।

শর্মিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ঠিকই, তবে সেটা এমন পর্যায়ে তখনও পৌঁছয়নি যাতে বাবার রাতের ঘুম ছুটে যায়। ভরসা দেওয়ার মতো করে মলয় বলেছিল,'তুমি অত ভাবছ কেন বাবা? কোনও ভয় নেই।'

বাবার সঙ্গে যেদিন শর্মিলা এবং উমানাথ ঘোষালের বিষয়ে কথাবার্তা হল তার মাসখানেক বাদেই একটা দারুণ চমকদার নাটকীয় ঘটনা ঘটল। এই নাটকীয় ব্যাপারটা অন্য এক নাটক থেকে শুরু হয়েছিল।

ঘটনাটা এ বছরেরই। পুজোর ছুটির পর কলেজ খোলার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য বছরের মতো ছেলেমেয়েরা নাটকের রিহার্সাল নিয়ে মেতে উঠেছিল। ফোর্থ ইয়ার বাংলা অনার্সের প্রবীর চমৎকার ছোট গল্প আর ওয়ান-অ্যাক্ট প্লে লেখে। তার লেখা নাম-করা ম্যাগাজিনে বেরোয়। পুজোর বন্ধের আগে প্রবীর রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র নাট্যরূপ দিয়েছিল। সেটাই স্টেজে নামাবার তোড়জোড় চলছে তখন।

ছুটির আগে ঠিক হয়েছিল চারুর রোলে অভিনয় করবে শর্মিলা। কিন্তু ওর ফ্যারিনজাইটিসের ধাত। ছুটির পর হঠাৎ কার্তিকের হিম লেগে গলায় ব্যথা হয়েছিল খুব। ক'দিন তো ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি। এই অবস্থায় রিহার্সাল-টিহার্সাল দেওয়া সম্ভব নয়। শর্মিলার জায়গায় অগত্যা চারুর রোলে নেওয়া হয়েছিল সেকেন্ড ইয়ার ফিজিক্স অনার্সের শ্রীপর্ণাকে।

রিহার্সাল হয়ে যাওয়ার পর এক শনিবারের সন্ধ্যায় কলেজের বিশাল হলে 'নষ্টনীড়' অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। বরাবরই এই কলেজের নাটকের খুব সুনাম। গভর্নিং বডির মেম্বাররা, ছাত্রছাত্রীরা সবাই নাটক দেখতে এসেছিল। এমনকী ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরাও এসেছিলেন।

নাটক সম্পর্কে দারুণ উৎসাহ শর্মিলার। অভিনয় না করলেও গলায় পাতলা দামি উলের মাফলার জড়িয়ে সে 'নষ্টনীড়' দেখতে এসেছিল। অন্য বছর তার বাবা আর মা-ও আসতেন। এবার আসেননি।

সামনের চারটে 'রো'য়ের যাবতীয় সিট বিশিষ্ট অতিথি এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পঞ্চম রো থেকে হলের বাকি সিটগুলো ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

পঞ্চম রো-র মাঝামাঝি জায়গায় বসেছিল শর্মিলা, আর তার ঠিক পেছনেই ছ'নম্বর রো-তে মলয়।

শর্মিলাকে একা দেখে বেশ অবাকই হয়ে গিয়েছিল মলয়। সে শুনেছে, নাটকের ব্যাপারে উমানাথ ঘোষালের প্রচণ্ড ইন্টারেস্ট। শর্মিলা যখন এ কলেজে ভরতি হয়নি তখনও শহরের মান্যগণ্য ব্যক্তি হিসেবে 'ইনভিটেশন কার্ড' পাঠালেই হাজার কাজ ফেলে তিনি নাটক দেখতে আসতেন।

নাটক শুরু হওয়ার কথা সন্ধে সাতটায়। তখন সবে সাড়ে ছ'টা বেজেছে। তার মধ্যেই হল ভরতি হয়ে গিয়েছিল।

পেছন থেকে ফিসফিস করে মলয় বলেছিল, 'তুমি একলা যে? তোমার মা-বাবা এলেন না?'

শর্মিলা জানিয়েছিল, 'বিজনেসের ব্যাপারে কলকাতায় এক ফাইভ স্টার হোটেলে ককটেল পার্টি আছে। মা এবং বাবাকে সেখানে যেতে হয়েছে।'

হঠাৎ গলার স্বর অনেক নীচে নামিয়ে শর্মিলা বলেছিল, 'বাবা আমাকে আজ কলেজে আসতে বারণ করেছিলেন। আমি আজিজুলকে নিয়ে চলে এসেছি।'

মলয় চমকে উঠেছিল, 'বারণ করা সত্ত্বেও এলে?'

'না এসে উপায় ছিল না। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'কী?'

'পরে বলব।'

এমনিতে তাদের একসঙ্গে দেখলেই কলেজের ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত হাসত, চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে যা বলাবলি করত, শুনতে না পেলেও তার মানে বুঝতে অসুবিধা হত না। কিন্তু সেদিন নাটক নিয়ে সবাই এত উত্তেজিত হয়েছিল যে মলয়দের কেউ লক্ষ করেনি।

কী জরুরি কথা বলবে শর্মিলা এবং কখন বলবে? উমানাথ ঘোষালের কথা ভেবে দারুণ উদ্বেগ হচ্ছিল মলয়ের। তিনি চাননি, শর্মিলা নাটক দেখতে আসুক। তবু সে এল কেন? এতটা সাহস তার হল কীভাবে?'

একটা ব্যাপার মনে পড়তে দুশ্চিন্তা খানিকটা কমেছিল মলয়ের। রাত্তিরে হেমন্তের হিম লাগলে ফ্যারিনজাইটিস বেড়ে যেতে পারে বলেই হয়তো উমানাথ শর্মিলাকে আসতে বারণ করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে শর্মিলার জরুরি কথার সম্পর্ক কী? না, উদ্বেগটা কিছুতেই কাটছিল না তার।

এক সময় নাটক শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রায় কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না মলয়। 'নষ্টনীড়ে'র প্রতিটি দৃশ্য এবং সংলাপ তার মুখস্থ। নিজে অভিনয় না করতে পারলেও নাটক সম্পর্কে তার ইন্টারেস্ট কম নয়। প্রায় রোজই রিহার্সালের সময় সে থাকত। কিন্তু 'হলে' বসে স্টেজের দিকে তাকিয়ে সব ঝাপসা মনে হচ্ছিল।

ভেতরে-ভেতরে উদ্বিগ্ন এবং অন্যমনস্ক থাকলেও মলয় মোটামুটি টের পাচ্ছিল, এবারের নাটক কলেজের সুনাম রাখতে পারবে না। শ্রীপর্ণা আর ভূপতির ভূমিকায় হিস্ট্রি অনার্সের যে ছেলেটি নেমেছে, মাঝে-মাঝেই তারা সংলাপ গোলমাল করে ফেলছিল। তবে এই কলেজের ছেলেমেয়েরা খুবই বিবেচক; অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভুলচুক নিয়ে তারা হইচই বাধায়নি। খুব শান্ত এবং সংযত হয়েই নাটক দেখে যাচ্ছিল। হাজার হোক শ্রীপর্ণারা তো তাদেরই সহপাঠী-সহপাঠিনী।

মোট পাঁচ অঙ্কের নাটক। একটানা তিন অঙ্কের পর মিনিট পনেরো ইন্টারভ্যাল। ইন্টারভ্যালের কিছুক্ষণ আগে শর্মিলা হঠাৎ পেছন ফিরে আস্তে করে বলেছিল, 'তুমি খেলার মাঠে গিয়ে সামনের গোল পোস্টটার কাছে অপেক্ষা করো। আমি একটু পর আসছি।' বলেই আবার স্টেজের দিকে তাকিয়েছিল।

মলয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তার মনে পড়েছে, শর্মিলা তাকে কিছু বলতে চায়। নাটক শেষ হওয়ার পর সময় পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। নিশ্চয়ই আজিজুল তখন তাকে নিতে আসবে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে অত রাতে তার সঙ্গে কথা বলাটা খুবই দৃষ্টিকটু। তাই নাটক চলার মাঝখানে শর্মিলা এভাবে সুযোগ তৈরি করে নিতে চেয়েছে।

আস্তে-আস্তে হল থেকে বেরিয়ে সোজা খেলার মাঠের নির্দিষ্ট গোলপোস্টের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মলয়। দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি, শর্মিলা চলে এসেছিল। নাটকের দিকে নজর থাকায় কেউ তাদের এভাবে চলে আসাটা লক্ষ করেনি।

তখন হেমন্তের শুক্লপক্ষ চলছে। দিগন্তের তলা থেকে রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। অঢেল জ্যোৎস্নায় তাদের সেই শহরের বাড়িঘর মাঠঘাট ভেসে যাচ্ছিল যেন। মিহি চিনির গুঁড়োর মতো হিম পড়ছিল সমস্ত চরাচর জুড়ে। মনে হচ্ছিল একটা ফিনফিনে সিল্কের পরদা গোটা পৃথিবী মুড়ে রেখেছে। ঠান্ডা শুকনো হাওয়া বইছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

শর্মিলা বলেছিল, 'বোসো'—বলে পায়ের স্লিপার খুলে তার ওপর বসে পড়েছিল।

হিমে মাঠের ঘাস ভিজে গিয়েছিল। মলয় বলেছিল, 'এই খোলা মাঠে বসলে! আবার ঠান্ডা লেগে যাবে কিন্তু—'

'কিচ্ছু হবে না। প্রোটেকশান নিয়ে নিচ্ছি।' বলে শাড়ির আঁচলে ভালো করে মাথা ঢাকতে-ঢাকতে বলেছিল, 'দাঁড়িয়ে রইল কেন, বোসো না—'

অগত্যা রুমাল বিছিয়ে তার ওপর বসতে হয়েছিল মলয়কে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর শর্মিলা বলেছিল, 'আমাদের ব্যাপারটা বাবা জেনে ফেলেছেন। লাস্ট উইকে তুমি আর আমি যে কলকাতায় গিয়েছিলাম, আমাদের এক রিলেটিভ তা দেখে ফেলে বাবাকে খবরটা দিয়েছে।'

হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল মলয়ের। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল সে, গলার স্বর ফোটেনি।

শর্মিলা আবার বলেছে, 'বাবা আমাকে আলটিমেটাম দিয়েছেন, তোমার সঙ্গে মেশা চলবে না, কোনওরকম সম্পর্ক রাখতে পারব না। তাঁর কথা না শুনলে আমাকে কলেজে আসতে দেবেন না।'

মলয় চমকে উঠেছে, 'তোমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে?'

'না। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আমাকে কলকাতার কলেজে ভরতি করে দেবেন।'

'তুমি কী বললে বাবাকে?'

'তাঁর কথায় রাজি হইনি। বাবাকে বলেছি তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারি না।'

মলয়ের স্তব্ধ হৃৎপিণ্ড হঠাৎ গতি ফিরে পেয়ে দশগুণ জোরে লাফাতে শুরু করেছিল। গলানো রুপোর মতো চাঁদের আলোয় শর্মিলাকে অলৌকিক কোনও দেবীমূর্তি মনে হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে প্রথম সে আবিষ্কার করেছিল, 'শর্মিলা যা বলেছে সে তো তারই কথা। শর্মিলাকে ছাড়া তারও চলবে না। তাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনও মানে নেই। তবু মলয়ের ভেতরকার দ্বিধাটা একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। সে বলেছে, 'কিন্তু—'

শর্মিলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল, 'কী?'

'আমাদের কথা তোমাকে সবই বলেছি। আমার বাবা উকিলের মুহুরি। তাঁর ইনকাম—'

মলয়কে শেষ করতে দেয়নি শর্মিলা। আর আগেই সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ওসব অনেক শুনেছি। তোমাদের ফ্যামিলির ব্যাপারে কিছুই লুকোওনি, কিছুই গোপন করোনি। নিজের অনেষ্টি তুমি বহুবার প্রুভ করেছ।'

রুদ্ধশ্বাসে মলয় জিগ্যেস করেছে, 'কি করতে চাও তুমি?'

'আমি একটা ডিসিশান নিয়ে ফেলেছি। আশা করি তোমার আপত্তি হবে না।'

'বলো, কী করতে হবে আমাকে?'

'কলকাতায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে হবে। দু-চার দিনের মধ্যে গিয়ে নোটিশ দিয়ে আসব। তারপর আরেক দিন যেতে হবে বিয়ের জন্যে।'

শর্মিলা যে মনে-মনে এতদূর এগিয়েছে, ভাবতে পারেনি মলয়। বিয়েটা হয়ে গেলে কত ধরনের সমস্যা দেখা দেবে, সিনেমা স্লাইডের মতো চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল তার। ভেতরে-ভেতরে অদ্ভুত এক ভয়ে গুটিয়ে যেতে লাগল সে। ঝাপসা গলায় কোনওরকমে সে শুধু বলতে লাগল, 'এখন বিয়ে!'

'হ্যাঁ, এখনই। বাবা আজই আমার এই কলেজে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। পার্টিতে গেছেন বলে কোনওরকমে চলে এসেছি। তোমার কনসেন্টটা দরকার। সেটা পেলেই কলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করব। কবে কোথায় কখন তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে খবর পেয়ে যাব। সেখান থেকে তোমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাব।'

সমস্ত ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অকল্পনীয় যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে মলয়। শর্মিলার মতো সে বেপরোয়া নয়, বরং রীতিমতো ভীরুই। তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল।

ঢোক গিলে কাঁপা গলায় বলেছে, 'কিন্তু—'

'কী?' পলকহীন তাকিয়ে-তাকিয়ে মলয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে যাচ্ছিল শর্মিলা।

মলয় বলেছে, 'আমাকে একটু ভাবার সময় দাও শর্মিলা।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

চোখ নামিয়ে মলয় বলেছিল, 'তা একটু পাচ্ছি। আমরা ভীষণ গরিব যে—'

কিছুক্ষণ ভেবে শর্মিলা বলেছে, 'তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। এই কলেজে আর আসতে পারব কিনা জানি না। তবে পাঁচ-ছ দিন বাদে তোমার সঙ্গে যেভাবেই হোক দেখা করব, নইলে কাউকে পাঠাব। তবে আমি যা বললাম, সেটাই কিন্তু করতে হবে।' একটু থেমে বলেছে, 'বিয়েটা আপাতত হয়ে যাবে। এখন কাউকে জানাবার দরকার নেই। পরে দুজনের পড়াশোনা শেষ হলে জানালেই চলবে।'

'তার আগেই যদি জানাজানি হয়ে যায়?'

'হলে হবে। আমি যদি তোমার জন্যে এতটা রিস্ক নিতে পারি, তুমি কি আমার জন্যে একটুও নেবে না?'

একটু নীরবতা। পরক্ষণে কিছু মনে পড়তে চোখ তুলে ব্যস্তভাবে মলয় বলেছে, 'একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'এখন ঝোঁকের মাথায় দারুণ ইমোশনাল হয়ে বিয়ে করতে চাইছ। পরে আমাকে যদি ভালো না লাগে! যদি মনে হয় ভুল করেছ, তখন? তার চেয়ে যা বলছি শোনো—'

'বলো—'

'বিয়েটা এখন থাক। তুমিও আছ, আমিও আছি। পরে যদি তোমার মনের অবস্থা এখনকার মতো থাকে, একটা ডিসিশান নেওয়া যাবে।'

স্থির চোখে মলয়কে দেখতে-দেখতে শর্মিলা বলেছিল, 'তুমি কি. ভয় পাচ্ছ?'

আস্তে-আস্তে মাথা নেড়েছে মলয়, অর্থাৎ ভয় পাচ্ছে।

শর্মিলা কি ভেবে এবার বলেছিল, 'দেখো আমি খানিকটা ইমোশনাল ঠিকই, তবে ঝোঁকের মাথায় কিছুই করছি না। অনেক ভেবেই বিয়ের ডিসিশানটা নিয়েছিলাম।' একটু থেমে ফের বলেছে, 'তোমার যখন হেজিটেসন রয়েছে, ক'দিন সময় নাও। পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব।'

কতক্ষণ সারা গায়ে হেমন্তের হিম আর পূর্ণিমার মায়াবী জ্যোৎস্না মেখে মলয়রা খেলার মাঠে বসেছিল, মনে নেই। হঠাৎ অনেক মানুষের গলা কানে আসতে দুজন চমকে উঠেছে। খানিক দূরে কলেজের হল থেকে ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে আসছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল,'নাটক শেষ হয়ে গেছে।

শর্মিলা বলেছিল, 'চলো, ওঠা যাক। আজিজুল নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে এসে বাইরের রাস্তাটা ওয়েট করছে।'

সেই যে পূর্ণিমার রাতে কলেজের মাঠে বসে ওরা বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেছিল, তার মাস খানেকের মধ্যে মলয়ের জীবন একেবারে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। ঘটনাটা প্রাকৃতিক কোনও বিপর্যয়ের মতোই ভয়াবহ। হঠাৎ দশ দিনের প্রচণ্ড জ্বরে বাবা মারা গেল। 'জীবন সংগ্রাম' বলে যে একটা বস্তু আছে, বাবাকে দেখলে সেটা টের পাওয়া যেত। ছেলেবেলা থেকে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে শরীরে ঘুণ ধরে গিয়েছিল, প্রবল জ্বরের ধাক্কাটা আর সামলাতে পারেনি।

এদিকে সেদিনের পর থেকে শর্মিলা আর কলেজে আসেনি। ওর ক্লাসেরই একটি মেয়ে সুজাতা

ছিল তার প্রাণের বন্ধু। তাকে দিয়ে মাঝে-মাঝে মলয়ের কাছে খবর পাঠাত। উমানাথ যে বলেছিলেন, তাঁর কথামতো না চললে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে শর্মিলাকে কলকাতার কলেজে ভরতি করে দেবেন, সেই সিদ্ধান্তটা আপাতত স্থগিত রেখেছেন। এখন কিছুদিন একমাত্র পরীক্ষার সময় ছাড়া মেয়েকে তিনি কলেজে পাঠাবেন না। পরে সবদিক বুঝে যা ভালো মনে হয় করবেন। অর্থাৎ শর্মিলাকে বাড়িতে আটকে ফেলেছেন তিনি। কলেজে চোখের আড়ালে গিয়ে সে মলয়ের সঙ্গে মেলামেশা করবে, সে সুযোগ আর দেবেন না।

শর্মিলার জন্য মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেত ঠিকই কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল মলয়। বাবা কিছুই জমিয়ে রেখে যেতে পারেনি। সঞ্চয়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মুহুরির কাজ করে যা সে রোজগার করেছে সংসারের হাঁ-মুখ বোজাতে-বোজাতেই তা শেষ হয়ে গেছে।

মায়ের একটা সরু সোনার চেন হার বেচে কোনওরকমে বাবার শ্রাদ্ধ চুকোনো হয়েছে। কিন্তু তারপর? তারা চার ভাইবোন এবং মা, এই পাঁচজন নিয়ে তাদের ফ্যামিলি। এরা কী খাবে, কী পরবে, এতগুলো মানুষের ভবিষ্যৎ কী, ভেবে-ভেবে রাত্তিরে মলয়ের ঘুম হত না।

ফৌজদারি উকিল সারদা চট্টরাজের মুহুরি ছিল বাবা। সারদাবাবু মানুষটি বেশ হৃদয়বান, সজ্জন। মলয়দের ফ্যমিলি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। বিশেষ করে মলয় ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বলে তাকে খুবই স্নেহ করতেন।

বাবার শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ার পর সারদাবাবু একদিন তাদের বাড়ি এসে মলয়ের হাতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, তা-ই ভাঙিয়ে কিছুদিন চলেছে। কিন্তু এভাবে দয়ার ওপর বেঁচে থাকা একেবারেই সম্মানজনক নয়। তা ছাড়া ঠেকনো দিয়ে কতদিন চলতে পারে? একটা স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা না হলে ফ্যামিলিটা রক্ষা করা যাবে না।

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত মলয় ঠিক করে ফেলেছিল, পড়াশুনো ছেড়ে দেবে। নিজে ভালো রেজাল্ট করার চাইতে ভাইবোনদের বাঁচানোটা অনেক বেশি জরুরি। শুনে মা কেঁদে ফেলেছিলেন, 'এতদূর এগিয়ে কলেজ ছেড়ে দিবি? তোর তো মাইনে দিতে হয় না।'

মলয় হেসে ফেলেছে। বুঝিয়ে মাকে বলেছে, পড়ার জন্য না হয় খরচ নেই কিন্তু কিছু খেয়ে তো কলেজে যেতে হবে। সেই ভাত জুটবে কোত্থেকে? ইত্যাদি ইত্যাদি—

এরপর মলয় সকালে উঠে রোজ স্টেশনের পাশের রেন-ট্রির তলায় বসতে লাগল। গাছটার কোনাকুনি যে চায়ের দোকানগুলো রয়েছে, তারা দুটো করে খবরের কাগজ রাখে। ওখানে যাওয়ার একমাত্র কারণ খবরের কাগজগুলোতে চাকরি-বাকরির যেসব বিজ্ঞাপন বেরোয় সেগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে টুকে আনা।

ভালো ছেলে বলে এই শহরে দারুণ খাতির মলয়ের, তাকে নিয়ে সবার খুব গর্ব। সে এলেই চায়ের দোকানদাররা অন্য খদ্দেরদের কাছ থেকে ছোঁ মেরে কাগজগুলো টেনে নিয়ে তাকে দিত।

বিজ্ঞাপন টোকা হয়ে গেলে বাড়ি ফিরেই অ্যাপ্লিকেশন লিখে ফেলত মলয়। তারপর স্নান-টান সেরে খেয়ে-দেয়ে সোজা কলকাতায়। দরখাস্তগুলো প্রথমে ডাকে ফেলে সে যেত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে। ওখানে একটা কার্ড করিয়ে নিয়েছিল। রোজ গিয়ে ওখানকার জুনিয়র অফিসার সুবিমল গাঙ্গুলিকে ধরত। যেমন করেই হোক কোথাও একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মলয়ের রেজাল্ট-টেজাল্ট দেখে সুবিমল তাকে অন্য চোখে দেখত, রীতিমতো সমীহই করত বলা যায়। এমন একটি ব্রিলিয়ান্ট ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি খুঁজছে, এজন্য খুবই বিষণ্ণ বোধ করত সুবিমল। মলয়ের জন্য তার ছিল গভীর সহানুভূতি। কিন্তু চাকরির ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারছিল না। মলয়ের শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী কোনওরকম কাজের সুযোগই পাওয়া যাচ্ছিল না।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে বেরিয়ে মলয় ডালহৌসি এরিয়ার অফিসপাড়ায় সেই বিকেল

পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত। কিন্তু সব জায়গাতেই 'নো ভ্যাকান্সি।' সারাদিন পর হতাশ ক্লান্ত বিপর্যস্ত মলয় ধুঁকতে-ধুঁকতে লোকাল ট্রেনে বাড়ি ফিরে আসত।

এই সব চাকরি-টাকরি খোঁজার আগে মলয়ের বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েই সুজাতাকে দিয়ে তাকে নির্জন গঙ্গার পাড়ে ডাকিয়ে এনে দেখা করেছিল শর্মিলা। কোন কৌশলে বাড়ির লোকেদের ধোঁকা দিয়ে সে বেরুতে পেরেছিল, মলয় জিগ্যেস করেনি। তখন এসব জানতে চাওয়ার মতো মনের অবস্থাও নয় তার।

অশৌচের সাজে মলয়কে দেখে নিঃশব্দে শর্মিলা তার কাঁধে একটা হাত রেখে স্তব্ধ মূর্তির মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। সেই স্পর্শটুকুর মধ্যে এমন এক মমতা মাখানো ছিল যা ভীত উদ্‌ভ্রান্ত শোকাচ্ছন্ন মলয়ের স্নায়ুগুলোকে জুড়িয়ে দিয়েছে। মা ছাড়া এমন ছোঁয়া আগে আর আরও কাছে পায়নি মলয়।

সেদিন সামান্য দু-একটা কথা বলে চলে গিয়েছিল শর্মিলা। পরে যখন সে শুনল মলয় কলেজ যাচ্ছে না, চাকরির খোঁজে কলকাতায় ছোটাছুটি করছে তখন আবার সুজাতাকে দিয়ে তাকে ডাকিয়ে এনে গঙ্গার ধারে দেখা করেছে।

উদ্বিগ্ন মুখে শর্মিলা জিগ্যেস করেছে, 'এসব কী শুনছি! তুমি নাকি কলেজ ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।' মলয় বিষণ্ণ হেসেছিল।

'না না, এ হতে পারে না। কাল থেকে তুমি আবার ক্লাস করবে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু-টিন্তু নয়।' অসহিষ্ণুভাবে মাথা নেড়েছিল শর্মিলা। 'পড়া কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না। ওটা কন্টিনিউ করতেই হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মলয় বলেছিল, 'আমাদের ফ্যামিলির অবস্থা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না! বাবার সেভিংস বলতে একটা পয়সাও নেই। ভাইবোনেরা স্টার্ভ করবে আর আমি লেখাপড়া চালিয়ে যাব, এটা ইমপসিবল।'

এবার হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসেছে শর্মিলা। গলা থেকে দামি হার এবং হাতের আঙুল থেকে হিরের আংটি খুলে বলেছে, 'এগুলো এখন রাখো, বিক্রি করলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। পরে আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।'

চমকে খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছিল মলয়। প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে সে, 'এ কী করছ! না না, প্লিজ—'

'কী হল?'

'এসব আমি নিতে পারব না।'

শর্মিলা গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার জিনিস তুমি নিতে পারো না?'

শর্মিলার আন্তরিকতা সহানুভূতি এবং সারল্য অভিভূত করে দেওয়ার মতো। কিন্তু তার হার আংটি বিক্রি করে সেই টাকায় নিজের ফ্যামিলি বাঁচাতে যাওয়ার মতো লজ্জা আর কিছুতেই নেই। সারা জীবন এই কারণে মলয়কে হীনম্মন্যতায় ভুগতে হবে। জোরে মাথা নেড়ে সে বলেছিল,'না, এ নিয়ে আমার ওপর জোর করো না, প্লিজ—'

শর্মিলার চোখে-মুখে গভীর দুঃখ ফুটে উঠেছে। ক্লান্ত গলায় সে বলেছে, 'এই ধরনের কমপ্লেক্সের মানে হয় না। আমার আছে তাই তোমাকে দিতে চাইছি। না থাকলে তো দেবার কথা উঠত না।'

মলয় উত্তর দেয়নি। সোজা শর্মিলার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না, যদি দুর্বল হয়ে পড়ে।

অভাব তো মানুষের শিরদাঁড়া শক্ত থাকতে দেয় না, সেটা যে-কোনও মুহূর্তে দুমড়ে বাঁকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার আছে।

আংটি-টাংটিগুলো নেওয়ার জন্য আরও কিছুক্ষণ বোঝাতে চেয়েছে শর্মিলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হয়েছে।

যাই হোক, শর্মিলার সঙ্গে সেই ছিল মলয়ের শেষ দেখা। সুজাতার কাছে সে খবর পেয়েছে, তাদের গোপন নির্জন গঙ্গার ধারে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে যেন জেনে ফেলেছেন উমানাথ ঘোষাল। তারপর থেকেই শর্মিলার ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। নজরদারদের চোখে ধুলো দিয়ে তার পক্ষে বাড়ি থেকে বেরুনো প্রায় অসম্ভব।

গঙ্গার ধারে সেই যে শেষবার শর্মিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারপর থেকে যত দিন গেছে ততই আরও বেশি করে হতাশ হয়ে পড়েছে মলয়। কলকাতায় ঘুরে-ঘুরে তার পায়ের জোড় আলগা হয়ে গেছে। এখনও চাকরি তো দূরের ব্যাপার, একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেনি। ক্রমশ অদ্ভুত এক ফ্রাসট্রেশনের শিকার হয়ে যাচ্ছিল মলয়। ভবিষ্যৎ বলতে তার সামনে কিছুই নেই। চারিদিকে অগুনতি কালো-কালো দেওয়াল খাড়া মাথা তুলে রয়েছে। সে যেন একটা বায়ুশূন্য ঘরে ঢুকে গেছে। দ্রুত তার শ্বাস আটকে আসছিল।

আগে মাঝে-মাঝে গঙ্গার ধারে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত শর্মিলা। তার সাহায্য না নিক, তবু তাকে দেখলেই সমস্ত হতাশা আর ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠার একটা ইচ্ছা চনমন করে উঠত। শর্মিলা যেন তার রক্তে খানিকটা অলৌকিক এনার্জি ছড়িয়ে দিয়ে যেত।

আজকাল আর সে আসে না। এক-এক সময় মলয়ের কেমন সংশয় হয়, সত্যিই কি কোনওদিন শর্মিলার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, নাকি অলীক স্বপ্নের মধ্যে পৃথিবীর সব সুষমা সারল্য এবং মায়া দিয়ে গড়া এক আশ্চর্য দেবীমূর্তি দেখেছিল? স্বপ্ন ভাঙতেই সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ইদানীং ফ্রাসট্রেশনের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে মলয়। কিছুই ভালো লাগে না। সারাক্ষণ বিচিত্র এক অস্থিরতা তাকে যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। চেনাজানা মানুষের সঙ্গ সে এড়িয়ে চলে। কেন না দেখা হলেই সেই একই প্রশ্ন ঃ 'পড়াশোনাটা বন্ধ করলে কেন?' বা 'চাকরি-বাকরি হল কিনা' ইত্যাদি। এসব শুনলে নিজেকে খুবই ডিফিটেড মনে হয়। মনে হয় সবদিক থেকে পরাজিত হতে-হতে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল সব কিছুই যখন অসহ্য ক্লান্তিকর তখন মাঝে-মাঝে রেন-ট্রির তলায় গিয়ে হাফ-মস্তান ওয়াগন-ব্রেকারদের কাছে চুপচাপ বসে থাকে মলয়। ওরা তাকে কিছুই জিগ্যেস করে না, কোনও কিছুই জানতে চায় না।

কখনও-কখনও মলয়ের মনে হয়, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে তো কতবার গেছে, কলকাতার এমন কোনও অফিস নেই যেখানে অন্তত দশ বার হানা দেয়নি, কিন্তু সৎভাবে কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত কি ওয়াগন-ব্রেকারদের দলে ভিড়ে রেলের মাল লুট করতে হবে? কিংবা মস্তান এবং ছেনতাইবাজদের মতো ছুরি হাতে তুলে নেবে?

এইভাবে যখন দিন কাটছে তখন আজ উমানাথ ঘোষাল গাড়ি পাঠিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে হেঁটেছে, মলয়ের খেয়াল নেই। হঠাৎ হুড়মুড় করে বেল বাজাতে-বাজাতে একটা সাইকেল রিকশ পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই চাপা মেয়েলি গলা কানে

এল। 'উঠে এসো।'

চমকে রিকশার দিকে তাকাতেই মলয়ের চোখে পড়লে সিটের সামনে পরদা ফেলা। পরদাটা অল্প সরিয়ে শর্মিলা তার দিকে ঝুঁকে আছে।

এখানে এভাবে শর্মিলাকে দেখবে, ভাবতে পারেনি মলয়। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে রইল।

শর্মিলা তাড়া লাগায়, 'কী হল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো—'

মলয় জিগ্যেস করল, 'কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?'

শর্মিলা ব্যস্তভাবে বলে, 'গেলেই বুঝতে পারবে।'

মলয় আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শর্মিলা আঙুল তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'কোনও কথা নয়, উঠে পড়ো।'

বিস্ময়টা থিতিয়ে যাওয়ার আগেই মলয় লক্ষ করে, সে উঠে শর্মিলার পাশে বসে পড়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে সামনের পরদা নামিয়ে শর্মিলা বলে, 'ঝিলের পাড়ে চলো।' তারপর মলয়ের দিকে ফিরে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয়, 'আমাকে এভাবে দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেছ তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। এখানে এলে কী করে?'

শর্মিলা যা উত্তর দেয়, তা এইরকম। মলয়কে উমানাথ যে তাদের বাড়িতে ধরে এনেছেন, এ খবরটা পেয়েই সে ড্রইংরুমের পাশের ছোট একটা ঘরে চলে আসে। দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজায় কান পেতে উমানাথ এবং মলয়ের সব কথাই সে শুনেছে। তারপর মলয় যখন সামনের গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়, শর্মিলা তখন বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং এই সাইকেল রিকশাটা করে মলয়কে ধরে ফেলে। রাস্তায় মলয়কে দেখতে না পেলে শর্মিলাকে তাদের বাড়িতে যেতে হত।

শুনতে-শুনতে চমকে ওঠে মলয়। বলে, 'এ তো ভীষণ রিস্কি ব্যাপার।'

'কীসের রিস্ক?'

'তুমি যে বাড়ি থেকে এভাবে চলে এলে? কেউ যদি দেখে ফেলত?'

'দেখে তো ফেলেছেই!'

শ্বাস টানার মতো শব্দ করে মলয় জিগ্যেস করল, 'কে দেখেছে?'

'আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে যাদের রাখা হয়েছে তারা। মানে বাবার স্পেশাল ইনটেলিজেন্স সারভিসের লোকেরা।' খুব হালকাভাবে কথাগুলো বলে হেসে ফেলে শর্মিলা।

যত মজার ভঙ্গিতেই সে বলুক না, মলয়ের শ্বাস যেন আটকে আসে। উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'ওরা যদি তোমার বাবাকে জানিয়ে দেয়?'

'ভয় নেই, জানাবে না।' শর্মিলা হাসতেই থাকে।

'মানে?'

'বাবার গোয়েন্দা বাহিনীতে টাকা দিয়ে কিছু ফিফথ কলামনিস্ট, মানে বিশ্বাসঘাতক বানিয়ে ফেলেছি। তারা আমাকে বেরুতে দেখেও মুখ খুলবে না।'

দুশ্চিন্তা অনেকটাই কেটে যায় মলয়ের। সে বলে, 'তুমি একটি দুর্দান্ত মেয়ে।' বলেই হেসে ফেলে।

'যাক, এতদিনে তবু বুঝতে পেরেছ।' শর্মিলা মলয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'আমার বাবাকে তো জানো না! তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে হলে অনেক রকম স্ট্র্যাটেজি ভাবতে হয়।'

একসময় সাইকেল রিকশাটা শহরের উত্তর দিকের শেষ মাথায় ঝিলের পাড়ে চলে আসে। ঝিলটা বিরাট। প্রায় পনেরো একর জায়গা জুড়ে কাচের মতো স্বচ্ছ জলে ভরে আছে। চারিদিকে বাঁধানো পিচের রাস্তা। রাস্তার দু-ধারে কয়েক হাত পর-পর কৃষ্ণচূড়া দেবদারু পিপুল আর ঝাঁকড়া

মাথা রেন-ট্রি। গাছগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে মিউনিসিপ্যালিটি সিমেন্ট বাঁধিয়ে বসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আর বসিয়েছে সুদৃশ্য ল্যাম্পপোস্ট। জায়গাটা চমৎকার।

এই মুহূর্তে চারিদিকে মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো জ্বলছে। ঝিলের জলে আলো পড়ে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে দুলে যাচ্ছে। ঝিরঝিরে পাতলা শুকনো হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

এখন বেশি লোকজন নেই ঝিলের পাড়ে। এখানে ওখানে দু-চারজন বসে আছে। কেউ-কেউ পিচের রাস্তায় অলস পায়ে হাঁটছে।

গাড়ি থামিয়ে রিকশাওলা ভাড়া চাইল।

শর্মিলা তাকে বলল, 'আমরা এখানে নামব না। ঝিলের পাড় দিয়ে আস্তে-আস্তে গাড়ি চালিয়ে যাও। আধঘণ্টা বাদে আমি যেখান থেকে উঠেছি তোমার গাড়িতে সেখানে পৌঁছে দেবে।'

ধীর গতিতে রিকশা ঝিলপাড়ের রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

শহরে এত জায়গা থাকতে শর্মিলা কেন এখানে এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে। আর বোঝা যাচ্ছে কেন সে পরদা-ঢাকা রিকশা থেকে নামল না। প্রথমত এ শহরে সব জায়গায় মানুষের থিকথিকে ভিড়। তুলনায় ঝিলের পাড় অনেকটা নিরিবিলি। এখানে চেনাজানা কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। তা সত্ত্বেও আদৌ কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি শর্মিলা। যদি কেউ শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলে, সেই ভয়ে গাড়ি থেকে নামলই না।

শর্মিলা বলল, 'তুমি বাবাকে যা বলেছ, তাতে আমি রাজি।'

মলয় বলল, 'তোমার বাবার সঙ্গে অনেক বিষয়েই কথা হয়েছে। পার্টিকুলার কোন ব্যাপারটায় তুমি রাজি বুঝতে পারছি না।'

'ওই যে বাবাকে বললে, চার বছরের ভেতর আইএএস কি আইপিএস হবে। এই চ্যালেঞ্জটা দারুণ বোল্ড মনে হয়েছে। দরজার কী-হোল দিয়ে দেখছিলাম তোমার চোখে-মুখে ট্রিমেন্ডাস পার্সোনালিটি ফুটে বেরুচ্ছিল। কী ভালো যে লাগছিল আমার!'

মলয় চুপ করে রইল। তার চ্যালেঞ্জটা শর্মিলার কাছে যে এত বিরাট ব্যাপার সেটা জেনে বুকের ভেতর হাজার হতাশা এবং ফ্রাসট্রেশনের মধ্যেও বিচিত্র অর্কেস্ট্রা বেজে যেতে লাগল।

মুখ ফিরিয়ে উৎসুক শর্মিলা এবার জিগ্যেস করল, 'বাবাকে যা বলেছ সে ব্যাপারে তুমি সিরিয়াস তো?'

মলয় বলল, 'তোমার কী মনে হয়?'

'সেটাই জানতে চাইছি।'

'শুধু ব্রেভাডো দেখাবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি তা বলিনি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।' শর্মিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আস্তে-আস্তে মলয়ের একটা হাত নিজের হাতের ভেতর তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল সে।

উষ্ণ কোমল দুটি মোমের মতো হাত থেকে আশ্চর্য এক মমতা মলয়ের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

সাইকেল রিকশা ঝিলপাড়ার রাস্তা ধরে অনবরত পাক খেয়ে যাচ্ছে। একসময় শর্মিলা বলল, 'আমার বিশ্বাস আছে, তুমি যা বলেছ তা করবেই। আমি—আমি—'

'তুমি কী?'

'তোমার জন্যে চার বছর অপেক্ষা করব।' শর্মিলার গলা আবেগে কাঁপতে লাগল।

আর সেই আবেগ যেন মলয়কেও ছুঁয়ে গেল। সে বলল, 'কিন্তু তোমার বাবা?'

'বাবা কী?'

'অন্য জায়গায় তোমাকে—' বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে যায় মলয়।

তার মনোভাব বুঝতে পেরে শর্মিলার ঠোঁটের কোণে আবছা একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে

যায়। সে বলে, 'আমার বাবা একজন পারফেক্ট ডিকটেটর। কিন্তু আমি তো তাঁরই মেয়ে। আমি না চাইলে বাবা আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারবেন, মনে করো?'

মলয় উত্তর দিল না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে সে দারুণ চমকে যায়। মাঝখানে কিছুদিন দেখা না হওয়ায় তার ভাবনা এবং অনুভূতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে শর্মিলা। হতাশা ক্লান্তি আর মানসিক চাপে সে যত ডুবছিল ততই যেন শর্মিলা বহুদিন আগে দেখা কোনও স্বপ্নের মতো অলীক হয়ে যাচ্ছিল। সে জানত না, তার মনের অনাবিষ্কৃত একটা অংশ জুড়ে এই মেয়েটা ছাড়া আর কেউ নেই। ভবিষ্যৎ বলতে যার কিছু নেই, কীভাবে নিজেদের ফ্যামিলিকে অবধারিত স্টার্ভেশন থেকে বাঁচাবে, এই নিয়ে সারাক্ষণ ভেবে-ভেবে যার মাথার শির ছিঁড়ে যাচ্ছে, শর্মিলাকে দেখামাত্র তার বুকের ভেতর সেই দুর্লভ মহার্ঘ স্বপ্নটা আবার কখন যেন ফিরে এসেছে।

শর্মিলা গভীর গলায় বলে, 'দেখো, তোমার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে থাকব। দরকার হলে সারা জীবন।'

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেয় না মলয়। পৃথিবীর সব বাধা অগ্রাহ্য করে শর্মিলা তার মতো একটি ছেলেকে ভালোবেসেছে। শুধু তাই না, তার জন্য বাকি জীবন অপেক্ষা করা সম্পর্কে যা বলল তা যে শুধু কথার কথাই নয়, সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না। এত বড় ঘটনা মলয়ের জীবনে আর কখনও ঘটেনি। গাঢ় গলায় সে বলল, 'আমি তোমার মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব।'

শর্মিলা তার হাত আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। তারপর রিকশাওয়ালাক বলে, 'যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে চলো।'

চার

ঝিলের পাড় থেকে বাইরে বেরিয়ে শর্মিলাদের সাইকেল রিকশা শহরের মেন রাস্তায় চলে এল।

এখানে প্রচুর লোকজন, চারধারে থিকথিকে ভিড়। রাস্তার দোকানপাট তো বটেই, ডানদিকের মিউনিসিপ্যাল মার্কেটও গমগম করছে।

রিকশার পরদাটা ফেলাই আছে। শর্মিলা চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেব?'

পরদা সামান্য সরিয়ে জায়গাটা দেখে নিল মলয়। বলল, 'সামনের ওই মোড়ে।'

একটু পর তাকে নামিয়ে দিয়ে বাঁক ঘুরে শর্মিলা চলে গেল। যতক্ষণ সাইকেল রিকশাটা দেখা যায়, তাকিয়ে রইল মলয়। তারপর রাস্তা পেরিয়ে দূরমনস্কর মতো হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশনের দিকে চলল। স্টেশনের গায়ে যে ওভারব্রিজটা রয়েছে সেটা পেরিয়ে ওধারে গেলে তাদের বাড়ি।

একসময় বাড়িতে পৌঁছে গেল মলয়।

স্টেশনের এদিকটা শহরের পুরোনো পাড়া। এখানকার বাড়িঘর, মন্দির—সব কিছুর গায়েই প্রাচীনত্বের ছাপ মারা। রাস্তাগুলো সাপের মতো পাক খেয়ে-খেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মলয়দের বাড়িটা দোতলা। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির শেষদিকে মলয়ের বাবার ঠাকুরদা এটা বানিয়েছিল। সেই ভদ্রলোক কী সব ব্যাবসা-ট্যাবসা করে মোটামুটি ভালোই পয়সা করেছিল। ঠাকুরদা সেই ব্যাবসা ধরে রাখতে পারেনি। তখন থেকেই পড়তি দশা। আর্থিক দিক থেকে ক্রমাগত তারা নিচেই নেমে চলেছে। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন শুধু অভাব আর হতাশা।

আর্থিক কোন লেভেলে তারা নেমে গেছে, বাড়িটার দিকে এক পলক তাকালেই টের পাওয়া যায়। দেওয়ালগুলোতে প্ল্যাস্টার নেই, নোনা লেগে ভেতরের ইট খানিকটা করে ক্ষয়ে গেছে। তার ওপর শ্যাওলার চিরস্থায়ী দাগ। ভাঙা কার্নিসের ফাঁক দিয়ে অশ্বত্থের মাথা বেরিয়েছে। তাদের শিকড় বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে।

সামনের দিকে খানিকটা খোলা জায়গা। কোনও এককালে সেখানে চমৎকার একটা বাগান হয়তো ছিল, এখন শুধুই আগাছার জঙ্গল, ঝোপঝাড় ইত্যাদি।

জঙ্গল ঠেলে, চার পাঁচটা সিঁড়ি ভেঙে একতলার বারান্দায় উঠতেই অল্প পাওয়ারের আলোয় চোখে পড়ল মা একধারে চুপচাপ বসে আছে। এমনিতেই মা খুব রোগা, তার রক্তশূন্য চেহারায় ক্ষয় শুরু হয়েছিল বহুকাল আগেই। বাবার মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে মা, এখন সে হাড়-মাংসের ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

আরেক ধারে তিন ভাইবোন—রুমা আলো আর নীলু চাপা নীচু গলায় ক্লাসের পড়া তৈরি করছে। মলয় কলেজ ছাড়লেও, ভাইবোনদের এখনও স্কুলে পাঠাচ্ছে।

মলয়কে দেখে মুখ তুলে তাকাল মা। চোখের তলায় গাঢ় কালির স্থায়ী ছোপ। বাবার মৃত্যু এই মহিলাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। নির্জীব গলায় মা বলল, 'কিছু হল হারু?'

বাবা মারা যাওয়ার পর যেদিন থেকে মলয় চাকরি খুঁজছে সেদিন থেকেই রোজ যান্ত্রিক নিয়মে এই কথাটা বলে যাচ্ছে মা।

মলয় রোজ যা বলে আজও তা-ই বলল, 'না মা—'

'ও—' মায়ের আর কিছুই যেন জানার নেই, এমনভাবে চুপ করে গেল।

মলয় আর দাঁড়াল না। বারান্দার একদিকে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে নিজের ঘরে ঢুকে জানালার ধারে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ল। তার এই জানলাটা দিয়ে তাকালে অনেকটা দূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশের বিরাট একটা ক্যানভাস চোখে পড়ে।

আজ কী তিথি কে জানে। সম্ভবত এখন পূর্ণিমা চলছে। দিগন্তের তলা থেকে রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠে এসেছে। স্বচ্ছ নীলাকাশে তুলোর পাহাড় হয়ে সাদা ভারহীন মেঘের দল এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে।

আজকাল বাড়িতে ঢুকলেই মলয়ের মনে হয় শ্বাস আটকে আসছে। মা এবং ভাইবোনদের দিকে সে ভালো করে তাকাতে পারে না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা আলাদা। সেই বিকেল থেকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যেসব নাটকীয় ব্যাপার একের-পর-এক ঘটে গেছে তা তাকে আচমকা জীবনের একটা আশ্চর্য জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বারবার শর্মিলার কথা মনে পড়ছে। সে তার জন্য আজীবন অপেক্ষা করবে। কিন্তু উমানাথ ঘোষালকে উত্তেজনার ঝোঁকে সে যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসেছে, সেটা রাখবে কীভাবে? ফিনিক-ফোটা মায়াবী জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে মাথার দু-ধারে শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে মলয়ের।

কতক্ষণ এভাবে কেটে যায়, নিজেও সে জানে না। আচমকা একটা কথা মনে পড়তে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু খেলে যায়। দারুণ উত্তেজনা বোধ করে মলয়। কিন্তু পরক্ষণেই অদ্ভুত এক দুর্ভাবনা এবং ভয় তাকে পেয়ে বসে। নিজের সঙ্গে খানিকক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে ফেলে, এই মুহূর্তে যা তার মনে পড়েছে, তা নিয়ে মা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে আজই কথা বলবে। কেন না, ব্যাপারটা তার একার ওপর নির্ভর করে না। এর সঙ্গে বাড়ির সবাই জড়িত। তারা রাজি না হলে কিছুই করা যাবে না।

হঠাৎ নীলুর গলা ভেসে আসে। নীচের তলা থেকে সে ডাকছে, 'দাদা খেতে এসো।'

মলয় চমকে ওঠে। তারপর ধড়মড় করে একতলায় নেমে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। রান্নাঘরটা বেশ বড় মাপের। এখানেই একধারে মেঝেতে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। মলয়ের চোখে পড়ল, পুরোনো আমলের কাঠের পিঁড়িতে আলো নীলু আর রুমা বসে আছে। ওদের সামনে খাবারটাবার নিয়ে বসে রয়েছে মা। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটা পিঁড়ি এখনও ফাঁকা। সেটা মলয়ের। সে বসতেই মা এনামেলের থালায়-থালায় রুটি তরকারি আর কলাইয়ের বাটিতে একটু করে ডাল দিয়ে সবার সামনে সাজিয়ে দিল।

সিলিং থেকে লম্বা তার ঝুলিয়ে সেটার সঙ্গে অল্প পাওয়ারের বাল্ব আটকে দেওয়া হয়েছে। বাল্বটার গায়ে সিকি ইঞ্চি পুরো ধোঁয়া ধুলো আর তেলের একটা কোটিং। ফলে যে আলোটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতে এ-ঘরের কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়, সব আবছা-আবছা।

খেতে-খেতে মা এবং ভাইবোনদের একবার দেখে নিল মলয়। সবাই মুখ নীচু করে খেয়ে যাচ্ছে।

মলয়কে বাদ দিলে অন্য ভাইবোনদের মধ্যে রুমাই বড়। ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। তারপর নীলু। সবার ছোট আলো। নীলু পড়ছে নাইনে, আলোর সিক্স চলছে।

কিছুক্ষণ আগে নিজের ঘরে বসে যা ভাবছিল, এখন মনে-মনে সেটাই গুছিয়ে নিল মলয়, তারপর বলল, 'তোমাদের সবার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে। সবদিক ভালো করে ভেবে উত্তর দেবে।'

ঠিক এই ভঙ্গিতে এই সুরে কখনও কথা বলে না মলয়। সবাই উৎসুক চোখে তার দিকে তাকাল।

মলয় বলতে লাগল, 'তোমরা সবাই জানো, ক'মাস ধরে অনবরত চেষ্টা করেও চাকরি-টাকরি কিছুই পাইনি। পার্ট ওয়ান পর্যন্ত যতই ভালো রেজাল্ট করে থাকি না কেন, পুরোপুরি বি এ-টা পাস করতে পারিনি। আজকাল অন্তত গ্র্যাজুয়েট না হতে পারলে কাজ-টাজ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার জন্যে এখনও একটা বছর লাগবে। আমি যদি ফের পড়াশোনা শুরু করে আসছে বার পরীক্ষা দিই, এই এক বছর সংসার কীভাবে চলবে? সারদাবাবু দয়া করে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু বার-বার তো দেবেন না।' এই পর্যন্ত বলে মলয় থামল।

কেউ কিছু বলল না। শ্বাসরুদ্ধের মতো তাকিয়ে রইল।

মলয় একটু ভেবে আবার শুরু করল, 'আমি একটা কথা ভেবেছি। ফ্যামিলিকে বাঁচাতে হলে, রুমা আলোর ভালো বিয়ে দিতে হলে, নীলুকে মানুষ করতে হলে আমার গ্র্যাজুয়েট হওয়া খুবই দরকার। শুধু তাই না, ভালো চাকরি পেতে হলে আরও বড় কমপিটিটিভ পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে হবে। নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, পরীক্ষায় বসলেই পাস করতে পারব। কিন্তু—'

শুনতে-শুনতে মা বুঝিবা সামান্য একটু আশার রেখা দেখতে পেল। আধফোটা গলায় বলল, 'কিন্তু কী?'

মলয় মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর জন্যে তিন চার বছর সময় লাগবে। আর লাগবে অনেক টাকা। এই টাকার ব্যাপারে একটা কথা ভেবেছি। তোমরা যদি আমাকে ভরসা দাও, বলতে পারি।'

মা বলল, 'আমাদের বলবি, তার ভেতর ভরসার কথা আসছে কেন? যা ভেবেছিস, বলে ফেল।'

তক্ষুনি কিছু বলল না মলয়। অনেকক্ষণ ভেবে, প্রচুর দ্বিধা কাটিয়ে এভাবে শুরু করল, 'দেখো মা, তোমার যদি অনেক গয়না-টয়না থাকত, বলতাম দাও, বিক্রি করে আগে জীবনে দাঁড়াই। আমাদের একমাত্র যা আছে তা হল এই বাড়িটা। এ-বাড়ি তোমার একার হলেও, চেয়ে নিয়ে বেচে দিতাম। কিন্তু এতে আলো-রুমা-নীলুর সমান ভাগ। ভয়টা আমার সেখানেই।' একটু থেমে আবার বলল, 'যদি আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে বাড়িটা বিক্রি করার ব্যবস্থা করি। যা দাম পাব তাতে তিন-চার বছর আমাদের চলে যাবে। ততদিনে আমি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাব। সবাইকে টেনেও তুলতে পারব। এখন সবকিছু তোমাদের মতামতের ওপর নির্ভর করছে।'

মা এবং ভাইবোনেরা মলয়ের কথা শেষ হতে-না-হতেই এক সঙ্গে জানাল, তাদের আপত্তি নেই, মলয় যাই করুক না কেন তাতেই তাদের নিঃশর্ত সায়।

মলয় জানে তার ওপর ওদের গভীর আস্থা। ওরা বিশ্বাস করে, সে কোনও অন্যায় করতে

পারে না। তবু বলল, 'এক্ষুনি তাড়াহুড়ো করে কিছু বলার দরকার নেই। চিন্তা-টিন্তা করে দু-চার দিন বাদে জানালেই হবে।'

মা বলল, 'চিন্তার কিছু নেই। যা ভেবেছিস তাই কর। সংসার নষ্ট হয়ে গেলে এই বাড়ি থেকে কী হবে?'

মলয় এবার ভাইবোনদের দিকে তাকিয়েছে, 'তোরা কী বলিস?'

সবাই বলেছে, যা জানাবার আগেই জানিয়ে দিয়েছে। নতুন করে আর কিছু বলার নেই।'

'পরে আবার ভাববি না তো দাদা তোদের ঠকাবার জন্যে এই ব্যবস্থা করেছে।'

'না।' জোরে মাথা নেড়েছে রুমারা।

মলয় গভীর গলায় এবার বলল, 'তোদের বিশ্বাসের মর্যাদা আমি প্রাণ দিয়েও রাখতে চেষ্টা করব।' মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'মা, যদি পারি এই বাড়িটাই একদিন ফিরে পেতে চেষ্টা করব। নইলে যেভাবে পারি তোমাদের নতুন বাড়ি করে দেবই।'

'আমি জানি।' মা স্নিগ্ধ হাসল। মলয়ের ওপর তার আস্থা বিশ্বাস এবং নির্ভরতা যে কতখানি, এই হাসিতে তা যেন ফুটে উঠতে থাকে।

মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি বেচে কলকাতায় চলে গিয়েছিল মলয়রা।

দ্বিতীয় পর্ব

পাঁচ বছর পর নতুন করে এই কাহিনি আজ আবার শুরু হচ্ছে।

ক'দিন আগে পুজো গেল। সবে কার্তিক মাস পড়েছে। কিন্তু হিম বা কুয়াশার চিহ্ন নেই কোথাও। বাতাসে এখনও টান ধরেনি। যেদিকেই তাকানো যাক, হয় ঝলমলে নীলাকাশ, তুলোর পাহাড়ের মতো অজস্র সাদা মেঘ, মাঠ ভরতি ধবধবে কাশফুল অথবা গলানো গিনির মতো অঢেল মায়াবী রোদ। অর্থাৎ শরৎকাল এখনও তার আপন মহিমায় চারধারে ছড়িয়ে আছে।

এখন ঠিক দুপুরও না, আবার বিকেলও না। দুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় সময়টা থমকে রয়েছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে কলকাতা থেকে একটা ডাউন লোকাল ট্রেন এসে বিবিবাজারে থামল। পেছন দিকের একটা কামরা থেকে আস্তে-আস্তে নেমে এল মলয়।

পাঁচ বছর আগে পূর্বপুরুষের বাড়ি বেচে দিয়ে মা এবং ভাইবোনদের হাত ধরে যে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাগ্রস্ত যুবকটি এ-শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এই মলয়ের মধ্যে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনকার মলয়ের স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়ে গেছে। গায়ের রঙে পড়েছে চকচকে পালিশ। ভাঙা গাল এবং কণ্ঠার খাঁজগুলো ভরাট হয়ে গেছে।

তার পরনে এখন দামি সাফারি স্যুট, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, নিখুঁত কামানো গাল, ব্যাকব্রাশ করা চুল, বাঁ-হাতে স্টিল ব্যান্ডে সুদৃশ্য ঘড়ি, ডান হাতে একটা চৌকো অ্যাটাচি কেস।

মলয়ের চেহারা এবং পোশাকে এমন এক ব্যক্তিত্ব দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাসের ছায়া পড়েছে, পাঁচ বছর আগে এসব কিছুই ছিল না।

সেই যে মলয় চলে গিয়েছিল, তারপর এই প্রথম বিবিবাজারে এল। সুরকি-বিছানো প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এবং চারিদিক দেখতে-দেখতে সে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

স্টেশনটা প্রায় একই রকম আছে। কোথাও পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। সেই চায়ের দোকান, ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিনের স্টল, প্ল্যাটফর্মের মাথায় সংক্ষিপ্ত অ্যাসবেস্টসের শেড, টকটকে লাল রঙের

স্টেশন বিল্ডিং—সবকিছু হুবহু পাঁচ বছর আগের মতোই।

প্ল্যাটফর্মে এখন ভিড়-টিড় নেই। এখানে ওখানে অল্প কিছু লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

চায়ের দোকানের পাশে ঝাঁকড়া পিপুল গাছটায় তলায় যে তিনজন উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে, তারা হল বিবিবাজার থানার ও-সি প্রশান্ত সরকার, সেকেন্ড অফিসার অসিত চ্যাটার্জি এবং সাব-ইন্সপেক্টর বৈদ্যনাথ জানা। এই অফিসারদের গায়ে পুলিশের ইউনিফর্ম। তিনজনেরই পেটানো স্বাস্থ্য। বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। দূরে মলয়কে দেখামাত্র তারা প্রায় উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। মলয়কে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তাদের স্টেশনে আসা।

কাছাকাছি এসে তিনজনই শিরদাঁড়া টান-টান করে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সসম্ভ্রমে স্যালুট করে বলল, 'গুড আফটারনুন স্যার।' ওরা মলয়কে চেনে।

মলয়ও একটা হাত বুক পর্যন্ত তুলে বলল, 'গুড আফটারনুন। আপনাদের খবর ভালো তো?' মলয়ও ওদের চেনে।

তিনজনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশান্ত বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'আমার মা আর ভাইবোনদের কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

মলয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রশান্ত ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'ওঁদের বাংলোয় পৌঁছে দিয়েছি, সেখানেই আছেন। আজ সকাল থেকে দুবার গিয়ে দেখে এসেছি।'

'ধন্যবাদ।' মলয় বলতে লাগল, 'স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, চলুন যাওয়া যাক।' বলেই সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে প্রশান্ত জানাতে লাগল, মলয়ের বাংলোর চাকরবাকর আর্দালি থেকে শুরু করে গেটের পাহারাদার, গাড়ির ড্রাইভার—সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। স্যারের এতটুকু অসুবিধা হবে না।

এগুলো রুটিন ব্যাপার। তার পদমর্যাদার কোনও অফিসার কোথাও পোস্টিং নিয়ে গেলে এসব বন্দোবস্ত আগেই করে রাখা হয়। অল্প হেসে মলয় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

স্টেশনের বাইরে আসতেই দেখা গেল একটা পুলিশের জিপ আর একটা মেরুন অ্যামবেসেডার দাঁড়িয়ে আছে।

প্রশান্ত জিগ্যেস করল, 'আগে কী অফিসে যাবেন, না বাংলোয়?'

'বাংলোয়। আজ আর কাজে জয়েন করছি না। একেবারে কাল থেকেই শুরু করব।'

'সে-ই ভালো। আজকের দিনটা রেস্ট নিন। এই যে স্যার, দয়া করে এই গাড়িটায় উঠুন—' প্রশান্ত অ্যামবেসেডরের পেছনের দরজা খুলে দিল। মলয় উঠবার পর দুই সহকর্মী অসিত এবং বৈদ্যনাথকে জিপ নিয়ে থানায় চলে যেতে বলল। তারপর ব্যাকডোর বন্ধ করে সামনের দরজা দিয়ে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসতে-বসতে ময়লকে বলল, 'চলুন স্যার, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

কখন কী করতে হবে ড্রাইভার জানে। স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে বিবিবাজারের মেন রাস্তায় নিয়ে এল। দু-চোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে জানালার বাইরে তাকাল মলয়। দু-ধারে দোকানপাট তেমনই চোখে পড়ছে। তবে রেন-ট্রির তলায় বাঁধানো সিটে ওয়াগন-ব্রেকার লালকু, ছিনতাইবাজ বিজন, মস্তান ঝন্টে বা কনফার্মড বেকার মতিকে দেখা গেল না। এই অ্যান্টি-সোশালের দল কী এখন আর এখানে বসে না?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে দারুণ মজাই লাগল মলয়ের। একদিন এই রেন-ট্রির তলা থেকেই উমানাথ ঘোষাল গাড়ি পাঠিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন ওভাবে না নিয়ে গেলে আজ একজন টপ পুলিশ অফিসার হয়ে বিবিবাজারে তার ফেরা হত না।

উমানাথ ঘোষালের কথা ভাবতেই অনিবার্য নিয়মে শর্মিলার মুখটা চোখের সামনে ফুটে

ওঠে মলয়ের। কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয়নি! মলয় জানে, সে তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

কখন রেন-ট্রি, সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড, দোকানপাটে জমজমাট এলাকা পেরিয়ে অ্যামবেসেডরটা উত্তর দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, খেয়াল নেই মলয়ের। দু-ধারে যে দৃশ্যাবলি চোখে পড়ছে তাতে মনে হয় এ-শহর একেবারেই বদলায়নি। দশ-বিশটা নতুন বাড়ি-টাড়ি হয়তো হয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি দু-একটা ঝকঝকে পার্কও বানিয়ে দিয়েছে এখানে-ওখানে, নইলে পাঁচ বছর আগের সেই ছবিই অবিকল চারিদিকে ছড়ানো। সমস্ত দৃশ্যপটের ওপর একটি কোমল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মুখ মহার্ঘ কোনও পেন্টিং-এর মতো ফুটে আছে। মলয় যখন বিবিবাজারে ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই শর্মিলার সঙ্গে দেখা হবে, আর দেখা হবে উমানাথ ঘোষালের সঙ্গে। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে শর্মিলার ব্যাপারে শেষ একটা বোঝাপড়া বাকি আছে।

হঠাৎ প্রশান্তর গলা কানে আসে, 'স্যার—'

জানলার বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় মলয়। প্রশান্ত ফ্রন্ট সিট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে লক্ষ করছে। সে বলে, 'কিছু বলবেন?'

'শুনেছি এখানে আপনাদের বাড়ি ছিল স্যার।'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে সে বাড়ি আমাদের আর নেই।' মলয় বিষণ্ণ হাসে, 'বিক্রি হয়ে গেছে।'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে প্রশান্ত। একটু ভেবে বলে, 'বাড়ি না থাক, নিজের শহরে তো থাকতে পারবেন।'

'কনসোলেশন!' রগড়ের ভঙ্গিতে হাসে মলয়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করে, 'কতদিন বাদে এখানে এলেন স্যার?'

লোকটা একটু বেশি বকে। মলয়ের ইচ্ছা ছিল জানলার বাইরে তাকিয়ে-তাকিয়ে আজন্মের চেনা শহরটাকে নতুন করে দেখবে আর শর্মিলার কথা ভাববে। কিন্তু তা হওয়ার উপায় নেই। ভেতরে-ভেতরে বিরক্ত হলেও ভদ্রতার খাতিরে মলয়কে উত্তর দিতেই হয়, 'পাঁচ বছর।'

'এই পাঁচ বছরে এখানকার ক্রাইম-রেট অনেক বেড়ে গেছে।' প্রশান্ত বলে।

বিরক্তির ভাবটা মুহূর্তে কেটে যায় মলয়ের। স্নায়ুগুলো টান-টান হয়ে ওঠে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে সে শুনে এসেছে, বিবিবাজারে অ্যান্টি-সোশাল অ্যাকটিভিটি দারুণ বেড়ে গেছে। প্রশান্তও একই কথা জানাল। মলয় বলল, 'কী টাইপের ক্রাইম?'

'মার্ডার আর স্মাগলিংই বেশি! রেপ-ডাকাতি-ছেনতাই-চুরিচামারিও রয়েছে।'

'আপনি এখানকার থানায় কতদিন আছেন?'

'বছর চারেক।'

'তা হলে তো এই শহরের নড়িনক্ষত্র আপনার জানার কথা। ক্রাইম এত বাড়ল কেন?'

'অভাব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'কোনও-কোনও রাজনৈতিক নেতা অ্যান্টি-সোশ্যালদের প্রশ্রয় আর প্রোটেকশান, দুইই দিচ্ছে। নইলে ক্রাইম বন্ধ করতে ক'দিন লাগে!'

গম্ভীর মুখে মলয় বলে, 'রাইট।'

এখানে আসার আগে এই শহরের অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে হোম ডিপার্টমেন্টে অনেক কথা শুনে এসেছে মলয়। যত দিন যাচ্ছে, জায়গাটা পুলিশের উঁচু মহলের যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে উঠছে। সেই জন্যই তার মতো সৎ এবং কড়া অফিসারকে পাঠানো হয়েছে। হোম ডিপার্টমেন্ট আন্তরিকভাবেই চায় এখান থেকে সমস্তরকম ক্রাইমের শিকড় উপড়ে ফেলা হোক।

প্রশান্ত আর কিছু বলে না। আস্তে-আস্তে মলয় আবার জানলার বাইরে তাকায়। হঠাৎ অনেকগুলো বাড়ির দেওয়ালে বড়-বড় কালো হরফে কিছু লেখা পড়ে সে চমকে ওঠে।

'আগামী নির্বাচনে সমাজসেবী উমানাথ ঘোষালকে ভোট দিন', বা 'জননায়ক উমানাথ ঘোষালকে বিধানসভার নির্বাচনে জয়যুক্ত করুন', অথবা 'আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেশব্রতী উমানাথ ঘোষালকে সসম্মানে বিধানসভায় পাঠান।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্টেশন থেকে আসতে-আসতে উমানাথ ঘোষালকে জেতাবার জন্য এ-জাতীয় আপিল দেওয়ালের গায়ে আর দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না মলয়। হয়তো দেখে থাকবে, তবে তেমনভাবে লক্ষ করেনি।

পাঁচ বছর আগে উমানাথ ছিলেন এ-শহরের সব চাইতে নামকরা বিজনেসম্যান। তিনি যে কী ম্যাজিকে হঠাৎ দেশব্রতী জননায়ক এবং সমাজসেবী হয়ে উঠলেন, মলয়ের জানা নেই। রীতিমতো অবাকই হয়ে গেল সে। পাঁচ বছর বাদে এ-শহরে পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে এটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় চমক।

বিরাট অক্ষরে নাম দেখা সত্ত্বেও কোথাও একটু সংশয় হয়তো ছিল মলয়ের। আঙুল বাড়িয়ে দেওয়াল দেখাতে-দেখাতে বলল, 'ইনি কোন উমানাথ ঘোষাল?'

প্রশান্ত বলল, 'বিবিবাজারে একজন উমানাথ ঘোষালই আছেন। ফেমাস ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট অ্যান্ড বিজনেসম্যান। দুর্দান্ত পয়সাওলা লোক। এই টাউনের সবচেয়ে বড় বাড়িটা ওঁদের। স্যার তো এখানকারই লোক; ওঁকে চিনতেন না?'

অদ্ভুত হাসে মলয়। বলে, 'নিশ্চয়ই চিনতাম। আমি যাঁকে জানতাম ইনিই তিনি কিনা মিলিয়ে দেখছিলাম।'

আচমকা গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে প্রশান্ত বলল, 'এই ভদ্রলোককে নিয়ে খুবই ঝামেলায় থাকতে হয়। আপনাকেও অনেক প্রবলেম ফেস করতে হবে স্যার।'

মলয় চমকে ওঠে, 'মানে?'

'উমানাথ ঘোষাল অ্যান্টি-সোশ্যালদের একজন বড় পেট্রন। ওঁর টাকা আছে, ইনফ্লুয়েন্স আছে। বুঝতেই পারছেন স্যার, আমাদের সমস্যাটা কীরকম হতে পারে।'

উমানাথ নির্বাচনে নামছেন, এ খবরটা নতুন হলেও অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, প্রথম জীবনে কেউ রাজনীতি করেনি বলে শেষ জীবনে করবে না, এমন কোনও নিয়ম নেই। অনেকেই তো দেখা যায় প্রথম দিকে পলিটিকস সম্পর্কে কোনও আগ্রহ বোধ করে না, চাকরি-বাকরি, ব্যাবসা বা প্রফেশন নিয়ে মেতে থাকে। পরে মধ্যবয়সে দুম করে ইলেকশানে-টিলেকশানে নেমে যায়। টাকা-পয়সা, প্রতিপত্তি এসব তো যথেষ্টই হয়েছে উমানাথের, এবার হয়তো রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেতে চান। পলিটিক্যাল পাওয়ার ব্যাপারটা দারুণ উত্তেজক নেশার মতো।

উমানাথ ঘোষাল রাজনীতিতে নামছেন, এই শহরে অবশ্যই এটা বড় মাপের ঘটনা। কিন্তু অ্যান্টি-সোশ্যালদের পৃষ্ঠপোষক হওয়াটা যেমন অভাবনীয় তেমনি মারাত্মক। এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

মলয় বলল, 'উমানাথবাবু যে সমাজবিরোধীদের প্রোটেকশান দিচ্ছেন, এমন প্রমাণও পেয়েছেন?'

'সলিড প্রমাণ এখনও পাইনি। তবে নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। আমরা চোখ কান খোলা রেখেছি। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

মলয় উত্তর দিল না। একটা কথা মনে পড়তে তার স্নায়ুতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। উমানাথ

ঘোষালের বাড়ি থেকে পাঁচ বছর আগে বেরিয়ে আসার সময় ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে একটা সদুপদেশ দিয়েছিলেন—মলয় যেন সৎভাবে জীবন যাপন করে। প্রশান্তর কথা ঠিক হলে সেই মানুষই এখন এ-অঞ্চলে অসৎ সমাজবিরোধী কাজকর্মের প্রধান উৎসাহদাতা হয়ে উঠেছেন। ব্যাপারটা ভাবতেই ভেতরে-ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে মলয়।

এক সময় প্রশান্তর গলা কানে ভেসে আসে, 'আমরা এসে গেছি স্যার।'

চমকে উঠে মলয় লক্ষ করে, বিরাট কমপাউন্ডওলা একটা সুন্দর বাংলো ধরনের বাড়ির ভেতর তাদের মেরুন অ্যামবেসেডরটা ঢুকে যাচ্ছে। এটাই এ-শহরে এস পি-র কোয়ার্টার।

গেটের কাছে দুজন পুলিশ কনস্টেবল ঢুলে বসে ছিল; মলয়কে দেখে টান-টান দাঁড়িয়ে স্যালুট দেয়।

দুই

মলয়কে পৌঁছে দিয়ে আর বাংলোর ভেতর ঢোকেনি প্রশান্ত। পরে আসবে, জানিয়ে একটা সাইকেল রিকশা ডাকিয়ে থানায় চলে গেছে।

বাংলোটা চমৎকার। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে একদিকে বাগান। নানারকম মরশুমি ফুলে বাগানটা আলো হয়ে আছে। মলয়ের আগে যিনি এখানে এসপি ছিলেন তাঁর ছিল দারুণ ফুলের শখ। মলয় শুনেছে, এই বাগানটা একরকম নিজের হাতেই তিনি করে গেছেন।

একদিকে বাগান, আরেক দিকে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের লন। মাঝখান দিয়ে নুড়ির রাস্তা।

প্রশান্ত চলে যাওয়ার পর বাদামি নুড়ি মাড়িয়ে-মাড়িয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল মলয়।

একতলা বাংলো বাড়িটার সামনের দিকে দামি ইটালিয়ান টাইলস বসানো প্রকাণ্ড বারান্দা। সেখানে অনেকগুলো গদিমোড়া সুদৃশ্য বেতের সোফা এবং সেন্টার টেবিল সাজানো রয়েছে।

অ্যামবেসেডারের আওয়াজ পেয়েই মা এবং রুমা-টুমারা বাংলোর ভেতর থেকে বারান্দায় এসেছিল। তাদের পেছনে গণ্ডাখানেক চাকর-বাকর এবং আর্দালিকে দেখা যাচ্ছে। তটস্থ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

লালবাজারে মলয়ের একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় কাল সে এখানে আসতে পারেনি; তবে মা এবং ভাইবোনদের পাঠিয়ে দিয়েছে।

বারান্দায় উঠতেই রুমারা একসঙ্গে হইচই বাধিয়ে দিল, 'এই কোয়ার্টারটা দারুণ দাদা। নর্থ বেঙ্গলেরটার চাইতে অনেক সুন্দর।'

এর আগে উত্তরবঙ্গে পোস্টিং ছিল মলয়ের। সেখানকার কোয়ার্টারটা এত বড় ছিল না। হাসিমুখে ভাইবোনদের দিকে তাকাল মলয়, 'যাক, তোদের তাহলে পছন্দ হয়েছে।'

'খুব।' সবাই মাথা হেলিয়ে সায় দেয়। এমনকি সেইসঙ্গে মা-ও।

'যাক, তোদের সবার ভালো লেগেছে। আই অ্যাম হ্যাপি।' বলে হঠাৎ কী মনে পড়তে মলয় একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'রুমা এবং নীলুকে বলল, 'কিরে তোরা আজ কলেজ-টলেজ যাসনি!'

রুমারা সবাই নর্থ বেঙ্গলে পড়ত। সেখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে রুমাকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ভরতি করে দিয়েছে মলয়। আসছে বছর পলিটিক্যাল সায়েন্সে সে ফাইনাল দেবে। নীলু ভরতি হয়েছে প্রেসিডেন্সিতে। ফিজিক্সে অনার্স তার; এ-বছরই পার্ট টু দেবে। আলোকে

বিবিবাজারের কলেজে ক্লাস ইলেভেনে ভরতি করে দেওয়া হবে! ঠিক হয়েছে নীলু আর রুমা এখান থেকেই কলকাতায় যাতায়াত করে ক্লাস করবে।

রুমা এবং নীলু জানাল, মলয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল বলে আজ আর তাদের কলকাতায় যাওয়া হয়নি; কাল থেকে তারা নিয়মিত ক্লাস করবে।

মলয় জানে এবং অনুভবও করে, এই ভাইবোনেরা তাকে খুবই ভালোবাসে। যদিও সে সবার বড়, ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, সে না আসা পর্যন্ত ওরা ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। সেই কারণেই কেউ কলকাতায় যায়নি।

রুমা বলল, 'বাংলোটা তো তুমি দেখোনি—'

'কি করে দেখব! এই সবে এলাম। এখনও তো ভেতরে ঢুকতেই দিসনি; বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস।' বলে মজা করে হাসে মলয়।

'এসো, এসো—' একরকম হাত ধরেই ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাংলোটা মলয়কে দেখায় রুমা। তাদের সঙ্গে-সঙ্গে নীলু আলো এবং মা-ও চলতে থাকে।

কোয়ার্টারে সবসুদ্ধু ছ'টা বড়-বড় বেডরুম, একটা ডাইনিং হল। এছাড়া কিচেন, স্টোর, তিনটে বাথরুম। সবগুলোর মেঝেতেই টাইলস বসানো। এ ছাড়া বাংলোটার পেছন দিকে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স, গ্যারাজ, মালিদের থাকার ঘর। মলয় জানে এই সব বাংলো টাইপের রাজকীয় ব্যাপারগুলো ব্রিটিশ আমলে তৈরি।

মলয় লক্ষ করল, কাল আর আজ এই দু-দিনের মধ্যেই সবগুলো ঘর গুছিয়ে ফেলেছে রুমারা এবং কে কোন ঘরটা নেবে, সেটাও ঠিক করে ফেলেছে। দক্ষিণ দিকের সব চাইতে বড় বেডরুমটা পড়েছে তার ভাগে।

বাংলোটা দেখবার পর ডাইনিং হলে চলে এল সবাই। মলয় বলল, 'দুপুরে আজ ভালো খাওয়া হয়নি। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়েছিলাম। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে মা। কিছু খেতে-টেতে দাও।'

'তুই মুখ-টুখ ধুয়ে জামাকামড় বদলে নে। খাওয়ার জোগাড় করছি।' মা বলল।

মলয় ডাইনিং হলে আর দাঁড়াল না, সোজা নিজের ঘরে চলে গেল।

পেছন থেকে রুমা চেঁচিয়ে বলল, 'দাদা, বাথরুমে তোমার তোয়ালে পাজামা-টাজামা সাজিয়ে রেখেছি।'

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে অ্যাটাচড বাথরুম থেকে একেবারে স্নান-টান সেরে পোশাক পালটে নিজের ঘরের নরম নিভাঁজ ধবধবে বিছানায় গিয়ে বসল মলয়। আর তখনই মা এবং আলো বড় সাদা প্লেটে লুচি তরকারি বেগুনভাজা মিষ্টি আর চা নিয়ে এল।

মলয়দের সেই দুঃসময় আর নেই। বাড়িতে এখন প্রচুর কাজের লোক। কিন্তু মা পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। নিজের হাতে ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে না পারলে তার তৃপ্তি হয় না।

মলয় বিছানায় বসেই খেতে লাগল। মা খাটের পাশে মলয়ের শখের যে ইজিচেয়ারটা রয়েছে সেটাতে বসল। আর আলো বসল খাটেরই একধারে।

মা অন্যমনস্কের মতো মলয়কে দেখতে-দেখতে হঠাৎ ডাকল, 'হারু—'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন আন্দাজ করল মলয়। জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবে মা?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নেড়ে মা বলল, 'অনেকদিন পর এখানে আসতে পেরে বড় ভালো লাগছে। কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

মলয় উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু ভেবে মা এবার বলল, 'তুই একবার হরসুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা কর।'

হরসুন্দর তরফদার বিবিবাজারের একজন নামকরা পয়লাওয়ালা লোক। সুদের কারবারে প্রচুর টাকা করেছে। তা ছাড়া ছোটখাটো নানা ধরনের ব্যাবসাও রয়েছে। এর কাছেই মলয় তাদের বাড়িটা বিক্রি করেছিল।

মলয় জানাল—দেখা করবে।

মা এবার বলল, 'বাড়িটা যাতে ফেরত পাওয়া যায়, হরসুন্দরবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলিস। হাজার হোক, ওটা আমার শ্বশুরকুলের ভিটে।'

মায়ের দুঃখটা বুঝতে পারে মলয়। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই একসময় বাড়ি বিক্রিতে রাজি হয়েছিল। তখন সংসার বাঁচানো এবং সন্তানদের মানুষ করা ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই ছিল না। ছেলেমেয়েদের সবাই ভালো হয়েছে। বিশেষ করে মলয়। আই পি এস-এ সারা দেশে সে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছিল। রুমা, আলো এবং নীলুও লেখাপড়ায় চমৎকার। আশা করা যায় মলয়ের মতো তারাও কৃতী হবে। তা ছাড়া এরা সবাই মাকে যথেষ্ট মান্য করে; যে-কোনও ব্যাপারে তার কথাই এ-বাড়িতে শেষ কথা।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়ের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। বরং বলা যায়, এমন সন্তানসুখ খুব বেশি মানুষের হয় না। তা সত্ত্বেও বহুকালের প্রাচীন ভাঙা বাড়িটা সম্পর্কে মায়ের মনে গোপন একটু কষ্ট বরাবরই ছিল। আগে সেটা বোঝা যায়নি। মলয় চাকরি পাওয়ার পর বাড়িটা ফিরিয়ে আনার কথা প্রায়ই বলছে।

মলয় বলল, 'হরসুন্দরবাবুকে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলব। কিন্তু বাড়িটা ফেরত কি পাওয়া যাবে?'

'দ্যাখ চেষ্টা করে।'

আরও কিছুক্ষণ বাড়ির ব্যাপারে কথাবার্তা বলে মা আর আলো চলে গেল। এর মধ্যে মলয়ের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আলোরা যাওয়ার পর খানিকটা সময় অলস ভঙ্গিতে বিছানায় বসে থেকে একসময় শুয়ে পড়ল মলয়।

মলয়ের মাথার দিকে বিরাট জোড়া জানলা। তার বাইরে অনেকটা ফাঁকা সবুজ মাঠ, সেখানে সামান্য কিছু ঝোপঝাড়। মাঝে-মাঝে আচমকা দু-একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের পর থেকে যতদূর চোখ যায় একটানা ধানখেত। ফাঁকে-ফাঁকে পেন্সিলের আবছা আঁচড়ের মতো চাষিদের গাঁ; কোথাও বাঁশের সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

বিকেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। রোদের রং এখন অনেক গাঢ়। ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে সুখদায়ক বাতাস। আকাশের নীল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হাওয়ায় ডানা মেলে ভেসে যাচ্ছে অগুনতি শঙ্খচিল। বকের ঝাঁক আড়াআড়ি আকাশে পাড়ি দিয়ে দিগন্তের দিকে চলেছে। সব মিলিয়ে জাপানি পেন্টারের আঁকা ছবি যেন।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে পাঁচবছর আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল মলয়ের।

যদিও তার প্রবল আত্মবিশ্বাস রয়েছে, তবু পাঁচবছর আগে উমানাথ ঘোষালকে সে যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এসেছিল সেটা শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে কিনা, এ-ব্যাপারে বেশ কিছুটা দুশ্চিন্তাও ছিল। যা ভাবা যায় বেশির ভাগ সময়েই তা করে ওঠা সম্ভব হয় না। অনেকের অনেক স্বপ্নই অবধারিত কোনও পদ্ধতিতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও একেবারে ছককাটা অঙ্কের নিয়মে ইচ্ছাপূরণ হয়েও থাকে, যেমন হয়েছে মলয়ের বেলায়। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন কোনও অলৌকিক রূপকথার গল্পের মতো অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এখান থেকে বাড়ি বেচে দিয়ে মলয়রা সোজা চলে গিয়েছিল কলকাতায়। টালিগঞ্জের শেষ মাথায় গলির ভেতর আধা বস্তি টাইপের একটা জায়গায় দু-খানা ঘর ভাড়া করে তারা থাকত। ওরা চার ভাইবোনই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতার স্কুল-কলেজে ভরতি হয়েছিল।

কলকাতায় আসার দেড় বছরের মধ্যেই বি-এ পাস করেছিল মলয়। ফার্স্ট ক্লাস অনার্সও পেয়েছে। তার এক বছর পর কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসে আইপিএস হয়েছে। পাস করার পর প্রথম পোস্টিংটা তার হয়েছিল কলকাতায়। মাসখানেক ওখানে থাকার পর মলয়কে পাঠানো হয়েছিল নর্থ বেঙ্গলে।

এই পাঁচ বছরে শর্মিলার সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি। তবে চিঠিতে যোগাযোগটা ছিল। প্রতিটি চিঠিতেই শর্মিলা জানিয়েছে, মলয়ের জন্য সে অপেক্ষা করছে।

কলকাতায় থাকার সময় দু-একবার সুজাতা তাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে এসেছে। আসলে সে নিজের থেকে আসত না, শর্মিলাই তাকে পাঠাত। সুজাতাও শর্মিলার অপেক্ষা করার কথা বলত। একবার সে জানিয়েছিল, উমানাথ ঘোষাল শর্মিলার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, মেয়ের ওপর এ-ব্যাপারে প্রচণ্ড চাপ দিয়েছেন। কিন্তু শর্মিলাকে টলানো যায়নি।

নর্থ বেঙ্গলে চলে যাওয়ার পর সুজাতার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। শর্মিলার একটা চিঠিতে জানা গিয়েছিল হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেছে সুজাতার। না-না, প্রেম করে বিয়ে নয়। রীতিমতো ঘটক লাগিয়ে 'নেগোসিয়েশন ম্যারেজ'। সুজাতার বর বিবিবাজারেরই ছেলে, তবে ওরা এখানকার আদি বাসিন্দা নয়, পার্টিশানের পর পূর্ব বাংলা থেকে চলে এসেছিল, থাকে বিবিবাজারের উত্তর দিকের নতুন কলোনিতে। নাম অভিজিৎ—অভিজিৎ ঘোষ। এম কম এবং কস্টিং পাস করে ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করছে। ভীষণ হাসিখুশি আর আমুদে টাইপের ছেলে। দেখা হলে হইচই করে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে। দেখতে শুনতেও চমৎকার। শর্মিলার ধারণা অভিজিৎকে মলয় চিনতেও পারে।

নাম থেকে মুখটা মনে করতে পারেনি মলয়। দেখা হলে হয়তো চিনতে পারবে। কেন না বিবিবাজারের মতো ছোট শহরে সবার সঙ্গে সবার আলাপ-পরিচয় না থাকলেও মুখচেনাটা থাকেই।

যাই হোক, শর্মিলার ব্যাপারটা বাড়ির সবাই জানে। চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী মলয় আই পি এস হয়েছে। এখন মা এবং ভাইবোনদের ইচ্ছা, শর্মিলার সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে যাক।

বিবিবাজারে আজ প্রথম দিন বলে ওরা কিছু বলেনি। তবে কাল পরশু থেকে রুমারা বিয়ের ব্যাপারে যে চাপ দিতে থাকবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মলয়ও ভেবে রেখেছিল, এখানে এসেই দু-চার দিনের ভেতর উমানাথ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু উমানাথ সম্পর্কে প্রশান্ত যে-সব উলটোপালটা খবর দিয়ে গেল সেগুলো খুবই অস্বস্তিকর। তিনি ইলেকশানে নামছেন, এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু অ্যান্টি-সোশালদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে বসাটা মারাত্মক ব্যাপার। এটা জানার পর তার পক্ষে উমানাথ ঘোষালের বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। ওদিকে পাঁচটা বছর অনবরত লাঞ্ছনা সয়েও দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বাবার সঙ্গে শর্মিলা যে যুদ্ধ করে গেছে, সে তো শুধু তারই জন্য। পাঁচবছর পর যখন মলয় মনে করেছিল, নির্দিষ্ট টার্গেটে প্রায় পৌঁছে গেছে সে, সেই সময় সব কিছু জট পাকিয়ে গেল।

হঠাৎ রুমার গলা ভেসে এল, 'দাদা, দাদা—'

দূরমনস্কর মতো জানলার বাইরে ধু-ধু নির্জন ল্যান্ডস্কেপের দিকে তাকিয়ে ছিল মলয়। চমকে ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল, প্রায় ছুটেই ঘরে ঢুকছে রুমা। তার ব্যস্ততা লক্ষ করে বেশ অবাকই হল মলয়। উঠে বসতে-বসতে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে রে?'

'তোমার সঙ্গে দুজন দেখা করতে এসেছে।'

'তারা কারা?'

'গেলেই দেখতে পাবে। চলো—চলো—'

চোখে-মুখে মজার একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে রুমা বলল, 'দূত এসেছে।' বলেই ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেল।

একটু পর ড্রইংরুমে আসতেই মনটা খুশিতে ভরে গেল মলয়ের। সুজাতা আর একটি ঝকঝকে স্মার্ট চেহারার যুবক বসে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায় সুজাতার স্বামী অভিজিৎ। মনে হল, পাঁচবছর আগে বিবিবাজারের রাস্তায় একে দেখেছে।

মা, আলো, নীলু এবং রুমা সুজাতাদের ঘিরে বসে আছে। সুজাতাকে সবাই খুব পছন্দ করে। মেয়েটা ভারী নম্র। তার চোখে-মুখে মধুর লাবণ্যের মতো সারাক্ষণ স্নিগ্ধ একটু হাসি লেগেই আছে।

মলয়কে দেখে হাসিমুখে সুজাতা বলল, 'এই যে এসপি সাহেব কেমন আছেন?'

'ভালো।' একটা সোফায় বসতে-বসতে মলয় বলল, 'আপনারা কেমন আছেন?'

'চলে যাচ্ছে।'

'শুধু চলে যাচ্ছে!' চোখের কোণ দিয়ে অভিজিৎকে দেখতে-দেখতে রগড়ের ভঙ্গিতে মলয় বলল, 'বেশ ভালোই চলছে মনে হয়।' তারপর বলল, 'আপনার মালিকটির সঙ্গে কিন্তু আলাপ করিয়ে দেননি।'

সুজাতা বলল, 'আইপিএস হওয়ার পর বুঝি ব্রিটিশ ফর্মালিটি মানতে শুরু করেছেন? আলাপ করিয়ে না দিলে কথা বলবেন না! নিজেদের গরজ থাকলে আলাপ-টালাপ করে নিন মশাইরা।'

মলয় কিছু বলার আগেই অভিজিৎ বলে উঠল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা আমরা দেখছি।' মলয়ের দিকে ফিরে হেসে-হেসে বলল, 'আপনার কথা সুজাতার কাছে এত শুনেছি যে নতুন করে ইনট্রোডাকশানের দরকার নেই। আপনাকে এই শহরে আগে আমি দেখেছিও। আর আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনিও কিছু-কিছু জেনে থাকবেন।'

মলয় জানাল, 'সে-ও অভিজিৎকে আগে দেখেছে। তার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানে। শর্মিলাই যে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, সেটা আর বলল না।

মা আগেই চা এবং মিষ্টি-টিষ্টির ব্যবস্থা করেছিল। একটা কাজের লোক বড় ট্রে বোঝাই করে সে-সব নিয়ে এল। মা নিজের হাতে সুজাতা এবং অভিজিতের সামনে সাজিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'খেতে-খেতে গল্প করো।'

সুজাতা বলল, 'এ কি, আমরা দুজনে শুধু খাব নাকি? আর সবাই?'

জানানো হল, ওরা আসার কিছুক্ষণ আগেই সবাই চা-টা খেয়েছে। তবু সুজাতাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য আবার এক কাপ করে চা নিল।

চায়ে আলতো করে একটু চুমুক দিয়ে মলয় অভিজিৎকে বলল, 'আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে ভীষণ অভিযোগ আছে।'

অভিজিৎ হকচকিয়ে গেল, 'কীসের অভিযোগ বলুন তো?'

'সুজাতা আমাদের এত বড় ফ্যামিলি ফ্রেন্ড কিন্তু বিয়ের সময় নেমন্তন্নর লিস্ট থেকে আমরা বাদ পড়ে গেলাম। ইনভিটেশনটা করলে কীরকম হই-হল্লোড় করতাম দেখতেন।'

সুজাতা তর্জনী তুলে অভিজিৎকে দেখাতে-দেখাতে বলল, 'দোষটা ওদের, আমার নয়। মাত্র তিনদিনের কথায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। আমরা অনেক বলেছিলাম, পরে ডেট ফিক্স করতে। ওরা শুনল না। এত তাড়াহুড়োয় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেককেই নেমন্তন্ন করতে পারিনি। পরে তাদের সঙ্গে যখন দেখা-টেখা হয়েছে, খুবই লজ্জায় পড়েছি।'

মজার গলায় মলয় বলল, 'এসব বলে অ্যাভয়েড করলে চলবে না। বিয়ের খাওয়াটা কিন্তু ছাড়ছি না। কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন—'

অভিজিৎ ওধার থেকে দারুণ উৎসাহের গলায় বলে উঠল, 'যেদিন বলবেন।' একটু ভেবে ফের বলল, 'নেক্সট রবিবার দুপুরে হলে অসুবিধা হবে?'

মলয় জানাল, এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সবে সে এখানে এসেছে; অফিসে জয়েন করে কাজকর্ম বুঝে নিক। পরে সুবিধামতো একটা দিন-টিন দেখে খাওয়াদাওয়া হইচই করা যাবে।

'বেশি দেরি করবেন না। খুব তাড়াতাড়ি দিনটা ঠিক করে আমাদের জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

এতক্ষণ ঠোঁট টিপে চুপচাপ মলয়দের কথা শুনছিল সুজাতা। শুনতে-শুনতে আশ্চর্য কৌতুকে তার চোখ কুঁচকে যাচ্ছিল। এবার সে বলল, 'অন্যের বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্যে তো অস্থির হয়ে উঠেছেন। নিজের বিয়ের কী হল?'

হকচকিয়ে গেল মলয়। কী উত্তর দেবে, তক্ষুনি ভেবে উঠতে পারল না।

অভিজিৎ বলল, 'শর্মিলা ঘোষাল নামে এক ভদ্রমহিলা আপনার জন্যে পাঁচ বছর ধরে শবরীর প্রতীক্ষা না কী যেন বলে, তাই করছেন। তাঁর কথাটা সিমপ্যাথেটিক্যালি একটু বিবেচনা করুন।'

বোঝাই যাচ্ছে, অভিজিৎ তার আর শর্মিলার কথা সবই শুনেছে। এবারও মলয় কিছু বলল না।

সুজাতা রীতিমতো তাড়াই লাগাল, 'কি মশাই, একেবারে চুপ করে গেলেন যে! উমানাথ ঘোষালের সঙ্গে কবে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

বিবিবাজারে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে উমানাথ সম্পর্কে যে-সব উলটোপালটা খবর পাওয়া গেছে তাতে হুট করে তাঁর বাড়িতে যাওয়া যে সম্ভব নয়, বিশেষ করে মলয়ের মতো একজন সৎ দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের পক্ষে, সেটা আর বলা গেল না। বিব্রতভাবে মলয় বলল, 'দেখি কবে যেতে পারি।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ করছিল সুজাতা। তার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো। উমানাথ ঘোষাল মেয়ের জন্যে আইএএস বা আইপিএস অফিসার ছেলে চেয়েছিলেন। আপনি তা হয়েছেন। এখানে এসে প্রথমেই উমানাথবাবুর কাছে গিয়ে বলা উচিত ছিল, মশাই, আমার চ্যালেঞ্জ রেখেছি। এবার আপনি আপনার কথা রাখুন। তা না করে ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলেন! শর্মিলাদের বাড়ি কবে যাবেন তা-ও ঠিক করে বলছেন না। আপনার ইচ্ছাটা কী?'

মা-ও খুব অবাক হয়ে মলয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার সঙ্গে শর্মিলার সম্পর্ক কী, সবাই তা জানে। মলয় কোনওদিন তা লুকোয়নি। পুত্রবধূ হয়ে একদিন যে শর্মিলা এ-বাড়িতে আসবে, এ একরকম অবধারিত। মলয় আই পি এস হওয়ার পর থেকে মা এ নিয়ে অনবরত তাড়া দিচ্ছে। মলয় জানিয়েছে রুমার বিয়ের পর সে বিয়ে করবে। মা তাতে রাজি নয়। কেন না সে জানে, শর্মিলা তাদের বাড়িতে বড় দুঃখে আছে, তার ওপর খুবই নির্যাতন চলছে। তাকে ওখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে আসা দরকার। মায়ের কথায় শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছে। কাল মা আর ভাইবোনেরা বিবিবাজারে চলে এসেছিল। আসার সময় মা বলেছিল আজ এখানে এসেই যেন সময় করে মলয় একবার শর্মিলাদের বাড়ি চলে যায়। মলয় ঘাড় হেলিয়ে জানিয়েছিল—যাবে। কিন্তু এখন একেবারে অন্যরকম বলছে। শর্মিলার ব্যাপারে তার আগের সেই আগ্রহ যেন আর নেই। কাজেই মায়ের অবাক হওয়ারই কথা।

মা মলয়কে বলল, 'না বাপু, মেয়েটাকে তুই আর কষ্ট দিস না। কত বছর ধরে সে তোর মুখ চেয়ে বসে আছে। আজ না যাস, কাল পরশু একবার ওর বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।' সুজাতার দিকে ফিরে বলল, 'হারুকে তোমরা একটু ভালো করে বোঝাও। শুভকাজটা আর ফেলে রাখা ঠিক না।'

রুমা আলো এবং নীলুও জানাল, দু-একদিনের মধ্যে মলয় না গেলে তারাই মাকে নিয়ে

উমানাথ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা করে আসবে।

মলয় চমকে উঠল, 'না-না, ওসব করিস না।' তারপরই বিষয়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল, 'আরে বাবা, আমরা হলাম পাত্রপক্ষ, আমাদের কি আগ বাড়িয়ে মেয়ের বাড়ি যেতে হয়! একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে না?'

সুজাতা বলল, 'আপনার পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ জ্ঞানটা দেখছি দারুণ টনটনে। কিন্তু এসব বাজে কথা শুনতে চাই না।' একটু থেমে গম্ভীর গলায় আবার বলল, 'আজ শর্মিলা আমাদের দুজনকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। কবে ওদের বাড়ি যাবেন, প্লিজ বলুন। এখান থেকে বেরিয়ে আমরা ওকে জানিয়ে যাব।'

এতক্ষণে মলয় বুঝতে পারল, সুজাতারা তার আসার খবরটা কার কাছে পেয়েছে এবং কে তাদের এখানে পাঠিয়েছে। সুজাতার সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। মলয় যে আজই বিবিবাজারে আসবে, সেটা তার পক্ষে জানা কোনওভাবেই সম্ভব নয় যদি না শর্মিলা জানিয়ে থাকে। আসলে শর্মিলাকে আগেই চিঠি লিখে এখানে তার নতুন পোস্টিং-এর খবরটা দিয়েছিল মলয়; সেইসঙ্গে কবে আসছে তা-ও।

মলয় এবার আর ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না। সোজাসুজি বলল, 'এখন আমার একটু অসুবিধা আছে। কবে যেতে পারব, পরে ঠিক করব।'

সুজাতা কী বলতে যাচ্ছিল, হাত জোড় করে মলয় বলল, 'প্লিজ এ-নিয়ে আজ আর কিছু বলবেন না। এমন কিছু ঘটেছে যাতে এই মুহূর্তে শর্মিলাদের বাড়ি আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

ঘরের সবাই হকচকিয়ে গেল! তবে এ নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করল না।

যেভাবে কথাবার্তা চলছিল, তার সুরটা আচমকা কেটে গেছে। সারা ঘর জুড়ে স্তব্ধতা নেমে এল।

কিছুক্ষণ পর আবহাওয়াটা সহজ করে তুলবার জন্য এলোমেলো গল্প শুরু করে দিল মলয়, কিন্তু আগের সেই স্বাভাবিকতা ফিরল না।

একসময় সুজাতা বলল, 'সন্ধে হয়ে গেল, আজ যাই।' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি অভিজিৎও উঠল।

মলয়রাও বসে থাকল না। উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে মা বলল, 'আবার এসো।'

সুজাতা এবং অভিজিৎ একসঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব। আপনাদেরও আমাদের ওখানে যেতে হবে।' রুমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা যখন ইচ্ছা চলে যাবে।' বলতে-বলতে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল।

সুজাতাদের সঙ্গে মলয়রাও এসেছিল। মলয় বলল, 'ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

অভিজিৎ বলল, 'না না, তার দরকার নেই। আমরা এখন বাড়ি ফিরছি না। শর্মিলাদের ওখানে একবার যেতে হবে।'

'ওখানেই দিয়ে আসুক।' বলতে গিয়েও বলল না মলয়।

এস পি-র গাড়ি অ্যান্টি-সোশালদের গড় ফাদার বা আশ্রয়দাতার বাড়ি যাক, সেটা তার চাকরির পক্ষে মারাত্মক। কেউ দেখে ফেললে তার সততা সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে উঠবে। এখানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে লোকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করুক, এটা মলয় চায় না।

গেটের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ফিসফিস করে সুজাতা মলয়কে বলল, 'শর্মিলা আপনাকে কতটা ভালোবাসে, নিশ্চয়ই জানেন। এই ভালোবাসা উপেক্ষার জিনিস নয়।'

জোরে শ্বাস টেনে মলয় বলল, 'আমি তা জানি। আর জানি, আমার যদি সামান্য অ্যাচিভমেন্ট হয়ে থাকে, সেসবই শর্মিলার জন্যে। ওকে না পেলে আমার জীবন টোটালি ব্যর্থ হয়ে যাবে। অনেকদিন ও কষ্ট করেছে। আর ক'টা দিন শুধু ওয়েট করতে বলুন।'

একটু পর সুজাতা আর অভিজিৎ গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামে।

তিন

মলয় আসার পর ক'টা দিন দেখতে-দেখতে কেটে গেল। এর মধ্যে অফিসে জয়েন করে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে সে। তারপর একদিন গিয়ে আই জি-র সঙ্গে দেখা করেছে। দু-দিন ঘুরে-ঘুরে চারপাশের থানাগুলো দেখেছে। নানা স্তরের পুলিশ অফিসারের এবং সাধারণ কনস্টেবলদের সঙ্গে কথা বলে এখানকার ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম বুঝতে চেয়েছে। বিবিবাজারের অপরাধ প্রবণতার বৈশিষ্ট্য কী অর্থাৎ এখানকার সমাজ-বিরোধীদের কোন-কোন ধরনের ক্রাইমের দিকে বেশি ঝোঁক, সেসব জানতে চেষ্টা করেছে।

মলয়ের কাজের ধাঁচটা অন্যরকমের। নীচের লেভেলের অফিসারদের রিপোর্ট বা ইনভেস্টিগেশনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে বসে থাকে না। প্রবলেমের একেবারে রুট পর্যন্ত গিয়ে সমস্ত কিছু ধরতে চায়।

এ ক'দিনে মলয় এখানকার ক্রাইম সম্বন্ধে যা বুঝেছে তা এইরকম। কাছে একটা বড় গুডস ট্রেনের ইয়ার্ড থাকায় ওয়াগন ভেঙে প্রায় রোজই অ্যান্টি-সোশালরা মাল সরায়। দিন-দিন এই ক্রাইমটা বেড়েই যাচ্ছে। ওয়াগন ভাঙার অনেকগুলো গ্যাং আছে এখানে। কম করে কুড়ি-পঁচিশটা। তারা রেল ইয়ার্ডটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। কোনও কারণে, ইচ্ছা করেই হোক বা ভুলেই হোক, একটা দল আরেক দলের এরিয়ায় ঢুকে গেলে মারদাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। নিজেদের ভেতর যত গোলমাল থাক, পুলিশ হানা দিলেই তারা এক জোট হয়ে যায়। তারপর সমানে বোমা আর পাইপ গান চালাতে থাকে। পুলিশ হল তাদের কাছে কমন শত্রু।

ওয়াগন ব্রেকাররা ছাড়া আছে ছেনতাইবাজেরা। রাত্রিবেলা কাউকে নির্জন গলি-টলিতে পেলেই বুকে ছুরি বা রিভলভারের নল ঠেকিয়ে তার টাকাপয়সা, ঘড়ি বা গয়না-টয়না ছিনিয়ে নেয়।

ওয়াগন ব্রেকার এবং ছেনতাইওয়ালা আগেও ছিল কিন্তু ইদানীং তাদের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে গেছে। এখানকার থানাগুলোর অফিসার-ইন চার্জরা জানিয়েছে, এর কারণ শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা, কোথাও চাকরি-বাকরি নেই, ইকনমিক গ্রোথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যা বরফের বলের মতো গড়াতে গড়াতে ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠছে। মানুষকে কিছু একটা করে তো খেতে হবে। কোনওদিকে সৎভাবে বাঁচার সুযোগ না পেয়ে তারা ক্রাইমের দিকে ঝুঁকছে। ফলে বুটলেগার ওয়াগনব্রেকার ছেনতাইবাজে বিবিবাজার থিকথিক করছে। ক্রাইমের কারণ যাই হোক,

'রুল অফ ল' বা আইনের শাসন চালাতেই হবে। আর্থিক দুর্গতি ঘোচাবার জন্যে গভর্নমেন্টের অন্য ডিপার্টমেন্ট আছে।

কীভাবে বেকার সমস্যা তারা ঘোচাবে, কীভাবে কলকারখানা বসিয়ে চাকরি-বাকরির সুযোগ করে দিয়ে 'বিপথগামী' যুবকদের সৎ পথে ফিরিয়ে আনবে, সেসব তাদের ব্যাপার।

বিবিবাজারে আজকাল নতুন-নতুন যে ক্রাইম শুরু করেছে তা হল রেপ আর স্মাগলিং এবং এ-সবের কারণে মার্ডার। পাঁচ বছর আগে এ শহর ছেড়ে যখন মলয়রা চলে যায়, ধর্ষণ বা চোরাচালানের কথা শোনাই যেত না।

বিবিবাজারের পেছন দিক দিয়ে গঙ্গা চলে গেছে। সেটা ধরে নৌকোয় করে গেলে দু-ঘণ্টায় ক্যালকাটা পোর্ট, আর ছোট মোটর লঞ্চে গেলে মিনিট কুড়ি পঁচিশ লাগে। গঙ্গার এই অংশটা হল স্মাগলারদের বেস অফ অপারেশন।

নানা ধরনের ক্রাইমের একেবারে খাস তালুকে এসে পড়েছে মলয়। সে আসার পর দু-একটা ছোটখাটো ওয়াগন ব্রেকিং-এর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। রেল পুলিশের তাড়া খেয়ে ওয়াগন ব্রেকাররা বোমা ছুড়তে-ছুড়তে পালিয়ে যায়। তবে এত ক্রিমিনাল যেখানে গিস-গিস করছে সেখানে যে-কোনও মুহূর্তে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।

তাই আগে থেকেই সতর্কতামূলক কিছু-কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে মলয়। এই ক'দিনে এ-অঞ্চলের সবগুলো থানার ওসিদের নিয়ে বার তিনেক আলোচনায় বসেছে সে। জানিয়ে দিয়েছে তারা যেন অ্যান্টি-সোশালদের 'ডেন'গুলোর ওপর কড়া নজর রাখে, চারিদিকে ইনফরমার লাগিয়ে ক্রিমিনালদের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে আগাম খবর নিয়ে আসে। ঠিকমতো খবর পেলে আচমকা হানা দিয়ে স্মাগলার বা খুনিদের শেষ করে ফেলা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

অফিসের ডিউটি ছাড়া আরও কিছু-কিছু কাজও এ ক'দিনে করেছে মলয়। একদিন হরসুন্দর তরফদারের সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই পুরোনো বাড়িটা ফেরত পাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। হরসুন্দর বাড়িটা ভেঙে সেই জায়গায় নতুন বাংলো টাইপের একটা ঝকঝকে দোতলা বানিয়ে মেয়ে-জামাইকে উপহার দিয়েছে। মেয়ে-জামাই এখন সেখানেই থাকে।

খবরটা শুনে মা একেবারে ভেঙে পড়েছে। বিয়ের পর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সে ওই বাড়িতে এসেছিল, জীবনের বেশির ভাগটাই ওখানে কেটে গেছে। বাড়িটার সঙ্গে মায়ের অনেক সেন্টিমেন্ট মমতা এবং স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তার ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক।

বিবিবাজারে আসার পর একটা কথা ভেবে রীতিমতো অবাকই হয়েছে মলয়। এ ক'দিনে এই শহরে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় কত বার যে তার গাড়ি টহল দিয়েছে তার ঠিক নেই। এমন কি উমানাথ ঘোষালের বাড়ির সামনে দিয়েও কম করে দশ-পনেরো বার গেছে কিন্তু রাস্তায় একদিনও শর্মিলাকে দেখতে পায়নি। সে কি বাড়ি থেকে বাইরে বেরোয় না?

প্রায়ই মলয় ভাবে, শর্মিলাকে ফোন করবে। কত কাল তাকে দেখেনি, কত কাল তার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু ফোন করলে শর্মিলা যদি উমানাথ ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে বলে? প্রবল ইচ্ছাটাকে তাই প্রাণপণে দমিয়ে রাখতে হয়।

মলয় বিবিবাজারে আসার পর সেই যে অভিজিৎ এবং সুজাতা তাদের বাংলোয় এসেছিল তারপর থেকে তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। এমনকী ওরা ফোনটোনও করেনি। আপাতত শর্মিলাদের বাড়ি সে যেতে পারবে না বলায় ওরা কি ক্ষুব্ধ হয়েছে?

রোজই মলয় ভাবে, সুজাতাদের বাড়ি যাবে। ওরা এসে দেখা করে গেছে। ভদ্রতার খাতিরেও একবার তার যাওয়া উচিত। কিন্তু নতুন পোস্টিং-এ জয়েন করে কাজকর্ম নিয়ে সে এত ব্যস্ত রয়েছে যে সময় করে উঠতে পারেনি। একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই সুজাতাদের ওখানে যাবে।

চার

আজ বিবিবাজার থানায় ন'টার সাইরেন বাজার সঙ্গে-সঙ্গে অফিসে বেরিয়ে পড়ল মলয়। এস পি'র জন্য নির্দিষ্ট মেরুন রঙের অ্যামবেসেডর গাড়িটার ব্যাক সিটে বসে আছে সে। সামনের সিটে স্টিয়ারিং হাতে ড্রাইভার ব্রজদুলাল মান্না। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; গোলগাল নাড়ুগোপাল টাইপের চেহারা।

বাংলো থেকে বেরিয়ে রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল, অগুনতি সাইকেল রিকশা, কিছু লরি এবং প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে বেশ জ্যাম। দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে। তারা কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে গলা ফাটিয়ে কী একটা স্লোগান দিচ্ছে।

মলয় বলল, 'কী ব্যাপার ব্রজবাবু, এত জ্যাম কেন?' বয়স্ক লোকদের, তাদের পদমর্যাদা যেমনই হোক, মলয় কখনও 'তুমি' করে বলে না।

ব্রজদুলাল বলল, 'মনে হচ্ছে মিছিল বেরিয়েছে স্যার।'

'কিসের মিছিল?'

'ভোটের।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল মলয়ের। প্রথম দিন এখানে এসেই দেওয়ালে-দেওয়ালে বিভিন্ন ভোটপ্রার্থীর নাম এবং তাদের প্রতীকের ছবি দেখেছিল। তারপর রাস্তায় যাতায়াতের সময় কতবার সে এ-সব ছবি দেখেছে। তবে সব চাইতে বেশি করে যে ক্যান্ডিডেটের নাম এবং তার প্রতীক চোখে পড়েছে তিনি হলেন উমানাথ ঘোষাল।

দেওয়ালে প্রার্থীদের নামটাম দেখলেও এ-ক'দিনে একবারও কোনও মিছিল-টিছিল দেখেনি মলয়। সব জেনেশুনেও সে জিগ্যেস করল, 'উমানাথ ঘোষাল এবাব এখানকার ইলেকশানে নেমেছেন না?' এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য একটাই। উমানাথের নামে ব্রজদুলালের মতো সাধারণ মানুষের কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা লক্ষ করা।

ব্রজদুলাল বলল, 'হ্যাঁ স্যার। লোক লাগিয়ে বিবিবাজারের সব দেওয়ালে নিজের নাম দাগিয়ে দিয়েছে লোকটা। স্যারের কি চোখে পড়েনি?'

এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মলয় বলল, 'উমানাথ ঘোষাল জিততে পারবেন? আপনার কী ধারণা?' এমনভাবে সে কথাটা জানতে চাইল, যেন ব্রজদুলালের ধারণার ওপরেই উমানাথের হারজিত নির্ভর করছে।

স্বয়ং এস পি সাহেব এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। কাজেই চট করে উত্তরটা দিল না ব্রজদুলাল। বেশ গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'জিতে যাবে স্যার।'

'কী করে বুঝলেন?'

'হেভি ক্যাশ ছড়াচ্ছে উমানাথ ঘোষাল। ঘোষালের যা টাকা, বিবিবাজারের সব ভোট কিনে নিতে পারে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'এখানকার সব মস্তান-টস্তানকে ভিড়িয়ে নিয়েছে। তারা বাড়ি-বাড়ি বলে আসছে, উমানাথ ঘোষালকে ভোট না দিলে পেটো ঝেড়ে উড়িয়ে দেবে।'

মলয় লক্ষ করল, মাঝবয়সি হলেও 'হেভি ক্যাশ', 'ভিড়িয়ে নেওয়া', 'পেটো' ইত্যাদি নতুন ইডিয়ম টিডিয়ম ব্রজদুলাল বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। সে বললে, 'এখানকার ইলেকশান কবে?'

'দু-মাস পরে।'

'এত আগে থেকেই প্রিপারেশন শুরু হয়ে গেছে!'

'তা তো হবেই স্যার। যে আগে বাজার গরম করতে পারবে লোকের নজর তার দিকে পড়বে।'

'রাইট—' মলয় আস্তে মাথা নাড়ল।

ওদের গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরও কিছু-কিছু সাইকেল রিকশা এসে জমা হয়েছে। তবে পাশ দিয়ে এখনও জায়গা আছে। দ্রুত জানলা দিয়ে পেছন দিকটা দেখে নিয়ে ব্রজদুলাল বলল, 'স্যার, মিছিল যাওয়ার পর রাস্তা ক্লিয়ার হতে সময় লাগবে। ব্যাক করে অন্য রাস্তা দিয়ে অফিসে চলে যাব?' এরপর আরও রিকশা-ফিকশা এসে গেলে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা পাওয়া যাবে না।'

কী ভেবে মলয় বলল, 'কতক্ষণ আর আটকে থাকতে হবে? ম্যাক্সিমাম পনেরো-কুড়ি মিনিট। আপনাকে আর কষ্ট করে গাড়ি ব্যাক করাতে হবে না। কিসের মিছিল আসছে একটু দেখেই যাই।'

দশ মিনিটও লাগল না, লম্বা প্রসেশন এসে পড়ল। রাস্তার অর্ধেকটা জুড়ে নানা ধরনের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বাকি অর্ধেক ফাঁকা। মিছিলটা সেখান দিয়ে এগিয়ে আসছে।

প্রায় ছ-সাতশো লোক রয়েছে মিছিলে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু যুবতী। এদের অনেকেরই হাতে পোস্টার বা লাল শালুর ফেস্টুন। পোস্টারে বা ফেস্টুনে লাল নীল কালো হরফে বড়-বড় করে লেখা আছে ঃ সমাজসেবী উমানাথ ঘোষালকে ভোট দিন। তাঁর প্রতীক মোটর লঞ্চের ছবিও সেগুলোতে আঁকা।

একটি যুবক আকাশের দিকে হাত ছুড়ে-ছুড়ে বলছে, 'আগামী নির্বাচনে সমাজসেবী উমানাথ ঘোষালকে—'

বাকি সবাই চিৎকার করে উঠছে, 'ভোট দিন, ভোট দিন।'

'বিবিবাজারের স্বার্থে—'

'উমানাথ ঘোষালকে ভোট দিন, ভোট দিন।'

'নির্বাচনে জিতবে কে?'

'উমানাথ ঘোষাল, আবার কে?'

'এখানে শান্তি আনবে কে?'

'উমানাথ ঘোষাল, আবার কে?'

'এখানে সুখ আনবে কে?'

'উমানাথ ঘোষাল আবার কে?'

'আগামী নির্বাচনে উমানাথ ঘোষালকে—'

'জয়ী করুন, জয়ী করুন।'

ব্রজদুলাল বলল, 'দেখুন স্যার, কত লোক জুটিয়েছে উমানাথ ঘোষাল। লোকটা জিতবেই, কেউ ওকে হারাতে পারবে না।'

ব্রজদুলালের কথার শেষাংশ কানে গেল না মলয়ের। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সাতাশ-আটাশ বছরের একটা যুবক মিছিলের সামনের দিকে থেকে ব্যস্তভাবে একেবারে পেছনে চলে যাচ্ছে। লাইনটা যাতে এধারে-ওধারে বেঁকে না যায় সেজন্য জরুরি নির্দেশ দিচ্ছে। যারা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে স্লোগান দিচ্ছে তাদের কানে-কানে কিছু বলে আসছে। পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে সে সামনের দিকে ছুটে আসছে।

বোঝা যায়, গোটা মিছিলটা তারই নিয়ন্ত্রণে চলছে।

পেটানো মজবুত স্বাস্থ্য তার, ছ'ফুটের মতো হাইট। পরনে ট্রাউজার্সের ওপর কারুকাজ-করা গুরু পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটার সবগুলো বোতাম খোলা। গলায় রুপোর সরু লম্বা চেন, চেনের সঙ্গে গাঁথা একটা ছোট ছুরি লকেটের মতো বুকের মাঝখানে ঝুলছে। তার বাঁ হাতে স্টিলের ঢলঢলে মোটা বালা।

দেখামাত্রই চিনতে পেরেছে মলয়। ও হল ঝন্টে। স্টেশানের কাছে সেই রেন-ট্রিটার তলায় পাঁচ বছর আগে প্রায় সারাক্ষণই ওকে বসে থাকতে দেখা যেত। তখনই ঝন্টে বিবিবাজারের বিখ্যাত মস্তান। শোনা যেত ও নাকি দু-দুটো মার্ডার করেছে কিন্তু পলিটিক্যাল এক নেতা শেলটার দেওয়ায় পুলিশ ওকে ছুঁতে পারছিল না।

সেই ঝন্টে তা হলে এখন উমানাথ ঘোষালের কাঁধে ভর করেছে! কিংবা উমানাথই হয়তো ঝন্টের ঘাড়ে চড়ে নির্বাচনে তরে যেতে চাইছেন।

ঝন্টের মতো নাম করা অ্যান্টি-সোশ্যালকে পলিটিক্যাল এজেন্ট করে নিলে লোকের কী ধারণা হতে পারে, উমানাথ ঘোষাল কি একবারও ভেবে দেখেননি? অথবা এটাই হয়তো এখনকার নিয়ম; ইলেকশান জিততে হলে মস্তান-টস্তান ছাড়া উপায় নেই। পলিটিকস কোন স্তরে নেমে গেছে ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়।

প্রশান্ত সেদিন বলেছিল, উমানাথ প্রচুর অ্যান্টি-সোশ্যালকে আশ্রয় দিয়েছেন। নিজের চোখেই তার একটা নমুনা দেখতে পেল মলয়।

ব্রজদুলাল আঙুল বাড়িয়ে ঝন্টেকে দেখাতে-দেখাতে বলল, 'এই লোকটাকে চেনেন স্যার?'

মলয় চমকে উঠল, 'কেন বলুন তো?'

'ও এখানকার সব চাইতে ডেঞ্জারাস মস্তান। ওর নামে বারোটা মার্ডার চার্জ রয়েছে। আগে ভবসিন্ধু কয়ালের হয়ে ভোটের সময় খাটত, এখন উমানাথ ঘোষালের ক্যাম্পে ভিড়েছে। এখানে ক্যাশের ব্যাপারটা অনেক বেশি কিনা।'

এসব খবর মলয়ের কাছে নতুন নয়। নতুনের মধ্যে ঝন্টের এক পলিটিক্যাল ক্যাম্প থেকে আরেক পলিটিক্যাল ক্যাম্পে চলে আসা, আর পাঁচ বছর আগে, তার বিরুদ্ধে দুটো খুনের বদলে বারোটা খুনের অভিযোগ।

ব্রজদুলাল আবার বলল, 'এই ঝন্টে এখন উমানাথের হয়ে প্রসেশন বার করছে, মিটিং করাচ্ছে, লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্যে বোঝাচ্ছে। না দিলে ফল কী হবে তা-ও জানিয়ে আসছে।'

মলয় ব্রজদুলালকে বাজিয়ে দেখবার জন্য বলল, 'মস্তান হলেও মিছিলে কম লোক তো জোগাড় করেনি!'

ব্রজদুলাল বলল, 'এক বেলার খাবার আর পাঁচটা করে টাকা পেলে কে মিছিলে আসবে না বলুন। ভবসিন্ধু কয়াল কি অবিনাশ সাধুখাঁ টাকা আর রুটি-তরকারি ছাড়ুক, দেখবেন এই লোকগুলোই সেখানে ভিড়ে যাবে।'

এ-ব্যাপারটা জানত না মলয়। সে রীতিমতো অবাক হয়ে যায়। একসময় মিছিলটা মলয়দের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর গাড়ি-টাড়ি স্বাভাবিকভাবেই চলতে শুরু করল।

অফিসে এসে মলয় দেখল, প্রশান্ত একটা ছোকরাকে নিয়ে তার কামরায় বসে আছে।

ছোকরার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। পোকায়-কাটা পাকানো চেহারা। ভাঙা গাল, খাপচা-খাপচা দাড়ি, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। পরনে ময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে সস্তা চপ্পল। অযত্নে বেড়ে ওঠা চুলে বহুকাল চিরুনি পড়েনি।

মলয় কামরায় ঢোকামাত্র দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করল

এবং মলয় যতক্ষণ না বসল দাঁড়িয়ে থাকল।

মলয় বসবার পর ওরা মুখোমুখি বসল। তারপর প্রথমেই প্রশান্ত তার সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ছোকরার নাম ফটিক। সে পুলিশের ইনফরমার। নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে অনেক রকম খবর নিয়ে আসে ফটিক। বিবিবাজারকে মাঝখানে রেখে পনেরো-কুড়ি মাইলের ভেতর অ্যান্টিসোশালরা কে কী করছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী—এসব ব্যাপার সে আগেভাগেই জানিয়ে দিয়ে যায়। ছোকরার একটা দারুণ ক্ষমতা আছে। চটপট যে-কোনও লোকের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। বুটলেগার স্মাগলার বা মস্তানদের ডেনগুলোতে তার অবাধ গতিবিধি। তার চেহারা পোশাক এবং কথা বলার ভঙ্গি এমন যে স্পাই বলে সন্দেহ করার উপায় নেই।

মলয় জিগ্যেস করল, কিছু খবর-টবর আছে নাকি?'

চোখ কুঁচকে ফটিক চাপা গলায় বলল, 'আছে স্যার দুটো টেরিফিক খবর—' হাত তুলে দুটো আঙুল দেখাল।

টেবিলে দু-হাত ছড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল মলয়। উৎসুক মুখে বলল, 'কী খবর?'

'বলছি স্যার—' বলে, একটু থামল ফটিক। তারপর ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে মুখে একটা নকল কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে ফের শুরু করল, 'স্যার, সকাল থেকে স্টমাকে কিছু পড়েনি। একটু চা-ফা না পেলে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না।' বলে ফটিক হাসল।

দেখেই টের পাওয়া যায় প্রচুর নেশা করে শরীরটা একেবারে ঝাঁঝরা করে এনেছে ছোকরা। তবু তার ভাঙাচোরা ক্ষয়াটে মুখের হাসিতে একটা আপন-করা ছেলেমানুষি ব্যাপার আছে। সে-জন্য তাকে ভালোই লাগে। মলয় কিছু খাবার আর চা আনিয়ে দিল।

খেতে-খেতে ডান হাত তুলে দুই আঙুল দেখিয়ে বলল, 'দুটো খবর আছে স্যার, টেরিফিক খবর। মাকড়ারা—' বলেই তাড়াতাড়ি জিভ কেটে হাতজোড় করে বলল, 'মাপ করবেন স্যার, আমার মুখটা হল খাটা পায়খানা। জেন্টলম্যানদের মতো ভালো কথা বলতে পারি না। হাঁ করলে খিস্তিখাস্তা বেরিয়ে আসে।'

মলয় বুঝতে পারল, ফটিককে তার নিজের ভাষায় নিজস্ব ভঙ্গিতে বলতে দিলে আসল কাজের কথাটি ঠিকমতো বার করে নেওয়া সম্ভব হবে। তার আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য বলল, 'জেন্টলম্যানদের মতো ভালো কথা বলতে হবে না। তুমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে খুশি বলো। আমি কিছু মনে করব না।

কালচে ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে ফটিক হাসল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' তারপর চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ কি ভেবে আচমকা জিগ্যেস করল, 'আপনি তো সবে এখানে ইন করছেন। বিলকুল নিউ। লালকু হারামীর নাম কি কেউ আপনাকে বলেছে?'

এরকম নাম আগে শুনেছে কিনা মনে করতে পারল না মলয়। আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'না তো। সে কে?'

'বিবিবাজারের সব চাইতে ফেমাস ওয়াগন ব্রেকার। শ্লা একখানা টেরিফিক মাল। দু-হাতে ঝিক ঝিক যা চালায়; টার্গেটে লাগবেই। আর লাগলে জখম-ফখম হওয়া নয়, ডাবল প্রোমোশন পেয়ে স্ট্রেট স্বগগে চলে যেতে হবে।'

ঝিক ঝিক মানে রিভলবার, মলয় তা জানে। ফটিকের কথা শুনতে-শুনতে বিদ্যুৎচমকের মতো তার মনে পড়ে যায়, পাঁচ বছর আগে স্টেশনের কাছে সেই রেনট্রি-টার তলায় একটা ছোকরা এসে বসত। সে-ও ওয়াগন ভাঙত, তার নামও ছিল লালকু। মনে হচ্ছে সেই লালকু আর ফটিকের লালকুতে তফাত নেই। ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারে সে হয়তো আরও বিখ্যাত হয়েছে, তার নাম দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মলয় জিগ্যেস করল, 'তুমি যে লালকুর কথা বলছ, তাদের বাড়ি কি নতুন পাড়ায়?'

ফটিক একটু অবাকই হল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওর বাবার নাম কি রমাশঙ্কর সমাজদার? বাজারে মুদি দোকান ছিল ভদ্রলোকের।'

চোখ গোল হয়ে গেল ফটিকের। ঘাড় কাত করে বলল, 'আপনি ওদের চেনেন নাকি স্যার?'

প্রশান্ত তার পাশ থেকে বলে উঠল, 'স্যারের বাড়ি এখানেই ছিল। উনি অনেককেই চেনেন।'

মলয় সোজাসুজি ফটিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লালকুর কথা কী যেন বলছিলে! কী করেছে সে?'

ফটিক বলল, 'খজড়াটা টেরিফিক একটা প্ল্যান করেছে স্যার। কেমন করে যেন খবর পেয়েছে সাত-আট দিনের ভেতর দিল্লি না বম্বে কোত্থেকে আর্মি-টার্মির জন্যে এক ওয়াগন ইলেকট্রনিকসের মেশিন-ফেশিন এসে বিবিবাজারের ইয়ার্ডে দু-রাত বডি ফেলে রাখবে। লালকু ঠিক করেছে তার গ্যাং নিয়ে ওয়াগানটা ভেঙে মাল হাপিস করবে। এটা করতে পারলে লেলকোদের হোল লাইফ কিছু না করলেও চলবে।'

মলয় চমকে উঠল। আর্মি মানে সেনাবাহিনীর মাল খোয়া যাওয়া মারাত্মক ব্যাপার। বলল, 'লালকুর গ্যাং-এ কত ছেলে আছে জানো?'

'বাইশজন।'

'তাদের নাম-ফাম জানো?'

'হ্যাঁ স্যার, নামের লিস্ট করে এই স্যারকে আজ দিয়েছি।' বলে প্রশান্তকে দেখিয়ে দিল ফটিক।

মলয় এবার প্রশান্তকে বলল, 'রেল পুলিশকে এ-ব্যাপারে অ্যালার্ট করতে হবে।'

প্রশান্ত জানাল, 'করেছি স্যার, ওরা আমাদের হেল্প চেয়েছে। এ-ব্যাপারে আগে থেকে কী করা যায় বুঝতে পারছি না। আপনার অ্যাডভাইস দরকার।'

একটু ভেবে মলয় বলল, 'এই ওয়াগন ব্রেকারগুলোকে রাউন্ড-আপ করে তুলে নিয়ে এলে কেমন হয়?'

প্রশান্ত বলল, 'তার একটু অসুবিধা আছে স্যার।'

'কী অসুবিধা?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মলয়।

'তাদের পেছনে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক আছে। হঠাৎ অ্যারেস্ট করলে গোলমাল হবে।'

স্নায়ুগুলো কিসের একটা ইঙ্গিত পেয়ে মুহূর্তে টান-টান হয়ে গেল মলয়ের। বলল, 'এই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকটা কে?'

প্রশান্ত বলল, 'উমানাথ ঘোষাল।'

বিবিবাজারের অ্যান্টিসোশালদের কথা উঠলেই বারবার উমানাথের নাম এসে যাচ্ছে। ভদ্রলোক কি এখানকার সব ক্রিমিনালের গডফাদার হয়ে বসেছেন? মলয় প্রায় হকচকিয়ে গেল। একটু ভেবে জিগ্যেস করল, 'উমানাথ ঘোষাল এই ওয়াগন ব্রেকারদের পেছনে দাঁড়াবেন কেন? তিনি সমাজবিরোধীদের পেট্রন, এটা জানাজানি হওয়া তাঁর পক্ষে কি ভালো? লোকে তাঁর সম্বন্ধে কী ভাববে? সম্মানটা কোথায় থাকবে মিস্টার ঘোষালের?'

প্রশান্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফটিক বলে উঠল, 'সম্মান-ফম্মান সব ফালতু ব্যাপার স্যার। কে কী ভাবল তা নিয়ে উমানাথ মাকড়া মাথা ঘামায় না। সবার ওপরে কী আছে জানেন?'

ফটিকের চোখমুখ এবং কথা বলার মজাদার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল মলয়। বলল, 'কী?'

'ভোট, ভোট।'

'মানে?'

'উমানাথ ভোটের সময় তার হয়ে খাটার জন্যে লেলকো হারামীদের ফিট করে রেখেছে। যারা তার জন্যে জান লড়িয়ে দেবে পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে গেলে মাকড়া কি ছাড়বে?'

প্রশান্ত বলল, 'শুধু সন্দেহের কারণে ওদের ধরলে খুবই ঝামেলায় পড়তে হবে স্যার। উমানাথ ঘোষালের প্রচুর টাকা, তা ছাড়া মাসে-মাসে টাকা দিয়ে নামকরা ল-ইয়ার পোষেন। কোর্টে কেস গেলে আমরা নাস্তানাবুদ হয়ে যাব।'

মলয় বলল, 'তা হলে এক কাজ করুন। লালকু আর তার গ্যাংটার ওপর কড়া ওয়াচ রাখুন। ওয়াগন ভাঙার সময় হাতে-হাতে ধরে চালান করবেন। তখন কোর্টে ক্রাইম প্রুভ করতে অসুবিধা হবে না।'

'সেই ভালো স্যার। সারাক্ষণ আমরা লালকুদের ওয়াচে রাখব; এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দেব না।'

মলয় ফটিকের দিকে ঘুরে বলল, 'এবার তোমার দু-নম্বরি খবরটা দাও।'

ফটিকের মিষ্টি-ফিষ্টি খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'স্যার, এ কেসটা আমি নিজে শুনিনি; হাওয়ায়-হাওয়ায় কানে ভেসে এসেছে। খিদিরপুর ডক এখান থেকে বেশি দূরে নয়—'

'জানি তো।'

'শুনলাম, একটা স্মাগলার পার্টি জাহাজের মাল হাপিস করার জন্যে প্ল্যান করছে।'

'কবে?'

'খুব শিগগির।'

'এই স্মাগলারদের দলে কারা আছে?'

'বলতে পারব না। তবে মাকড়াদের নাম দু-চার দিনের ভেতর আপনাদের জানিয়ে দেব।'

মলয় প্রশান্তকে বলল, 'ডকের পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

'হ্যাঁ স্যার।' প্রশান্ত মাথা নাড়ল।

'ফটিক নামগুলো জোগাড় করতে পারলে তাদের ওপরও কনস্টান্ট ওয়াচ রাখতে হবে।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রশান্তদের সঙ্গে আলোচনা করে কেটে গেছে। এদিকে প্রচুর কাজ জমে রয়েছে। আজকের মধ্যেই সেসব করে ফেলতে হবে। মলয় বলল, 'আর কোনও খবর দেবেন?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল প্রশান্ত। বলল, 'না স্যার। আমরা তা হলে এখন উঠি।'

'আসুন—'

ফটিককে নিয়ে প্রশান্ত যখন দরজা পর্যন্ত গেছে, হঠাৎ কী মনে পড়তে মলয় ডাকল, 'একটু শুনে যান।'

ওরা ফিরে এসে টেবিলের ওধারে দাঁড়াতেই মলয় ফটিককে বলল, 'তুমি যে এভাবে দিনের বেলা থানার ওসি-র সঙ্গে আমার কাছে এলে এটা কিন্তু ভীষণ রিস্কি। স্মাগলার আর ওয়াগন ব্রেকাররা দেখতে পেলে বিপদ ঘটে যাবে।'

ট্যারাবাঁকা কালচে দাঁত বার করে ফটিক বলল, 'এখন আমাকে যেভাবে দেখছেন সেইভাবে কি আর ওই শ্লা স্মাগলারদের 'ডেন'-এ 'ইন' করব? ওদের ওখানে অন্য মেক-আপ চড়িয়ে যাই। আপনি স্যার ঘাবড়াবেন না।'

বোঝা যাচ্ছে, নানারকম ছদ্মবেশে অ্যান্টিসোশালদের সঙ্গে মেশে ফটিক। সে যে পুলিশের কাছে খবর পাচার করে, এটা যাতে জানাজানি না হয়ে যায় সেজন্য ছোকরা খুবই সচেতন। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মলয় হালকা গলায় বলে, 'আমাদের কাছেও মেক-আপ নিয়ে এসেছ নাকি?'

'না স্যার—' আঙুল দিয়ে নিজের মুখ দেখাতে দেখাতে ফটিক বলে, 'এটা আমার আসলি

থোবড়া (মুখ); এই থোবড়া লালকু আর ঝন্টে ফন্টেরা চেনে না।' একটু ভেবে আবার বলে, 'তবু স্যার, সাবধানে থাকতে হবে। এখন থেকে দিনের বেলা আপনাদের কাছে আর আসব না। রাত্তির-ফাত্তিরে দেখা করব। ওকে স্যার?'

ঠিক আছে।'

ফটিকরা চলে গেলে ক'টা কনফিডেনশিয়াল ফাইল দেখতে লাগল মলয়। এগুলোতে এই অঞ্চলের নামকরা ক্রিমিনালদের নানারকম রেকর্ড রয়েছে। দেখা গেল, লালকু এবং ঝন্টের নামে একটা করে আস্ত ফাইল। মার্ডার থেকে শুরু করে এরা যে কতরকমের অপরাধ করে গেছে, পড়তে-পড়তে শ্বাস আটকে আসছিল মলয়ের। বিলিতি ক্রাইম স্টোরিতেও এত সব চুল খাড়া-করা ঘটনা পাওয়া যায় না।

ফাইলের পাতাগুলোতে কতক্ষণ ডুবেছিল মলয়ের খেয়াল নেই। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। চমকে সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে মেয়ে-গলা ভেসে এল, 'আমি এসপি মলয় মুখার্জির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

পাঁচ বছর পরও কণ্ঠস্বরটা চিনতে অসুবিধা হল না। মলয়ের রক্তস্রোতে ঝড়ের মতো কিছু বয়ে যেতে লাগল যেন। বিবিবাজারে আসার পর থেকেই তার মনে হচ্ছিল, যে-কোনও মুহূর্তে ফোনে এই গলাটা ভেসে আসবে। কতদিন যে সকালে বা ছুটির পর বাড়ি ফিরে অসীম প্রত্যাশায় টেলিফোনের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে লাইন এলেই মনে হয়, এই বুঝি শর্মিলার গলা শোনা যাবে, কিন্তু না, মলয়কে হতাশই হতে হয়। শর্মিলার ফোন না করার কারণ যে তার ক্ষোভ দুঃখ এবং তীব্র অভিমান তা বোঝে মলয়। কিন্তু সে-ও তো এক অদ্ভুত অবস্থায় আটকে গেছে। ফোনে অবশ্যই সে যোগাযোগ করতে পারে, সুজাতাদের বাড়ি ডাকিয়ে এনে শর্মিলার সঙ্গে দেখাও করতে পারে। কিন্তু এসব করলে অনিবার্যভাবেই উমানাথের প্রসঙ্গ উঠবে। সেটা তার পক্ষে ভীষণ অস্বস্তিকর। উমানাথ ঘোষাল তার এবং শর্মিলার মাঝখানে বিরাট এক দেওয়াল তুলে দিয়েছেন। সেটা পেরিয়ে কোনওভাবেই তার কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

গলার স্বর চেনা সত্ত্বেও মলয় বলল, 'কে শর্মিলা?'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ। তারপর আবার শর্মিলার গলা শোনা গেল, 'কেমন আছ?'

মলয় বলল, 'ভালো। তুমি?'

'খারাপ কি? তোমাদের বাড়ির সবার খবর ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালোই।' মায়ের শরীর স্বাস্থ্যের কথা আর ভাইবোনেরা কে কী করছে জানিয়ে মলয় জিগ্যেস করল, 'তোমাদের বাড়ির সবাই কেমন আছেন?'

'ওই একই রকম। শুধু মায়ের আরথ্রাইটিসের ব্যথাটা কিছুদিন ধরে খুব বেড়েছে।'

মলয় লক্ষ করল, উমানাথ ঘোষাল সম্পর্কে একটা কথাও বলল না শর্মিলা।

একটু ভেবে মলয় বলল, 'এম-এ পরীক্ষাটা তো লাস্ট ইয়ারে ড্রপ করেছিলে। এবার দিচ্ছ তো?'

'দেখি।'

হঠাৎ মলয়ের মনে হল, শর্মিলার কথা বলার ধরনটা খুবই নিস্পৃহ। যে প্রাণবন্ত টগবগে মেয়েটাকে পাঁচ বছর আগে সে চিনত, তার সঙ্গে এই আশ্চর্য সংযত এবং উদাসীন শর্মিলার কোনও মিলই নেই যেন।

মলয় এবার বলল, 'সুজাতা আর অভিজিৎ একদিন আমাদের বাংলোতে এসেছিল।'

শর্মিলা আস্তে করে বলল, 'জানি।'

'অভিজিৎকে আগে দেখিনি। আলাপ করে খুব ভালো লাগল।'

'ওরা খুব ভালো।'

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মলয় বলল, 'অনেক কথা হল ওদের সঙ্গে।'

শর্মিলা আগ্রহশূন্যের মতো বলল, 'শুনেছি। ওরা সেদিনই বলে গেছে।'

মলয় ভেবেছিল, তার সঙ্গে সুজাতাদের কী-কী কথা হয়েছে, শর্মিলা তা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানতে চাইবে। কিন্তু সে কোনওরকম কৌতূহল দেখাল না।

ভেতরে-ভেতরে কোথায় যেন একটা ধাক্কা খেল মলয়। নিজের অজান্তেই হঠাৎ বলে ফেলল,'আসছে রবিবার দুপুরে সুজাতাদের বাড়ি আসবে?' বলতে-বলতেই উমানাথ ঘোষালের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ অস্বস্তি করতে লাগল সে। কিন্তু বলা হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার নেই।

শর্মিলা বলল, 'এত তাড়াতাড়ির কী আছে? তুমিও এখানে আছ, আমিও আছি। দেখা একদিন নিশ্চয়ই হবে।'

তার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ নেই শর্মিলার। সেই কারণে মন খারাপ হয়ে গেল মলয়ের। আবার আরামও বোধ করল এই ভেবে, অন্তত উমানাথ ঘোষালের প্রসঙ্গ নিয়ে তাকে অস্বস্তিতে পড়তে হবে না!

শর্মিলা আবার বলল, 'ভালো থেকো। অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। এবার ফোন ছাড়ছি।'

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে মলয় বলল, 'প্লিজ ছেড়ো না।'

'কেন?'

'কতদিন পর তোমার গলা শুনছি। আর কিছু বলবে না?' আবেগে গলা কাঁপতে লাগল মলয়ের। শর্মিলা চুপ করে রইল। গলায় অপরিসীম ব্যাকুলতা ফুটিয়ে মলয় বলল, 'লাইন কি ছেড়ে দিলে?'

আধফোটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'না।'

'আমি যা জানতে চাইলাম সে সম্বন্ধে কিছু বলো।'

'আজ ওসব থাক।' কথাগুলো শেষ হতে-না-হতেই কট করে একটা শব্দ হল। বোঝা গেল শর্মিলা লাইন ডিসকানেক্ট করে ফোনটা ক্রেডেলে রেখে দিয়েছে।

চার

আরও কয়েকদিন কেটে গেল। এর মধ্যে বিবিবাজারে সেনসেশানাল বা চমকে দেওয়ার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। এখানকার ম্যাড়মেড়ে জীবনযাত্রার প্যাটার্নে কোনওরকম হেরফেরও চোখে পড়েনি। সবই একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। একটা দিন যেন আরেকটা দিনের হুবহু কার্বন কপি।

রোজ রুটিনমাফিক কাজ করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে মলয়। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সন্ধের দিকে সুজাতার বাড়ি চলে গিয়েছিল সে। সুজাতারা খুবই আদর আপ্যায়ন করছে, প্রচুর খাইয়েছে, চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছে, কিন্তু একবারও শর্মিলার কথা তোলেনি।' ক'দিন আগে শর্মিলার জন্যই যে তারা তার কাছে ছুটে গিয়েছিল, সেদিন সুজাতাদের দেখে তা মনেই হয়নি। হয়তো শর্মিলাই তার সম্বন্ধে মলয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে বারণ করে দিয়েছে। মলয় যে যেচে এ-নিয়ে কথা বলবে তারও উপায় নেই।

এই ক'দিনে একটা ঘটনা অবশ্য তাদের বাড়িতে ছোটখাটো ঝড় বইয়ে গেছে। রুমা দুম

করে একটা ছেলেকে নিয়ে এসে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ছেলেটি অর্থাৎ সরোজ ওর সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছিল বিএ-তে। হিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এমএ-তেও ভালো করবে বলে অধ্যাপক এবং সহপাঠীদের ধারণা।

সরোজ খুবই বিনয়ী, ভদ্র আর নম্র ধরনের ছেলে। চেহারায় ধারাল বুদ্ধির ছাপ। চওড়া কপাল, পুরু সেলের চশমার পেছনে উজ্জ্বল চোখ, ঈষৎ অনমনস্ক চাউনি, অবিন্যস্ত চুল—এসব বুঝিয়ে দেয়, ছেলেটা পড়াশোনা ছাড়া বিশেষ কিছু বোঝে না। কথা বলে কম। সারাক্ষণ তার চোখমুখে স্নিগ্ধ একটু হাসি লেগেই আছে।

গল্প-টল্প করে চা-টা খেয়ে সরোজ চলে যাওয়ার পর রুমাকে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিল মলয়। বলেছিল, 'কী ব্যাপার এবার ঠিক করে বল। কিচ্ছু লুকোবার চেষ্টা করবি না।'

প্রথমে হকচকিয়ে গেছে রুমা। তারপর চুরি-করে-ধরা-পড়ে যাওয়া গোছের একটু হেসে বলেছে, 'কী আবার ব্যাপার। শুধু-শুধু লুকোতে যাব কেন?'

সোজাসুজি রুমার চোখের দিকে তাকিয়ে মলয় বলেছে, 'ভেরি গুড। এখন আরেকটু সৎসাহস দেখাও। আমি যা জিগ্যেস করব তার কারেক্ট উত্তর দিবি।' একটু থেমে আস্তে করে বলেছে, 'সরোজ একজাক্টলি কে?'

ঘরে এসে মলয় খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে রুমা। চোখ নামিয়ে রুমা বলেছিল, 'কে আবার, তখনই তো বললাম, আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়ি।'

'বন্ধু, ক্লাসমেট তো আরও অনেক আছে। কিন্তু বেছে-বেছে একজনকেই বাড়ি নিয়ে এলি যে?'

রুমা উত্তর দেয়নি।

মলয় চোখ কুঁচকে মজার একটা ভঙ্গি করে জিগ্যেস করেছে, 'সরোজরা থাকে কোথায়?'

'সল্ট লেকে।'

'মা-বাবা আছেন?'

'হ্যাঁ। ওর বাবা একটা মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির ফিনান্স কনট্রোলার।'

'ভাইবোন ক'টি?'

'দুই ভাই, এক বোন। ও সবার ছোট।'

'সরোজের দাদা-দিদি কী করেন?'

'দিদি টেরোন্টোতে আছে। ওখানে ফিলজফিতে পি এইচ ডি করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। জামাইবাবুও একই ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স ওঁর সাবজেক্ট। আর দাদা ট্রম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে বিরাট অফিসার।'

সামান্য ঝুঁকে আচমকা মলয় প্রশ্ন করেছিল, 'তুই ওদের এত খবর জানলি কী করে?'

রুমা বলেছে, 'বারে, ওদের বাড়ি আমাকে নিয়ে গেছে না? তখন—' বলতে-বলতে জিভ কেটে লজ্জায় জড়সড় হয়ে থেমে গিয়েছিল।

মলয় বলেছে, 'ও, তাহলে সরোজকে এখানে আনার আগেই তুই ওদের বাড়ি হানা দিয়েছিস!'

'নিজের থেকে গেছি নাকি? আমাকে জোর করে নিয়ে গেল যে।'

'রাইট রাইট। তোর তো যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না।'

চোখের কোণ দিয়ে মলয়কে দেখতে-দেখতে আদুরে ভঙ্গিতে ছোট বালিকার মতো রুমা বলেছে, 'যাও দাদা। খালি-খালি ইয়ার্কি।'

একটু চুপচাপ। তারপর মলয় জিগ্যেস করেছে, 'সরোজের ফিউচার প্ল্যান কী?'

'এখান থেকে এমএ-টা করে দিদির কাছে টোরেন্টোতে চলে যাবে। ওখানে রিসার্চ করতে চাইছে।'

আরও ঝুঁকে রুমার কানের কাছে মুখ এনে মলয় ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'এমএ-র পর তো বিয়ে; তারপর রিসার্চ। তোদের প্ল্যানটা সেইরকম না?'

রুমা চমকে উঠেছে। পরক্ষণে তার সারা মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গিয়েছিল। দ্রুত দু-হাতে মুখটা ঢেকে আস্তে-আস্তে মাথা নাড়তে-নাড়তে সে বলেছে, 'জানি না—'

মলয় গভীর স্নেহে হেসে-হেসে বলেছে, 'বিয়ের পর তোকেও নিয়ে যাবে তো? তুইও রিসার্চ করবি?'

প্রথমে কিছুতেই উত্তর দেবে না রুমা। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার কাছ থেকে আদায় করা গেল, সরোজ এবং তার পরিকল্পনা সেইরকমই। অর্থাৎ বিয়ের পর একসঙ্গে টোরেন্টোতে গিয়ে গবেষণা করা।

'ফাইন।' মলয় একটু ভেবে এবার কিছুটা উদ্বেগের গলায় বলছে, 'আরে, ভাইটাল খবরটাই তো এখনও নেওয়া হয়নি।'

'কী খবর দাদা?'

'সরোজদের পদবি কী—মানে সারনেম?'

'বসু।'

'নানারকম ক্যালকুলেট করে, অঙ্ক কষে ভালো ছেলে, তাদের ব্রিলিয়ান্ট ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড— সমস্ত কিছুই জোগাড় করেছিস, কিন্তু একটা জায়গায় যে গোলমাল করে ফেললি দিদি।'

'কোথায়?' প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় মুখ তুলে মলয়ের দিকে তাকিয়েছিল রুমা।

'আমরা মুখার্জি, ওরা বসু। মা কি ইন্টার-কাস্ট ম্যারেজে রাজি হবে? এমন বিয়ে আমাদের বংশে আগে আর কখনও হয়নি। এর প্রিসিডেন্স নেই।'

'আমি কিছু জানি না দাদা, যা করবার তুমি করবে।' বলেই শরীর নুইয়ে মলয়ের কোলে মুখ গুঁজে দিয়েছিল রুমা।

গভীর মমতায় তার চুলে আঙুল বুলোতে-বুলোতে মলয় বলল, 'দেখি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে। চিফ জাস্টিস কী রায় দেয়, তার ওপর সব নির্ভর করছে।' চিফ জাস্টিস, মানে এখানে মা।

মাকে সব বলতে প্রথমে জোরে-জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে জানিয়েছে, এ-বিয়ে হতে পারে না। আসলে এই বয়সে এসে মায়ের পক্ষে সংস্কার কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব।

এরপর ক'দিন ধরে মাকে সমানে বুঝিয়েছে মলয়। আজকাল এ-জাতীয় বিয়ে আকছার হচ্ছে। জাতের ব্যাপার নিয়ে কেউ এখন মাথা ঘামায় না। এ-সব পুরোনো সংস্কার একেবারেই অর্থহীন। আসলে দেখতে হবে রুমার বিয়ে যার সঙ্গে হচ্ছে সেই ছেলেটি কেমন, তাদের ফ্যামিলিটা ভালো কিনা, সেখানে গেলে রুমা সুখী হবে কিনা, এই সব। সেদিক থেকে সরোজের তুলনা হয় না; তাদের ফ্যামিলিও চমৎকার। এমন ছেলে, এমন ফ্যামিলি ব্রাহ্মণদের মধ্যে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। অনেক বোঝাবার পর শেষ পর্যন্ত মা রাজি হয়েছে, তবে খুঁতখুঁতনি পুরোপুরি কাটেনি।

মায়ের মত পাওয়ার পর মলয় সরোজের বাবাকে চিঠি লিখেছে, খুব তাড়াতাড়িই একদিন সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে। এই চাঞ্চল্যকর পারিবারিক ঘটনাটি ক'দিন মলয়কে বেশ ব্যস্ত রেখেছিল। তবে তারই মধ্যে চোখে পড়েছে, বিবিবাজারের নির্বাচনী হাওয়া বেশ তেতে উঠেছে। ইলেকশান টেম্পো লাফিয়ে-লাফিয়ে চড়ছে। এখানকার কোনও বাড়ির দেওয়ালে এক ইঞ্চি জায়গাও আর ফাঁকা নেই; নানা রঙের কালিতে ক্যান্ডিডেটদের নাম এবং তাঁদের প্রতীকের ছবিতে বোঝাই হয়ে গেছে।

কিছুদিন আগেও একমাত্র উমানাথ ঘোষালের মিছিল বেরুতে দেখা যেত। তাঁর নির্বাচন কর্মীরাই স্ট্রিট কর্নার মিটিং করত। কখনও-কখনও শহরের নামী লোকদের সভাপতি করে কোর্টপাড়া

কি ঝিলপাড়ের মাঠে সভা করত। এখন ভবসিন্ধু কয়াল, রমানাথ ভট্টাচার্য, সীতাকান্ত চৌধুরি আর অবিনাশ সাধুখাঁয়ের ওয়ার্কাররাও মিটিং এবং মিছিল করছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত বিবিবাজার চিৎকারে স্লোগানে বক্তৃতায় সরগরম হয়ে থাকে।

আজ সারাদিন দারুণ পরিশ্রম গেছে। যতটা পরিশ্রম ঠিক ততটাই টেনশান।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই মলয়কে ছুটতে হয়েছিল কলকাতায়। ডিস্ট্রিক্টগুলোর ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার জন্য হোম সেক্রেটারি তাঁর ঘরে এসপি-দের একটা মিটিং ডেকেছিলেন। সেখানে আই.জি, ডি.আই.জি এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল অফিসাররাও ছিলেন।

হোম সেক্রেটারি নিজে প্রতিটি এসপি-র কাছ থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ডিস্ট্রিক্টের ক্রাইম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিয়েছেন। অপরাধ দমনে নানারকম সাজেশান দিয়েছেন। তা ছাড়া প্রতি মাসে প্রত্যেককে আইন শৃঙ্খলার কাজ কেমন চলছে, তার বিশদ রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মিটিং শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে ফিরে সোজা নিজের অফিসে চলে গিয়েছিল মলয়। সেখানে ক'টা জরুরি ফাইল দেখে আরজেন্ট নোট দিয়ে বাড়ি আসতে-আসতে সন্ধে পেরিয়ে গেছে।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল মলয়ের। বাড়ি এসে একটু জিরিয়ে আরেক বার স্নান করে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

আলোর রান্নাবান্নার দারুণ শখ। মাঝে-মাঝে দিশি-বিদেশি রেসিপি দেখে এটা সেটা তৈরি করে। আজ করেছিল টিকিয়া কাবাব। একটা প্লেটে মলয়ের জন্য কাবাব আর চা নিয়ে এল আলো।

কাবাবে একটা কামড় দিয়ে আধবোজা চোখে চিবুতে-চিবুতে মলয় বলল, 'সুপার্ব। দারুণ বানিয়েছিস। ফাইভ-স্টার হোটেলের বাবুর্চিদের তুই নাক কেটে দিতে পারিস।'

আলোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দাদা অর্থাৎ মলয় খুশি হলে তার আনন্দের সীমা থাকে না। শুধু সে-ই না, রুমা আর নীলুও মলয়কে খুব যত্ন করে। দাদাকে খুশি করার জন্য তাদের মধ্যে একটা গোপন সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা রয়েছে।

মলয় আবার বলল, 'রান্নার হাতটা যা তৈরি করেছিস তাতে লাইফের ফিফটি পারসেন্ট চার্মই তোর মুঠোর ভেতর চলে এসেছে। যে ঘরে যাবি, তারা তোকে মাথায় করে রাখবে।'

'আহা—' আরক্ত লাজুক মুখে একটু হেসে আলো চলে গেল। কাবাব এবং চা শেষ করে বিছানায় ফের গা এলিয়ে দিতেই ঘুমে দু-চোখ জুড়ে আসতে লাগল মলয়ের। ঘুমিয়ে পড়তও সে কিন্তু চেতনার শেষ অন্তরীপটুকু গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আগেই ঝন-ঝন করে ফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটা তার মাথার কাছে একটা সরু লম্বাটে ধরনের কাশ্মীরী টেবিলের ওপর থাকে।

মুহূর্তে ঘুম ছুটে যায় মলয়ের। প্রচণ্ড বিরক্তিতে ফোনটার দিকে তাকায় সে; একটানা সেটা বেজেই চলেছে। মলয় একবার ভাবে, যতই বাজুক, তুলবে না। পরক্ষণে মনে হয়, কোনও জরুরি 'কল' হতে পারে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই প্রশান্তর গলা ভেসে আসে, 'স্যার একটু ডিসটার্ব করলাম—'

মলয় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন—'

'এইমাত্র খবর পেলাম লালকুর গ্যাং আজ মাঝরাত্তিরে ওয়াগন ভাঙতে যাচ্ছে।'

'কে বললে, ফটিক নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার, ও এখন আমার সামনেই বসে আছে।'

'রেল পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছেন তো?'

'সেদিন আপনার সঙ্গে কথা বলার পর ওদের অ্যালার্ট করে দিয়েছিলাম। আজও খানিকক্ষণ

আগে জানিয়েছি। কিন্তু—'

'কী?'

'লালকুর গ্যাংটাকে রুখবার মতো স্ট্রেনথ ওদের নেই। ওরা আমাদের হেল্প চাইছে।'

'হেল্প যখন চাইছে, তখন করতেই হবে।'

প্রশান্ত বলল, 'তার রেজাল্ট হবে এই, শেষ পর্যন্ত পুরো ঝামেলাটা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বে। ওয়াগন ভাঙতে দেখলে লালকুদের অ্যারেস্ট করতেই হবে। ওরা যে টাইপের ক্রিমিনাল, হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডকাফ পরতে চাইবে না। বোমা, পাইপগান-টান দিয়ে ডেফিনিটলি অ্যাটাক করবে।'

মলয় বলল, 'তার সম্ভাবনা আছে।'

'ওরা অ্যাটাক করলে আমাদের ফায়ার করতে—'

আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে মলয় বলল, 'অ্যারেস্ট, ফায়ার—স্পটে গিয়ে যা দরকার মনে হবে তাই করবেন।'

এবার প্রশান্তর দ্বিধান্বিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'সেদিনও আপনাকে বলেছিলাম, আজও বলছি, লালকুদের গায়ে হাত দিলে পরে ট্রাবল হতে পারে।'

প্রশান্তর ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তার দ্বিধা বা উৎকণ্ঠার একমাত্র কারণ উমানাথ ঘোষাল। হঠাৎ মাথার ভেতর একটা শিরা যেন ছিঁড়ে যায় মলয়ের। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'যা হওয়ার হবে। আপনি আইন অনুযায়ী চলবেন। ট্রাবল বা রি-অ্যাকশান যা-ই হোক না , আমি ফেস করব। সব দায়িত্ব আমার। 'রুল অফ ল' বলে যে একটা বস্তু আছে, এই ডিস্ট্রিক্টের ক্রিমিনালদের আমি বুঝিয়ে দেব।'

প্রশান্ত নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন আমার আর ভয় নেই।'

মলয় বলল, 'ভালো করে প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাবেন। যত রাতই হোক, কী হল না হল, আমাকে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই স্যার। গুড নাইট।'

ফোনটা নামিয়ে রাখতে-রাখতে একটা কথা ভেবে একটু অবাকই হল মলয়। এর আগে যখন সে নর্থ বেঙ্গলে ছিল, ওখানকার সব মান্যগণ্য মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতারা তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। মলয় ওখানে পোস্টিং নিয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহের ভেতর তাঁরা তার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে গিয়েছিলেন। অন্যান্য এসপি বা এই জাতীয় বড় পুলিশ অফিসারদের কাছে সে শুনেছে, নানা কারণে বিজনেসম্যান বা পলিটিক্যাল পার্টির নেতারা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এই বিবিবাজারে আসার পরও এখানকার ভিআইপি-দের প্রায় সবাই তার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। একমাত্র উমানাথই বাদ। তিনি আসেনওনি, ফোনও করেননি। এর কারণ অবশ্য বোঝা যায়। একদিন যাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন তার সামনে যেচে এসে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া ভদ্রলোকের মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করা যায়। মলয় যে তার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আইপিএস হবে এবং এই শহরেই এসপি হয়ে আসবে, এতটা বোধ হয় ভাবতে পারেননি উমানাথ। তবে আজ হোক কাল হোক, ব্যবসা এবং রাজনীতি চালাতে হলে তার কাছে উমানাথ ঘোষালকে আসতেই হবে।

সেই যে সন্ধেবেলা প্রশান্ত ফোন করছিল, তারপর থেকে ভীষণ অস্থির হয়ে আছে মলয়। ভেতরে-ভেতরে চাঞ্চল্যের সঙ্গে অদ্ভুত এক উত্তেজনাও চলছে।

এখন অনেক রাত। প্রায় একটার মতো বাজে। শরীরে অসীম ক্লান্তি সত্ত্বেও মলয় কিছুতেই

ঘুমোতে পারছে না।

তাদের গোটা বাংলোটা, শুধু বাংলোটা কেন, এই বিবিবাজার শহর গভীর ঘুমের আরকে ডুবে যাচ্ছে। জানলার বাইরে মাঠঘাট, দূরের শস্যক্ষেত্র, সবকিছু এখন নিঝুম। মাঝে-মাঝে দু-একটা রাতজাগা পাখির ডাক আর ঝিঁঝিদের বিলাপ ছাড়া পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আর কোনও শব্দ নেই। এই মধ্যরাতে ক'টা পাখি, ক'টা ঝিঁঝি এবং মলয় ছাড়া আর কেউ বুঝিবা জেগেও নেই।

পুলিশের সঙ্গে লালকুদের এনকাউন্টারের ফলাফল কী হবে, দু-পক্ষের কতজন মারা যাবে বা জখম হবে, এই সব ভাবতে-ভাবতেই উদ্বেগে রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে মলয়ের। আসলে সে ঝানু বেপরোয়া পুলিশ অফিসার হয়ে উঠতে পারেনি। তার মধ্যে আবেগ সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এখনও প্রবলভাবে কাজ করে।

সন্ধে থেকে মলয় ঘুমোতে তো পারছেই না একটানা শুয়েও থাকতে পারছে না। কিছুক্ষণ হয়তো বিছানায় ছটফট করল, পরক্ষণেই উঠে জানলার কাছে গিয়ে দূরমনস্কর মতো বাইরের দৃশ্য-টৃশ্য দেখল, তারপরেই ঘরময় অস্থির পায়ে হাঁটতে লাগল। যা-ই করুক, তার কান সর্বক্ষণ রয়েছে টেলিফোনটার দিকে। কখন প্রশান্তর ফোন আসে, তারই প্রতীক্ষা।

ফোন এল রাত সাড়ে তিনটেয়। প্রশান্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, 'ক্ষমা করবেন স্যার, আপনার ঘুম ভাঙিয়ে একটু বিরক্ত করছি।'

মলয় বলল, 'মোটেই বিরক্ত করছেন না। আপনার ফোনের জন্যে জেগেই ছিলাম। বলুন কী হল?'

প্রশান্ত জানাল ফটিক ঠিক খবরই দিয়েছে। রাত বারোটা চল্লিশে লালকু আর তার গ্যাং ওয়াগন ভাঙতে যায়। আগে থেকেই রেল পুলিশ, প্রশান্ত এবং পাশের রূপাপুর থানার ওসি ধরণী সাহা আর্মড ফোর্স নিয়ে অন্ধকার ঝোপঝাড় বা অন্য সব বাতিল ওয়াগনের আড়ালে পজিশন নিয়ে বসে ছিল। লালকুরা নির্দিষ্ট ওয়াগনটা যেই ভাঙতে শুরু করল পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের চ্যালেঞ্জ করে। ওর বোমা রিভলবার এবং পাইপগান নিয়ে পুরোপুরি তৈরি হয়েই এসেছিল। চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে-সঙ্গে লালকুরা বৃষ্টির মতো বোমা ছুড়তে শুরু করে, পাইপগান টানও চালাতে থাকে। পুলিশ যেভাবে চারিদিক থেকে টাইট করডন করেছিল তাতে পালাবার রাস্তা ছিল না; লালকুরা চাইছিল বোমাটোমা চালিয়ে করডনটা ভাঙতে পারলেই ভেগে যাবে কিন্তু সে সুযোগ তারা পায়নি। পুলিশকেও বাধ্য হয়ে ফায়ার করতে হয়েছে। খুব সম্ভব বিবিবাজারে ওযাগন ব্রেকার এবং পুলিশের মধ্যে এতবড় এনকাউন্টার আর কখনও হয়নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লালকুদের পুরো গ্যাংটাকেই অ্যারেস্ট করা গেছে।

মলয় বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশনস। কিন্তু—'

প্রশান্ত বলল, 'কিন্তু কী স্যার?'

'এত বোমা আর গুলি-টুলি চলল, ক্যাজুয়ালটি কিছু হয়নি?'

'তা তো স্যার হবেই। ওদের আটজন জখম হয়েছে। তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা সিরিয়াস। আমাদের পাঁচজন ইনজিওরডের ভেতর একজন বাঁচবে কিনা সন্দেহ। সবাইকে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠান হয়েছে। আমারও ছোটখাটো একটা চোট লেগেছে; তবে মারাত্মক কিছু না; পায়ে বোমার স্পিল্‌নটার ঢুকে গিয়েছিল।'

উদ্বেগের গলায় মলয় জিগ্যেস করল, 'স্পিল্‌নটারটা বার করা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ স্যার; ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন।'

মলয় এবার জানাল আহত পুলিশদের সব রকম সাহায্য করা হবে। তাদের সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য যাতে পুরস্কার দেওয়া হয়, সে তার সুপারিশ করবে।

কৃতজ্ঞ সুরে প্রশান্ত বলল, 'ধন্যবাদ স্যার।'

মলয় এবার জানায়, কাল জেলা হাসপাতালে গিয়ে আহত সহকর্মীদের দেখে আসবে।

পাঁচ

কাল শেষ রাতে প্রশান্তর সঙ্গে কথা হওয়ার পর সে মনে-মনে ঠিক করে রেখেছিল, আজ সকালে উঠেই জেলা হাসপাতালে চলে যাবে। কিন্তু ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ায় তাড়াতাড়ি উঠতে পারেনি।

মলয়ের ঘুম যখন ভাঙল, আটটা বেজে গেছে। আরও আগে জাগিয়ে না দেওয়ার জন্য রুমা আর আলোকে একটু বকাবকি করল। তারপর তাড়াহুড়ো করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক বাদে স্নান-টান এবং ব্রেকফাস্ট সেরে মলয় যখন বেরুতে যাবে সেই সময় একটা আরদালি এসে খবর দিল, কে একজন দেখা করতে এসেছে। তাকে ড্রইংরুমে বসানো হয়েছে।

সকালে ভিজিটর আসা একেবারেই পছন্দ করে না মলয়, বিশেষ করে এই বেরুবার সময়টায় রীতিমতো বিরক্তই হল সে। তবে বাড়ি পর্যন্ত যখন লোকটা এসেই পড়েছে, দু-একটা কথা না বলে হাঁকিয়ে দেওয়া অভদ্রতা।

'ঠিক আছে—' বলে মলয় ড্রইংরুমে চলে এল।

একটা মধ্যবয়সি লোক সোফার কোণে চুপচাপ বসে ছিল। গোলগাল চেহারা। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। বড়-বড় কাঁচাপাকা চুল, পাতা কেটে কান এবং ঘাড়ের ওপর দিয়ে লতিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টকটকে ফরসা রং। খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ গোলআলুর মতো মুখ, থুতনিতে একটা খাঁজ। গলায়, গালে থাক-থাক চর্বি। চোখদুটো ঢুলুঢুলু; দেখে মনে হয় সর্বক্ষণ স্বপ্নেব বা নেশাব ঘোরে রয়েছে।

লোকটার পরনে চুনোট করা ধাক্কাপাড় মিহি ধুতি আর গিলে-করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি। পায়ে জরি-বসানো শুঁড়তোলা নাগরা। দু-হাতের ফুলো-ফুলো আঙুলে হিরে-পান্না-চুনি-মুক্তো ইত্যাদি বসানো ছ-সাতটা আংটি। তাকে দেখামাত্র নাইনটিনথ সেঞ্চুরির বাবুদের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মলয় ড্রইংরুমে ঢুকতেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাতজোড় করে সারা মুখ ভরে বিগলিত হেসে বলল, 'নমস্কার স্যার—'

'নমস্কার। বসুন—'

পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বার করে সেটা খুলে বাড়িয়ে দিল লোকটা। কৌটোটা পানের খিলিতে বোঝাই। বলল, 'চলবে স্যার?'

'আমি পান খাই না।'

অগত্যা নিজেই একটা খিলি তুলে মুখে পুরে কৌটোটা ফের পকেটে রাখল লোকটা। আগে মলয় লক্ষ করেনি, এবার তার চোখে পড়ল লোকটার দাঁতের ওপর চিরস্থায়ী কালচে ছোপ। বোঝাই যায়, পান খাওয়ার অভ্যাস তার অনেক কালের।

লোকটা এবার অন্য পকেট থেকে ছোট কৌটো বার করে এক চিমটি জরদা তুলে মুখে চালান করল। তারপর বলল, 'স্যার, আমার নাম রমণীমোহন চট্টরাজ। অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে যাব কিন্তু সুযোগ আর হয়ে উঠছিল না। এতদিন পর সেই সৌভাগ্যটা হল।'

চোখের কোণ দিয়ে রমণীমোহনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপতে-মাপতে নীরস গলায় মলয় জিগ্যেস করল, 'আপনি কী করেন?'

'আমি ল-ইয়ার। আগে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কোর্টে প্র্যাকটিশ করতাম। এখন—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা থেমে গেল রমণীমোহন। তারপর একটু ভেবে বলল, 'এখনকার ব্যাপারটা পরে বলছি। তার অগে দু-চারটে খুচরো কথা সেরে নিই।'

লোকটা তাড়াহুড়ো করে কথা বলে না। ধীর চালে, যেন ঘুমের ঘোরে বলে যায়। কবজি উলটে এক পলক ঘড়ি দেখে মলয় বলল, 'আমাকে এখনই বেরুতে হবে। দরকারী আলোচনা থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।'

রমণীমোহন হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল। তার চোখমুখ থেকে ঘুমন্ত ভাবটা মুহূর্তে সরে গেল। মলয়ের মনে হল, পুরোপুরি আলাদা একটা মানুষ তার সামনে বসে আছে। যে লোক এত দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, অবশ্যই তার সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার।

রমণীমোহন বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার, আপনার সময়ের খুব দাম। দয়া করে আমাকে পনেরোটা মিনিট দিন। তার বেশি এক সেকেন্ডও নেব না।'

'ঠিক আছে।'

রমণীমোহন বলল, 'স্যার, আমি শুনেছি আপনি এখানকারই ছেলে। মানে এই বিবিবাজারেই জন্মেছেন।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মলয় বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। এখানে আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল।'

বিনয়ে গলে যেতে-যেতে রমণীমোহন এবার বলল, 'আপনি তো স্যার এই শহরের গর্ব। আপনার মতো এমন স্ট্রিক্ট অনেস্ট অফিসার খুব কমই দেখা যায়। লোকে কত সুখ্যাতি করে আপনার।' একটু থেমে দম নিয়ে ফের শুরু করে, 'আবার এ-ও শুনেছি আপনার মনটা ভীষণ কোমল—একেবারে গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো। দয়া মায়া ক্ষমা, এসব গুণে—'

মলয় খুবই বিব্রত বোধ করছিল। কেউ সামনে বসে অনবরত তোষামোদের কথা বলে গেলে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। তা ছাড়া এই চাটুকারিতার পেছনে যে গভীর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে, সেটা টের পেতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় বার রমণীমোহনকে থামিয়ে দিয়ে কিছুটা রূঢ় গলায় মলয় বলল, 'ফ্ল্যাটারি থাক। যে কারণে এসেছেন, সেটা বলুন।'

'তা তো বলতেই হবে—' মুখের পান শেষ হয়ে গিয়েছিল। আরেকটা খিলি বার করতে-করতে রমণীমোহন বলল, 'স্যার, এ-সব ফ্ল্যাটারি নয়। আজকাল মানুষ খুব ছোট আর নোংরা হয়ে গেছে। তার মধ্যেই যদি কারও গ্রেটনেস দেখতে পাই বড় আনন্দ হয়। মহত্ত্বের কথা গলা ফাটিয়ে সারা পৃথিবীকে জানাতে ইচ্ছা করে। যাক গে, স্যার যখন অস্বস্তি বোধ করছেন তখন আর বলব না। তবে—'

'কী?'

'নিজের মহত্ত্বের কথা শুনতে চায় না, এমন মানুষ আপনি ছাড়া ওয়ার্ল্ডে আর একটিও নেই। এটা এক ধরনের গ্রেটনেস।'

লোকটা একটু বেশিই বকে। কখন যে সে আজে-বাজে ধানাই-পানাই থামিয়ে আসল কাজের কথায় আসবে, কে জানে। অপরিসীম বিরক্তি নিয়ে মলয় অপেক্ষা করতে লাগল।

রমণীমোহন আর সময় নিল না। পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, 'চার মিনিট কেটে গেছে, এখনও আমার হাতে এগারো মিনিট রয়েছে।' বলেই সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে, ঝপ করে গলার স্বর খাদে নামিয়ে দিল, 'স্যার, কাল রাত্তিরে পুলিশ ওয়াগনব্রেকার বলে তেইশ জনকে অ্যারেস্ট করেছে।' বলে পান চিবুতে-চিবুতে মলয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল।

রমণীমোহনের আসার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে টের পাওয়া যাচ্ছে। মুহূর্তে স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে উঠল মলয়ের। শিরদাঁড়া টান-টান করে স্থির চোখে রমণীমোহনকে দেখতে-দেখতে তীক্ষ্ণ গলায়

বলল, 'ওয়াগন-ব্রেকার বলে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মানে? হোয়াট ডু য়ু মিন? ওরা ওয়াগনব্রেকার নয়?'

রমণীমোহন অবিচলিত ভঙ্গিতে ধীর নিরুত্তেজ স্বরে বলতে লাগল, 'ওরা হয়তো রেল ইয়ার্ডে গিয়েছিল, ওয়াগনেও হয়তো হাত দিয়েছে। আসলে স্যার, ওরা স্লাইটলি বিপথগামী যুবক। দেশের যা অর্থনৈতিক অবস্থা—বুঝতেই পারছেন।' বলে থামল। নিস্তব্ধ ড্রইংরুমে শুধু পান চিবুনোর চাকুম-চাকুম শব্দ শোনা যেতে লাগল।

রমণীমোহনের কথা শেষ না হতে-না-হতেই আচমকা আবছাভাবে কিসের একটা ইঙ্গিত যেন পেয়ে যায় মলয়। সোজাসুজি লোকটার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বলল, 'কে আপনি? আমার কাছে কে আপনাকে পাঠিয়েছে?'

চোখ কুঁচকে একটু হাসল রমণীমোহন। পকেট থেকে ছোট কৌটো বার করে এক চিমটি জরদা তুলে মুখে পুরতে-পুরতে বলল, 'তখন বলেছিলাম আমি কোর্টে প্র্যাকটিশ করতাম। এখন কী করি বলিনি। এবার আসল পরিচয় দেওয়ার সময় হয়েছে। আমি উমানাথ ঘোষালের পলিটিক্যাল অ্যাডভাইজার। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রমণীমোহন আবার শুরু করল, 'স্যার, আপনাকে কেন বিরক্ত করতে এসেছি, হয়তো আন্দাজ করতে পেরেছেন।'

মোটামুটি বুঝতে পেরেও মলয় বলল, 'না। যা বলার পরিষ্কার করে বলুন।'

'স্যার, আপনার কোমল হৃদয়। এবারকার মতো ছেলেগুলোকে ক্ষমা করে দিন। সকালে গিয়ে ওদের সঙ্গে লক-আপে দেখা করে এসেছি। ওরা খুবই অনুতপ্ত, ভুল করেও আর কোনওদিন রেল ইয়ার্ডের দিকে যাবে না।'

কড়া গলায় মলয় বলে, 'ওরা বোমা পাইপগান চালিয়ে পুলিশ জখম করেছে। ওদের নামে থানায় কেস লেখা হয়ে গেছে। এই সব ক্রিমিনালদের ক্ষমা করে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। যা করার কোর্ট করবে।'

হাতজোড় করে রমণীমোহন এবার বলল, 'স্যার, অপরাধ নেবেন না, একটা কথা বলছি। আপনি দয়া করলে কোর্ট ওদের সম্বন্ধে পুলিশের যে রিপোর্ট পাবে তাতে ওরা খুব বিপদে পড়বে না। ওরা নতুন করে সৎভাবে বাঁচার সুযোগ পাবে।'

শরীরের সব রক্ত লাফ দিয়ে মাথায় উঠে এল যেন মলয়ের। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চান, পুলিশ এমনভাবে কেস সাজিয়ে দিক যাতে জঘন্য ক্রিমিনালগুলো ছাড়া পেয়ে যায়—এই তো?'

আস্তে-আস্তে মাথা নাড়তে-নাড়তে রমণীমোহন বলল,'পুলিশ কী করবে না করবে সে সম্বন্ধে আমি কি কিছু বলতে পারি স্যার, না সে সাহস আমার কাছে? আমি স্যার সুপ্রিম কোর্টে এসেছি করুণা ভিক্ষে করতে। দয়া করে স্লাইটলি বিপথগামী ছেলেগুলোকে একটা সুযোগ দিন।'

স্থির চোখে কিছুক্ষণ রমণীমোহনের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মলয় বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে আশা করি। যদি লক-আপে ওই ওয়াগনব্রেকারগুলোর সঙ্গে না থাকতে চান এই মুহূর্তে এখান থেকে বেরিয়ে যান। পুলিশকে ক্রিমিনালদের যেভাবে ফলস রিপোর্ট দিতে বলছেন—এই চার্জে আপনার কোমরে দড়ি দিয়ে এখান থেকে হাঁটিয়ে হাজতে নিয়ে যেতে পারি—তা কি জানেন?'

রমণীমোহন কোনও কারণেই বিব্রত বা বিচলিত হয় না। তার ওঠার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে বলল, 'তা আর জানি না স্যার। তবে যেসব কথা বললাম সেগুলো আমার নয়। মিস্টার ঘোষালের এরকমই ইচ্ছে—'

হঠাৎ মাথার ভেতর একটা শির ছিঁড়ে গেল যেন। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মলয়ের। প্রায় চিৎকারই করে উঠল সে, 'আপনার মিস্টার ঘোষালাকে বলে দেবেন তাঁর ইচ্ছায় পুলিশের নিয়ম পালটাবে না। কতকগুলো বর্‌ন্ ক্রিমিনালদের জন্যে তাঁর এত ইন্টারেস্ট, এত দরদ কেন?'

'স্যার, ঘোষাল সাহেবের মন বড় সফট। চাকরি-বাকরি না পেয়ে যারা খারাপ পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে উনি তাদের ফিরিয়ে আনতে চান। কত বড় একটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন বলুন তো? এ গ্রেট সোশাল ওয়ার্কার—গ্রেট! নমস্য লোক।' উমানাথের প্রতি ভক্তিতে গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল রমণীমোহনের।

কী মনে পড়তে মলয় হঠাৎ বলল, 'আপনার প্রভুটি তো এবার এখান থেকে ইলেকশানে নামছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—' বেশ নড়েচড়ে বসল রমণীমোহন।

'ঘোষাল সাহেবকে জানাবেন অ্যান্টিসোশালদের সম্বন্ধে এত ইন্টারেস্ট দেখালে ভোটাররা বিগড়ে যেতে পারে।'

'না স্যার, না স্যার—' হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে রমণীমোহন বলল, 'অন্য কোনও ইন্টারেস্ট নেই; এ একেবারে নিঃস্বার্থ সমাজসেবা! ঘোষাল সাহেব গ্রেট ম্যান—'

ঘড়ি দেখে মলয় বলল, 'ঠিক আছে, এবার আপনি আসতে পারেন। আমাকে এখন বেরুতে হবে।' বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সে।

রমণীমোহনকেও অগত্যা উঠতে হল। মলয়ের পাশাপাশি ড্রইংরুমের বাইরে যেতে-যেতে বলল, 'তা হলে স্যার ওই ব্যাপারটার কী হবে?'

'যা বলার তা তো বলেই দিয়েছি। এ-নিয়ে আর কোনও কথা শুনতে চাই না।'

কিন্তু রমণীমোহন হল একটা ঘ্যানঘেনে মাছি। সহজে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। সে বলল, 'স্যার, শুধু একটা কথা শুনুন। ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে আপনার একটা সুইট রিলেশান হতে যাচ্ছে বলে শুনেছি। সামান্য কারণে সম্পর্কটা বিটার করা ঠিক না।'

লোকটা ধৈর্যের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। মলয়ের মাথার ভেতর বিস্ফোরণ ঘটে গেল। নিজের অজান্তে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল, 'স্কাউন্ড্রেল, এক সেকেন্ডের ভেতর এখান থেকে চলে না গেলে তোমাকে—'

এতক্ষণে অবিচলিত নিরুদ্বেগ ভাবটা ছুটে গেল রমণীমোহনের । মলয়ের চোখে মুখে এবং কণ্ঠস্বরে এমন কিছু রয়েছে যাতে ভয়ানক চমকে উঠল সে। পরক্ষণেই দেখা গেল তার ময়দার তালের মতো গোলাকার শরীরটা বিদ্যুৎ-গতিতে গড়াতে-গড়াতে সামনের লন, গেট ইত্যাদি পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছয়

সেদিনের সেই ঘটনাটার পর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে মলয়ের। যে উদ্দেশ্যে উমানাথ রমণীমোহনকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন সে ব্যাপারে তার পক্ষে কিছু করা একেবারেই অসম্ভব। উমানাথ যা-যা চাইছেন, সেসব করলে সৎ অফিসার হিসেবে তার সুনাম বা মর্যাদার ওপর ক'পোঁচ কালি পড়বে, সে সম্বন্ধে মলয় খুবই সচেতন। কেরিয়ারের শুরুতেই দুর্নাম বা অসম্মানের শিকার সে হতে চায় না। তা ছাড়া নিরঙ্কুশ 'রুল অফ ল' বা আইনের শাসন চালু করতেই তার বিবিবাজারে আসা। এ-ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে সে অঙ্গীকারবদ্ধ।

অবশ্য উমানাথের অনুরোধ না মানার ফলটা তার নিজের জীবনে ভালো না-ও হতে পারে।

এই কারণে তার এবং শর্মিলার মধ্যে দূরত্ব হয়তো আরও বেড়ে যাবে। বিষণ্ণ হওয়া ছাড়া এ-নিয়ে মলয়ের আর কিছু করার নেই আপাতত।

রমণীমোহন সেদিন যে পালিয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। উমানাথ অন্য কোনও দূতও পাঠাননি বা কোনওভাবে যোগাযোগের চেষ্টাও করেননি।

এদিকে আইন অনুযায়ী লালকু এবং তার গ্যাংটাকে কোর্টে চালান করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জখম, খুনের চেষ্টা, বে-আইনি অস্ত্র রাখা, ওয়াগন ভাঙা, ইত্যাদি দশ বারো রকমের চার্জ দেওয়া হয়েছে। কোর্ট তদন্তের কারণে লালকুদের একমাসের জন্য জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

ওধারে যত দিন যাচ্ছে, বাজারের ইলেকশান টেম্পো ততই চড়ছে। নির্বাচনের সময় যাতে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে না পড়ে সেজন্য কলকাতায় গিয়ে একস্ট্রা ফোর্সের ব্যবস্থা করে রেখেছে মলয়। ফোন করলে এক ঘণ্টার ভেতর তারা বিবিবাজারে পৌঁছে যাবে। তা ছাড়া ডিএসপি এবং স্থানীয় ওসি-দের নিয়ে ঘন-ঘন মিটিংও করছে সে। শহরের যে-জায়গগুলো খুবই 'সেনসিটিভ' সেখানে নজর রাখা হচ্ছে।

আজ মাঝ রাত্তিরে যখন মলয় গভীর ঘুমে ডুবে আছে সেইসময় হঠাৎ মায়ের গলা আবছাভাবে কানে এল, 'হারু, হারু—'

ধড়মড় করে উঠে বসে মলয় দেখল, ঘরে আলো জ্বলছে। মা এবং আলো খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে সে বলল, 'কী হয়েছে মা?'

মা উদ্বেগের গলায় বলল, 'থানা থেকে কারা সব এসেছে। কী নাকি হয়েছে! তোকে দরকার। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে তো আমার ভয়ই করছে।'

এত রাতে ডিএসপি বা থানার লোকেরা আগে আর কখনও তাদের বাংলোতে আসেনি। কী ব্যাপারে বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে-ভেতরে উদ্বেগ বোধ করলেও বাইরে তা ফুটে উঠতে দিল না মলয়। মাকে ভরসা দিয়ে বলল, 'কীসের ভয়? কোনও চিন্তা নেই।' তারপর সোজা ড্রইং রুমে চলে এল। দেখা গেল ডিএসপি রূপক ব্যানার্জি, প্রশান্ত এবং রূপাপুর থানার ওসি সুবিমল বসু বসে আছে। তাদের বসতে বলে মলয় জিগ্যেস করল, 'এত রাতে আপনারা? কী হয়েছে?'

সবার প্রতিনিধি হিসেবে ডিএসপি রূপক ব্যানার্জি মাঝ রাতে মলয়ের ঘুম ভাঙাবার জন্য প্রথমে কুণ্ঠিতভাবে ক্ষমা চাইল। জানাল নিরুপায় হয়েই তাদের আসতে হয়েছে। তারপর সোজা কাজের কথায় চলে এল। রূপাপুরের গঙ্গার ঘাটের দু ফার্লং দূরে যে ঝুপসি বটগাছ রয়েছে, কিছুক্ষণ আগে সেটার তলা থেকে স্মাগলারদের একটা দল ছোট লঞ্চে করে ক্যালকাটা পোর্টের দিকে গেছে। খিদিরপুর ডকের কাছে এখন অনেক জাহাজের ভিড়। তা ছাড়া আজ অমাবস্যার রাত, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার ওপর আকাশে ডিপ্রেশানের কারণে অসময়ের মেঘও জমেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে গাঢ় অন্ধকারে অগুনতি জাহাজের কোনও একটা থেকে গোপনে মাল সরানো খুব দুরূহ কাজ নয়, যদি জাহাজের ক্রু বা অন্য অফিসারদের যোগসাজস থাকে। আন্দাজ করা যায়, যে-স্মাগলাররা একটু আগে পোর্টের দিকে গেছে তারা অসংখ্য জাহাজের কোনও একটার ক্রু-ট্রুদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আগে থেকে ষড়যন্ত্র করেছে।

শুনতে-শুনতে শিরদাঁড়া টান-টান হয়ে গেল মলয়ের। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'গ্যাংটাকে আপনারা চলে যেতে দিলেন? ওদের ফলো করার কোনও ব্যবস্থা করলেন না?'

রূপক বলল, 'করেছি স্যার। একজন সাব ইন্সপেক্টরকে ক'জন আর্মড পুলিশ দিয়ে ওদের পেছনে পাঠিয়েছি।'

'পোর্ট পুলিশকে অ্যালার্ট করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'রূপাপুরের গঙ্গার ধার থেকে যখন লঞ্চে উঠেছে তখন মনে হচ্ছে স্মাগলারদের গ্যাংটা এদিকেরই হবে।'

'সার্টেনলি স্যার।'

'ওদের কাউকে চিনতে পেরেছেন?'

'না। যা অন্ধকার; তার ওপর লঞ্চের লাইট-টাইটও জ্বালায়নি। চেনা অসম্ভব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রূপকই আবার বলল, 'স্যার, আমার ধারণা গ্যাংটা হেভিলি আর্মড। যদি টের পায় আমরা ফলো করছি, একটা ভয়ঙ্কর এনকাউন্টার হয়ে যেতে পারে।'

মলয় বলল, 'তা তো পারেই।'

'আমি ইনস্ট্রাকশান দিয়েছি স্মাগলারদের লঞ্চটা এক সেকেন্ডের জন্যে যেন চোখের আড়ালে না যেতে পারে। জাহাজ থেকে মাল সরিয়ে ওরা কোথায় যায় আগাগোড়া যেন ওয়াচ রাখা হয়। তারপরেই আপনার কাছে চলে এসেছি। এখন আপনি যেমন অ্যাডভাইস করবেন সেইরকম ব্যবস্থা করা হবে।'

'আপনি ঠিক ইনস্ট্রাকশানই দিয়েছেন মিস্টার ব্যানার্জি। তবে এত বড় একটা মারাত্মক গ্যাং; আরও রেসপনসিবল অফিসার সঙ্গে যাওয়া উচিত। অন্য কোনও লঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যাবে?'

'যাবে স্যার। পোর্ট পুলিশের কাছে দুটো লঞ্চ চেয়েছিলাম। রূপাপুরের জেটিতে এখনও একটা দাঁড়িয়ে আছে। ক'জন পুলিশও রয়েছে ওটাতে।'

'গুড। পাঁচ মিনিট বসুন। আমি পোশাক বদলে আসছি।' বলে উঠে দাঁড়াল মলয়।

'আপনি যাবেন স্যার!'

'নিশ্চয়ই। এতবড় একটা অপারেশনে পার্টিসিপেট করব না?'

ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই জিপে করে মলয়রা বেরিয়ে পড়ল। এত রাতে রাস্তা ফাঁকা থাকায় রূপাপুরে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না।

ছোট জেটির একধারে ছোট লঞ্চটা দাঁড়িয়ে ছিল। জিপ থেকে সবাই লঞ্চে উঠল। লঞ্চটার এধারে-ওধারে ক'টা মিটমিটে আলো জ্বলছিল।

ডেকের ওপর বেঞ্চে বারো-চোদ্দজন আর্মড পুলিশ বসে আছে। সবার হাতে রাইফেল। এসপি, ডিএসপি-দের মতো বিরাট অফিসারদের দেখে তটস্থ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে তারা স্যালুট করল।

এক মুহূর্ত কী ভেবে মলয় বলল, 'আগের লঞ্চটায় ক'জন আর্মড পুলিশ আছে?'

সুবিমল বলল, 'ষোল জন।'

মলয় বলল, 'যথেষ্ট। এক কাজ করা যাক, এদের ছ-সাত জন আমাদের সঙ্গে যাক। বাকি সবাই বটগাছতলায় গিয়ে ওয়েট করুক। প্রশান্তবাবু ওদের সঙ্গে থাক। আমার ধারণা, গ্যাংটা যদি এদিকের হয়, এখানে ফিরে আসতে পারে।' সুবিমলের দিকে ফিরে বলল, 'জিপ নিয়ে আপনি ওখানে রেডি থাকবেন। বলা যায় না, 'চেজ' করতে হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই স্যার।' সুবিমল ক'জন আর্মড পুলিশ সঙ্গে করে নেমে গেল।

লঞ্চের মাল্লারা একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। মলয় তাদের দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, 'সারেং কে?'

'হুজুর আমি—' পাকানো চেহারার মধ্যবয়সি একটি লোক সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। তার মাংসহীন থুতনিতে এক গোছা দাড়ি, মাথায় টুপি, মাঝারি সতর্ক চোখে সুর্মার টান। পরনে

ডোরাকাটা লুঙ্গি আর কুর্তা।

'কী নাম তোমার?'

'জয়নাল হুজুর।'

'আগের লঞ্চটা যেদিকে গেছে আমাদের সেদিকে যেতে হবে। তার আগে বাতিগুলো নিভিয়ে দিতে হবে। এতটুকু আওয়াজ যেন না হয়। অন্ধকারে লঞ্চটাকে খুঁজে বার করতে পারবে তো?' মলয় জানে, পুলিশের লঞ্চটাকে পাওয়া গেলে স্মাগলারদের বোটটাকেও যে পাওয়া যাবে, এ একেবারে অবধারিত।

জয়নাল জানাল, বেশখ পারবে। তার পেঁচার চোখ। অন্ধকারে দু-মাইল দূরের পোকাটা পর্যন্ত তার নজর আসে। শুধু পুলিশের লঞ্চটা না, তার আগে দুশমনদের যে বোটটা গেছে সেটাও সে হুজুরের জন্য খুঁজে বার করবে। মাটিতে ছুঁচ পড়লে যে শব্দ হয় তেমন শব্দও হবে না।

'বহুত আচ্ছা। এখন স্টার্ট দাও।'

একটু পরেই লঞ্চের আলোগুলো নিভে গেল।

জয়নাল লঞ্চে স্টার্ট দিল।

সে যা বলেছিল ঠিক তাই। একটা বড় জলপোকার মতো জলের ওপর আলতোভাবে ভাসতে-ভাসতে লঞ্চটা পোর্টের দিকে এগিয়ে চলেছে। মলয়রা রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সুবিমল একটা দূরবীন দিয়ে এসেছিল; সেটা এখন মলয়ের হাতে।

অন্ধকার এত গাঢ় যে তা ভেদ করে নজর চলে না। দূরবীনে যা চোখে পড়ছে তা স্পষ্ট কিছু নয়। মাঝে-মাঝে দু-একটা টিমটিমে আলোর ফুটকি দেখা যায় কি যায় না। অনেক দূরে হাওড়া ব্রিজটাকে প্রাগৈতিহাসিক কোনও জন্তুর কঙ্কাল মনে হয়।

গঙ্গায় বা তার দু-ধারে যদিও আবছা আঁচড়ের মতো কিছু চোখে পড়ে, মাথার ওপর এই মুহূর্তে চেনা আকাশটাকে একেবারেই চেনা যায় না। আজ আর তারা ফোটেনি। ঘন আলকাতরার পোঁচ দিয়ে সেটা আগাগোড়া কেউ লেপে রেখেছে।

ঘণ্টখানেক বাদে আচমকা পাশ থেকে জয়নালের চাপা গলা ফিসফিসিয়ে উঠল, 'হুজুর, ওই যে আমাদের আগের লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে। লেকেন দুশমনদের বোটটা দেখতে পাচ্ছি না।'

ঘাড় ফিরিয়ে মলয় বলল, 'আমাদের লঞ্চটা ওই লঞ্চটার কাছে নিয়ে যাও।'

'জি—'

পাঁচ মিনিটও লাগল না, মলয়দের লঞ্চ আগের লঞ্চটার গায়ে গিয়ে ভিড়ল। সত্যিই পেঁচার চোখ জয়নালের।

সঙ্গে-সঙ্গে সামনের লঞ্চটা থেকে তীব্র চাপা গলায় কেউ বলে উঠল, 'হু আর ইউ?'

সুবিমল বলল, 'আমরা অমল। এসপি আর ডিএসপি সাহেবও আমাদের সঙ্গে এসেছেন।' অমল রূপাপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর।

অন্ধকারেও টের পাওয়া গেল গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে অমলরা স্যালুট করল।

মলয় বলল, 'আপনারা এখানে লঞ্চ থামিয়ে দিয়েছেন! স্মাগলারদের বোটটা কোথায়?' তার গলার স্বরে দুশ্চিন্তার ছাপ রয়েছে।

'ওই যে স্যার জাহাজটা, তার গায়ে সেঁটে রয়েছে।' দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হয়তো কোনও একদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল অমল।

চোখ এতক্ষণে অনেকটা সয়ে এসেছে। মলয়ের নজরে পড়ল, খানিক দূরে পঁচিশ তিরিশটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। তবে বেশির ভাগেরই ভেতরে আলো-টালো জ্বলছে না। শুধু অনেক উঁচুতে মাস্তুলের মাথায় লাল-নীল আলো দেখা যাচ্ছে।

এর ভেতর কোন জাহাজটার গায়ে স্মাগলারদের বোট সেঁটে আছে বোঝা যায় না। মলয়

জিগ্যেস করল, 'কোন জাহাজটার গায়ে?'

অমল বলল, 'ওই যে স্যার, ডান দিক থেকে ফোর্থ।'

তবু ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। জয়নালের মতো অমলেরও পেঁচার চোখ হয়তো। মলয় বলল, 'পোর্ট পুলিশকে দেখেছেন?'

অমল বলল, 'না স্যার, অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। জাহাজের ওধারে ওরা থাকতে পারে।' একটু থেমে বলল, 'তবে বুঝতে পারছি, জাহাজের ওপর থেকে দড়িতে বেঁধে বোটে মাল নামানো হচ্ছে। স্যার, এখন কি চার্জ করব?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মলয় বলল, 'এখন থাক। আওয়াজ টাওয়াজ করলে নির্ঘাত ওরা জলে লাফিয়ে পড়বে। এই অন্ধকারে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওয়েট করতে থাকুন।'

কে যেন বলল, 'ঠিক বলেছেন স্যার।'

মলয় বলল, 'আমি একেবারে রুটসুদ্ধু ধরতে চাই। এই গ্যাংয়ের লোকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট মাত্র। আসল লোকটা কে, তা জানতে না পারলে এখানে স্মাগলিং বন্ধ করা যাবে না।'

'রাইট স্যার—' লঞ্চের অন্য সবাই একসঙ্গে সায় দিল।

আরও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ জয়নাল বলল, 'হুজুর, দুশমনদের বোটটা ফিরে যাচ্ছে।' সামনের লঞ্চ থেকে একই কথা বলল অমল।

এত বড় অপারেশন আগে আর কখনও করেনি মলয়। উত্তেজনায় তার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর শ্বাস আটকে-আটকে আসছিল। সে অমলদের ডানদিকে ঘুরে ওধার থেকে স্মাগলারদের বোটটার ওপর নজর রেখে এগুতে বলল। আর তারা যাবে বোটটার এ পাশ দিয়ে। অর্থাৎ দু-দিক থেকেই ওয়াচ রাখা হবে।

'স্মাগলারদের বোটেও আলো নেই; চাকার জল কাটার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। দু-ধারে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে-দূরে থেকে দুটো লঞ্চ একই গতিতে এগিয়ে চলেছে।

সাত

মলয় বা ভেবেছিল হুবহু তা মিলে গেল। স্মাগলারদের বোটটা রূপাপুরের কাছে সেই বিশাল বটগাছটার তলায় এসে থামল। প্রায় একই সঙ্গে অমলদের লঞ্চ একশো গজ পেছনে থামল আর মলয়ের নির্দেশে তাদের লঞ্চটা সামনের দিকে ষাট সত্তর গজ দূরে ভিড়ল।

স্মাগলারদের বোটের লোকগুলো নিঃশব্দে নীচে নেমে মালপত্র তুলে ওপরে রাস্তায় উঠে আসতেই দেখা গেল একটা মাঝারি ট্রাক কোত্থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ক্ষিপ্র হাতে ওরা মালগুলো ট্রাকে তুলতে লাগল।

ততক্ষণে সামনের এবং পেছনের বোট দুটো থেকে মলয় এবং অমলরা আর্মর্ড ফোর্স নিয়ে নেমে পড়েছে। কিন্তু কেউ রাস্তায় উঠল না। রাস্তা থেকে পাড়ের যে ঢাল গঙ্গায় নেমে গেছে সেখানে ঝোপঝাড়ের ভেতর বসে রইল।

আরও কিছুক্ষণ পর যখন খুব আস্তে বুকে হেঁটে-হেঁটে ট্রাকটা দূরের বাঁকের দিকে এগিয়ে গেছে সেই সময় বটগাছের আড়াল থেকে চারটে জিপ বেরিয়ে এল। তার প্রথমটায় বসে আছে প্রশান্ত। এদিকে ঢালু পাড় থেকে উঠে এসেছে মলয়রা। প্রশান্ত ব্যস্তভাবে বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন স্যার। ট্রাকটা বেরিয়ে যাচ্ছে।'

মলয় রূপক আর সুবিমলকে নিয়ে প্রশান্তর জিপে উঠে আর্মড পুলিশদের পেছনের জিপগুলোতে উঠতে বলল। সবাই উঠে বসতে না বসতেই গাড়িগুলো এগিয়ে চলল।

চারটে জিপ দেখে একটু অবাক হয়েছিল মলয়। প্রশান্তকে বলল, 'আমরা যখন পোর্টের দিকে যাই একটা জিপ ছিল। এতগুলো গাড়ি কোত্থেকে এল?'

প্রশান্ত জানাল, যদি স্মাগলাররা ফিরে আসে এবং তাদের 'চেজ' করার দরকার হয়, একটা জিপে তো হবে না। আর্মড পুলিশ, এসপি, ডিএসপি, দুজন ওসি ইত্যাদি এতগুলো লোকের জন্য আরও গাড়ি-টাড়ির দরকার। তাই থানা থেকে আরও তিনটে জিপ আনিয়ে উঁচু-উঁচু ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল।

ট্রাকটা আগে-আগে চলেছে। দু-আড়াই শো গজ পেছনে চারটে জিপ প্রায় নিঃশব্দে সেটাকে যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তায় অনেকগুলো বাঁক ঘুরে একসময় ট্রাকটা বিরাট কমপাউন্ডওলা একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। গাঢ় অন্ধকারেও বোঝা যায়, ভেতরে বিরাট বিল্ডিং ছাড়াও লম্বা-লম্বা কয়েকটা শেড রয়েছে। মলয়দের জিপগুলো কাছাকাছি চলে আসার আগেই নিরেট লোহার পাতের মজবুত গেট বন্ধ হয়ে গেল।

এ বাড়িটা রূপাপুর এবং বিবিবাজারের মাঝামাঝি জায়গায়।

জিপ থেকে সবাই নেমে পড়েছিল। প্রশান্তরা জানতে চাইল, ইঁদুরগুলো তো গর্তে ঢুকেছে। এখন তারা কী স্ট্রাটেজি নেবে?

মলয় বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। দূর থেকেও বোঝা যায় দোতলার দুটো ঘরে আলো জ্বলছে। ঘুলঘুলি এবং বন্ধ জানলার ফাঁকে তারই আভাস।

মলয় বলল, 'এ-অঞ্চলে স্মাগলারদের ঘাঁটি তা হলে এটাই। বাড়িটা কার জানেন?'

প্রশান্তরা জানাল, তারা জানে না।

মলয় বলল, 'এ-সম্বন্ধে কালই খোঁজ নেবেন। আমাদের সঙ্গে ক'জন আর্মড কনস্টেবল আছে?'

মনে-মনে হিসেব করে সুবিমল বলল, 'একত্রিশ জন।'

'গোটা বাড়িটা কর্ডন করতে হবে। মিস্টার সরকার আর আপনি পঁচিশ জনকে নিয়ে যান। এমনভাবে কনস্টেবলরা পজিশান নেবে কোনওদিক দিয়ে ক্রিমিনালগুলো যাতে পালাতে না পারে। আপনারা দুজনে বাড়ির পেছন দিকের দায়িত্ব নিন। সামনের দিকে ছ'জন কনস্টেবল নিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি আর আমি থাকব। খুব অ্যালার্ট থাকবেন। দশ মিনিটের ভেতর সবাই পজিশান নেবেন।'

প্রশান্তরা চলে গেল। ঠিক দশ মিনিট বাদে মলয়ের নির্দেশে একটা কনস্টেবল দরজায় জোরে ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'দরবাজা খুলো—'

ঘুলঘুলির ফাঁকে যে আলো দেখা যাচ্ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে নিভে গেল।

কনস্টেবলটা সমানে ধাক্কা দিতে-দিতে চিৎকার করে যাচ্ছে। তার সঙ্গে অন্য কনস্টেবলরাও ধাক্কাধাক্কি শুরু করল কিন্তু ভেতর থেকে সাড়া আসছে না। এবার মলয় চিৎকার করে উঠল, 'তিন মিনিটের মধ্যে দরজা না খুললে ভেঙে ফেলা হবে। ভেতরে যারা আছ, পালাবার চেষ্টা করবে না, পুলিশ চারিদিকে কর্ডন করে রয়েছে।'

তিন মিনিট কাটবার পরও দরজা খোলার লক্ষণ নেই। তখন সবাই প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে তো লাগলই, সেই সঙ্গে বুটের লাথিও পড়তে লাগল, কিন্তু গেটটা এতই মজবুত যে আধ ইঞ্চিও নড়ানো গেল না।

মলয় কনস্টেবলদের থামিয়ে দুটো জিপের ড্রাইভারকে বলল, 'আপনারা স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দরজার দুটো পাল্লায় ধাক্কা মারুন।'

এবার কাজ হল। জোড়া জিপের ধাক্কায় কবজা খুলে গেটটা ছিটকে পড়ল আর তার হাঁ-মুখ দিয়ে সবাই ভেতরে ঢুকতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে সামনের দোতলা থেকে এক ঝাঁক গুলি হাওয়া কেটে হিস-হিস করে বেরিয়ে গেল।

মলয় দ্রুত মাটিতে শুয়ে চাপা গলায় সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'লাই ডাউন—সবাই শুয়ে পড়ুন।' ভেতরে প্রচুর বড়-বড় গাছ, বাগান ইত্যাদি। সেসব দেখিয়ে বলতে লাগল, 'গাছের আড়ালে থেকে বুকে হেঁটে-হেঁটে এগুতে থাকুন।'

বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, সবাই এক-একটা গাছের পেছনে পজিশান নিয়েছে। এবার চেঁচিয়ে মলয় বলল,'যারা ভেতরে আছ, সারেন্ডার করো। নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব।'

তার কথা শেষ হতে-না-হতেই বাড়িটা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি উড়ে আসতে লাগল; সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ করে হ্যান্ড গ্রেনেড ফাটছে।

মলয় কনস্টেবলদের উদ্দেশে হুকুমের সুরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফায়ার।'

কনস্টেবলদের রাইফেলগুলোর মুখ থেকে বুলেট ছুটতে লাগল। পেছন দিক থেকেও গুলি এবং গ্রেনেডের আওয়াজ আসছে। খুব সম্ভব স্মাগলাররা ওদিক দিয়ে পালাতে গিয়ে গুলি-টুলি ছুড়ছে। প্রশান্ত সুবিমল এবং তাদের আর্মড ফোর্স রাইফেলের মুখে তার জবাব দিচ্ছে।

অন্ধকারে পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না; টার্গেট ঠিক নেই। অন্ধের মতো মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাতকে ছিঁড়েখুঁড়ে একটানা ঘণ্টা খানেক দু-পক্ষ গুলি আর বোমা চালিয়ে গেল।

এখন রাত তিনটে সাড়ে-তিনটের মতো বাজে। এক মুহূর্তের জন্যও বোমা এবং গুলি থামছে না।

হঠাৎ একসময় একটা কনস্টেবল বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মর গিয়া।' পরক্ষণেই বাড়ির ভেতর থেকে একই রকম করুণ আর্তনাদ ভেসে এল, 'মরে গেলাম।'

বোঝা গেল ওদের গায়ে বুলেট লেগেছে।

কনস্টেবলকে জিপে করে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তার রাইফেলটা নিয়ে ফায়ার করতে শুরু করল মলয়। কিন্তু ওরা যেখানে পজিশান নিয়েছে সেখান থেকে দোতলা বিল্ডিংয়ের দূরত্ব কম করে বিশ পঁচিশ গজ। যেভাবেই হোক, বাড়িটার ভেতর তাদের ঢুকতেই হবে। মলয় চাপা গলায় বলল, 'সবাই খুব সাবধানে মাঝখানের স্পেসটা ক্রস করে-করে বাড়িটার দিকে চলুন।'

বুক টেনে-টেনে আবার ওরা এগুতে লাগল। গুলি সমানে চলছেই। মলয়দের ডান হাতের তর্জনীগুলো অনবরত ট্রিগার টিপে যাচ্ছে।

ওরা যখন দশ গজের মধ্যে এসে গেছে তখন বাড়ির ভেতরে আবার চার-পাঁচজনের প্রাণ ফাটানো চিৎকার শোনা গেল। অর্থাৎ আরও ক'জন জখম বা একেবারে শেষ হয়েছে। ওদের আর্ত কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই মলয় টের পেল, তার ডান কাঁধের মাংসের ভেতর দিয়ে আগুনের হালকার মতো কিছু একটা ঢুকে বেরিয়ে গেল। বাঁ-হাতটা কোনও স্বয়ংক্রিয় নিয়মে ডান কাঁধে চলে এল। টের পাওয়া গেল, গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।'

মলয় একজন কনস্টেবলকে বলল, 'আমার ডান পকেটে একটা রুমাল আছে, ওটা বার করে ডান কাঁধটা শক্ত করে বেঁধে দাও।'

কনস্টেবলটা বাঙালি। উদ্বিগ্ন সুরে বলল, 'কী হল স্যার, গুলিটুলি লেগেছে?'

'মনে হচ্ছে।'

রুমাল বাঁধতে-বাঁধতে কনস্টেবল বলল, 'স্যার, ভীষণ রক্ত পড়ছে; আপনার হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

মলয় বলল, 'নার্ভাস হবেন না। নট এ ভেরি সিরিয়াস ইনজুরি। অপারেশনটা কমপ্লিট হওয়ার পর হাসপাতালে যাব।'

আরও কয়েক মিনিট পর ভেতর থেকে গুলি বা বোমা আগের মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে আর আসছে না। একসময় কমতে-কমতে সেগুলো একেবারেই থেমে গেল।

ভোর হওয়ার মুখে স্মাগলারদের দলটা যখন সারেন্ডার করল তখন কাঁধ থেকে স্রোতের মতো রক্ত পড়ে-পড়ে মলয় বেহুঁশ হয়ে গেছে। চেতনা পুরোপুরি অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আগে সে জানতে পেরেছে, তাকে বাদ দিলে আরও পাঁচজন কনস্টেবল আর সুবিমলের গায়ে গুলি লেগেছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা খুবই সিরিয়াস। স্মাগলারদের তিনজন মারা গেছে। সাতজন কমবেশি জখম। আর জেনেছে, এই গ্যাংটার লিডার হচ্ছে ঝন্টে।

যেটা মলয় বেহুঁশ থাকার সময় জানতে পারেনি তা হল, ওই বিশাল বাড়িটা থেকেই জিপে করে তাকে কলকাতার পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আট

দিন পাঁচেক হাসপাতালে থাকার পর মলয়কে আজ রিলিজ করে দেওয়া হল। প্রচুর রক্তপাতের কারণে শরীরটা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। এখন অন্তত দিন পনেরো তাকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর স্বাভাবিক ডিউটি শুরু করতে পারে।

বিবিবাজারের বাংলোতে মলয় যখন ফিরে এল তখন বিকেল। রুমা আর আলোর কাঁধে দু-হাত রেখে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মা-ও সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে। নীলু নেই; পাঁচদিন পর আজ সে কলেজে গেছে।

এ ক'দিন বাড়ির কেউ ঘুমোতে পারেনি; স্নান খাওয়ার কারও ঠিক ছিল না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মা, রুমা, আলো আর নীলু পুলিশ হাসপাতালে পড়ে থাকত।

মা বলল, 'তুই এই সর্বনাশা কাজ ছেড়ে দে হারু। গুলিটা কাঁধে না লেগে যদি অন্য কোথাও লাগত?'

মলয় বলল, 'লাগত না। তোমার আশীর্বাদ রয়েছে না?'

'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। তুই এই বিপদের কাজ ছেড়ে দিবি।'

'আচ্ছা, পরে সে সব ভাবা যাবে।' মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিল মলয়। একটু পর রুমারাও চলে গেল।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপচাপ বিশ্রাম করা গেল না। ফোনের পর ফোন আসতে লাগল। বিরাট স্মাগলারদের গ্যাংটা ধরবার জন্য আইজি, ডিআইজি, হোম সেক্রেটারি ছাড়াও অন্যান্য আইপিএস বন্ধুরা তাকে অভিনন্দন জানালেন। মলয় আহত হওয়ার জন্য তাঁরা যে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন সে-কথা জানিয়ে বললেন, তার সুস্থ হওয়ার খবরে আন্তরিক স্বস্তি বোধ করছেন। মলয় সবাইকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাল।

এই সব অভিনন্দন-টভিনন্দনের পালা চুকতে-চুকতে সন্ধে পেরিয়ে গেল।

রাত আটটা নাগাদ প্রশান্ত ফোন করল। প্রথমে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মলয়ের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর বলল, 'স্যার, একটা মারাত্মক নিউজ আছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বলে একটা কথা আছে না; এ ঠিক তাই।'

মলয় বলল, 'কী নিউজ?'

'যেখানে স্মাগলারদের সঙ্গে আমাদের এনকাউন্টার হয়েছিল আপনি সেই বাড়িটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিলেন।'

মলয়ের মনে পড়ে গেল। সে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলাম। খোঁজ নিয়েছেন?'

'নিয়েছি স্যার। পাঁচ দিন এখানে-ওখানে, নানা সরকারি দপ্তরে ছোটাছুটির পর আজ বিকেলে একটা ট্রিমেন্ডাস ডিসকভারি হল। বাড়িটার মালিকের নাম আমরা জানতে পেরেছি। ঝন্টে আর তার গ্যাংটার বিরুদ্ধে যে কেস উঠেছে তাতে এই ইনফরমেশনটা একটা ভাইটাল রোল প্লে করবে।'

দারুণ আগ্রহে মলয় জিগ্যেস করল, 'বাড়িটার মালিক কে?'

প্রশান্ত বলল, 'উমানাথ ঘোষাল। কিছুদিন হল উনি বাড়িটা কিনেছেন।'

হৃৎপিণ্ডের শব্দ কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল মলয়ের। অনেক রাজনৈতিক নেতার মতো অ্যান্টিসোশালদের কাঁধে ভর দিয়ে উমানাথ নির্বাচন তরে যেতে চান। আজকাল এটাই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক এবং গর্হিত, তবু আজকাল ব্যাপারটা একরকম মেনেই নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নিজের বাড়িতে স্মাগলারদের ঘাঁটি করতে দেওয়া আইনের চোখে মারাত্মক ব্যাপার। তার ওপর যিনি জনপ্রতিনিধি হতে চলেছেন তাঁর ব্যাকগ্রাউন্ড যদি এই হয়, দেশ কোন অন্ধকারে ডুবে যাবে, ভাবতেও দম বন্ধ হয়ে আসে। কিছুটা উত্তেজিত ভঙ্গিতেই মলয় বলল, 'কোর্টে এটা প্রমাণ করা যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই যাবে স্যার।' গলায় বেশ জোর দিয়ে প্রশান্ত বলল, 'আমি সব রেকর্ড জোগাড় করে রেখেছি। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যার ভেতর দিয়ে উমানাথ ঘোষাল গায়ের চামড়া বাঁচিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।' একটু থেমে প্রবল উৎসাহে গলার স্বর এক পরদা উঁচুতে তুলে বলতে লাগল, 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে উমানাথ সম্পর্কে আরেকটা সাঙঘাতিক ইনফরমেশন পাওয়া গেছে।'

'কী ইনফরমেশন?'

'লোকটা নাকি পনেরো-কুড়ি বছর ধরে স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িত। স্টিভেডরি করার জন্যে এ-ব্যাপারে তার অনেক সুবিধা হয়েছে। আগে ঘোষালের বেস অফ অপারেশন ছিল কলকাতায়। রিসেন্টলি শিফট করে এদিকে নিয়ে এসেছে। ক্যালকাটা পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ঘোষালকে ধরতে পারেনি। এবার মক্কেলকে বাগে পাওয়া গেছে, শুধু খেলিয়ে তুলতে হবে। এইরকম একটা হারামজাদা আবার ইলেকশানে নামতে চাইছে! দিনকাল যা হয়েছে!' এক নাগাড়ে বলে যেতে লাগল প্রশান্ত।

উমানাথ সম্পর্কে নতুন এই তথ্যটা জানার সঙ্গে-সঙ্গে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মলয়। সে কোনও উত্তর দিল না।

হঠাৎ গলার স্বর পালটে অত্যন্ত বিব্রত ভঙ্গিতে প্রশান্ত এবার বলল, 'অপরাধ যদি না নেন, একটা কথা বলব স্যার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না—'

'রিসেন্টলি আমি এক জায়গায় শুনলাম উমানাথ ঘোষালদের সঙ্গে আপনাদের নাকি একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হতে যাচ্ছে—' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল প্রশান্ত।

বোঝাই যাচ্ছে, শর্মিলা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই জেনেছে প্রশান্ত কিন্তু সোজাসুজি তা বলা অভদ্রতা। তা ছাড়া সুপিরিয়র অফিসারকে এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করার সাহস প্রশান্তর নেই। তাই ঘুরিয়ে ওভাবে বলেছে।

প্রশান্তর কথায় সূক্ষ্ম অস্বস্তিকর একটা ইঙ্গিত আছে। শর্মিলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে বলে উমানাথ সম্পর্কে মলয় কতটা কঠোর হতে পারবে, হয়তো সে ব্যাপারে কিছু সংশয় আছে প্রশান্তর। নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল মলয়ের। মনে হল হুড়-হুড় করে রক্তচাপ নেমে গিয়ে তাকে খুবই অসুস্থ আর দুর্বল করে ফেলেছে। তবু যতটা সম্ভব গলার স্বর চড়িয়ে মলয় বলল, 'এ-নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আইন তার নিজের কাজ করে যাবে। এ-ব্যাপারে কোনও কম্প্রোমাইজ নেই। আমার শরীর ভালো নেই। ফোন রাখছি।' বলেই লাইন কেটে দিল মলয়।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ নির্জীবের মতো চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে পড়ে রইল মলয়। সে বুঝতে পারছে, ক্রমশ তার কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে শর্মিলা। অদ্ভুত এক

বিষণ্ণতা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে লাগল যেন।

কিন্তু আজকের দিনটার মতো জঘন্য দিন মলয়ের জীবনে খুব কমই এসেছে। আবার ফোন বেজে উঠল। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে যে একটু বিশ্রাম করবে তার আর উপায় নেই।

হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে একটি উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'স্যার, ভালো আছেন? আমরা আপনার জন্যে কীরকম 'ওরিড' ছিলাম বলে বোঝাতে পারব না। মা কালীর অসীম করুণা যে মারাত্মক কোনও ক্ষতি হয়নি। জয় মা—'

এত বড় শুভাকাঙ্খীটা যে কে, গলা শুনে বোঝা যাচ্ছে না। মলয় জিগ্যেস করল, 'আপনি কে বলছেন?'

'অধমের নাম রমণীমোহন চট্টরাজ—সেই যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

মলয়ের কানের ভেতর বিগলিত কণ্ঠস্বর যেন ফোঁটায়-ফোঁটায় ঢুকতে লাগল। রমণীমোহন লোকটা সবসময় গলেই আছে। মলয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, রূঢ় ভঙ্গিতে বলল, 'কী চান আপনি?'

'আমি স্যার, কিছুই চাই না। কেমন আছেন, এটুকু। নিঃস্বার্থভাবে এটুকু জেনে নিয়ে আপনার কাছ থেকে একটা খবর জানতে চাইব।'

স্নায়ুগুলো প্রখর হয়ে উঠল মলয়ের। আগের স্বরেই জিগ্যেস করল, 'কী খবর? আগেই বলে রাখছি, স্মাগলারদের বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করবেন না।'

হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে রমণীমোহন বলল, 'না স্যার, ও-সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই।'

গলা নামিয়ে মলয় বলল, 'বলুন কী জানতে চাইছেন।'

'রাত্তিরে ক'টায় আপনি ঘুমোতে যান?'

এরকম একটা প্রশ্ন আশা করেনি মলয়। ভেতরে-ভেতরে সামান্য থতিয়ে গেল সে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'পুলিশের লোকদের ঘুমোবার ফিক্সড টাইম থাকে। তবে আমি আজই হাসপাতাল থেকে এসেছি। একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে-দেয়ে আজ ঘুমোব।'

'এখন আটটা পঁচিশ। দশটা পর্যন্ত কি স্যার জেগে থাকবেন?'

'থাকতে পারি। কেন বলুন তো?'

'একজন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। দশটার আগেই পৌঁছে যাবেন।'

'কে, কে আসবেন দেখা করতে?'

উত্তর পাওয়া গেল না। তার আগেই লাইন কেটে গেছে। এরপর অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটতে লাগল। তার দুর্বল শরীরের পক্ষে স্নায়বিক চাপ খুবই ক্ষতিকর। কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে উত্তেজনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে না।

আধঘণ্টা একটা দমবন্ধ অবস্থায় থাকার পর হঠাৎ মলয়ের মনে হল, কেউ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে-ছুটতে আসছে। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল রুমা। তাকে প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চাপা গলায় রুমা বলল, 'দাদা, উমানাথ ঘোষাল এসেছেন। ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

যদিও রমণীমোহন জানিয়েছিল কেউ আসবে কিন্তু সে যে উমানাথ, এ ছিল অভাবনীয়। কাঁধে যে বিরাট ব্যান্ডেজ রয়েছে সেটা একেবারে ভুলে গিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বসল মলয়। বলল, 'তুই উমানাথ ঘোষালকে চিনিস?' ব্যাপারটার তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।

'কি আশ্চর্য। ছোটবেলা থেকে কতবার দেখেছি। মাঝখানে শুধু ক'টা বছর দেখিনি। চিনতে পারব না?'

'আচ্ছা যাচ্ছি—'

ঘরের বাইরে আসতেই মলয় দেখল, মা আলো এবং নীলু রুমার মতোই দৌড়তে-দৌড়তে এদিকে আসছে। মা বলল, 'ঘোষাল মশাই প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন। মিষ্টি-টিষ্টি পাঠাব তো?'

দেখা যাচ্ছে উমানাথ পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ-বাড়িতে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। গম্ভীর মুখে মলয় বলল, 'কিছু পাঠাতে হবে না। উনি মেয়ের বিয়ের কথা পাকা করতে এ-বাড়িতে আসেননি।' বলতে-বলতে সোজা ড্রইংরুমে চলে গেল।

উমানাথ ঘোষাল একটা সোফায় একা চুপচাপ বসে ছিলেন। মলয়কে দেখে উঠবার চেষ্টা করতেই নীরস গলায় সে বলল, 'বসুন—' বলে তাঁর মুখোমুখি বসে পড়ল।

পাঁচ বছর পর উমানাথকে দেখল মলয়। চেহারা-টেহারা প্রায় আগের মতোই আছে। তবে চুল বেশ পেকে গেছে। যেটা সব চাইতে বেশি করে চোখে পড়ে, ভদ্রলোকের সেই ব্যক্তিত্ব আর নেই। মুখে কেমন যেন দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কের ছাপ। চুল উষ্কখুষ্ক। চোখের তলায় পুরু করে কালি জমেছে। মনে হয়, বেশ কিছুদিন উমানাথ ঘুমোননি।

গোটা ড্রইংরুম জুড়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর উমানাথই শুরু করলেন, 'তুমি আইপিএস হয়েছ। কী খুশি যে হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।'

মলয় উত্তর দিল না।

উমানাথ আবার বললেন, 'মাস দেড়েক হল, তুমি এখানে এসেছ। রোজই ভাবি আমাদের বাড়ি আসবে। রোজই হতাশ হই। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম, এ-জীবনে আইপিএস, আইএএস হতে পারবে না। আমি হেরে গেছি। এই ডিফিট আমার কাছে কত বড় আনন্দের—'

স্থির চোখে উমানাথকে লক্ষ করছিল মলয়। আচমকা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এ-সব আজেবাজে কথা থাক। হঠাৎ এত রাতে একজন পুলিশ অফিসারের বাড়ি আপনাকে ছুটে আসতে হয়েছে কেন সেটাই বলুন।'

উমানাথ হকচকিয়ে গেলেন। মলয় যে তাঁর সঙ্গে কড়া পুলিশ অফিসারদের মতো কথা বলবে, এতটা ভাবতে পারেননি। কাঁপা গলায় বললেন, 'তুমি বোধ হয় জানো আমি এবার ইলেকশানে নেমেছি।'

'জানি।'

'এদিকে ক'টা ছোকরা আমার একটা বাড়ি থেকে নাকি ধরা পড়েছে। শুনতে পাচ্ছি তারা স্মাগলার।'

'আপনি ভালো করেই জানেন তারা স্মাগলার আর আপনার বাড়ি থেকেই তাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর ওদের যে লিডার সেই ঝন্টে আপনার হয়ে ইলেকশানে খাটছে।'

ভীষণ দমে গেলেন উমানাথ। বললেন, 'কিন্তু আমি জানতাম না ঝন্টে একটা স্মাগলার।'

মলয় তাকিয়েই আছে। এরকম ভণ্ড মিথ্যেবাদী আগে আর দেখেনি। সে কোনও উত্তর দিল না।

উমানাথ বলতে লাগলেন, 'ঝন্টের ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে মলয়। কয়েক দিন পর ইলেকশান; আমি একেবারে রুইনড হয়ে যাব।'

এতক্ষণে আসল জায়গায় পৌঁছেছেন উমানাথ। মলয় বলল, 'কেসটা সাব-জুডিস। এ-বিষয়ে আমার পক্ষে মুখে খোলা অসম্ভব।'

চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল উমানাথের। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'কিন্তু বাবা, আমি যদি শেষ হয়ে যাই তোমার গায়েও তো তার আঁচ লাগবে। তোমার সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। শর্মিলার কথা ভেবে—' অন্ধের মতে হাত বাড়িয়ে মলয়ের একটা হাত আঁকড়ে ধরলেন উমানাথ।

মলয় আস্তে-আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিতে-নিতে কর্কশ গলায় বলল, 'আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক

হবে কিনা, আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আমি খুব অসুস্থ। আপনার আর কোনও কথা না থাকলে আমি উঠছি।'

মুহূর্তে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেন উমানাথ। শ্বাসরুদ্ধের মতো অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি। তারপর হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। টলতে-টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ পেছন থেকে গম্ভীর গলায় মলয় ডাকল, 'শুনুন—'

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন উমানাথ। ঘাড় ফিরিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'কিছু বলবে?'

'আপনি আমাকে একদিন সৎভাবে জীবনযাপন করতে বলেছিলেন। আশা করি আপনার তা মনে আছে। সেই উপদেশ অনুযায়ী আমি চলছি। ভবিষ্যতে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে আসবেন না।'

'আমি—আমি—' প্রায় ধসে পড়লেন উমানাথ। তারপর ঘুরে পা টেনে-টেনে সামনের 'লন' পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামলেন।

এদিকে উমানাথ চলে যেতেই মা রুমা আলো এবং নীলু ড্রইংরুমে ছুটে এল। তাদের চোখে মুখে অসীম কৌতূহল।

মা জিগ্যেস করল, 'কী জন্যে এসেছিলেন ঘোষাল মশাই?'

মলয় ভাসা-ভাসা উত্তর দিল, 'এই একটা দরকারে।'

'বিয়ের বিষয়ে কিছু কথা হল?'

'হয়েছে।'

গভীর আগ্রহে মা বলল, 'কী কথা রে?'

'বিয়েটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করে ফেললাম।' বিষণ্ণ হাসল মলয়।

বিমূঢ়ের মতো মা এবং রুমারা তাকিয়ে রইল।

আরও আধঘণ্টা বাদে খাওয়া-দাওয়া সেরে মলয় সবে তার ঘরে এসে শুয়েছে, কিন্তু ঘুমোয়নি। হাসপাতাল থেকে বাংলোয় ফেরার পর এমন সব উত্তেজক নাটকীয় ব্যাপার একের পর এক ঘটে গেছে যে স্নায়ুগুলো কষে-বাঁধা তারের মতো টান-টান হয়ে আছে। আজ খুব তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না।

রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে খানিকক্ষণ বই পড়ার অভ্যাস তার বহুদিনের। আজও বিভিন্ন দেশের টেরোরিস্টদের নিয়ে লেখা একটা দারুণ নামকরা বই হাতে করে শুয়েছে মলয় কিন্তু এক অক্ষরও তার মাথায় ঢুকছে না।

হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলতেই তার মনে হল, অবিশ্বাস্য কোনও স্বপ্ন দেখছে। দরজা পেরিয়ে মা এবং রুমার সঙ্গে শর্মিলা আসছে।

কত বছর পর শর্মিলাকে দেখল মলয়। হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য থমকে, পরক্ষণেই উদ্দাম গতিতে লাফাতে লাগল। তাকে দেখালে বুকের ভেতরটা যে এখনও এত আলোড়িত হয় সেটা আজই যেন প্রথম আবিষ্কার করল মলয়। নিজের অজান্তেই দ্রুত উঠে বসল সে।

ততক্ষণে মা আর রুমা শর্মিলাকে ঘরে এনে ওধারের একটা ডিভানে বসিয়েছে।

মা বলল, 'তোরা কথা বল। আমরা যাচ্ছি—' বলে রুমাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মায়ের মনোভাবটা বোঝা যায়। উমানাথের কারণে মলয় এবং শর্মিলার সম্পর্কটা যে জট পাকিয়ে গেছে সেটা টের পেয়েছে মা। নিজেদের মধ্যে কথা বলে তারা যাতে জটটা ছাড়িয়ে নিতে পারে তার সুযোগ করে দিয়ে গেল সে। মা খুবই সাদাসিধে মানুষ। কোথাও কোনও জটিলতা দেখলে

ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।

চোখ নামিয়ে বসে আছে শর্মিলা। আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে সে। কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে; চোখের নীচে আবছা কালির ছোপ। এই ক'বছরে তার ওপর দিয়ে যে একটা ঝড়ের মতো কিছু বয়ে গেছে সারা শরীরে তার স্থায়ী ছাপ পড়েছে।

কে বলবে এই মেয়েটিই পাঁচ বছর আগে কি আশ্চর্য প্রাণবন্তই না ছিল। তার সব সজীবতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। শর্মিলাকে দেখতে-দেখতে অসহ্য কষ্টে বুকের ভেতরটা মুচড়ে যেতে লাগল মলয়ের।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর শর্মিলা বলল, 'তোমার কাঁধে বুলেট লাগার খবর পেয়েছি। খুব চিন্তা হচ্ছিল। এখন কেমন আছ?'

আজ সারাদিনে অনেকেই তার খবর নিয়েছে। শুধু শর্মিলা বাদ। নানা ঘটনায় তার কথা একবারও মনে পড়েনি। সে যে তাকে দেখতে এত রাতে ছুটে এসেছে, এ-জন্য গভীর আবেগে বুক ভরে যেতে লাগল মলয়ের। সে বলল, 'ভালোই। তবে শরীরটা এখনও দুর্বল। ডাক্তাররা কিছুদিন রেস্ট নিতে বলেছেন।'

'ডাক্তাররা যা বলেছেন তাই করো।'

একটু চুপ করে থেকে কী ভাবল মলয়। তারপর বলল, 'তুমি কেমন আছ?'

শর্মিলা আধফোটা গলায় বলল, 'খুব ভালো।'

'না, তুমি ভালো নেই। এত রোগা হয়ে গেছ কেন?'

'কোথায় রোগা? আমি ঠিক আছি।'

অনেকক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে ব্যস্তভাবে মলয় জিগ্যেস কবল, 'এত রাত্তিরে তুমি কার সঙ্গে এলে?'

চমকে উঠল শর্মিলা। তারপর শিথিল গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা খুব দরকারী কথা আছে। শুনবে?'

স্নায়ুগুলো আচমকা প্রখর হয়ে উঠেছে মলয়ের। সে বলল, 'তার আগে জানতে চাই কার সঙ্গে এসেছ?'

মুখ তুলেই তক্ষুনি নামিয়ে নিল শর্মিলা। আবছা গলায় বলল, 'বাবার সঙ্গে।'

'কিছুক্ষণ আগে তিনি তো এসেছিলেন?'

'জানি।'

শর্মিলা তা হলে তাকে দেখতে আসেনি। তার আসার উদ্দেশ্যটা মলয়ের কাছে মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে গেল। শর্মিলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কাজে লাগাতে চাইছেন উমানাথ। ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠল মলয়ের। সে বলল, 'উনি কোথায়?'

শর্মিলা বলল, 'রাস্তার মোড়ে গাড়িতে বসে আছেন।'

চোখ কুঁচকে কী ভেবে মলয় এবার বলল, 'তুমি কী বলতে এসেছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু তা শোনা আমার পক্ষে উচিত নয়। আশা করি এ-নিয়ে তুমি আমাকে বিব্রত করবে না।'

মুখ লাল হয়ে উঠল শর্মিলার। বলল, 'না, করব না। আচ্ছা এখন উঠি।' তার গলা কাঁপতে লাগল।

'এখনই যাবে?'

'হ্যাঁ, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

শর্মিলা উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মলয়ও তার সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

বাইরে খানিকটা দূরে ডাইনিং রুমের কাছে মা, রুমা-টুমারা উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে কোনও কিছু জিগ্যেস করতে সাহস পেল না।

শর্মিলা ঝাপসা গলায় মাকে 'যাই' বলেই সোজা ডাইনিং রুম, ড্রইংরুম এবং 'লন' পেরিয়ে গেটের কাছে চলে এল। মলয়ও সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে। বলল, 'চলো, তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'দরকার নেই।'

রাস্তায় নেমে সোজা বাঁ-দিকে চলে গেল শর্মিলা। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

গেটের কাছে স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল মলয়। মনে হল জীবনের সব মাধুর্য এবং সুষমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

নয়

সেই যে শর্মিলা চলে গেল তারপর আরও মাসখানেক কেটেছে। এর মধ্যে কোর্টে স্মাগলারদের কেসের দু-দুটো শুনানি হয়ে গেছে। ঝন্টেরা এখনও জামিন পায়নি; তাদের জেল হাজতে রাখা হয়েছে। শুনানির সময় বার-বার উমানাথ ঘোষালের নাম উঠেছে। সাক্ষীসাবুদ যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে এই মামলা থেকে চামড়া বাঁচিয়ে তাঁর পক্ষে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

এই মামলার দু-দিনের শুনানির বিবরণ সব খবরের কাগজে বেরিয়ে গেছে। কাগজ থেকে সেগুলো তুলে উমানাথের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা পোস্টারে পোস্টারে সারা বিবিবাজার ছেয়ে ফেলেছে। মিটিং করে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমাগত স্লোগান দিতে-দিতে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। 'স্মাগলারদের বস', 'সমাজবিরোধীদের গডফাদার' উমানাথ ঘোষালকে চিনে নিন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিবিবাজারের সব চায়ের দোকান, ক্লাব, রোয়াকের আড্ডা, বৈঠকখানা উমানাথ ঘোষালকে নিয়ে সরগরম হয়ে ছিল।

শেষ পর্যন্ত উমানাথ নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তুমুল উত্তেজনা এবং উদ্দীপনার মধ্যে এই এক মাসের ভেতর ভোটও হয়ে গেছে।

কিন্তু এই শহর একেবারে অসহ্য লাগছিল মলয়ের। প্রতিদিনের কাজকর্ম সবই সে করেছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে কিন্তু সমস্ত কিছুই যান্ত্রিক নিয়মে। রোজ প্রতিটি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল এই শহরে সে আছে, শর্মিলাও আছে। কিন্তু কোনওদিনই আর তাদের দেখা হবে না। হলেও অপরিচিতের মতো উদাসীন ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে।

মা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে আলোচনা করে মলয় ঠিক করে ফেলল বিবিবাজারে আর থাকবে না। কলকাতার কাছাকাছি অন্য কোথাও পোস্টিং নেবে যাতে রুমাদের পড়াশোনার অসুবিধে না হয়।

অনেক ধরাধরি করে কলকাতার তিরিশ মাইলের ভেতর একটা পোস্টিং পেয়েও গেল মলয়।

আজ সকালে মা এবং ভাইবোনদের নতুন কাজের জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে মলয়। বিকেল চারটের নতুন এসপি-কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সে সেই অ্যামবেসেডরটায় উঠল। গাড়িটা তাকে বীরপুরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে।

কখন যে গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে পিচের মসৃণ রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করেছে, আর কখন যে বিবিবাজারের সীমানা পেরিয়ে কলকাতার দিকের হাইওয়েতে এসে পড়েছে, খেয়াল নেই। অন্যমনস্কর মতো জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল মলয়। দু-ধারের মাঠ-ঘাট শস্যক্ষেত্র অলৌকিক চলমান ছবির মতো পেছনে সরে সরে যাচ্ছে। এ শহরে কোনওদিন আর ফেরা হবে না, ভাবতেই অসহ্য কষ্টে

হৃৎপিণ্ড ফেটে যেতে লাগল যেন।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, রাস্তার একটা বাঁকের মাথায় এসে ড্রাইভার ব্রজদুলাল আচমকা ব্রেক কষল। পিচের ওপর চাকা ঘষটানো একটা শব্দ হল ক্যাঁচ করে গাড়িটা লাফিয়ে উঠেই থমকে গেল।

মলয় চমকে উঠে বলতে যাচ্ছিল, 'কী হয়েছে', তার আগেই চোখ পড়ল রাস্তার এক ধারে এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে শর্মিলা। রক্তস্রোত পলকের জন্যে থমকে গেল মলয়ের, পরমুহূর্তেই দুরন্ত বেগে ধমনীতে আছড়ে পড়ল। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে শর্মিলার কাছে চলে এল সে। বলল, 'এ কি, তুমি!'

শর্মিলা সোজা পরিপূর্ণ চোখে তার চোখের দিকে তাকাল। সে দিন রাতে প্রায় সারাক্ষণ অসীম কুণ্ঠায় চোখ নামিয়ে বসে ছিল সে। কিন্তু এখন সংকোচ গ্লানি বা লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই। সে বলল, 'তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানতাম, তুমি আজ চলে যাবে। তাই—'

'তোমার বাবা—' এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল মলয়।

শর্মিলা গভীর শ্বাস টেনে বলল, 'বাবা আমাকে পাঠাননি। আমি নিজেই এসেছি।'

'কিছু বলবে?'

তাকিয়েই আছে শর্মিলা। চোখ না নামিয়ে সে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল মলয়ের। সে বলল, 'কিন্তু—'

মলয় কথা শেষ করতে পারল না; শর্মিলা বলল, 'আমি সব ছেড়ে চলে এসেছি।' তার স্বর কাঁপতে লাগল।

শর্মিলাকে নতুন করে যেন আবিষ্কার করল মলয়। মনে হল, চারপাশের পৃথিবী আশ্চর্য মাধুর্যে ভরে যাচ্ছে।

গাঢ় আবেগে শর্মিলার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে মলয় বলল, 'এসো—'